স্মৃতির সাতকাহন

প্রথম খণ্ড

ধীরাজ গুহ

প্রান্তর

প্রান্তর প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
কর্ণেল বাড়ি, কৃষ্ণনগর, আগরতলা ৭৯৯০০১

Smritir Satkahan
***by* Dhiraj Guha**

প্রথম প্রকাশ ঃ আগরতলা বইমেলা, ফেব্রুয়ারী, ২০০৯
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ আগরতলা বইমেলা, মার্চ, ২০১৩

সম্পাদনা
ড. ননীগোপাল চক্রবর্তী ও হিমাংশু কীর্তনীয়া

প্রচ্ছদ ঃ **সুশীল**

চিত্র বিন্যাস
মিন্টু দত্ত ও অভিজিত ভট্টাচার্য

অক্ষর বিন্যাস
অরূপ দেবনাথ

প্রকাশক
শ্রীমতি সাধনা গুহ

মুদ্রণ
প্রান্তর প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
কর্ণেল বাড়ি, কৃষ্ণনগর, আগরতলা ৭৯৯০০১

মূল্য ঃ ২০০.০০

শ্রীচরণেষু মাকে

মু খ ব ন্ধ

সাতকাহন শিরোনামে আরোহণ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত ধীরাজ গুহর ব্যক্তিগত কলামের লেখাগুলি দুই মলাটের পক্ষপুটে বই হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছে এই কথা জানা ছিল। কিন্তু সেই বইয়ের একটা মুখবন্ধ আমাকেই লিখতে হবে এমন আশঙ্কা কখনোই করিনি। কিন্তু সেই অনুরোধই যখন এসে গেল তখন সেটা আর ফিরিয়ে দেওয়া গেল না।

সাতকাহনের কাহিনিগুলির সময়কাল ছয় সাড়ে ছয় দশকের; সংঘটন ক্ষেত্র মূলত ত্রিপুরা ও কলকাতা। সেই সঙ্গে একটু আধটু অসম এবং একটু আধটু ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশ। সেইসঙ্গে একটু বাংলাদেশও।

ধীরাজকে চিনি মহারাজা বীর বিক্রম কলেজে তার ছাত্র হিসাবে আসার সময় থেকে। তাকে দেখেছি ছাত্র সংগঠনের কর্মী হিসাবে, আদালতের উকিল হিসাবে, সমাজসেবী হিসাবে এবং সবশেষে দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে। এছাড়াও তার অন্য অনেক পরিচয় রয়েছে। তার রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্যের পরিচয় আমার সবিস্তারে জানা নেই। এবং একদমই জানা ছিল না তার গল্প বলার দক্ষতার কথা বা তার পরিহাস প্রিয়তার কথা।

রোগশয্যায় শুয়ে শুয়েই সাতকাহন রচনার কথা ধীরাজের মাথায় আসে। শুরুতেই সে কথা সে বলেছে। এই ইচ্ছার মধ্যে যে অন্তর্লীন সাহসিকতা লুকিয়ে আছে তার জন্য তাকে অভিনন্দন জানাতেই হয়। মানুষ শুধু দেহেই বাঁচে না, মনেও বাঁচে। কেউ কেউ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই বাঁচে। এই প্রসঙ্গে হামদি বে বা তার বে অব বেঙ্গলের কথা স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়ে যায়।

নিয়মিত রোজনামচা না লেখা কোন মানুষ পাঁচ দশকের সময়কালের ঘটনা চরিত্র ইত্যাদির অনুপুঙ্খ বিবরণ কি করে মনের মধ্যে ধরে রাখে সেটা ভাবলেই অবাক হতে হয়। কিন্তু ধীরাজ তার লেখাগুলির মধ্যে তাই করেছে। মাঝে মধ্যে কালক্রম হয়তো সঠিকভাবে রক্ষিত হয়নি। কোথাও কোথাও হয়তো বা অংশীদার কিছু কিছু ব্যক্তির নাম আসে নি। সার্বিক বিচারে কিন্তু ধীরাজকে তবুও স্মৃতিধরই বলতে হবে।

সাতকাহনের বিভিন্ন লেখাকে মোটামুটিভাবে তিনটি বড় দাগে ভাগ করা যায় — সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক লেখা, রাজনীতি সম্পৃক্ত লেখা এবং সম্পূর্ণ রাজনৈতিক লেখা। ধীরাজের পরিহাসপ্রিয়তার পরিচয় ছড়িয়ে আছে তার অরাজনৈতিক লেখার মধ্যে এবং

কিছুটা তার রাজনীতি সম্পৃক্ত লেখাগুলির মধ্যে। রাজনৈতিক লেখাগুলির মধ্যে ধীরাজ তার রাজনৈতিক মতামত নির্দ্বিধায় প্রকাশ করেছে। সেই মতামতের সঙ্গে একমত না হয়েও লেখাগুলির স্বাদ উপভোগ করা যায়।

বাল্যকালে বা কৈশোরে আমরা অনেকেই অনেক দুষ্টামি ও শয়তানি করে থাকি। ধীরাজও অবশ্যই করেছে। কিন্তু আমাদের সঙ্গে তার পার্থক্য এই যে সে সেগুলিও ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করে দিতে পেছপা হয়নি। প্রসঙ্গত সেই সব ঘটনার কুশীলবদের নামও এসেছে। নারকেল চুরি, ভেড়া চুরি ইত্যাদির কাহিনির বর্ণনা করতে করতে তার মনে হয়েছে আর বেশি বললে হয়ত বন্ধুরা রাগ করতে পারে। তাই তাকে লিখতে হয়, "এ লেখা প্রকাশিত হওয়ার পর শারীরিকভাবে নিগৃহীত হতে পারি।" ধীরাজের এই আশঙ্কা অমূলক বলেই মনে করি। তার বন্ধুরাও তো তাকে ভালবাসে।

রাজনীতি সম্পৃক্ত লেখাগুলির মধ্যে ধীরাজ খুব সহজ চালে ত্রিপুরার গত পঞ্চাশ বছরের বামপন্থী রাজনীতি এবং রাজনৈতিক ছোট বড় কুশীলবদের কথা তুলে ধরেছে। তুলে ধরেছে নকশাল রাজনীতি এবং কংগ্রেস রাজনীতির কথাও। এ গোত্রের লেখাগুলির মধ্যে কলকাতার রাজনীতির কথাবার্তাও চলে এসেছে সহজ ছন্দে। এসেছে কলকাতার ছাত্র রাজনীতির কথা এবং ছাত্রপরিষদের নেতাদের কথাও।

সম্পূর্ণ রাজনৈতিক যে লেখাগুলি সাতকাহনে আছে সেগুলির মধ্যে ধীরাজের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশিত। এই রকম লেখাগুলির সঙ্গে অনেকেই দ্বিমত পোষণ করতে পারেন। ধীরাজের বিশ্লেষণ সঠিক মনে না হতে পারে কারো কারো। পড়তে পড়তে কেউ একটু মুচকি হেসেও ফেলতে পারেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা আনন্দ পাবেন একথা বলা যায় নিঃসন্দেহে।

শেষ করার আগে "সাতকাহন" শব্দগুচ্ছ নিয়ে একটু কথা। সাত এবং কাহন পৃথক পৃথক শব্দ হিসাবে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজী আব্দুল ওদুদ এবং রাজশেখর বসুর অভিধানে আছে। কিন্তু "সাতকাহন" শব্দটি কোনটাতেই নেই। একটা হাল্কা ধারণা ছিল সাতকাহন মানে বাড়িয়ে চড়িয়ে বলা। কিন্তু সব দেখে এখন মনে হচ্ছে সাতকাহন -এর অর্থ হিসাবে "অনেক অনেক কথাকেই" মেনে নিতে হবে। ধীরাজ সাতকাহনে অনেক অনেক কথাই বলেছে।

আশা করি ধীরাজের সাতকাহন সবারই ভাল লাগবে। সাতকাহনের মধ্যে আমরা অনেকেই নিজেদের কিংবা নিজেদের পরিপার্শ্বকে খুঁজে পাব। মনে হবে সত্যিই তো আমিও তো সেখানে ছিলাম।

মিহির দেব

সূচি

বিশু পর্ব

প্রয়াত নৃপেনদা ভীষণ আড্ডাবাজ লোক ছিলেন। অবসর সময়ে আমাদের পেলে কি খুশিই না হতেন। আড্ডার সময় একদিন তিনি বললেন, জানো তো আনন্দবাজার পত্রিকায় যখন কাজ করতাম তখন প্রায়ই নিউজের খরা দেখা দিত। পত্রিকার পাতা তো আর খালি ছেপে বের করা যায় না। তখন আমরা হাহাকারের কাহিনী লিখতাম। আগে থেকেই মোটামুটি তৈরি করা থাকত আপতকালীন সময়ে ব্যবহারের জন্য। সেগুলি কি — যেমন দক্ষিণ বঙ্গে জলের হাহাকার, উত্তরবঙ্গে খরায় মাঠ চৌচির ইত্যাদি।

দিল্লিতে চিকিৎসার কারণে এসে মনে হল আমাদের যৌবনের সোনাঝরা দিনে যে সমস্ত মহান, ত্যাগী এবং বর্ণময় ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসেছি এদের কথা অবসরকালীন সময়ে লিখে রাখলে কোন একদিন হয়ত আরোহণের নিউজের খরার সময় এই অভিজ্ঞতাগুলো হাহাকার হিসেবে নয়, অমূল্য সম্পদ হিসাবে আরোহণ কর্তৃপক্ষ ব্যবহার করলেও করতে পারে।

আরোহণ পত্রিকার রোববারের আরশি-র পরিচালিকা জয়া গোয়ালা আমার স্নেহভাজন, ছোটবোনের মত। সেও আমার প্রতি দুর্বল বলেই মনে হয়। এমনিতে 'আরশি'-র পাতার গুণগত মান সম্পর্কেও ভীষণ খুঁতখুঁতে এবং সাবধানী। পছন্দ না হলে যার লেখাই হোক ছাপায় না। সেই জয়া কিনা আমার প্রতি অনুকম্পাহেতু সাহিত্যের পাতাটির অন্যান্য লেখার মত গুণমান সম্পন্ন না হওয়া সত্ত্বেও আমার বেশ কিছু কবিতা ছাপিয়ে দিয়েছে। আমিও সাবধানী। নিজের নাম ব্যবহার করিনি, ছদ্মনামে লিখেছি। কেননা সেই গল্পটি আমার মনে আছে।

এক স্বরচিত কবিতাপাঠের আসরে এক নব্য কবি তার দীর্ঘ কবিতা আবৃত্তির পর দেখলো সামনে উপবিষ্ট শ্রোতা কেউ নেই তবে লাল জাঙ্গিয়া পরিহিত এক পালোয়ান একটি তৈলাক্ত, শক্ত বংশ দণ্ড নিয়ে মঞ্চের সামনে পায়চারী করছে। অনেকক্ষণ ইতস্তত করে কবি মঞ্চ থেকে নেমে পালোয়ানকে করজোড়ে বলল, এবারের মত আমাকে রেহাই দিন। আর কবিতা পাঠ করব না। পালোয়ান প্রত্যুত্তরে জানাল, ধুর মশাই, আপনাকে কে খুঁজছে, আপনাকে যারা নির্বাচিত করে নিয়ে এসেছে সেই কর্মকর্তাদের আমি খুঁজছি। পাঠকরাই বলুন, এরপরও কি নিজ নামে কবিতা লেখার সাহস করা যায়? কেউ যদি স্ব-রচিত কবিতা পাঠের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে বসে? পীযূষ রাউত জাতীয় নমস্য কবি ব্যক্তিত্বদের বুকের পাটা বড়। তাঁরা সাহস করে স্বনামে লিখে

যান। আমরা বরঞ্চ পঞ্চাননী দেবী, সৌদামিনী হাজরা ইত্যাদি ছদ্মনামে চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারি।

এখন আবার জয়া পেছনে পড়েছে জম্পেশ একটি গল্প লিখে দেওয়ার জন্য। মনে মনে ভাবি সব পিতা মাতার কাছে নিজের সন্তানের যেমন চাঁদ-পানা মুখ প্রতিভাত হয়, জয়া ওদের কাছেও কি আমাকে সব কাজের হলুদ, সব্যসাচী মনে হয় না কি? ভালোবাসার দায় ফেরানো কি যায়? গল্প না হোক স্মৃতির মালা গেঁথে দেখার চেষ্টা করি না কেন?

আমার এক বন্ধু আছে বিশু। আর বিশদ পরিচিতি দেব না। এ লেখা প্রকাশের পর শারীরিকভাবে নিগৃহীত হতে পারি। বয়স ২ বছর ভাঁড়িয়ে চাকরি নিয়ে গতবছর অবসরে এসেছে। এমন বর্ণময়, দোষে-গুণে মিলিয়ে মানুষ আমি আর দেখিনি। পাদ প্রদীপের আলোয় সে আসতে চায়ওনি এবং আসতেও পারে নি।

বিশুর বাবা পাড়ার জীবনদাকে স্নেহ করত ভালছাত্র এবং কর্তব্যনিষ্ঠ, সৎ মানুষ হিসাবে। জীবনদাকে অনুরোধ করল, প্রতিবছর প্রতি ক্লাসে ঠোকর খাওয়া বিশুকে একটু পড়াশোনায় সাহায্য করতে। জীবনদা থেকে বিশু বয়সে বড় কিন্তু জীবনদার ছোটভাই-এর সঙ্গে নীচু ক্লাসে পড়ে। বিশুর তো পোয়াবারো। প্রতিদিন সকালে বইখাতা নিয়ে বাবার চোখের সামনে দিয়ে জীবনদার বাড়িতে পড়াশোনা করতে যায়। বিশুর বাবা ভাবে ছেলের এবার একটা গতি হবে। তিনি কি জানতেন পড়তে যাওয়ার সময় বিশু পকেটে এক প্যাকেট বিড়ি নিয়ে যায়। বিশুর পড়াশোনার উন্নতি কতটুকু হয়েছে জানা যায়নি। তবে জীবনদাকে অল্প কয়দিনে ধূমপায়ী করে ছেড়েছিল। সেই বিশুর সঙ্গে প্রতিদিন দেখা হত। বছর বারো/চোদ্দ আগে হঠাৎ ৫/৭ দিন দেখা নেই। দেখা হলে বললাম, কি ব্যাপার, কোথায় ছিলি? গম্ভীরমুখে বলল, ছেলেটা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে, তাই একটু 'সমাজ বিদ্যা' সন্ধ্যার সময় দেখিয়ে দিয়েছি। আমি সভয়ে বললাম, করেছিস কি তুই? তুই নিজে বসন্ত রোগীদের জন্য আলাদা রুমে বসে পরীক্ষা দিলি আর আমরা উমাকান্ত স্কুলে বীরবাদল সেনের সমাজ বিদ্যা ক্লাস না করে পরীক্ষার সময় অযথা লুজ শিট নিয়ে যা ইচ্ছে তা লিখে খাতা ভারী করে জমা দিতাম যাতে স্যার, খাতার আয়তন দেখে বিরক্ত হয়ে খাতা না দেখেই মার্কস্ দেন। আমাদের অনুমান মিলে যেত, ৪০/৪৫ গড়ে সবাই পেয়ে যেতাম। ঘটনা হল বিশুর ছেলে আগের পরীক্ষায় নিজের উদ্যোগে সমাজ বিদ্যাতে পেয়েছিল ৪৭। বিশুর তদারকির পর পায় ৩৩ মার্কস। এরপর আর বিশু ছেলেকে পড়ানোর সাহস পেয়েছে কিনা আমার জানা নেই। প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের অনবদ্য সৃষ্ট চরিত্র ঘনাদা, সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা। যদি আমার প্রেমেন্দ্র মিত্র বা সত্যজিতের মত লেখার মুন্সিয়ানা থাকত তবে বুক ঠুকে বলতে পারতাম আমাদের বিশুও কম যায় না। আমার কথা ঠিক কিনা পাঠকদের ওপর বিচারের ভার ছেড়ে দিলাম। ১৯৭০/৭১ সন। বিশু সি. পি. আই (এম) দলের সর্বক্ষণের কর্মী ছিল না। তবে হলপ করে বলতে পারি মাসোহারা ছাড়া ২/৩ জন সর্বক্ষণের কর্মীর কাজ হাসি মুখে সে একা করে যেত। প্রয়াত নেতা ভানু ঘোষ এবং কানু ঘোষ এই দুই ভাইয়ের অত্যন্ত স্নেহভাজনদের মধ্যে বিশুসহ আমরা বেশ কয়েকজন ছিলাম। ঘুম থেকে ভোরবেলা উঠে আবার রাত্রিতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত বিশুর কাজের তালিকা শুনলে যে কোন

লোক গাল গল্প মনে করবেন। পার্টি মুখপত্র বিক্রী, অফিসে অফিসে বন্ধ কালেকশান, পোস্টার লেখা, পোস্টার সাঁটা, নাটকের মঞ্চ সজ্জা, সভা-সমাবেশে যোগ দেওয়ার জন্য গ্রুপ সভা করা, পার্টির পোস্টার ফেস্টুন নিয়ে মফস্বলে বয়ে নিয়ে যাওয়া, মাইকিং করা, লিফলেট বিলি করা তার ওপর আমাদের ধমক হাসিমুখে খেয়ে তপন করের ফাই-ফরমাস খাটা—এসবই ছিল বিশুর কাজ। ভাল কথা মনে পড়ে গেল— বিশু গণসংগীতও গাইত তপনদার সঙ্গে। বর্তমান পুরপিতা শঙ্কর দাশ বলতে পারবেন সেগুলো গণসংগীতের পর্যায়ে পড়ত কিনা।

বিশু 'গণশক্তি', পত্রিকা বিক্রী করত। গ্রাহক আমরা ঠিক করে দিয়েছিলাম সবাই মিলে। দুই-তৃতীয়াংশ কমিশন অন্য আরেকজন পার্টি সহযোদ্ধাকে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য দিয়ে দিত আমাদের কথা অনুযায়ী হাসিমুখে। সেই সহযোদ্ধা বন্ধু আজ সমাজের অনেক উঁচু জায়গায় প্রতিষ্ঠিত। জানি না তার বিশুর মুখখানা মনে আছে কিনা। আগরতলা শহর, শহরতলি, সদর সব মিলিয়ে তখন সক্রিয় পার্টি কর্মী ক'জন? হাতে গোনা ২০/২৫ জন হবে কি? সভা-সমিতি, প্রচার, তহবিল সবই তপন করের নির্দেশ অনুযায়ী বেশিরভাগ কাজই বিশুকে করতে হত। এমনই একটা সম্পর্ক তখন আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল যে রাতে বাড়িতে ফেরার সময় হলে সবার মন খারাপ হয়ে যেত।

বিশু পোস্টার লিখে ফায়ার ব্রিগেড চৌমুহনিতে পোস্টার সেঁটে পার্টি অফিসে এসে বসেছে। কিছুক্ষণ পর ভানুদা সাইকেল চড়ে সেই পথেই পার্টি অফিসে এলেন। আমরা সবাই আছি। বিশু সগর্বে ভানুদাকে জিজ্ঞেস করল ভানুদা ফায়ার ব্রিগেডে আমার লেখা পোস্টারটা আপনার চোখে পড়েছে কি? ভানুদা বিশুকে বলল, তুই ভাত খেয়ে এসেছিস? বিশু বলল না। ভানুদা পার্টির মাসিক বাকি হোটেলে ভাত খাওয়ার একটা স্লীপ বিশুকে দিয়ে বলল, তুই ভাত খেয়ে পোস্টারের পাশে গিয়ে দাঁড়া। তুই কি লিখেছিস পথচারীদের পড়ে শুনিয়ে দিস, নয়ত কেউ তোর লেখা বুঝে উঠতে পারবে না।

১৯৭০ সালে ত্রিপুরা রাজ্যকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দানের দাবিতে আইন অমান্য আন্দোলন। বিভিন্ন ঘরোয়া সভায় কানু ঘোষ বক্তা। সঙ্গী বিশু। কানুদা প্রতিটি সভায় বললেন, কমরেড — আইন অমান্যের দিন যাওয়ার আগে পারিবারিক সব দায়িত্ব কাউকে বুঝিয়ে দিয়ে যাবেন। আইন অমান্যকারীদের গুলি করে শচীন সিংহের সরকার খুন করতে পারে, বড়মুড়া পাহাড়ে ছেড়ে দিয়ে আসতে পারে কিংবা বন্দি করে বিহার বা অন্য কোনও রাজ্যের জেলে পাঠিয়ে দিতে পারে। বিশুর বক্তব্য, কানুদা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন ব্রিটিশ শাসকদের মত কংগ্রেস শাসকরা একইরকম কাজ করতে পারে। ফলস্বরূপ লাভ একটাই হয়েছিল, ভয়ে অনেকেই আইন অমান্যে অংশ গ্রহণ করতে আসেনি।

সকালে আইন অমান্য আন্দোলনে যাওয়ার সময় কানুদা সজল চোখে তাঁর একমাত্র সম্বল বাই-সাইকেলটি এবং জীর্ণকুটিরের চাবি দুর্গাচৌমুহনির হোমিওপ্যাথি ডাক্তার পার্টি কর্মী রমেশ দেবনাথকে দিয়ে বললেন যদি ফিরে না আসি সাইকেল এবং চাবি পার্টি অফিসে জমা দিয়ে দিও।

বিকালে আইন অমান্যকারীদের গ্রেপ্তারের পর সবাইকে জেলখানার মাঠে ব্যারিকেড করে রেখে সন্ধ্যের পর ছেড়ে দেওয়া হয়। হঠাৎ বিকেলে আগরতলা সেন্ট্রাল জেল থেকে

কানুদার ফোন বটতলা পার্টি অফিসে। ধরলেন ভানুদা। বিশুকে ডেকে ফোন দিলেন। কানুদা বিশুকে নির্দেশ দিলেন আইন অমান্যে আসার আগে দু'টো ডিম কেটলিতে সিদ্ধ বসিয়ে এসেছেন। খেয়ে আসতে মনে নেই। রমেশ দেবনাথ থেকে চাবি নিয়ে দু'টো ডিম যাতে এক্ষুনি আমি আর বিশু গিয়ে খেয়ে আসি। বিশু আমাকে নেয়নি। একাই খেয়ে এসেছিল সে দু'টো ডিম। কের চৌমুহনির জহরের চা-এর স্টল, বটতলা অমৃতায়ন বা আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, রাত্রিতে কের চৌমুহনির তপন করের বাড়ি ছিল আমাদের আড্ডার জায়গা। না এসব আড্ডায় সি. পি. আই. (এম.) দলের বর্তমান স্টার নেতাদের মধ্যে কেউ যেতেন না। আমরা যারা পার্টি করে আনন্দ পেতাম, ফলাফল কি হবে তত চিন্তা করার মত মেধা শক্তি ছিল না, মাঝারি গোছের বাড়ি ঘরের বন্ধনহীন অনেকটা বখাটে ধরনের বলতে পারেন তারাই সেসব আড্ডার আসরের কুশীলব ছিলাম। এখনকার প্রতিষ্ঠিত নেতাদের মধ্যে একমাত্র শঙ্কর দাশের যাতায়াত ছিল সেসব আড্ডায়। সারাদিন হাড় ভাঙা খাটুনির পর ৫টা চা'কে ৭ টা করে নিমকি সহযোগে খাওয়া হত। কানুদা সাবধান করে দিয়ে বলতেন, নিমকি চিমটি দিয়ে তুলে খাবি, নয়ত নির্ঘাৎ যক্ষ্মা হবে। সে যা হোক, বিশুর নাম পড়েছিল কাঁচি বিশু। কেন? কেউ সিগারেট ধরালেই তার ডান হাতের মধ্যমা ও তর্জনী কাঁচির মত কারোর মুখের সিগারেটের দিকে ধেয়ে যেত। বিশুকে উপেক্ষা করে কার সাধ্য।

সারাদিন কাজের পর প্রায় প্রতিদিনই নির্মল আড্ডা জমত। যে আসরে পরচর্চা, পরনিন্দা এসবের কোনও ঠাঁই ছিল না। আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের জন্য দুঃখ হয়। এরা এসব আড্ডায় যোগ দেওয়ার অবকাশ করে উঠতে পারেননি। যদি কষ্ট করে সময় করে উঠতে পারতেন অনেক মুক্তমনা, পূর্ণাঙ্গ মানুষ হতে পারতেন। এরা হয়ত এসব আড্ডাকে ঘৃণাই করতেন বা সময় নষ্ট করা বিবেচনা করতেন।

সেই আড্ডায় বর্তমান ত্রিপুরা আইন কলেজের অধ্যক্ষ জার্মান ভাষায় বক্তৃতা দিতেন। জীবনে কোনদিন কৃষ্ণকেশব রায় এক বর্ণ জার্মান ভাষা শেখেননি আমরা সবাই জানতাম। বর্তমানে প্রগতি স্কুলের শিক্ষক বিজয় সিংহ রায় সেই বক্তৃতার বাংলা অনুবাদ করত। কোনও না জানা লোক আড্ডায় ঢুকে পড়লে সবিস্ময়ে হাঁ করে সেই বক্তৃতা শুনে তারিফ না করে পারত না। প্রয়াত বন্ধু কের চৌমুহনির চন্দন চক্রবর্তীর গলা ছিল খুব সুরেলা আর শঙ্করদার তো কথাই নেই। শঙ্করদার গান শুনেই তো ফুলনদি মজল। যদিও সিগারেট খেয়ে সে গলা এখন আর নেই। এরা দু'জন গণসংগীত গাইত। আমাদের শরীরের প্রতিটি রোমকূপ সজাগ হয়ে উঠত, মন উদাস হয়ে যেত সত্যিই আমাদের দেশে কবে রুশ বিপ্লবের মত ঘটনা ঘটবে। বিপত্তি দেখা দিত এরপর যখন তপন কর, বিশুকে নিয়ে গণসংগীত ধরতেন। ১/২টা নয় ৩/৪টা গাইতেন দু'জনে মিলে। উঠে যাওয়ার বা উসখুশ করার উপায় নেই। খুব মনোযোগ দিয়ে (বেসুরো) গান শুনছি ভাবখানা দেখিয়ে যেতে হত। কেননা রাত্রিযাপন তো প্রায়দিনই তপনদার বাড়িতেই করতে হত। তপনদার মা বা বড় বৌদি আমাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। অর্থাৎ আমার আর শঙ্করদার। বিশু আর চন্দনের বাড়ি কাছাকাছি, এরা গভীর রাতে যার যার বাড়িতে চলে যেত। প্রায়ই তপনদা শারদীয়া দেশহিতৈষী বা অন্যান্য পার্টি বই থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রবন্ধ পাঠ করে আমাদের শোনাতেন।

এরমধ্যে মাঝে মাঝে বিনোদনের আসর বসত। কেশবের পূর্বপুরুষ নোয়াখালির লোক এবং আমার বাবা-মা এদেরও আদি বাড়ি নোয়াখালি। আমার বাবার বিয়ে আগরতলায় এবং আমার জন্মও আগরতলায়। আমি কখনও নোয়াখালি যাইনি। কিন্তু আমাদের ধলেশ্বর কল্যাণী এলাকায় কৃষ্ণগোপাল দাসের বিধবা পিসি আমার দৌরাত্ম্যের কারণে আমাকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন গালাগাল এবং আমার প্রয়াত ঠাকুরমার ভাষা শুনে নোয়াখালি ভাষা ভালই আয়ত্ত করেছিলাম। কেশব তো এই ভাষায় চোস্ত ছিল। প্রায়ই আমি আর কেশব নোয়াখালি ভাষায় ঝগড়া করতাম। সকলে হেসে লুটোপুটি খেত। এক অনাবিল আনন্দময় জীবনের যাত্রী ছিলাম সবাই। একদিন কেউ পার্টি অফিসে বা আড্ডায় না এলে সকলে মিলে সাইকেল নিয়ে পরদিন ছুটতাম তার বাড়ি। কেউ সুস্থ থাকলে পার্টি অফিসে আসবে না — বিশ্বাসই করতে পারতাম না কেউ।

আমরা তো মাঝে মাঝে কাজ ফাঁকি দিয়ে তাড়াতাড়ি আড্ডায় চলে আসতাম। বিশু সব কাজ সেরে আড্ডার মাঝখানে মূর্তিমান ভগ্নদূতের মত এসে যোগ দিয়ে বলত, তপনদা শুনেছেন আমাদের পাড়ার কণকের বিয়ে ঠিক হয়েছে। তপনদা শুধাল, তুই কি করে জানলি? বিশু বলত, আজ দুপুরে কণকের মা, মাসিমাকে (কর্মচারী নেতা প্রয়াত দিগ্বিজয় ভট্টাচার্যের মা) বলছিল — মাসিমা আন্গো কণ-র তো বিয়া ঠিক হইছে। মাসিমা জিজ্ঞেস করেন — ছেলে কি করে? কন'র মা জানায় অতশত জানি না গো মাসিমা, শুনেছি ছেলে মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে অল্প কথায় লিকে। আপনি তো জানেন মাসিমা, চাঁদেরও কলঙ্ক আছে আন্গো কণর কোনও কলঙ্ক নাই। আন্নেগো আশীর্বাদে ছেলে ভাল না হয়ে পারেনা, কি বলেন? কথা বলা শেষ করেই বিশু কাঁচি বাড়িয়ে দিল সিগারেটের জন্য। সিগারেটের আধখাওয়া টুকরো হাতে দিয়ে বললাম — আরে পাত্র কি করে বুঝলাম না তো। বিজ্ঞের মত বিশু উত্তর দিল এ কারণেই তোমার জীবনে কিস্যু হল না। পাত্র মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে স্টেনোগ্রাফারের কাজ করে। আমরা সবাই প্রাণখোলা হাসিতে ফেটে পড়লাম। পাত্রটির নাম নাই বা জানালাম। পাঠকরা অনুমান করে নিতে পারেন।



বিজয় সিংহরায়

আরেক দিন বিশু এসে আমাদের অল্প কথায় রামায়ণ শোনাল। সে এক অনবদ্য অনুভূতি আমাদের। ওকে এক প্যাকেট চারমিনার সিগারেট উপহার দিয়েছিলাম।

বিশুর জবানিতে জানা যায়, নিম্নোক্ত অল্প কথার রামায়ণটি সে শিখেছিল তার পিসীমা রাজ্যের খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী স্বপন নন্দীর মায়ের কাছে।

"ঔ যে দেখৌন উঠুন সুরজ বিয়ানিয়ার বেলা,
তারপুত্র দশরথ আছলান বড় বালা।
তিন বিয়া করিলান রাজা কপাল পুড়িয়া,
একই গুয়ার না অইলা একই গুয়া পুয়া।

কুবাই থিক্কা আইলান মুনি রাজার ও অন্দর,
গাইট্টা গাইট্টা চাইর পোয়া হইলা রাজার ঘর।
বড় রাণীর ঘর ও রাম, মাইঝের ও লক্ষণ,
ছরু রাণীর ঘর ও হইলা ভরত, শত্রুঘ্ন।
রাজা যখন বুড়া হইলায়, রাম হইতা রাজা,
হুনিয়া খুশী হইলায় রাজ্যের যত প্রজা।
কেকুর বাপের বান্দী, কপাল বড় পুড়া,
পিঠজ্বলাখান, মনওলাখান, ধেনুরলাখান তেরা।
ওতা শুনি কেকুরে কইন,
রাম হইতা রাজা,
তোর দুই পোয়া কি খুদের জাউ খাইতা?
ওতা শুনি কেকুর মাথাত চৌরঙগী দিলাইলা,
উপাস করি, গোঁসা করি, মাটির উপর হুইলা।
ইতা দেখি দশরথ কৈন ইতা কর কিতা,
এই বেলা দিতাম পারি তুমি চাও যিতা।
রাম গেলা বনবাস, ভরত বড় বোখা,
হিংহাসনে বওয়াইলাইন রামের পাদুকা।
বন থিকা বৌ চুরি করিলাইন রাবণ,
রাবণ মারি হিতা আইনলাইন,
হৌ তো রামায়ন।"

সিলেট জেলার বসবাসকারী জনগণের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। সিলেট জেলার ভাষাকে উপহাস করার জন্য এই রামায়ণ রচিত হয়নি।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই বিশুর কাজ ছিল ইলা মাসীমার (প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ) বাড়িতে গিয়ে চা খাওয়া। একদিন সকালে চা খেতে গিয়ে দেখে সুদৃশ্য, সতেজ একটি লাউ ইলা মাসীমাদের উঠোনে গড়াগড়ি খাচ্ছে। বিশু এর কারণ জিজ্ঞেস করলে ইলা মাসীমা জানান, লাউটি দেখতে সুন্দর হলেও প্রচণ্ড তেতো। এটা তাদেরই গাছের লাউ। বিশু সেই লাউ তুলে নিয়ে চলে আসে কের চৌমুহনি জহর পালের চা স্টলে। কের চৌমুহনির মোড়ের বড় পুকুরওয়ালা বাড়ির প্রশান্ত চৌধুরীর লাউটি দেখে পছন্দ হয়। বিশুর কাছ থেকে মাছের মাথা দিয়ে লাউয়ের ঘণ্ট খাবে বলে ৪ আনা দিয়ে লাউটি কিনে নিয়ে যায়। বিশু ভীষণ তৎপর হয়ে ওঠে ৪ আনা তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলার জন্য। ১৫/২০ মি:


কৃষ্ণকেশব রায় (মামা কেশব)

পরে প্রশান্ত চৌধুরী লাউয়ের দু'টি টুকরো নিয়ে জহর পালের দোকানে এসে বিশুকে চেপে ধরে ৪ আনা ফেরৎ দেওয়ার জন্য। প্রশান্তের মা লাউ কাটতে কাটতে অভ্যেসবশতঃ এক টুকরো মুখে দিয়ে বোঝে প্রচণ্ড তেতো। তারপরই প্রশান্ত লাউ নিয়ে পয়সা ফেরতের জন্য আসে। বিশু বলে আমার গোটা লাউ ফেরৎ দিয়ে পয়সা নিয়ে যাও। আমি টুকরো লাউ নেব কেন? প্রশান্তের পক্ষে আর বিশুর কাছ থেকে ৪ আনা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। অম্বরীশ দেববর্মার বাড়িতে নূতন দালান তুলছে। বিশু সবুজ দু'টো চারা গাছ নিয়ে অম্বরীশের সামনে দিয়ে ধীরলয়ে হেঁটে যাচ্ছে। অম্বরীশ জিজ্ঞেস করল বিশু কিসের চারা? বিশুর বাবা ফরেস্টে কাজ করতেন। বিশু বলল বাবার ওখানে গিয়েছিলাম, দু'টো জহরী চাঁপার চারা এনেছি। অম্বরীশ পীড়াপীড়ি করতে তাকে দিয়ে দিল। কয়েক দিনপর অম্বরীশের বাড়ির দেওয়ালে ফাটল ধরার অবস্থা। কি ব্যাপার ওই চারা দু'টো জহরী চাঁপার নয় বটের চারা ছিল।

আরেকটি ঘটনা এটি অবশ্য আমি দেখিনি কেননা তখন তপন কর বা বিশুর সঙ্গে সখ্য ছিল না। প্রগতিস্কুল সংলগ্ন এলাকায় আদিবাসীদের বাড়িতে বিশেষ একটি নেশা জাতীয় জিনিষ তৈরী হত। তখন নাকি পুলিশের খুব উৎপাত চলছে। কেউ ঐ এলাকার ধারে কাছে ঘেঁসতে পারে না। তপনদা কার সঙ্গে যেন বাজী ধরে ভাগনে বিশুকে দিন দুপুর বেলা বাই-সাইকেলের সামনে বসিয়ে নেশার বোতলে পাতাবাহার গাছের ডাল ভেঙে ঢুকিয়ে সাইকেল চালিয়ে পুলিশের সামনে বেরিয়ে এসেছিলেন এবং বাজী জিতে নিয়েছিলেন।

বিশু ওদের কের চৌমুহনির একটি গ্রুপ ছিল। মিনটু, হাবলু, গুপু, টুটু, রাকেশ, বিশু ইত্যাদি। যে কোন বিয়েবাড়িতে বরযাত্রী হিসেবে এরা খেতে বসলে একটা সময়ে কনে পক্ষের কাউকে খুঁজে পাওয়া যেত না। প্রতি জনে ৩০/৩৫ টুকরো মাছ, ৪০/৪৫ টি রসগোল্লা, ৩/৪ হাঁড়ি দই, প্রায় ১ কেজি খানেক মাংস গলাধঃকরণ এদের কাছে কিছুই নয়। এরা আলুকে বলত ক্ষতি। অর্থাৎ আলু খেয়োনা, পেটভরে যাবে। তাই আলু ক্ষতির সমার্থক। বিশুর কথায় কাঁঠাল খেতে গেলে ১ কোয়া থাকতে হয় মুখে, ১ কোয়া হাতে আর ১ কোয়ার ওপর চোখ। বিশুর ছে৷ে সিঁদল দিয়ে ১ থাল ভাত খেতে পারে না বলে বিশুর মনে খুব দুঃখ। ছেলে মানুষ হয়নি ব৷ে বিশুর আক্ষেপ।

বিশুর বাবা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে কাজ করতেন। একবার মফঃস্বল থেকে বাড়িতে আসার সময় প্রায় ১মন মিষ্টি আলু বাড়িতে এনেছেন। ২/৩ দিন পর বিশুর বাবার এক বন্ধু বাড়িতে এলে বিশুর বাবা বিশুর মাকে ডেকে বলেন, অমুকবাবুকে কিছু মিষ্টি আলু দিয়ে দাও। বিশুর মা বিশুর বাবাকে আড়ালে ডেকে বলে, তোমার কি কোন আক্কেল নেই? ছেলেপিলের ঘর, ভাত খেতে বসার সময় আলু চুলোয় দিয়ে বসে। খাওয়া শেষ হলে মিষ্টি আলু পকেটে পুরে বাইরে বেরিয়ে যায়। ঘরে কোত্থেকে মিষ্টি আলু থাকবে। বিশুর বাবা চোখ কপালে তুলে বললেন সামনের বার আসার সময় বিষ কচু নিয়ে আসব। দেখি রাবণের গুষ্টি কত খেতে পারে। বিশুর বাড়িতে রাজমিস্ত্রীরা দালানের কাজ করছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় যাওয়ার সময় তাদের কাজের সাজসরঞ্জাম একটি ঘরে জমা রেখে যায়। একদিন সকালে এসে সরঞ্জাম রাখার ঘর ভেতর থেকে কিভাবে যেন ছিটকিনি পড়ে

যাওয়ায় টানাটানি করে খুলতে পারছিল না। ঠিক উল্টো দিকে ঠাকুর ঘরে বিশুর বাবা পুজো দিচ্ছিলেন, তিনি আড়চোখে সব নজর রাখছিলেন। পুজো শেষে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বলে উঠলেন, ঠাকুর আমার রান্নাঘরে স্থায়ীভাবে এমনি করে কবে ছিটকিনি পড়বে বলে দাও।

ইমারজেন্সীর সময় বিশু তার বন্ধু অম্বরীশকে নিয়ে কোলকাতা যায়। আমি তখন রবীন্দ্রভারতী হোস্টেলে থাকি। বিশুর কাকা কোলকাতা থাকেন, কাকীমা ঘটি। বিশু খেতে বসলে আর এক হাতা ভাত দিই বাবা, বলে যে পরিমাণ ভাত দিতেন কাকীমা তাতে বিশুর পেটের এক কোণাও ভরত না বলে ওরা চলে আসত আমার এখানে। রবীন্দ্রভারতী হোস্টেলের সামনে ৩/৪ টি হোটেল ছিল। মিল সিষ্টেমে খাওয়া জুটত। ২/৩ দিন খাওয়ার পর বিশু ও অম্বরীশকে বলে দিল, মিল সিষ্টেমে হবে না। পাইস সিষ্টেমে খেতে হবে। দু'দিন খাওয়ার পর এদের আর পাইস সিষ্টেমে ও খেতে দেয় না। কেননা পাইস সিষ্টেমেও দোকানীরদের পোষায় না।

তখন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের শাসন চলছে পশ্চিম বাংলায়। বহু পার্টিকর্মী বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ। পরস্পরের সঙ্গে দেখা করার জন্য অনেকেই শহিদ মিনার সংলগ্ন এলাকায় আসত। কেননা সে অঞ্চলটা ছিল 'নো ম্যানস্ ল্যান্ড'। সে কারণে শহিদ মিনার এলাকায় বহু অস্থায়ী খাবারের দোকান গড়ে উঠেছিল। ২/৪ দিন খাওয়ার পর বিশু আর অম্বরীশকে সবাই চিনে ফেলে। এরপর থেকে ওরা গেলেই বলত খাবার নেই।

৫/৬ বছর আগে ভোর ৪টে নাগাদ বিশুর ছেলের ফোন, বাবা খুব অসুস্থ। জি. বি. হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। নিজে গাড়ি চালানো শিখিনি। তাই ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেটের সম্পাদক আমার বন্ধু রূপক বর্মন কে ফোন করলাম। রূপক এলে গাড়ি বের করে বিশুর কৃষ্ণনগরের ভাড়া বাড়িতে গেলাম। ওর ছেলে ধরে ধরে তাকে নিয়ে এল। বিশুকে জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে? কাঁদো-কাঁদো গলায় বিশু বলল, আমি খেতে পারি না। অনেক দুঃখের মধ্যে হাসি এল। বললাম তোর কি মাথা ব্যথা, পেট ব্যথা না বুক ব্যথা, সেটা বল। না খেতে পারাটা তো রোগের উপসর্গ মাত্র। বিশুর একই উত্তর, খেতে পারি না। যা হোক, জি. বি. হাসপাতালে ওকে ভর্তি করলাম। ডাক্তাররা নাকে মুখে নল ঢুকিয়ে দিল।

দু'দিন পর বিকেলে ওকে হাসপাতালে দেখতে গিয়ে দেখি ও বেডে নেই। পাশের রোগীদের জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম নাক-মুখ থেকে নল খুলে নিয়েছে সকালে। ঘন্টাখানেক আগে বিশু বেরিয়ে গেছে। আমি আরো ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করেও ওর দেখা না পেয়ে চলে এসেছি। পরবর্তী সময় ওকে জিজ্ঞেস করলে বিশু বলে ও নাকি শ্যামলী বাজার বোনের বাড়িতে চান করতে গিয়েছিল। কিন্তু আমাদের বিশেষ পরিচিত একজনের কাছে জানতে পেরেছিলাম জি. বি. বাজার হোটেলে মাছের মাথা যাকে জাম্বু বলে সেটা দিয়ে ভাত খেতে বিশু বেরিয়েছিল। বিশু অবশ্য আজও সেটা স্বীকার করতে চায় না।

৭০ এর দশকে গ্রুপ বেঁধে আমরা রাত্রির বেলা পোস্টারিং করতাম। তপন কর আমাদের বুঝিয়েছিল দল বেঁধে যে কোন বিয়ে বাড়িতে খেতে গেলে পাত্রীপক্ষ মনে করবে পাত্র পক্ষের লোক আর পাত্র পক্ষ মনে করবে পাত্রী পক্ষের লোক। সুতরাং কোন বিয়ে

বাড়ি নজরে পড়লেই সবাই ঢুকে পরতাম এবং নির্দ্বিধায় চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় খেয়ে বেরিয়ে আসতাম। বিপত্তি হয়নি কোনদিন।

রামনগর রোড নং - ১ একটি বিয়ে বাড়িতে সানাই বাজছে। সেদিন আমরা লোকসংখ্যায় কম। কি করা যায়। তপনদা ন্যাংটো একটা পাগলকে সংগ্রহ করে নিয়ে এল। বিশুর দায়িত্ব পড়ল পাগলটাকে কোন ভাবে বিয়ে বাড়িতে ঢুকিয়ে দেওয়া। বিশু সে কাজ সুচারু রূপেই সম্পন্ন করল। মিনিট দশেক পর আমি, বিশু, তপনদা ও সঙ্গে আরো কে যেন ছিল বিয়ে বাড়িতে ঢুকে জিজ্ঞেস করলাম একটা পাগল এসেছে কি?

বিয়ে বাড়ির লোকেরা বিরক্ত হয়ে বলল পাগল সামাল দিয়ে রাখতে পারেন না? ন্যাংটো পাগল মেয়েদের মাঝখানে ঢুকে পড়ে কি হুলুস্থুল কাণ্ডই না বাঁধিয়েছে। তাকে একটা ঘরে আপাতত বেঁধে রাখা হয়েছে। তপনদা বিয়ে বাড়ির সবাইকে বোঝাল পাগলটি কত বড় ঘরের ছেলে। নিজেও শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য। ছেলেটির বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যায়। এমনিতে খুব ঠাণ্ডা। বিয়ে বাড়ির সানাই-এর আওয়াজ পেলে ওকে আটকে রাখা যায়না। উপস্থিত সবাইর চোখ ছলছল করে এল। তারপর আমাদের এবং পাগলটিকে পেটপুরে খাইয়ে তারপর নিষ্কৃতি দিল।

বিশু আমার থেকে বয়সে বড় হলেও ও আমার মাসছয়েক পরে বিয়ে করে। জীবনদার বিয়ের পাঞ্জাবি পরে বিয়ে করতে যায়। আজো ও সেই পাঞ্জাবি আর ফেরত দেয়নি। জিজ্ঞেস করলে বলে বিশুর বাল্যবন্ধু বাবু (সঞ্জীব) নাকি সেই পাঞ্জাবি বিয়ে করতে যাওয়ার সময় বিশুর কাছ থেকে হাওলাত নিয়েছে। জীবনদাকে সে কথা সত্যি কিনা আর জিজ্ঞেস করা হয়ে ওঠেনি।

রামনগর ৪নং রাস্তায় শিশির মজুমদারের বাড়ি। প্রায়ই যেতাম সবাই। বৌদি খুব আদর করে আমাদের এটা সেটা খেতে দিত। শিশিরদার বড় ভাইয়ের বিয়ে। শিশিরদা কলেজে পড়ার সময়ই বিয়ে করে নিয়েছিল। আমরা সবাই নিমন্ত্রিত। উপহার হিসাবে কিছু একটা নিতে হয়। কারোর পকেটে পয়সা নেই। সেদিনই সন্ধ্যায় প্রয়াত সহযোদ্ধা সুভাষ চক্রবর্তী (তার নাম গুটিকয় দাড়ির জন্য আমি হো-চি-মিন রেখেছিলাম) পার্টি অফিসে কানুদার কাছ থেকে অনল রায়ের লেখা 'যুগের আলো' বইটি কিনেছে। আমি বিশুকে জিজ্ঞেস করলাম বইটি সকালে উদ্ধার করা যাবে তো? বিশু দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘাড় নাড়িয়ে 'হ্যাঁ' বলল। আমি অনেক বলে কয়ে সুভাষের কাছ থেকে এক রাত্রিরের জন্য বইটি হাওলাত নিলাম। সুভাষসহ সকলে শিশিরদার বড়ভাইয়ের বিয়ে খেয়ে এলাম। উপহার দিলাম অনল রায়ের 'যুগের আলো'। পরদিন সকালে বিশু শিশিরদার বড়ভাই-এর ঘরে গিয়ে চা খেয়ে বৌদির কাছ থেকে 'যুগের আলো' বইটি পড়ার কথা বলে নিয়ে এসে সুভাষকে ফেরত দিয়ে দেয়। যতদূর জানি এরপর মাস তিনেক বিশু শিশিরদার বাড়িমুখো হয়নি।

১৯৭৯ কি ১৯৮০-র গোড়ার দিকে আমি, চন্দন সেনগুপ্ত, শিশির মজুমদার সবাই মিলে 'সলিল চৌধুরী' নাইটের ব্যবস্থা করলাম রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে। ঝড়বৃষ্টির জন্য প্রথম দিন অনুষ্ঠান হয়নি। দু'দিন পরে আবার তারিখ ঠিক হল। সলিল চৌধুরী, স্ত্রী

সবিতা চৌধুরী, মেয়ে অন্তরা চৌধুরী, সুবীর সেন ইত্যাদি খুব বড় টিম এসেছিল। আমাদের বাজেটে টান পড়েছে। মেলারমাঠ এখনকার নজরুল ছাত্রাবাসে শিল্পীদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দায়িত্বে বিশু। বিশুকে বাজেটের কথা জানানো হল। বিশু বলল, চিন্তার কোন কারণ নেই। যে টাকা ২ দিনের জন্য তাকে দেওয়া হয়েছে সেটা দিয়ে ৪দিন খাইয়েও টাকা বাঁচবে। আমরাতো বুঝে উঠতে পারছিলামনা কি করে সেটা সম্ভব। বিশু সেটাই সম্ভব করে আমাদের দেখিয়েছিল। প্রত্যেক শিল্পীকে সকালে একটু একটু বাকলসহ আনারস দুধ সহযোগে খাইয়ে দিয়েছিল। এরপর যা হওয়ার সবাই বাথরুমে যায় আর আসে। খাবে আর কোথায়? বিশুকে গিয়ে বললাম, এরা অনুষ্ঠান করবে কি করে? বিশু বলল, তিনদিন পর অনুষ্ঠানের দিন ঠিক হয়ে যাবে। তাছাড়া বটতলায় ইন্দ্রডাক্তারের কাছ থেকে হোমিওপ্যাথিক পুরিন্দা খাইয়েছি। দেরিতে হলেও তিনদিনের মাথায় ওষুধ কাজ করবে। শিল্পীদের সন্ধ্যের পর একটু আধটু নেশা করতে হয়। সে টাকা অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদেরই বহন করতে হয়। বিশু সে খরচও আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছিল। সলিল চৌধুরী এসেই সস্ত্রীক সকন্যা তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তীর সঙ্গে পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী সচিবালয়ে দেখা করেছিলেন। সন্ধ্যায় যখন নেশার প্রসঙ্গ ওঠে তখন বিশু সলিলদাকে বলে নৃপেনদা আপনাকে কি শ্রদ্ধা করে নিজের চোখেই তো দেখে এলেন। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা সবাই পার্টির লোক। এদের থেকে এ ব্যাপারে টাকা নিলে পাঁচ কান হবে, নৃপেনদাও জেনে যাবে। তার চেয়ে আপনি টাকা দিন, আমি লুকিয়ে এনে দেব। অনুষ্ঠানের সময়কার চারদিন বিশু আর বাড়ি যায়নি। সলিল চৌধুরী আর সুবীর সেনের সঙ্গেই রাত কাটিয়েছে তাদেরই পয়সায়। এরপর যতবার কোলকাতা গেছে ততবারই সলিল চৌধুরী আর সবিতা চৌধুরীর অতিথি হয়ে তাদের বাড়িতেই উঠত বিশু। থাকা-খাওয়া সব ফ্রি। আরো কি কি ফ্রি ছিল বিশুই বলতে পারবে।

বিশু যখন গণ্ডাছড়ায় সরকারি কর্মচারী হিসাবে কর্মরত তখন বি. ডি. ও বিশুকে ডেকে বলল, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, অমুক ডিপার্টমেন্টের সচিব, ডি. এম, এস. ডি ও এরা গণ্ডাছড়া সফরে আসবে। এদের সঙ্গে ড্রাইভার, এদের আলাদা আলাদা এসকর্ট ইত্যাদি থাকবে। আপনাকে ছয়হাজার টাকা দেব এদের দু'দিনের খাওয়া-দাওয়া, আদর-আপ্যায়ণ সব আপনাকে এই টাকার মধ্যেই করতে হবে। বিশু বলল, স্যার-আমাকে কেন? এত বড় বড় অভিজ্ঞ অফিসাররা আছেন। বি. ডি. ও জানাল কেউ দায়িত্ব নিতে চায়না। অতীতে সবাই দায়িত্ব নিয়েছে এবং প্রত্যেকের নিজের পকেটের টাকা দিয়ে ঘাটতি মেটাতে হয়েছে। বিশু বলে তাহলে আপনার সম্মান রক্ষার্থে আমার দায়িত্ব নিতেই হয়। সেই ছয় হাজার টাকা থেকে দু'হাজার টাকা [illegible] আমাকে জানিয়েছে। অতিথিরা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চিরাচরিত [illegible] পরা অবস্থায় [illegible] রমণীরা অতিথিদের নাচের তালে তালে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেয়। তারপর প্রত্যেককে বাঁশের চোঙায় মহিষের দুধ খেতে দেয়। এরসঙ্গে [illegible] চোখ ওঠা গোটা গোটা আনারস তো ছিলই। কাউকে এরপর আর রান্নাঘরমুখো করা যায়নি। মহিষের মাংস [illegible] কর্মচারীদের খেয়ে শেষ করতে হয়েছে।

১৯৮১ সালে বিয়ের পর বিশু স্থলপথে গৌহাটি হয়ে তিনমাসের জন্য স্ত্রীকে নিয়ে হনিমুনে গেল। সবমিলিয়ে টাকা নিল দশহাজার। শুনে বললাম, কি করে হবে এত কমটাকা দিয়ে। বিশু আমায় জানাল — এত টাকা লাগবে না, ফেরত আসবে। তিনমাস পরে বিশু ফিরে এল। এসেই বেতন তুলল তিনমাসের। যে টাকা নিয়ে গিয়েছিল ফেরত নিয়ে এসেছে ছয়হাজার টাকা। পাঠকদের বিশ্বাস হচ্ছে না তো? বিশুর জবানীতে শোনা মত হিসাব দিচ্ছি। গৌহাটি ও লামডিং মিলে বিশুর খুড়া শ্বশুর, মেসো শ্বশুর ইত্যাদির বাড়িতে ওরা ছিল প্রায় মাসখানেক। ঐসব বাড়িতে গিয়ে সস্ত্রীক শুধু বডি থ্রো করে দিয়েছিল একমাসের জন্য। খাওয়া-দাওয়া ফ্রি তো বটেই। শাড়ি-জামা-কাপড় ইত্যাদি উপহারও পেয়েছে প্রচুর। শালীরা জামাইবাবুর কাছে আব্দার করেছিল খাওয়ানোর জন্য। বৈশিষ্ঠ্যমুনির আশ্রম দেখে ফেরার পথে ধু ধু মাঠের প্রান্তরে সন্ধ্যের পর শালীদের নিয়ে বাস থেকে নেমে পড়ে। যেখানে খাওয়ার কোন দোকানই নেই। শুধু তেলেভাজা আর বাদামের দু'একটা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দোকান। তেলেভাজা এবং বাদাম শালীদের খাইয়ে বিশুর খরচ হয়েছিল সর্বমোট ১০/১২ টাকা।

তারপর বিশু ট্রেনে কোলকাতা যায়, আত্মীয় স্বজনের বাড়ি গিয়ে নূতন বৌ দেখায়। খাওয়া-দাওয়া করে, উপহার নেয়। এই করতে করতে কাটিয়ে দেয় আরো মাস দু'য়েক।

১৯৯৩ সনে বিশুর বড় শালা কাজ করত কোচিন। সস্ত্রীক গিয়ে শালার কোয়ার্টারে



বিশুর বিয়েতে আমরা :
সঞ্জীব ব্যানার্জি, ধীরাজ গুহ, পঙ্কজ ভট্টাচার্য, শঙ্কর দাস, জীবন চক্রবর্তী ও শিশির মজুমদার

ওঠে। বিশুর শালা সদ্য প্রয়াত হয়েছে। খুব রসিক ছিল। জামাইবাবুকে ঝোলে-ঝালে-অম্বলে মাসখানেক সাদরে পুষে রাখে। বিশুর একপয়সা খরচ নেই। শুধু শালাকে ইশারা দিলেই হয়। একদিন বিশু বাজারে গিয়ে ১ কে.জি. কইমাছ ১৫ টাকা দিয়ে কিনেছিল। কোচিনে অধিকাংশ লোক নিরামিশাষী তাই মাছের দাম ছিল খুবই কম। শুধু ছয় হাজার টাকা ফেরত বড় কথা নয়। বিশু উপহার নিয়ে এসেছিল ২৫/৩০ হাজার টাকার মত। তাছাড়া তিনমাসের বেতন তো আনাম ছিলই। বিশুকে বলেছিলাম 'নিঃখরচায় জীবন-যাপন ও তৎসহ ভ্রমন'- এই শিরোনামে একটা বই লিখে ফেল। ছাপানোর দায়িত্ব আমার। বেচারার সময় নেই। ভোরবেলা থেকে রাত্রি ১২ টা পর্যন্ত আমাদের মানসদা অর্থাৎ মানস দেববর্মনের (ইউ.পি.এস.সি'র প্রাক্তন সদস্য) নিরাপত্তার ব্যাপার সামলে সময় করে উঠতে পারছে না।

একবার বিশুকে বাগে পেয়েছিলাম। ১৯৭৮ সাল। সবে আইন পাশ করে কোর্টে যোগ দিয়েছি। সন্ধ্যায় হরিগঙ্গা বসাক রোডে এস. এফ. আই. অফিসের সঙ্গে ঘোষ কেবিনের ছাদে জমজমাট আড্ডা। জে. সি. ঘোষের অনর্গল ইংরেজী যে না শুনেছে তার জীবন বৃথা। ছাদে উঠে দেখি বন্ধু অরবিন্দ ভট্টাচার্য (বর্তমানে প্রয়াত) মুখভার করে বসে আছে। অরবিন্দ ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথিত যশা সাহিত্যিক প্রয়াত ভীষ্মদেব ভট্টাচার্যের জেঠতুতো ভাই। পরে দশরথ দেবের একান্ত সচিব হিসাবে বহুদিন কাজ করে গেছে। জিজ্ঞেস করলাম বন্ধু কি হয়েছে বল। অরবিন্দ জানাল সকাল ১১টা নাগাদ সে যখন বাড়িতে ছিল না বিশু হন্তদন্ত হয়ে অরবিন্দের বাড়িতে ঢুকে অরবিন্দের মা'র কাছে এক গ্লাস জল চায়। মাসীমা আমাদের সবাইকে চিনতেন এবং খুব স্নেহ করতেন। তিনি বিশুকে একটু জিরিয়ে নিতে বললে, বিশু মাসীমাকে বলেছিল, তার সময় নেই। রিক্সা দাঁড় করিয়ে এসেছে। এখন বিশু নাকি ঠিকেদারীর কাজ করে ভাল টাকা আয় করে। অরবিন্দকেও নাকি বিশু বলেছিল তার সঙ্গে ঠিকেদারীর কাজে যুক্ত হতে কিন্তু অরবিন্দ পার্টি করবে বলে বিশুকে না করে দিয়েছে। যথারীতি জল খেয়ে বিশু অরবিন্দের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় হন্ত-দন্ত হয়ে যেন কোটি টাকার ঠিকেদারীর কাজে ও ভীষণ ব্যস্ত। অরবিন্দের মা অত্যন্ত সহজ সরল মহিলা। বিশুর সব কথা বিশ্বাস করে দুপুরে অরবিন্দ খেতে গেলে অরবিন্দের বেকারত্ব, পরিবারের প্রতি দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ইত্যাদি নিয়ে খোঁচা দিয়ে এমন সব কথা বলেছিল অরবিন্দ ভালোভাবে আর দুপুরে খেতে পারেনি। মন খারাপ করে বিকেল থেকেই ঘোষ কেবিনের ছাদে এসে বসেছিল। আমি অরবিন্দকে আশ্বস্ত করে বললাম, মন খারাপ করিস না, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এর শোধ তুলছি। তবে বিশু এলে কোন কিছু বুঝতে দিস না।

পরের দিন দুপুরে ১২/১টা হবে যখন বিশু কোনভাবেই বাড়ি থাকবে না জানি তখন নূতন একটা স্কুটার কারো কাছ থেকে হাওলাত নিয়ে বিশুর বাড়িতে গেলাম। বিশুর মা মাসীমাকে জিজ্ঞেস করলাম, বিশু কোথায়? বিশুর বাবা কাছেই ছিল এগিয়ে এল। মাসীমা বলল, বিশু তো বাড়ি নেই। বললাম, মাসীমা বিশুকে বলেছিলাম কোর্টে আমার সঙ্গে ক্লার্ক হিসাবে যোগ দেবে কিনা? সে তো আমাকে বলল, তপনদা তাকে ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খা না করে সর্বক্ষণের পার্টি কর্মী হতে উপদেশ দিয়েছে। আমরা যারা কলকাতা গিয়ে পড়াশুনা

করে এসেছি আমাদের সে ঘৃণা করে। তবুও ভেবেছিলাম বিশু যদি রাজি হয় তবে আমার এবং বিশুর দু'জনের জন্যই ভাল হত। এখন তো তিন/চারটি বি. এ. পাশ করা ছেলে আমার পেছনে লেগে আছে ক্লার্কের কাজ করার জন্য। অতএব বিশু যদি সত্যিই এই কাজ না করতে চায় তবে যাতে আমাকে বিকেলের মধ্যে জানিয়ে দেয়, আমি অন্য ছেলে নিয়ে নেব।

তপনদার নাম ইচ্ছে করেই বলেছিলাম। জানতাম বিশুর ভবিষ্যত অন্ধকারের জন্য তপনদাকেই বিশুর পরিবারের সবাই অকারণে দোষে। বিশুর বাবা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল তোমার প্র্যাকটিস কেমন জমেছে বাবা? আমি বললাম, মেশোমশাই সবই তো পার্টির লোক, আমাদের টাকা দেয় না তবে আমাদের ক্লার্কদের দিয়ে যায়। ক্লার্কদের আয় আমাদের থেকে চারগুণ। তবু হিসেব তো রাখিনা। গত ছয় মাসের আয়ে সব খরচ বাদ দিয়ে স্কুটারটা কিনেছি। বিশুর বাবার জহুরীর চোখ। হিসেব করে নিয়েছিলেন তপন করের ছায়ামুক্ত হয়ে কোর্টে আমার সঙ্গে ক্লার্ক হিসাবে যোগ দিলে বিশু কত আয় করতে পারত। বিশুর বাড়ি ত্যাগ করার আগেই শুনেছি বিশুর বাবা বিশুর মাকে বলছে আজ যদি বিশুর ভাতের সঙ্গে ছাই না দাও তবে তোমার এক দিন কি আমার একদিন। আত্মতৃপ্তি নিয়ে বিশুর বাড়ি থেকে ফিরে এসেছি কিছু একটা অঘটন ঘটবেই ঘটবে ভেবে নিয়ে।

সন্ধ্যায় বিশুকে দেখলাম ঘোষ কে-বিনের ছাদে মুখে কোন দুশ্চিন্তার ছায়া নেই। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর বাধ্য হয়ে বিশুকে জিজ্ঞেস করলাম, বাড়িতে সব ঠিক ঠাক আছে তো? গাছের ডালে কাক-চিল বসতে পেরেছে তো?

বিশু বলল, কেন পারবে না। তোমার কারণে মা ভাতের সঙ্গে ছালি দিয়েছিল। ছালি ফেলে দিয়ে ভাত খেয়ে এসেছি। আমি কি বোকা নাকি চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাব। আমি অবাক চোখে চেয়ে রইলাম বিশুর দিকে। বিশুই পারে সব ঘটনা এমন সহজভাবে মেনে নিতে।

আমি বললাম, আমার কারণে মানে? তুই কেন অরবিন্দ'র মাকে উল্টো-পাল্টা বলে সেদিন গাল খাওয়ালি। বিশু বলল, ঠিক আছে শোধবোধ হয়েছে তো। এখন একটি গোটা সিগারেট দে। হাফ সিগারেটে চলবে না। মনে হয়, ভাতের সঙ্গে কিছু ছাই পেটে গেছে। পেটটা কেমন জানি উগলাচ্ছে। বাধ্য হয়ে দিলাম একটি গোটা সিগারেট। বিশু পরম তৃপ্তিতে সিগারেট টানতে লাগল। আমি অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম তার দিকে। এই বিশু যে কোন পরিচিত লোকের বাড়ির বিয়ে, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন যে কোন ব্যাপারে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাহায্য করতে ওস্তাদ ছিল। অসংখ্য মানুষের শেষ যাত্রার সঙ্গী বিশু। যে কোন পরিচিত লোক অসুস্থ হলে সেবার জন্য শুশ্রূষার কারণে বিশুকে খবর দিলেই হোত। অক্লান্ত পরিশ্রম করতে পারত। এখন অবশ্য অলস হয়ে গেছে। মানসদার এয়ার কন্ডিশনড রুম বিশুর চরিত্রটাই পাল্টে দিয়েছে।

১৯৮৭ সন। মেলার মাঠ গান্ধীঘাটের কাছে পার্টির ছেলেরা ওয়ালিং করছে। আমি সকালে স্কুটারে কোথায় যেন গিয়েছিলাম। ফেরার পথে পার্টির ছেলেদের দেখে দাঁড়ালাম। এমন সময় নেতাজী স্কুলের দিক থেকে হঠাৎ কয়েকটা ছেলে দৌড়ে এসে বোমা ছুঁড়তে আরম্ভ করল। দা, ছোরা ইত্যাদি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পরল যারা দেওয়াল লিখছিল তাদের উপর।

জয় বর্মনসহ বেশ কিছু পার্টি কর্মী গুরুতর আহত হল। সবাইকে হাসপাতালে ভর্তি করে যখন একটা সিগারেট ধরালাম, তখন দেখি আমার দু'পায়ের প্যান্টে অজস্র ছিদ্র এবং রক্তে ভেসে যাচ্ছে দু'পা। অর্থাৎ বোমার টুকরো দু'পায়ে ঢুকে ক্ষত বিক্ষত হয়ে আছে। এতক্ষণ স্নায়বিক উত্তেজনায় টের পাইনি। আমাকেও হাসপাতালে ভর্তি হতে হল অপারেশানের জন্য। বহুদিন কষ্ট পেয়েছিলাম এবং শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল।

বিশু তখন কামালঘাট ব্লকে পঞ্চায়েত সচিবের কাজ করে। সে উড়ো খবর পায় আমি মারা গেছি বোমার আঘাতে। উদভ্রান্তের মত বিশু জি. বি. হাসপাতালে ছুটে এসে যখন আমাকে বেডে জীবিত অবস্থায় খুঁজে পায় তখন আমার বুকে মুখ গুঁজে তার সে কি কান্না। একান্ত আপনজনের বুক নিঙড়ানো আন্তরিক অশ্রুজল। যে কোন লোক এরকম অকৃত্রিম ভালোবাসার জন্য সারাজীবন সাধনা করে গেলে ক্ষতি নেই।

মুশকিল হলো, এত স্মৃতি মাথায় ভিড় করে আছে, সব লিখে পাঠকদের জানাতে গেলে ১ বছরেরও বেশি সময় লেগে যাবে। এছাড়া আমাদের সময়কার হাড়-হিম করা সব শয়তানিই বলুন বা নষ্টামিই বলুন সব জেনে গেলে আজকের প্রজন্মের ছেলেরা না আমাদের মত নচ্ছার পূর্বসুরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ শুরু করে সেটাও একটা সমস্যা বটে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হোলো আমি কম্‌লি ছেড়ে দিতে চাইলে কি হবে, কম্‌লি তো আমাকে ছাড়ছে না।

বিশুর কথা বলছি। যতই ভাবি বিশু অধ্যায় এবার শেষ করে অন্য প্রসঙ্গে যাই। তখনই স্মৃতির মণিকোঠায় টুপ করে এমন একটি ঘটনা ভেসে ওঠে যে পরিবেশনের লোভ সামলানো দায়। বিশুর মত পরোপকারী তবে কিচক ছেলে আমার জানা মত দ্বিতীয় কেউ নেই। বিশুর রান্নাবান্নার হাত খুবই ভাল। পরিচিত যে কোন লোকের বাড়ীর যে কোন অনুষ্ঠানে ছোট বেলা থেকেই বিশু প্রয়োজনমাফিক হাজির থাকত। বাড়ীর লোকেরাও বিশুর ওপর সব দায়িত্ব সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারত। বিশুর বৌ রিউর মনে বড় আক্ষেপ ছিল (জানি না এখনো আছে কিনা) বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সবাই সস্ত্রীক নেমন্তন্ন রক্ষা করতে যায় কিন্তু রিউকে যেতে হয় একা একা। কারণ বিশু তো সেই নেমন্তন্ন বাড়িতে সকাল থেকে গিয়েই হাতা-খুন্তি নিয়ে ভাঁড়ার ঘর সামাল দিচ্ছে। বিশুর বউ যেন নেমন্তন্ন বাড়িতে বন্ধুর গিন্নী নয়, ভাঁড়ার ঘরের দায়িত্বে থাকা ঠাকুর মশায়ের স্ত্রী। রিউ কিন্তু কখনো বলে না যে আমাদের বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে একমাত্র বিশুই দুর্গাপূজার ৩/৪ দিন রিক্সা ভাড়া করে বউ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে বউকে নিয়ে পিকনিকে যায়। বিবাহ-বার্ষিকীতে বা রিউ-র জন্মদিনে রিউকে নিয়ে আউটিং-এ যায়। ঘরের রান্না-বান্না তরকারি কাটা বা ছোট-ছোট মাছ কাটা বিশুকেই করতে হয় বলে বিশুর মুখে শুনেছি। বিশুর বৌ নাকি ছোট মাছ কাটতে পারে না। হতেই পারে। কিন্তু আমাদের এক বন্ধু এস টি এস সি কর্পোরেশনের অ্যাকাউন্টট্যান্ট দীপক দেবনাথ সব শুনে বিশুকে বলেছিল, শালা যেন মাধুরী দীক্ষিতকে বিয়ে করেছে। এতে বিশু অভিমান করেছিল বলে আমার মনে হয়নি। বিশুর সবচেয়ে বড় যে গুণটি আমরা কেউ রপ্ত করে উঠতে পারলাম না সেটা হল — বিগত ২৮ বছরের দাম্পত্য জীবনে বোমা মেরেও বিশুর পেট থেকে তার বৌ-এর বিরুদ্ধে একটি কথা আমরা আজও বের করতে পারিনি।



জগতজ্যোতি রায় (বিশু)

আমার শুভানুধ্যায়ী, অসমবয়সী বন্ধু বনাম অভিভাবক আগরতলা শহরের একসময়কার বিখ্যাত কন্ট্রাক্টর, বনমালীপুর বি কে রোড নিবাসী আর.এল. রায়কে একদিন যতই বিশুর প্রসঙ্গ বলছি তিনি কিছুতেই বিশুকে চিনতে পারছিলেন না। এমন সময় বিশু আমার চেম্বারে এসে হাজির। রায়দাকে বললাম, এর কথাই এতক্ষণ বলছিলাম। রায় দা বিশুকে দেখে বললেন— ও আপনি ঠাকুর মশাই-এর কথা এতক্ষণ বলছিলেন? খোঁজ নিয়ে জানলাম আমার অনুপস্থিতিতে বিশু রায়দার অনুরোধে ওনার বাড়িতে কোন এক অনুষ্ঠানে রান্নার তদারকির দায়িত্ব পালন করে এসেছিল।

আমাদের পত্রিকা অফিসের অনেক সহকর্মী যারা বিশুকে নামে মুখে চেনে না তারা বিশুকে দেখানোর জন্য আমাকে অনুরোধ করে। আমি যখন তাদের বললাম, তোমরা সবাই বিশুকে দেখছ। গত সরস্বতী পুজোর দিন আমাদের পত্রিকা অফিসে সবার খাওয়া-দাওয়া তৈরির দায়িত্ব যে পালন করেছিল সেই বিশু। সবাই সবিস্ময়ে বলল, উনিই এত বিখ্যাত ব্যক্তি! আসলে রান্না নয়— বিশুর সবাইকে খাইয়ে তৃপ্তি পাওয়ার নেশা।

সঠিক সন মনে নেই। ১৯৮০ বা ৮১ সন হবে বিশুর বাবা অসুস্থ হয়ে জি বি হাসপাতালে ভর্তি। জেনারেল বেড এবং কেবিন মিলিয়ে প্রায় মাসখানেক ভর্তি ছিলেন তিনি হাসপাতালে। পিতাকে পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয় বিশু। বিশুর পিসীরা এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনরা কাঁদতে কাঁদতে হাসপাতালে ভিড় জমায়। বিশুকে জিজ্ঞেস করে— ধনভাইকে ডাক্তার কি খেতে বলেছে। বিশু নির্দ্বিধায় সবাইকে বলে তেমন কিছু নয়— ছানা, বিভিন্ন ধরণের ফল এবং ছোট মুরগীর স্যুপ। আসলে তখন বিশুর বাবা খাওয়ার মত অবস্থায় নেই। স্যালাইন চলছে। তারপর যা ঘটার তাই ঘটেছিল। আত্মীয়

স্বজনের বাড়ী-ঘর থেকে পালা করে ফলমূল, ছানা, স্যুপ আসতে থাকে। সেসব দিনে রাতে গলাধঃকরণ করে চলে বিশু।

মাসখানেক শয্যাশায়ী থাকার পর বিশুর বাবা যখন বাড়ী ফেরেন তখন তিনি কৃশকায়, অস্থিকঙ্কালসার। আর বিশুর সারা শরীর থেকে যেন দ্যুতি বেরুচ্ছে সাধুসন্তদের মত। নধর কান্তি, হৃষ্টপুষ্ট দেহ। মাথার চুল আর গোঁফ দাড়ি ফেলে দিলেই দীক্ষা দেওয়ার কাজটুকু শুরু করতে পারে এমন অবস্থা।

স্মৃতি হাতড়ে যেসব মণি মুক্তা আহরণ করা সম্ভব সেসব তাড়াতাড়ি পাঠকদের জানিয়ে দেয়াই ভাল। শুধু শুধু বিশুকে পেটুক আখ্যা দিয়ে কি লাভ ? আমাদের যৌবনে আমরাও কি কম খেতে পারতাম নাকি ?

স্কুল ও কলেজ পর্ব

১৯৬৮ কি ১৯৬৯ সন। ভারতের ছাত্র ফেডারেশন তখনও গঠিত হয়নি। আমাদের রাজ্যে সি.পি.আই(এম) দলের ছাত্র শাখা সংগঠনের নাম ছিল ত্রিপুরা ছাত্র ফেডারেশন। বটতলা বীরেনদার বাড়িতে একচালা টিনের ছাউনি ঘরে অফিস। সে যাহোক, সিদ্ধান্ত হোলো ছাত্র ফেডারেশনের রাজ্যভিত্তিক কনভেনশান খোয়াইয়ে অনুষ্ঠিত হবে। কনভেনশনের একমাস আগেই সংগঠনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খোয়াই চলে যেতে হল আমাকে কনভেনশনের প্রস্তুতি ও অর্থ সংগ্রহের কাজ করার জন্য। গিয়ে উঠলাম শিক্ষক কামিনী সিংহের বাড়ি। নিরংহংকারী এমন সজ্জন লোক জীবনে খুব কম দেখেছি। আমার কাজ ছিল খোয়াই-এর ছাত্রকর্মীদের নিয়ে বাড়ি বাড়ি অর্থ সংগ্রহ। টাকা পেতাম কম। ধান ও চাল পেতাম বেশি। তাতেই আমাদের কি আনন্দ। উপজাতি পল্লিতে কি আদর আপ্যায়ন যে পেয়েছি বলে বোঝাতে পারব না। উপজাতি মহল্লায় রাত্রিবাস, তাদের জীবনযাত্রা খুব কাছ থেকে দেখা তখনই শুরু। রাজ্য কনভেনশানে প্রধান অতিথি বি.পি.এস.এফ অর্থাৎ বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক সুভাষ চক্রবর্তী। তাকে আগরতলা থেকে রিসিভ করে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব বর্তেছিল আমার উপর। সঙ্গে আরো কে ছিল মনে করতে পারছি না। সম্ভবত মধুসূদন ভট্টাচার্য (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক) ছিল। সুভাষদাকে কল্যাণপুর একটা হোটেলে খাওয়াতে ঢোকালাম। আমরা সবাই পেটপুরে খেলাম। কোলকাতার লোক তাই সুভাষদা ভাল করে খেতে পারেননি। তবে আমাদের খাওয়া তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছিলেন। আমার খাওয়া শেষ হলে বললেন, পেট ভরেছে তো ? আমি হেসে বললাম, যা খেয়েছি এক্ষুণি আবার সে পরিমাণ খেতে পারি। সুভাষদা চোখ কপালে তুলে বললেন, অসম্ভব। খেয়ে দেখাও তো দেখি। আমি সঙ্গে সঙ্গে যা খেয়েছিলাম সব আবার খেলাম। সুভাষদা অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। এরপর যতবার সুভাষদা আগরতলা এসেছে আমার এই খাওয়ার গল্প আমাদের ছাত্রকর্মীদের সভায় বলতে গিয়ে বলতেন, ধীরাজকে সমুদ্রে জাহাজডুবির গল্প বলতে বললেও ঠিক সাঁতার কাটতে কাটতে সমুদ্রে পানিফল ভেসে আসার কথা বলবে এবং এই পানিফল খেয়ে কিভাবে জীবন রক্ষা করেছিল তা অবশ্যই বলবে। সুভাষদা সম্ভবত আমাদের ছাত্রকর্মী গ্রুপের কয়েকজনের খাওয়ার কাহিনী পার্টি নেতাদের বলেছিলেন। সে কারণেই খোয়াই কনভেনশান চলাকালিন দু'বেলা নৃপেনদা এবং উদয়পুরের নরেশ ঘোষ আমাদের খাওয়ার তদারকি করতেন। এই কনভেনশানেই প্রথম বিমল সিন্‌হার সঙ্গে

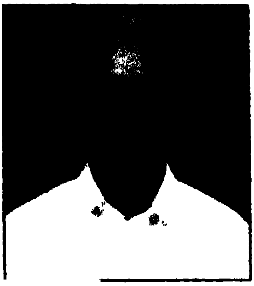
পরিচয়। ছিপছিপে বেতের মত শরীর, সোনাঝরা হলুদের মত গায়ের রঙ, প্রথম দর্শনেই যে কোন লোকের দৃষ্টি আকর্ষিত হতে বাধ্য।

১৯৬৯ সন থেকে ১৯৭২ সন পর্যন্ত আমরা একটি গ্রুপ মধুসূদন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে সারা শহর/শহরতলি ঘুরে ওয়ালিং করতাম। প্রায়ই রাতের বেলা পুলিশ (তখন তো একটিই থানা ছিল কোতোয়ালি থানা, এখন যেটি পশ্চিম আগরতলা থানা) আমাদের ধরে নিয়ে যেত। বেশিরভাগ দিনই ধরা পড়তাম আমি আর সমীর চক্রবর্তী। শঙ্কর দাসও আমাদের সঙ্গে থাকতেন। তবে শঙ্করদার ভদ্র পরিচিতির জন্য তাকে পুলিশ ইচ্ছে করেই গ্রেপ্তার করতেননা কিনা কে জানে। দশরথদা, নৃপেনদা বছরে প্রায় ৯/১০ মাস আগরতলার বাইরে থাকতেন। সুতরাং আমাদের থানা থেকে গভীর রাতে ছাড়ানোর দায়িত্ব নিতে হত বীরেনদাকে। ছোটখাটো শান্ত, বিনয়ী এই মানুষটিকে একবার প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত হতে দেখেছিলাম। নাম মনে নেই এক পুলিশ অফিসার বীবেনদাকে 'হোল্ড ইওর টাং' বলেছিলেন। বীরেনদা বলেছিলেন, 'ইওর প্রাইম মিনিস্টার ইন্দিরা গান্ধী কুড নট হোল্ড মাই টাং, হু আর ইউ সো ডেয়ার টু টেল মি টু হোল্ড মাই টাং' ? বীরেনদা তখন লোকসভার সদস্য।

থানা লক-আপে এত রাত অতিথি হিসাবে কাটিয়েছি একটু বর্ণনা না দিলে মনে শান্তি পাব না। দুটো রুম। একটিতে অসংখ্য সাইকেল রাখা থাকত। ২৪ ঘণ্টা মশা ভনভন করত এবং পাশের রুমে অর্থাৎ আমাদের যেখানে রাখা হত গারদের ফাঁক দিয়ে অনায়াসে যাতায়াত করত। আসামিদের যে রুমে রাখা হত সেখানে কম্বল পাতা থাকত। প্রস্রাবাগারের প্রস্রাব ভেসে এসে দুই-তৃতীয়াংশ ঘর ভেসে থাকত। সমীর একটু শৌখিন এবং খুঁতখুঁতে ছিল। ও এই নোংরা পরিবেশে ঘুমোতে পারত না। আমি কিন্তু অনায়াসে অন্যান্য আসামীদের ঠেলেঠুলে রুমের এক-তৃতীয়াংশ শুকনো জায়গায় একটু জায়গা করে অকাতরে ঘুমিয়ে যেতে পারতাম। আমার ঘুমের গল্প বললে অনেকেরই হিংসা হতে পারে।

১৯৭২ সাল। গুয়াহাটি ঝালুকবাড়ি 'ল' কলেজে ভর্তি হয়ে আগরতলা ফিরছি। ধর্মনগর থেকে ভাত খেয়ে রাতে ট্রাকের ওপরে উঠেছি। তখন রাত্রিতে আসাম-আগরতলা সড়কে যাতায়াত শুধু নিরাপদই ছিল না, আরামদায়কও ছিল। আমি জানি ঘুমিয়ে গেলে আমার হুঁশ থাকে না। তাই ড্রাইভার আর অ্যাসিস্ট্যান্টকে পইপই করে বলে দিয়েছি আশ্রম চৌমুহনি বা কল্যাণী স্টপেজে এলে যাতে আমাকে ডেকে দেয়। পরদিন ভোরবেলা যখন অনেক জোরাজুরি করে আমাকে গাড়ির অ্যাসিস্ট্যান্ট কল্যাণী স্টপেজে ঘুম থেকে তুলল তখন দেখি আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভিজে জবজবে। রেকসিনের অ্যাটাচির ভেতর জল ঢুকে ভেতরের সব জামাকাপড় ভিজে একাকার। বুঝলাম পথে খুব বৃষ্টি হয়েছে। গাড়ি থেকে নেমে ড্রাইভারকে খুব ধমকালাম—কি কাণ্ডজ্ঞান মশাই আপনাদের, এত বৃষ্টি হল আমাকে ডেকে ভেতরে আনলেন না? যত ধমকাই ড্রাইভার, অ্যাসিস্ট্যান্ট, ট্রাকের ভেতরে বসা অন্য যাত্রীরা হাসে। কি ব্যাপার, সবাই মিলে নাকি চেষ্টা করেও আমার ঘুম ভাঙাতে পারেনি। মাঝখানে ওরাও আমার ঘুম ভাঙাতে গিয়ে অল্পবিস্তর ভিজে গেছে। কথাটা অবিশ্বাস্য মনে হল না। নিজের ঘুম তো জানি।

পোস্ট অফিস চৌমুহনির পুরানো পোস্ট অফিস গোলাকার ইউ প্যাটার্নের ছিল।



সমীর চক্রবর্তী

ওয়ালিং করতে বেরিয়েছি। মধু নীল রং দিয়ে শ্লোগান লেখে, আমরা রঙের বাটি ধরে রাখি। সেদিন শঙ্কর দাশও ছিলেন আমাদের সঙ্গে। পোস্ট অফিসের দেওয়ালের কার্ণিশে রঙের বাটি ধরে আছি, অর্ধেক শরীর কার্ণিশের ওপরে, অর্ধেক শরীর কার্ণিশের নীচে ঝুলন্ত। মধু, শঙ্করদা সহ গোটা গ্রুপ ওয়ালিং সেরে চিত্রকথা সিনেমা হলের সামনে পৌঁছে দেখে আমি নেই। আমার ঘুমের ব্যাপারে সবাই ওয়াকিবহাল ছিল। দৌড়ে ফিরে এসে দেখে ঝুলন্ত অবস্থায় আমি ঘুমুচ্ছি। নীচ থেকে ডাক দিলে বিপত্তি হতে পারে তাই এরা সবাই ছাদে উঠে প্রথমে আমার দু'হাত শক্ত করে ধরে আমার ঘুম ভাঙায়। আমি শরীরের অর্ধেক হিঁচড়ে উপরে তুলে ওদের সঙ্গে ছাদ থেকে নেমে আসি। অনেকেরই বিশ্বাস না হতে পারে। তবে সৌভাগ্য আমার বর্তমান আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের পুরপিতা শঙ্কর দাশও জীবিত, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মধুসূদন ভট্টাচার্যও জীবিত।



লেখক (ধীরাজ গুহ)

পার্টি নেতাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে বীরেনদা, নৃপেনদা, দশরথদা এরা অনেক বড় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তবু এদের ব্যক্তিত্বের জন্যই বোধহয় পার্টিকর্মীদের সঙ্গে একটু দূরত্ব থেকে যেত (একথাটা অবশ্য আমাদের অনেকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)। কিন্তু ভানু ঘোষের সঙ্গে কোন পার্টিকর্মীর বিন্দুমাত্র দূরত্ব ছিল না। ভানুদা যেন বাড়ির অকৃতদার জ্যেঠামশাই। সবাইকে শাসন করতে পারেন। ছোটদের, বড়দের কড়া শাসন থেকে স্নেহভরা বুক দিয়ে আগলে রাখতে পারেন—যার কাছে সব আব্দার, সব অনুযোগ করা যায়।

১৯৭২ সন। পার্টি বিধানসভা নির্বাচনে বিকল্প সরকারের শ্লোগান দিয়েছে। সেবার ৬০টি বিধানসভার আসনে সি.পি.আই (এম) দল ১৮টি আসন পেয়েছিল। বটতলায় একটাই পার্টি অফিস। পার্টি অফিস আগলাতো গৌতম দাস ও উৎপলেন্দু বিকাশ সাহা। তারা পার্টির সমস্ত কাগজপত্র, ভোটারলিস্ট থেকে আরম্ভ করে নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত কাগজপত্র রক্ষণাবেক্ষণ, বিলি বণ্টনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করত এবং সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর পার্টি অফিসেই ঘুমোত। আমরা অপেক্ষাকৃত কম দায়িত্বপ্রাপ্ত বাউণ্ডুলে গ্রুপ সারারাত ওয়ালিং বা পোস্টারিং করে রাত্রি ৩/৪টার সময় শীতের মধ্যে গিয়ে গৌতম বা উৎপলের ঘুম ভাঙাতাম। তারা যে ঘরে ঘুমোত তার পাশের ঘরে কাগজ, পুরানো পোস্টার পুড়িয়ে আগুনের উত্তাপ নিতাম। এদের নিভিয়া ক্রীম চুরি করে মুখে মাখতাম। স্বাভাবিক কারণেই ভোরবেলা পার্টি অফিসে ভানুদা এলে গৌতম ও উৎপল আমাদের অভব্য আচরণের ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করত।

ভানুদা একদিন শুধু ডেকে আমাকে কি ঘটনা ঘটেছে জিজ্ঞেস করেছিল। আমি

অকপটে সত্য কথা ভানুদাকে বলেছিলাম। আমার মনে আছে গৌতম ও উৎপলকে ডেকে ভানুদা শুধু বলেছিল, রাত্রি দশটায় তো লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোস। এই শীতের রাতে ৩/৪টা অব্দি পোস্টারিং এবং ওয়ালিং করে যারা আগুনের উত্তাপ নিতে পার্টি অফিসে আসে তাদের কষ্ট কি বোঝার চেষ্টা করেছিস কোনদিন ? তারপর থেকে আর কোন অসুবিধে আমাদের হয়নি কোনদিন। তার অর্থ এই নয় যে, ভানুদা গৌতম বা উৎপলকে আমাদের থেকে কম ভালবাসত। কিন্তু কোন ক্যাডারকে কিভাবে নার্সিং করতে হবে এ ব্যাপারে ভানুদার মত দক্ষ লোক আমার এত বয়সে পৌঁছেও আমি পাইনি। ভানুদার মত নেতা (যিনি বিড়ি শ্রমিকের সংগঠন দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে এসেছিলেন, পরবর্তী সময়ে পার্টি সম্পাদক হয়েছিলেন) না থাকলে আমার বিশ্বাস হয় না পার্টিকে আন্তরিকভাবে ভালোবেসে জীবন উৎসর্গ করার মত এত কর্মী বেরিয়ে আসত।

বড়জলার পার্টিসভ্য কাষ্ঠশিল্পী বিনোদ সূত্রধর ১৯৭২ সনে নির্বাচনের আগে ভানুদার কাছে এসে বায়না ধরল—বড়জলাতে জনসভা ডাকা হয়েছে, ভানুদা, কানুদা, বীরেনদা, নৃপেনদা, দশরথদাকে বক্তা হিসাবে পাঠাতে হবে। ভানুদা বিনোদদাকে বলল এত কথা না বলে পার্টি রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সব সদস্যকে তোমার জনসভায় পাঠাতে হবে বললেই তো হয়। বিনোদদা সকাল আটটায় রিক্সার মধ্যে মাইক ফিট করে প্রচারে বেরিয়ে পড়লেন। দুপুর ১১টায় বিশু এসে খবর দিল শঙ্কর চৌমুহনি বিনোদদা মাইকে বক্তব্য রাখছেন, শ্রোতা নেই একজনও। অর্থাৎ বটতলা থেকে শঙ্কর চৌমুহনির মাঝখানে ৪/৫ জায়গায় বক্তৃতা দিতে বিনোদদার সময় লেগেছে মাত্র তিন ঘণ্টা। যথারীতি সভা হয়েছিল বড়জলা এলাকায় অর্থাৎ বিনোদদার বাড়ির পাশে নির্ধারিত স্থানে। বক্তা অনেকেই ছিল। সেই সভার সভাপতি ছিলেন প্রয়াত শ্রদ্ধেয় নেতা কানু ঘোষ। আমরা বিশুকে পাঠিয়েছিলাম সেই সভায়। সব দেখেশুনে এসে আমাদের রিপোর্টিং করার দায়িত্ব ছিল তার। বিশু রাত ৯টা নাগাদ ফিরে এল তপন করের কের চৌমুহনির বাড়িতে। আমি, চন্দন চক্রবর্তী, তপনদা, শঙ্করদা, মধু ভট্টাচার্য, বিজয় সিংহরায়-সহ অনেকেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। বিশুকে অনেক তোষামোদ করে, সিগারেট ঘুষ দিয়েও কথা বের করতে পারছিলাম না। সে কথা আরম্ভ করেই হাসতে হাসতে মাটিতে গড়িয়ে পরে। অনেক কষ্টে যেটা বুঝতে পারলাম—সভাপতি হিসাবে কানুদা যখন বক্তব্য রাখেন তখন মাঠ



বীরেন দত্ত

প্রায় ফাঁকা। হাতে গোণা দু'চারজন। বক্তৃতার মাঝখানে কানুদা হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে বলে ওঠেন, বিনোদ আমার কথা ল্যাম্প পোস্টে ধাক্কা খাচ্ছে।



নৃপেন চক্রবর্তী

সম্ভবত ১৯৬৯ সন বা ১৯৭০ সন হবে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের সদর বিভাগীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বামুটিয়ায়। এই উপলক্ষে প্রয়াত তপন করের নেতৃত্বে আগরতলা শহর এবং শহরতলিতে বেশ কয়েকটি ডি.ওয়াই.এফ.আই-এর প্রাথমিক ইউনিট গঠিত হয়। বিশুর বটতলা মাছবাজারের ব্যবসায়ী এবং অন্যান্যদের সঙ্গে খুব সখ্যতা এবং মেলামেশা ছিল। বিশু অনেক পরিশ্রম করে বটতলা মাছ বাজারে দীনেশ দাসের মিষ্টির দোকানে অনিল সরকারকে দিয়ে এক সভা করে ডি.ওয়াই.এফ.আই-বটতলা বাজার ইউনিট গঠন করে। সন্ধ্যায় বটতলা পার্টি অফিসে ভানুদার উপস্থিতিতে আমাদের সকলের সামনে কত পরিশ্রম তার এই ইউনিট করার জন্য করতে হয়েছিল বুঝিয়েছিল। ভানুদা হেসে শুধু বলেছিলেন কয়জন শেষ পর্যন্ত পাশে থাকে দেখ। বিশু দু'বেলা বটতলা পার্টি অফিসে হাজিরা দিত। কিন্তু পরের দিন সকালবেলা বিশু আর পার্টি অফিসে আসেনি। সেদিন বিকেলে কি কারণে যেন আমি পার্টি অফিসে যাইনি। যতদূর মনে পড়ে শঙ্কর দাশ ফুঁসলে 'পাতাল ভৈরবী' জাতীয় কোন সিনেমা দেখতে নিয়ে গিয়েছিল।



দশরথ দেব

এর পরদিন পার্টি অফিসে গিয়ে জানতে পারলাম—বটতলা মাছবাজারে বিশুর উদ্যোগে ডি.ওয়াই.এফ.আই ইউনিট গড়ার খবর পেয়ে এলাকার কংগ্রেস কর্মী এবং মাতব্বররা সেই ইউনিট লালবাহাদুর শাস্ত্রী ক্লাব ইউনিটে রূপান্তরিত করে নেয় পরের দিনই। বিশু সে খবর পেয়ে গতকাল মন খারাপের জন্য সকালবেলা পার্টি অফিসে আসেনি। তবে কি আর করবে। সন্ধ্যায় গুটি গুটি পায়ে পার্টি অফিসে এসে হাজির বিশু। রাত ৮/৮-৩০ মি: নাগাদ ভানুদা বিড়ি

শ্রমিকদের সভা ছেড়ে পার্টি অফিসে ফিরে এলেন। এসেই বিশুকে দেখে বললেন, কি বিশু তোর বটতলা মাছবাজার ডি.ওয়াই.এফ ইউনিটের খবর কি ? বিশু মুখ বুজে খোঁচা হজম করে নিল। এরপরই তপন কর ভানুদাকে বলল, ভানুদা বিশু আগামী কয় মাস আর বটতলা বাজারে যাবে না জিজ্ঞেস করুন তো? এবার বিশু ফুঁসে উঠলো। বলল কেন ? ইচ্ছে করলে এখনো যেতে পারি। ভানুদা বললেন, দেখি তোর ক্ষমতা। যদি তুই এখন বটতলা বাজার থেকে দুটো ইলিশ মাছ নিয়ে আসতে পারিস তবে এই মুহূর্তে পার্টি অফিসে তোরা যতজন আছিস সবার আজ রাতে খাওয়ানোর দায়িত্ব আমার। তপনদা, চন্দন চক্রবর্তী, বিশু, জয়নগরের শিবু গাঙ্গুলি-সহ তখন পার্টি অফিসে ছিল মোট ১৬ জন পার্টিকর্মী ও দরদী। বিশু এককথায় ভানুদার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলো। বললো, আমি এক্ষুনিই ইলিশ মাছ নিয়ে আসছি। বিশু বটতলা পার্টি অফিসের সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় দেখে ওর পিছু পিছু শিবু গাঙ্গুলিও নেমে আসছে। বিশু জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার শিবু তুই কোথায় যাচ্ছিস? শিবু বলল, তুই যে মাছ নিয়ে আসতে পারবি সে তো আমি ভাল করেই জানি। ভানুদা একা লোক, নিজে রেঁধে খান। ওনার বাড়িতে সরষের তেল, কাঁচালঙ্কা, কালো জিরা এবং এতজনের ভাত করার মত ডেকচি কোথায় পাওয়া যাবে। সুতরাং, এগুলি জোগাড়-যন্ত্র করে আমি ভানুদার বাড়ি চলে যাচ্ছি। তুই মাছ নিয়ে সবাইকে সঙ্গে করে ভানুদার বাড়িতে আয়। আধ ঘণ্টার মধ্যে জামাই ষষ্ঠীর ইলিশের মত জোড়া ইলিশ হাতে ঝুলিয়ে পার্টি অফিসে বিশু এসে হাজির হয়েছিল। সবাই মিলে আনন্দে হৈ-হৈ করে উঠল। তারপর ১৬ জন পার্টিকর্মী ভানুদার রামনগর ৬ নং রোডে ছনের ছাউনি দেওয়া বাঁশের বেড়ার ঘরে সমবেত হয়েছিল রাত্রি ৯-৪৫/১০ টা নাগাদ। শিবু গাঙ্গুলির বাড়ি থেকে নেওয়া বড় ডেকচিতেই ভাত এবং ভাপে ইলিশ রান্না হয়েছিল। খেয়ে দেয়ে সেদিন নাকি সবার বাড়ি ফিরতে রাত দেড়টা/দু'টো বেজে গিয়েছিল। তবে শিবু গাঙ্গুলির হাতে রাঁধা ভাপে ইলিশ ভাত খেয়ে সবার অমৃত মনে হয়েছিল। রান্না চলাকালীন সময়ে ভানুদার কাছ থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এবং পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরাতে এসে পার্টি করার অভিজ্ঞতা শুনতে শুনতে সময় ওদের কি করে কেটে গিয়েছে ওরা বলতেও পারেনি। পরের দিন সব ঘটনা শুনে সেদিন সন্ধ্যায় আমরা যারা পার্টি অফিসে গরহাজির ছিলাম সবাই কপাল চাপড়েছি।


ভানু ঘোষ

সেই শিবু গাঙ্গুলি বেশ কয়েক বছর আগেই ক্যান্সার রোগে ভুগে আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে। শিবু বিড়ি, সিগারেট খেত শুনিনি কোনদিন। তবু ক্যান্সারের ছোবল থেকে বাঁচতে পারেনি। যার যার পেশায় ব্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর আমরা নিজেদের নিয়ে বা যার যার এলাকার পার্টি নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম যে ছাত্রজীবনে সমস্ত আগরতলা শহর-শহরতলির পার্টিকর্মী, সভ্য, সমর্থক, দরদীদের সবাইর একে-অপরের খোঁজ রাখার অভ্যেস সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল। আস্তে আস্তে আমরা সবাই নিজেদের একটা গণ্ডির মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়েছিলাম। সে কারণেই মৃত্যুর বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই শিবু গাঙ্গুলির সঙ্গে তেমন কোন যোগাযোগ আর ছিল না। মারা যাওয়ার বেশ কয়েক দিন পর শিবুর মৃত্যু সংবাদ পাই। অবশ্য আমাদের ছাত্রজীবনের সময় আর যার যার পেশায় ব্যস্ত হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে পার্টিও অনেক বিশাল হয়ে উঠেছিল। এত বিপুল সংখ্যক পার্টিকর্মী, দরদীদের একে-অপরের দৈনন্দিন খোঁজ রাখাও সম্ভব ছিল না।

কিন্তু একথা হলফ করে বলতে পারি ৬০-৭০ এর দশকের পার্টি কর্মীদের মধ্যে মানসিক যে অচ্ছেদ্য একটা ভালোবাসার বন্ধন ছিল যেটা তাদের তাড়িত করত সহকর্মীর দৈনন্দিন খোঁজ রাখতে সেই মানসিক ভালোবাসার নিবিড় বন্ধন ১৯৭৮ সালে পার্টি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই আস্তে আস্তে অন্তর্হিত হতে শুরু করেছিল। একটা কৃত্রিম, লোকদেখানো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল— যে সম্পর্ক অনেক সময় স্বার্থের বলয়কে আবৃত করে ঘুরপাক খায়। পার্টির আকার বিশাল হয়েছে এই কারণ থেকে ও মনের ভেতর থেকে তাগিদের অভাব ভালোবাসার নিবিড় বন্ধন অটুট রাখার সবচেয়ে বড় অন্তরায় বলেই আমার মনে হয়।

পাঠকদের কাছে প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এ কারণে যে আমার ডায়েরি লেখার অভ্যেস কোনদিনই ছিল না।সুতরাং বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে সন, তারিখের ব্যাপারে আমি নিজেই মাঝে মাঝে ধন্ধে পড়ে যাই। সুতরাং খুব সতর্কতা সত্ত্বেও যদি সন বা তারিখের কোন ভুল হয়ে যায় আমায় ক্ষমা করবেন।

ত্রিপুরা রাজ্য পূর্ণ রাজ্য হিসাবে ঘোষিত হওয়ার পর ১৯৭২ সনে ৬০ সদস্যক আসনে প্রথম বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রে সেবার কংগ্রেস প্রার্থী অশোক ভট্টাচার্যের সঙ্গে সি.পি.আই(এম) দলের প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন প্রয়াত কানু ঘোষ। কানুদা সেই নির্বাচনে অশোক ভট্টাচার্যের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। আমার যতদুর মনে পরে বড়জলা'র একটা অংশ তখন রামনগর বিধানসভার অন্তর্গত ছিল। বিনোদ সূত্রধর অনেক পোস্টার এলাকায় সাঁটবেন বলে পার্টি অফিস থেকে ক্ষেপে ক্ষেপে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের সবার মনেই একটা সন্দেহ উঁকি মারছিল বিনোদদার এলাকায় কর্মী প্রায় নেই বললেই চলে। এত পোস্টার বিনোদদা একা এলাকায় সাঁটবেন কি করে ! একদিন দুপুরবেলা কৌতূহল নিরসনের জন্য সাইকেলে চড়ে বিনোদদার বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। সঙ্গে কাকে নিয়ে গিয়েছিলাম এক্ষুণি মনে করতে পারছি না। গিয়ে দেখি বিনোদদার ঘরের মাটির দেওয়ালের চারদিক শোভিত হয়ে আছে সি.পি.আই(এম) প্রার্থী কানু ঘোষকে এই চিহ্নে ভোট দিন। বিনোদদার বাড়ির গেট, বাঁশের বেড়া সব জায়গায় কানুদার পোস্টার সাঁটানো। এলাকাতে যে দু'চারটে পোস্টার লাগানো

হয়নি তা নয়, তবে সিংহভাগই বিনোদদার বাড়ি ঘিরেই নয়নাভিরামভাবে প্রদর্শিত হচ্ছিল। কানুদাকে আর ভয়ে বলিনি সে কথা। কারণ সে খবর জানলে বিনোদদার কি গতি হতে পারে আঁচ করে বোবা সেজেই ছিলাম। সেবারের বিধানসভা নির্বাচনে সব ভোটারের বাড়িতে ভোটার স্লিপ পৌঁছে দেওয়ার মত কর্মীবাহিনী আমাদেব ছিল না। প্রার্থীকে নিয়ে বাড়ি-বাড়ি যখন আমরা ২/৪ জন যেতাম তখন যতটুকু সম্ভব ভোটার স্লিপ পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা হত। কানুদার জন্য সেবার জান লড়িয়ে খেটেছিল বলাই সিংহরায়, বিজয় সিংহরায়, মধুসূদন ভট্টাচার্য (যাকে আমরা বেঁটে মধু বলে সম্বোধন করতাম) এবং আরো বেশ কয়েকজন কর্মী। এই মধু বর্তমানে আগরতলা এ.জি অফিসে কর্মরত।

একদিন সন্ধ্যে হয় হয় সময়ে এরা সবাই কানুদাকে নিয়ে রামসুন্দরনগর পাড়ার এক বাড়িতে ঢুকেছে প্রার্থীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল বয়স্ক কেউ বাড়িতে নেই। বাচ্চা একটি মেয়ে বাড়িতে আছে। কানুদা মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলেন, ভোটার স্লিপ পেয়েছ মামণি? মেয়েটি বলল, হ্যাঁ। কানুদা খুব খুশি হলেন এলাকার পার্টির ছেলেরা খুব কাজের ছেলে মনে করে। বিজয় সিংহরায়ের কেন জানি একটু সন্দেহ হল। সে মেয়েটিকে বলল—ভোটার স্লিপগুলি এনে দেখাও তো খুকী। মেয়েটি ঘরে ঢুকে মাটিব হাঁড়ি থেকে বের করে এনে যেটা দেখাল সেটা হল কংগ্রেস প্রার্থী অশোক ভট্টাচার্যেব ভোটার স্লিপ। কানুদা সভয়ে চিৎকার দিয়ে উঠল— কালসাপ, কালসাপ। মেয়েটিকে বললেন, এক্ষুণি এগুলি ফেলে দাও। বিজয়, বলাই ওরা মেয়েটির হাতে পার্টিব ভোটার স্লিপ গুঁজে দিল। কানুদা বললেন—এই স্লিপগুলি খুব যত্ন করে মাটির কুলুঙ্গীতে রেখে দাও। বাবা বাড়িতে এলে বাবার হাতে তুলে দিও। মেয়েটি কানুদার কালসাপ চিৎকার শুনে এমন হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিল যে, সব কথাতেই সে উদাস ও নির্নিমেষ চোখে চেয়েছিল। সব কথা বুঝতে পেরেছিল কিনা কে জানে।

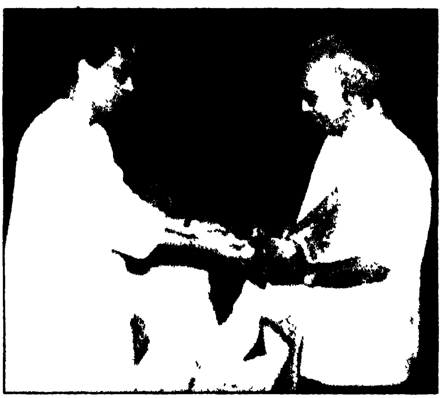
সম্ভবত ১৯৭৩ সন হবে। ভারতের ছাত্র ফেডারেশনেব রাজ্য সম্মেলন। আমি এবং বিমল সিংহ তখন এস.এফ.আই-এর সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলাম। সেই অবস্থাতেই আমরা দু'জনে এবং শঙ্করদা আইন পড়তে কোলকাতা চলে যাই। কোলকাতা থেকে আমি এবং বিমল এস.এফ.আই সম্মেলনে যোগ দিতে আগরতলায় আসি। আমরা এস এফ.আই-এর পূর্ববর্তী সম্মেলনে এস.এফ.আই সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলাম। আমি এবং বিমল দু'জনই সম্মেলনে বলি যে যেহেতু এখন আমরা পড়াশোনার জন্য কোলকাতা অবস্থান করছি সুতরাং আমাদের এস.এফ.আই-এর রাজ্য কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হোক। শেষে নৃপেনদার পরামর্শ অনুযায়ী আমাদের দু'জনকেই এস.এফ.আই রাজ্য কমিটির আমন্ত্রিত সদস্য হিসাবে রাখা হয় যাতে মাঝে মাঝে ত্রিপুরায় এলে আমরা এস.এফ.আই রাজ্য কমিটির সভায় যোগ দিতে পারি। সেই সম্মেলনটি হয়েছিল আগরতলা চিলড্রেন্স পার্কে অবস্থিত কমিউনিটি হলে। ছেলে প্রতিনিধিদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল সম্মেলনস্থল অর্থাৎ কমিউনিটি হলে। মেয়ে প্রতিনিধিদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল প্যারাডাইস চৌমুহনি, গান্ধীঘাট সংলগ্ন পিপলস রিলিফ কমিটি (পি.আর.সি) অফিসে। সম্মেলনে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন সদ্য কোলকাতা থেকে আগত প্রণব রায়। যিনি বর্তমানে প্যারাডাইস চৌমুহনিস্থিত 'কৃষিশিল্প উদ্যোগে'র মালিক।

ছেলে বা মেয়ে প্রত্যেক প্রতিনিধিকে এসে রিপোর্টিং করতে হয়েছিল প্রণব রায়ের কাছে। তার কাছেই প্রত্যেকের বেডিং জমা দেওয়ার নির্দেশ ছিল। যথারীতি সব প্রতিনিধিরা প্রণব রায়ের কাছে রিপোর্টিং করে বেডিং জমা দিয়েছিল। কৈলাসহর থেকে প্রতিনিধি হিসাবে এসেছিল গৌরমোহন সিন্‌হা। সে কোনও বেডিং নিয়ে আসেনি। আমরা গৌরমোহনকে বললাম, ভাই স্বেচ্ছাসেবকের নেতা প্রণব রায়ের যন্ত্রণায় আমরা অস্থির, কিছু একটা ব্যবস্থা কর। জানতাম, গৌরমোহনের কিচুকে বুদ্ধি অসাধারণ। সে বলল, ঠিক আছে ব্যবস্থা হবে। গৌরমোহন সোজা সম্মেলন শেষে প্রণব যখন খুব ব্যস্ত তখন গিয়ে বলল, আমার বেডিং দাও। আমার শরীর খারাপ খাব না। এক্ষুণি ঘুমিয়ে যাব। প্রণব গৌরমোহনকে তার বেডিং খুঁজে নিতে বলল। গৌরমোহন হাতের সামনে যে বেডিং পেল নিয়ে চলে এল। রাতের বেলা খাওয়া-দাওয়ার পর গৌরমোহন বেডিং খুলে দেখে সেটি মেয়েদের বেডিং। কি আর করা যাবে। সায়া, ব্লাউজ, শাড়ি ও অন্যান্য পরিধেয় বস্ত্র আলাদা করে সরিয়ে রেখে, গৌরমোহন নির্দ্বিধায় ঘুমিয়ে পড়ল সেই বেডিং খুলে। ওদিকে মেয়েদের থাকার জায়গায় একটি বেডিং স্বাভাবিক কারণেই কম হওয়াতে লেগেছে ঝামেলা। প্রণবের মাথার চুল ছেঁড়ার অবস্থা। হাতে-পায়ে ধরে, বাড়ি থেকে বিছানা আনিয়ে সে রাত্রে কোনভাবে সে ম্যানেজ করেছে। পাঠকরা, শুধু চিদানন্দ দাশগুপ্ত পরিচালিত সৌমিত্র-অপর্ণা অভিনীত 'বাক্স বদল' চলচ্চিত্রের কথাটি স্মরণ করুন।

পরের দিন সকালে উল্টে গৌরমোহন প্রণবকে গিয়ে ধমকাতে শুরু করেছিল---মশাই, আপনার কাণ্ডজ্ঞান নেই, আমার বেডিং বদল করে মেয়েদের বেডিং আমায় দিয়েছেন। আমরা দেখলাম ব্যাপারটা বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। পরে যে করে হোক আমি, বিমল সবাই মিলে ব্যাপারটা সামাল দিয়েছিলাম। পরিশেষে, জানিয়ে রাখি প্রণব রায় মুখে খুব কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করলেও অন্তরে অত্যন্ত উদার ও কোমল স্বভাবের সহযোদ্ধা ছিল। তার সঙ্গে এ ধরনের পরিহাস করা আমাদের উচিত হয়নি। আজ প্রকাশ্যে এই লেখার মাধ্যমে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। প্রণব আমাদের ক্ষমা কোরো।

১৯৭৩ সনে এস.এফ.আই সম্মেলন শুরু হওয়ার আগের দিন কমিউনিটি হলটি স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য চাবি দিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন অজয় বিশ্বাস। তিনি তখন কর্মচারী আন্দোলনের ডাকসাইটে নেতা এবং আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটিতে চাকুরিরত। বিকেলবেলা ভানুদা অর্থাৎ প্রয়াত ভানু ঘোষ আগরতলা কমিউনিটি হলে গেছেন স্বেচ্ছাসেবকদের কাজকর্ম তদারকি করতে, গিয়ে দেখেন কমিউনিটি হল বন্ধ। তবে এক নেপালি দারোয়ান কমিউনিটি হলের সামনে দণ্ডায়মান। ভানুদা প্রথমে তাকে বাংলায় স্বেচ্ছাসেবকরা এসেছিল কিনা চাবি নিতে ইত্যাদি জিজ্ঞেস করার পরও যখন নেপালি দারোয়ান ভাবলেশহীনভাবে নীরব দৃষ্টিতে ভানুদার দিকে চেয়ে ছিল তখন ভানুদা বুঝলেন দারোয়ান বাংলা বোঝে না। তাই তিনি নেপালি দারোয়ানকে তাঁর নিজস্ব স্টাইলে হিন্দিতে বোঝানোর চেষ্টা করলেন পুরো ব্যাপারটা। ভানুদার সেই দুর্বোধ্য হিন্দি নিম্নরূপ ঃ কমিউনিস্ট পার্টিকা অর ছাত্র ফেডারেশনকা কোই নেতা চাবি লেনে কি লিয়ে আয়ে? দারোয়ান না সূচক মাথা নাড়াল। ভানুদার পরবর্তী সংলাপ— কমিউনিস্ট পার্টিকা লেড়কা বহুত আচ্ছা হ্যায়, উস লোক আনে কা সাথ সাথ চাবি দে দো। দারোয়ান

নিরুত্তর। ভানুদা বললেন— কুছ সমঝা কি নেহি ? দারোয়ান আবারও না-সূচক ঘাড় নাড়াল। এমন সময় সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের আমলে খড়দহ, বন্দীপুর থেকে বিতাড়িত সহযোদ্ধা সঞ্জীব ব্যানার্জি (যিনি তৎকালীন সময়ে আগরতলা এসে তার বড়ভাই এল.আই.সি'র ডেভেলাপমেন্ট অফিসার তথা ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় বামপন্থী সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শিবদাস ব্যানার্জির আশ্রয়ে ছিলেন) এসে রঙ্গমঞ্চে হাজির হলেন। ভানুদা সঞ্জীবকে দেখেই অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বললেন, সঞ্জীব দেখো তো,এই দারোয়ান না বোঝে বাংলা, না বোঝে হিন্দি। এর থেকে কি করে কমিউনিটি হলের চাবি আদায় করা যায়। সঞ্জীব ব্যানার্জি হিন্দিভাষী বহু এলাকা ঘোরা ছেলে, চোস্ত হিন্দি বলতে পারত। সে নেপালি দারোয়ানকে হিন্দিতে সব বুঝিয়ে বলার পর দারোয়ান সঞ্জীবকে বলল, অজয়দার নির্দেশমত সে চাবি হস্তান্তরের জন্যই কমিউনিটি হলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সঞ্জীব কমিউনিটি হলের চাবি দারোয়ান থেকে বুঝে নিয়ে দারোয়ানকে বলল, তুমি মিউনিসিপ্যালটি অফিসে গিয়ে অজয়দাকে বলে দাও চাবি যথাস্থানে, যথাযোগ্য লোকের কাছে দিয়ে দিয়েছ। সঞ্জীবের মুখে সব খবর শুনে আমরা সবাই বুঝলাম, ভানুদার মনে একটাই খেদ ওনার বহু কষ্টার্জিত নির্ভুল হিন্দি কেন দারোয়ান বুঝল না। হিন্দির ব্যাপারে অবশ্য ভানুদাকে নিয়ে এতকথা লেখার পর জনান্তিকে পাঠকদের জানিয়ে রাখি ভানুদার থেকেও নির্ভুল হিন্দিতে আমি কথা বলে থাকি। ২/৩ বছর আগে আমার দু'মেয়েই ছুটিতে পুণে থেকে বাড়ি এসেছে। ভোর ৫-৩০ মি:-৬টা নাগাদ হিন্দিভাষী আমার এক মক্কেলের ফোন এসেছিল ল্যান্ড ফোনে। বাড়ির সবাই ঘুমোচ্ছে দেখে মনের আনন্দে, প্রাণখুলে মক্কেলের সঙ্গে হিন্দিতে কথাবার্তা চালিয়ে গিয়েছিলাম। আমি কি ছাই জানতাম ছোটমেয়ে বাথরুমে যাবে বলে বিছানা থেকে উঠে আমার হিন্দি কথোপকথন শুনে আমার বড় মেয়েকেও ঘুম থেকে ইতিমধ্যে তুলে নিয়েছে। কথোপকথন শেষ করে ফোন রেখে বিছানায় ফিরে যেতে গিয়ে দেখি, আমার দু'মেয়েই ড্রয়িং রুমে আমার হিন্দি কথোপকথন শুনে হাসতে হাসতে মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। এরপর থেকে যে কোন কারোর সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলতে গেলে এখন চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিই।



শিবদাস ব্যানার্জিকে সম্বর্ধিত করছেন
মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার

প্রসঙ্গক্রমে যে সঞ্জীব ব্যানার্জি এবং তার জ্যেঠতুতো দাদা শিবদাস ব্যানার্জির কথা বলেছিলাম, তাদের সম্পর্কে দু'চার কথা না লিখলে নিজের বিবেকের কাছে দায়ী থেকে যাবো। শিবদাস ব্যানার্জি অর্থাৎ শিবকাকু কর্ণেল চৌমুহনির মোড়ে আমাদের বন্ধু এবং অতীতের ছাত্র আন্দোলন

এবং পার্টির সহযোদ্ধা, বর্তমানে ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকার মালিক ও সম্পাদক সমীরণ রায়ের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। শিবকাকু এল.আই.সি'র ডেভেলাপমেন্ট অফিসার হিসাবে কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছেন। শিবকাকু ছিলেন অকৃতদার। শিবকাকুদের খড়দহ বন্দীপুরের বাড়িতে আমি বেশ কয়েকবার গিয়েছি। বন্দীপুরে শিবকাকুদের খুড়তুতো, জ্যেঠতুতো ভাই মিলিয়ে একটা গোটা পাড়া গড়ে উঠেছে। এদের বাবা-কাকা-জ্যেঠারা মিলেই এলাকাতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নাটক বা যাত্রাপালা করে নিতে পাবত। এদের পরিবারেব বাইরের কোন সদস্য/সদস্যাকে অভিনয়ের জন্য ডাকতে হোতো না। যাহোক, কর্মসূত্রে শিবকাকু আগরতলা চলে আসেন। সেটা কত সালে আমি বলতে পারব না। তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায় ৬০-এর দশকে বা তাবও আগে হতে পারে।

আগরতলা ববীন্দ্রভবনেব দক্ষিণ দিকেই ছিল প্ল্যান্টার্স এয়াবওয়েজ-এব ট্রান্সপোর্ট অফিস। যার ম্যানেজার ছিলেন আরেক অকৃতদার প্রফুল্ল ভট্টাচার্য। যিনি বর্তমানে প্রয়াত। তাঁব বাড়ি এখনও আছে বিজয়কুমার স্কুলের বিপরীতে 'প্রফুল্ল নিকেতন'। তাব ভাইপো নান্টু, জয়ন্ত, হাবুল এরা আগবতলা শহরে যথেষ্ট পরিচিত এবং প্রতিষ্ঠিত। প্ল্যান্টার্স এয়ারওয়েজে আরেকজন মধুবাবু নামে কাজ কবতেন। প্রফুল্লবাবু, শিবকাকু এবং মধুবাবু তিনজনই ছিলেন সি.পি.আই (এম)-এর ঘোর সমর্থক এদের সন্ধ্যের পর আড্ডা ছিল প্ল্যান্টার্সের অফিসে। পার্টির জন্য সিংহভাগ চাঁদা আদায় করে দিতেন প্রফুল্লবাবু। এরা তিনজনই ছিলেন ভানুদার খুব ঘনিষ্ঠ। প্রফুল্লবাবুও বিয়ে করেননি। বড়ভাই ছোট-ছোট ৬/৭ জন ছেলেমেয়ে রেখে অল্প বয়সে মারা যান। প্রফুল্লবাবু এদের বড় করে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। প্রফুল্লদা চেঞ্চ স্মোকার ছিলেন। শিবকাকুও নিজের আপনভাই, খুড়তুতো-জ্যেঠতুতো ভাইদের মানুষ কবে তোলার, প্রতিষ্ঠিত করে তোলার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে বিয়ে করার আর সুযোগ পাননি। ত্রিপুরা সংস্কৃতি পরিষদ-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাণপুরুষ ছিলেন শিবকাকু। তাঁব আরেক জ্যেঠতুতো ভাই উদয় ব্যানার্জি যিনি পরবর্তী সময়ে খড়দহ মিউনিসিপ্যালিটির কর্মকর্তা নির্বাচিত হয়েছিলেন, তিনিও জরুরি অবস্থার সময় খড়দহ থেকে এসে শিবকাকুর আশ্রয়ে ছিলেন। উদয় এখন খড়দহের অন্যতম একজন ধনী ব্যবসায়ী। পার্টির সঙ্গে সম্ভবত যোগাযোগ নেই। শিবকাকু ছিলেন বামপন্থী সাংস্কৃতিক আন্দোলনে প্রয়াত হীরালাল সেনগুপ্তের মতই প্রাণপুরুষ এবং পুরোধা ব্যক্তিত্ব। বিভিন্ন নাটকে শিবকাকুর প্রাণবন্ত, সাবলীল অভিনয় আজো অমলিন ও ইতিহাস হয়ে রয়েছে। কর্মজীবনের সমাপ্তির পর তিনি রয়েল গেস্ট হাউসের পূর্বতন মালিক চুনী বর্মণের অনুরোধে কিছুদিন রয়েল গেস্ট হাউসের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তার আগে প্রফুল্লবাবু, মধুবাবুর অনুরোধে প্ল্যান্টার্সের একটি সিস্টার্স কনসার্নে মটরস্ট্যান্ড রোডে কাজ



প্রফুল্ল ভট্টাচার্য

করেছিলেন। প্রফুল্লবাবু মারা যাওয়ার পর শিবকাকু মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। খড়দহ চলে যান। কিন্তু এ ভাইয়ের বাড়ি, ও ভাইয়ের বাড়ি একবেলা, দু'বেলা করে নেমন্তন্ন খেয়ে ১৫/২০ দিন বা সর্বাধিক ২/৩ মাস কাটানোর পর আবার ঘুরে ফিরে আগরতলা চলে আসতেন। কারণটা কি বা রহস্যটাই বা কোথায় আমি আজো বুঝে উঠতে পারিনি। খড়দহ এলাকা কি শিবকাকুকে স্নেহের ডোরে স্থায়ীভাবে বাঁধতে পারেনি, না আগরতলার মায়া তিনি কোনভাবেই কাটাতে পারছিলেন না আমি বলতে পারব না। এই ৮৫ বৎসর বয়সের চিরতরুণ এখন গান্ধীগ্রাম, দুর্গাঙ্গি এলাকায় প্রতিষ্ঠিত 'সান্ধ্যনীড়' বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিক। 'সান্ধ্যনীড়' বৃদ্ধাশ্রমে বিভিন্ন সময় অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিবকাকুর উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি পাঠ শ্রবণ যেকোন শ্রোতার সৌভাগ্যের ব্যাপার বলতে হবে। আমি যতটুকু জানি 'সান্ধ্যনীড়' বৃদ্ধাশ্রম গড়ে তোলার উদ্যোক্তাদের কারো কারো মাথায় শিবকাকুর মাথার ওপর একটি ছাউনি বা আশ্রয় গড়ে তোলার ব্যাপারটি এই বৃদ্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সদর্থক-সহায়ক ভূমিকা নিয়েছিল। শিবকাকুর ছোটভাই সঞ্জীব ব্যানার্জি যিনি ভারতীয় দূরসঞ্চার নিগম (বি.এস.এন.এল)-এর পদস্থ অফিসার এবং বর্তমানে কোলকাতা নিবাসী তিনিও ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। সে কাহিনী পরে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করব।

শিবকাকুর ভাড়া বাড়িতে (কর্ণেল চৌমুহনি) আমাদের সহযোদ্ধা, জুটমিলের বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত কর্মী নির্মল মোদক (হারাধন সংঘ, লেক রোডে বাড়ি) একদিন বিকেলে গিয়েছে। পুষ্ট একটি পাকা পেপে শিবকাকুর খাটের নীচে শোভিত হচ্ছিল। শিবকাকু জিজ্ঞেস করলেন, কি নির্মল, পেপে খাবে নাকি ? নির্মল বলল, 'না'। তারপর ঘণ্টাখানেক আড্ডা দেওয়ার পর নির্মল শিবকাকুকে বলল, কাকু পেপে খাওয়ার জন্য আরেকবার অনুরোধ করলেন না কেন ? কাকু উত্তর দিলেন, অনুরোধ করলেই তুমি 'হ্যাঁ' বলবে তাই। তারপর অবশ্য শিবকাকু হাসতে হাসতে পেপে কেটে নির্মলকে তৃপ্তির সঙ্গে খাইয়েছিল। এই হলো শিবদাস ব্যানার্জি।

আমি ১৯৬৭ সনে উমাকান্ত একাডেমি থেকে হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করি। আমার সহপাঠী কৃষ্ণ কেশব রায়, বাঁধন রায়, প্রদীপ রায়, প্রদীপ বসাক, পরিমল ঘোষ, দিলীপ চক্রবর্তী, অমিত ব্যানার্জি, অমিত ভট্টাচার্য, ভূপাল চৌধুরী, স্নেহাংশু চৌধুরী, চন্দন সেন, দীপক দত্ত (নোটন), রুণু দে, মধুসূদন ভট্টাচার্য (২) আরো অনেকে। শচীন গুপ্ত ছিলেন আমাদের ইংরেজির শিক্ষক। খুবই রাশভারী লোক। অমিত ব্যানার্জি ছিল খুব ফর্সা তাই তাকে তিনি ডাকতেন রেড মাঙ্কি, আর আমি কালো ছিলাম তাই আমাকে ডাকতেন ব্ল্যাক মাঙ্কি। আমাদের ক্লাশ টিচার ছিলেন মানিক চৌধুরী। তিনি আমাদের রোলকল করতেন। প্রায় দিনই রোলকলের সময়ই আমাকে জিজ্ঞেস করতেন ক্লাশের পড়া তৈরি করেছি কি না। না বলতে হত প্রায়দিনই। কপালে জুটত পুরোটা ক্লাশ চলাকালীন সময়ে কানে ধরে বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে থাকা। আমাদের ব্যাচের অধিকাংশ মেধাবি ছাত্ররা আড্ডা দিত আর.এম.এস. চৌমুহনিতে। মেধাবি ছাত্রের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় বাঁধন, দুই প্রদীপ, পরিমল, দিলীপ, অমিত ভট্টাচার্য, অমিত ব্যানার্জি, ভূপাল চৌধুরী। মহারাজগঞ্জ বাজার বাড়ি ছিল নেপাল সাহা এবং সত্যগোপাল সাহা দুই ভাইয়ের। এরাও আমাদের সহপাঠী ছিল। আমরা



উমাপ্রসাদ (ভানু) কুশল, স্নেহাংশু ও সমরেন্দ্র

বাকিরা ছিলাম মাঝারি গোছের ছাত্র। আমরা ধর্মেও ছিলাম, জিরাফেও ছিলাম। আমাদের প্রধান শিক্ষক প্রথম পর্যায়ে পেয়েছিলাম রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক প্রয়াত শীতিকণ্ঠ সেনগুপ্ত মহাশয়কে। সৌম্য দর্শন, ধুতি- পাঞ্জাবি পরিহিত এই শিক্ষক সম্ভবত. ত্রিপুরা রাজ্যের আমাদের সময়কালে সবচেয়ে আদরণীয় ও সম্মানিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর দাপটের কাছে শাসকদলীয় অনেক হোমরা-চোমরা ম্রীয়মান হয়ে থাকতেন। তিনি হঠাৎ করে তথাকথিত ভালো ছাত্রদের নিয়ে ক্লাশ নাইন থেকে 'মডেল সেকশান' চালু করেছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি আমি কি করে যে মডেল সেকশানের ছাত্র হিসাবে সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলাম আমি নিজেও বলতে পারি না।

যাহোক, আমাদের সহপাঠী কৃষ্ণ কেশব রায় স্কুলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিল আমরা যখন ক্লাশ নাইন বা টেনে পড়ি তখন। তার দৌলতে প্রায়দিনই ক্লাশ ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ পেতাম। স্কুল সাফাই-এর কাজে আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে শ্রেণি শিক্ষককে বলে কেশবই আমার ছুটির ব্যবস্থা করত। তারপর কিসের স্কুল সাফাই। দে দৌড়। কোথায় না যেতাম। সমস্ত আগরতলা শহর চরকিবাজির মত ঘুরতাম। চলে যেতাম কলেজটিলা হাওড়া নদীর পাড়ে। সেখানে বনগযাম ছিল খুব মিষ্টি। তাই কুড়িয়ে খেতাম। বিকেলে কলেজ মাঠে কাদায় লুটোপুটি হয়ে ফুটবল খেলা এবং সম্মিলিতভাবে কলেজ লেকে জন্মদিনের পোশাকে স্নানপর্ব। কৈশোরের অতীত দিনগুলি ছিল সত্যিই সোনাঝরা দিন। প্রায়দিনই স্কুলে যাওয়ার সময় কিছু পয়সাকড়ি চুরি করে নিয়ে যেতাম। মার অভ্যেস ছিল আলমারির মধ্যে কাপড়ের বা শাড়ির ভাঁজে টাকা রাখার। কোথায় কত টাকা রাখত প্রায়ই ভুলে যেত। মা'র ভুলে যাওয়ার এই অভ্যেস আমার চুরির কাজে মস্ত সুবিধা করে দিত। বিজয়া দশমীর দিন বা অন্যান্য দেবদেবীর পূজার অনুষ্ঠানে তাদের পায়ে ছোঁয়ানো রূপোর টাকা মা একটা বাক্সে জমা করে রাখত। সেখান থেকে মাঝেমধ্যে দু'একটা রূপোর টাকা তুলে নিলে সোনা-রূপোর দোকানে বেচে পাওয়া যেত এক টাকার বিনিময়ে এক টাকা চার আনা। তখনকার দিনে এই এক টাকা চার আনার দাম কত বিশাল ছিল বলে বোঝানো যাবে না। স্কুলের সামনে হরিদাস আচার এবং অন্যান্য মুখরোচক খাওয়ার বেচত। বন্ধু-বান্ধবসহ হরিদাসের কল্যাণার্থে সেই টাকা খরচ হয়ে যেত। কি মুখরোচক চানাচুর যে বিক্রি করত রাধেশ্যাম, যত খেতাম ততই মনে হোত যারা এই চানাচুরের স্বাদ ভোগ করতে পারেনি তাদের জীবন বৃথা। মনে-মনে বাসনা ছিল চানাচুর খাওয়ার জন্য রাধেশ্যামের মেয়ে বিয়ে করে ঘরজামাই হয়ে জীবন কাটিয়ে দেব। জানি না, রাধেশ্যামের কোন মেয়ে ছিল কিনা। হরিদাস আর রাধেশ্যামের খরচ যোগানোর পাশাপাশি দেখা দিল নতুন

বিপত্তি। সিনেমা দেখার নেশা। মহারাজা বীরবিক্রম কলেজে সম্ভবত. ১৯৭১ সনে কলেজে ভর্তি হতে গিয়ে খুন হয় ধলেশ্বর কল্যাণী এলাকার ক্ষীর গোপাল দে। যে এলাকায় আমি তখন থাকতাম। ক্ষীর গোপালের বড়ভাই ছিল ননীগোপাল দে। বিকেল বেলা কলেজ মাঠে খেলতে গেলে দেখা হয়ে যেত ননীগোপালের সঙ্গে। খেলাধুলা মাথায় উঠত। কলেজ মাঠের গ্যালারিতে তাকে ঘিরে বসতাম আমরা কয়েকজন। ননী সিনেমা হলের পর্দা খোলার মুহূর্ত থেকে শেষ পর্যন্ত তার দেখা সিনেমার আদ্যোপান্ত বিবরণ দিত। জেমিনি গনেশন থেকে আরম্ভ করে পৃথ্বীরাজ কাপুরের শিবপূজার মধ্য দিয়ে সিনেমা শুরুর ঢং-ঢং আওয়াজ যতদিন সিনেমাটা না দেখতে পারতাম কানে বাজত। ননীর মুখে মুঘল-এ-আজম, আনারকলি প্রভৃতি সিনেমার বিবরণ যখন শুনতাম ঘন ঘন গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত। ফলে আরো বেশি টাকা রোজগারের শুলুক সন্ধান শুরু হয়ে যেত। বাড়ির গরুকে খেলতে যাওয়ার সময় ঘাস খাওয়াতে কলেজটিলা নিয়ে যেতাম। খেলা শেষে বাড়ি ফেরার সময় নিয়ে ফিরতাম। তখন মাঝে মাঝে গরুটিকে কলেজটিলার কোন এক জায়গায় কারোর কাছে পাহারায় রেখে বাড়ি এসে বলতাম, গরু দড়ি ছিঁড়ে অন্য লোকের গাছ-গাছালি বা ফসল খেয়ে নেওয়ায় গরুটিকে খোঁয়াড়ে দিয়ে দিয়েছে। ছাড়িয়ে আনতে পয়সা লাগবে। তারপর যা হয় আর কি । গরু ছাড়ানোর পয়সার সদ্ব্যবহার হোতো সিনেমা দেখায়। আরো বেশ কিছু পন্থা বের করেছিলাম বন্ধু-বান্ধবসহ খরচ করার জন্য। সবগুলো বলে ফেলাটা সমীচিন হবে না বলে লিখছি না।শুধু সহজতম যে পদ্ধতিটা মাথা খেলিয়ে বের করেছিলাম সেটা হোলো, সমসাময়িক বন্ধু-বান্ধব যেই থলে নিয়ে বাজারে যেত তাকেই কি সওদা করতে যাচ্ছে জিজ্ঞেস করতাম। যদি দেখতাম মুদি দোকানের কোন সওদা বাজারে লিস্টে আছে তবে আমাদের মাসিক বাকি মুদিদোকান থেকে সেই জিনিসগুলি আমাদের বাড়ির বাকি অ্যাকাউন্টে কিনে দিয়ে দিতাম আর বন্ধুটির কাছ থেকে নগদ টাকা নিয়ে নিতাম। তারপর তাকে নিয়েই সিনেমা দেখা, মিষ্টি খাওয়া ইত্যাদি সেরে নিতাম। ২/৩ মাস পর যখন মুদি দোকানে বাকি বেশি উঠছে কেন বলে মা'র সঙ্গে বাবা কথাবার্তা বলতেন তখনই ১০/১৫ দিন আবার সতর্ক হয়ে চলতাম।

আমার মা'র তুলসীবতী স্কুলে ক্লাশ নাইনে পড়ার সময় বিয়ে হয়ে যায়। তখন মায়ের মাত্র ১৫ বছর বয়স। শুনেছি মায়ের যখন ১৬/১৭ বছর বয়স তখন আমার জন্ম। এত অল্প বয়সে স্বাভাবিক কারণেই শিশুর যত্ন করার মত চোস্ত হয়ে ওঠেননি তিনি। আমার ছোট মামা বর্তমানে প্রয়াত দিলীপ ঘোষ আমার থেকে মাত্র বছর দু'য়েকের বড় ছিল। দিদিমার বুকে তখন অঢেল দুধ ছিল। আমি দিদিমার ও নিজের মায়ের স্তন যৌথভাবে পান করে বড় হয়ে উঠেছি। আমি ছোটবেলায় এত দুষ্ট ছিলাম যে, আজ পর্যন্ত সে ধরনের দুষ্টছেলে আমার নজরে পড়েনি। আমার মা যদি ২৪ ঘণ্টা আমার পেছনে লেগে না থাকত তবে নির্ঘাৎ আমি সিনেমা হলের টিকিট ব্ল্যাকার হয়ে পড়তাম এবং এখন শহরে কোন সিনেমা হল না থাকার কারণে অনাহারে থাকতে হত। মা সিনেমা দেখতে খুব ভালবাসত। তখন তো উত্তম-সুচিত্রার যুগ চলছে। প্রায় প্রতিটি বই-ই সুপারহিট। আমার সিনেমা দেখার নেশা ছাড়ানোর জন্য মা সিনেমা দেখাই বন্ধ করে দিলেন। তাতে কি খুব একটা লাভ হল, মোটেই না। আমার সিনেমা দেখার পদ্ধতিটা শুধু পাল্টে ফেলতে হয়েছিল। আগে পুরো

সিনেমা দেখতাম। পরে একটি সিনেমা দু'বারে দেখতে হোতো। প্রত্যেকটি সিনেমা হলের গেটকীপারের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। তখন ম্যাটিনি শো ছিল দুপুর ৩-৬টা বা ২.৩০ মি:-৫.৩০ মি। দুপুর ২টা নাগাদ বাড়ি থেকে খালি গায়ে বেরুতাম, কেননা আগের দিন কোন বন্ধুর বাড়িতে যাকে নিয়ে সিনেমায় যাব তার বাড়িতে জামা লুকিয়ে রেখে আসতাম। প্রথম দিন সিনেমা ৪টে/৪.৩০ মি: পর্যন্ত দেখে ৫টার মধ্যে খালি গায়ে বাড়ি ফিরে আসতাম। পরের দিন ৩/৩.৩০ মি: বাড়ি থেকে খালি গায়ে বেরিয়ে সন্ধ্যায় সিনেমার বাকি অংশ দেখে বাড়ি ফিরতাম। সিনেমার টাইম মিলত না বলে কেউ ঠিক বুঝে উঠতে পারত না। প্রায়ই বাড়ি থেকে অর্থাৎ ধলেশ্বর, কল্যাণী এলাকা থেকে পালিয়ে চলে যেতাম কৃষ্ণনগর, প্রগতি রোড (অর্থাৎ এখন যে এলাকায় থাকি) মামার বাড়ি। আমার ছোট মামা প্রয়াত দিলীপ ঘোষ আমার থেকে মাত্র দু'বছরের বড় ছিল। কিন্তু আমরা ছিলাম বন্ধুর মত। পরে আমার পার্টির সহযোদ্ধা-সহকর্মী সবাই আমার সুবাদে দিলীপ মামার বন্ধু হয়ে পড়েছিল। একবার স্কুল থেকে পালিয়ে মামার বাড়ি চলে গেলাম। বিকেলবেলা দিদিমা মামাদের মাসিক বাকি মুদির দোকান 'পচার দোকানে' ছোটমামাকে মুড়ি এবং আরো কি যেন আনতে পাঠাল। সঙ্গে গেলাম আমি। ছোট মামাকে শলা-পরামর্শ দিয়ে টিনসুদ্ধ মুড়ি ১ টাকায় বিক্রি করে 'রূপছায়া' সিনেমা হলে রাজকাপুর অভিনীত 'কানাইয়া' দেখে এলাম। ৬টা-৯টার সিনেমা শো। সেটাই জীবনে প্রথম ইভিনিং শো দেখার অভিজ্ঞতা। তখন থার্ড ক্লাশ সিনেমা দেখতে সাড়ে সাত আনা লাগত। মামা-ভাগ্নের লেগেছিল ১৫ আনা। বাকি ১ আনা দিয়ে কি করেছিলাম বলব না। তবে সম্ভবত: পরে মুড়ির টিন বেচে সিনেমা দেখার চেয়ে ছোটমামা বিড়ম্বনায় পড়েছিল বিড়ি পকেটে পাওয়াতে। তখন আমি উমাকান্ত স্কুলে ক্লাশ নাইনে বা টেনে পড়ি। সে বছরই একদিন বিকেলে মা আমাকে আর ছোটভাই তপনকে সঙ্গে দিয়ে ঠাকুরমাকে পাঠালেন লক্ষ্মীনারায়ণবাড়ি। আমার ইচ্ছে হল মামার বাড়ি যাব। তপনকে বললাম—লক্ষ্মীনারায়ণবাড়ি থেকে বেরিয়ে যখন রিক্সায় উঠব তুই রিক্সা থেকে লাফ দিয়ে নেমে মামার বাড়ির দিকে দৌড় দিস। তপন বলল—বড়দা আমি পুরো পথ চিনব না। আমি বললাম— তোকে ধরাতে পেছন পেছন আমি দৌড়ব। তখন বলে দেব কোনদিকে যেতে হবে। সে অনুযায়ী তপন রিক্সা থেকে লাফ দিয়ে দৌড় শুরু করল। আমি তপনকে ধরার অভিনয় করে পেছন পেছন দৌড়াচ্ছি আর তাকে বাঁ-দিকে যা—ডানদিকে যা বলে নির্দেশ দিচ্ছিলাম। ঠাকুরমা রিক্সায় আমাদের পেছন পেছন আসছিলেন। পরে সব ঘটনা শুনে তপনকে যখন মা মারতে উদ্যত হলেন তখন তপন মা'কে সব ঘটনা বলে দিল। মা তো আমাকে চেনেন। আমি তো তাঁরই ছেলে। মা তপনের কথা বিশ্বাস করলেন। মা ঠাকুরমাকে সত্য ঘটনা বলতে গেলে ঠাকুরমা বলেন, বৌমা তুমি আর আমাকে বোঝাতে যেও না। আমার বড় নাতি এই বাঁদরের পেছনে ছুটতে ছুটতে ঘেমে নেয়ে উঠেছে। আমি নিজের চোখে দেখেছি। তুমি আমাকে সাত-পাঁচ বোঝালেই আমাকে বুঝতে হবে না কি ? মা আর বৃথাশ্রম ব্যয় করেন নি।

উমাকান্ত স্কুলে আমার আর এক সহপাঠী স্বপন দুলাল রায় চৌধুরীর কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। তার বাড়ি ছিল ধলেশ্বর স্কুল পেরিয়ে জয়গুরু ফার্মেসির কাছে। সে ছাত্র ভাল তো ছিলই, আর ছিল কথায় কথায় হাসির রোগ। আমার সঙ্গেই সে বিজ্ঞান

বিভাগের ছাত্র ছিল। ১৯৬৬ সনে আমরা তখন উমাকান্ত স্কুলে ক্লাস টেনে পড়ি। চিলড্রেন্স পার্কে মেলা বসত প্রতি বছর। সে বছর উমাকান্ত স্কুল, তুলসীবতী, নেতাজী স্কুল ইত্যাদি মিলে কয়েকটা ঘর মেলাতে নিয়ে আমরা বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্ররা বিজ্ঞানের উপর আমাদের জ্ঞানের বহর দেখানোর সুযোগ পেয়েছিলাম। কি প্রচণ্ড উৎসাহ আমাদের মধ্যে। প্রতিদিন বিজ্ঞান বিভাগের বাছাই করা ছাত্ররা আমাদের স্টলে ডিউটি দিতাম। সবার লক্ষ্য ছিল অন্যান্য স্কুল থেকে বেশি প্রশংসা কুড়িয়ে পাওয়া। আমার সঙ্গে বিজ্ঞানের স্টলে স্বপন দুলাল ছিল। বাঁধন, প্রদীপ, পরিমল ওরা তো অবশ্যই ছিল। আমরা ভ্যানিশিং ইংক্ তৈরি করেছিলাম। দর্শনার্থীদের গায়ে ছিটিয়ে দিতাম—সমস্ত পোশাক মুহূর্তে লাল হয়ে যেত। কিন্তু ১ মিনিট পরেই আমার লালকালির দাগ অদৃশ্য হয়ে যেত। তখন রাজ্যের উন্নয়নমন্ত্রী সম্ভবত ছিলেন সুখময় সেনগুপ্ত। তিনি আমাদের স্টলে গেলে তাঁর জামাকাপড়ে এবং তৎকালিন 'বসুমতী' পত্রিকার সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের জামাকাপড়ে স্টল পরিদর্শনের সময় ভ্যানিশিং ইংক্ ছিটিয়ে দিয়ে খুব মজা পেয়েছিলাম মনে আছে। এরা দু'জনও খুব মজা পেয়েছিলেন এবং দর্শনার্থীদের খাতায় প্রশংসাসূচক বাক্য লিখে গিয়েছিলেন। একদিন বিজ্ঞানের স্টল আমরা যখন পরিচালনা করছিলাম তখন হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে যায়। সমস্ত মেলা প্রাঙ্গণ অন্ধকারে ডুবে যায়। ৫/৬ মি: স্টলে অপেক্ষা করে আমি, স্বপন দুলাল এবং আরো ২/১ জন মেলা ঘুরতে বেরিয়ে পড়ি। ভেবেছিলাম বিদ্যুৎ এলে আবার স্টলে ফিরে আসব। মেলা প্রাঙ্গণ ঘুরতে গিয়ে দেখলাম লক্ষ্মীনারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে গরম জিলিপি ভাজা হচ্ছে। ভেতরে নিবু নিবু ম্লান হ্যাজাক লাইটের আলো জ্বলছে। স্বপন দুলালকে পাঠালাম ছেঁড়া এবং অচল-প্রায় একটি এক টাকার নোট দিয়ে ক্যাশ কাউন্টারে বসে থাকা মালিকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ব্যস্ত রাখতে। এই ফাঁকে আমি এবং সঙ্গের সাথীরা কড়াই-এ রাখা রসগোল্লার রস চিপে পকেটে পুরে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ করে জিলিপি ভাজার কারিগরের নজরে পড়ে যায় ব্যাপারটা। সে চিৎকার করে ওঠে চোর-চোর বলে। সবাই যার যেমন দৌড়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু আমি পালাতে গিয়ে মেলায় প্রহরারত পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যাই। তার মূল কারণ হোলো মাত্র কয়েকদিন আগে কোন এক দুষ্টুমির জন্য মা যখন আমাকে বকা-ঝকা করছিলেন তখন আমি মার হাতের নাগালের বাইরে গিয়ে মার সঙ্গে মুখোমুখি তর্ক করেছিলাম। মা রেগে গিয়ে হাতের কাছে থাকা শক্ত কি একটা জিনিস ঢিল ছুঁড়ে মারায় আমার মাথা ফেটে গিয়েছিল। যার ফলে আমার মাথায় স্টিচ করতে হয়েছিল কিছুটা চুল ফেলে দিয়ে। ছোট একটি ব্যান্ডেজও মাথায় ছিল। সেই ব্যান্ডেজের কারণেই অন্ধকারের মধ্যে আমাদের পেছনে ধাওয়া করনেওয়ালারা আমায় শনাক্ত করে পুলিশের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছিল। মুহূর্তের মধ্যে মেলাপ্রাঙ্গণে রটে গিয়েছিল যে উমাকান্ত স্কুলের একজন ছাত্রকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে অহেতুক-বিনাকারণে। সমস্ত ছাত্ররা যারা মেলাপ্রাঙ্গণে ঘুরছিল একজোট হয়ে গেল। তুলসীবতী স্কুলে সেদিন পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টের (তখনকার সময়ে এই নামেই তথ্য ও জনসংযোগ ডিপার্টমেন্টকে সবাই চিনত) তরফে কি একটা সিনেমা দেখানো হচ্ছিল। সেখানেও মেলাপ্রাঙ্গণ থেকে প্রচুর উমাকান্ত স্কুলের ছাত্র সিনেমা দেখতে গিয়েছিল।

কৃষ্ণকেশব রায় (মামা কেশব হিসেবে যে সর্বাধিক পরিচিত ছিল আমি তাকে মামা

ডাকাব সুবাদে) কিছু ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে দৌড়ে চলে গেল মেলাপ্রাঙ্গণ থেকে তুলসীবতী স্কুলে। সেখানে সিনেমা চলাকালীন সময়েই একটি টুল টেনে পর্দাব সামনে দাঁড়িয়ে বন্ধুগণ, ছাত্রসমাজ বিপন্ন বলে এক বক্তৃতা দিল। সিনেমা হয়ে গেল বন্ধ। সব ছাত্ররা এরপব আমাকে গ্রেপ্তারেব প্রতিবাদে এবং নিঃশর্ত মুক্তিব দাবিতে স্লোগান দিতে দিতে থানার সামনে জড়ো হল। বাকি আরেকটা অংশ উত্তেজিত হয়ে মেলাপ্রাঙ্গণে লক্ষ্মীনারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারসহ বেশকিছু দোকান লুটপাট করেছিল। সব মিলিয়ে এক অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, মামা কেশবেব 'ছাত্র-সমাজ বিপন্ন' এই বক্তৃতাব ফলে।

আমাদেব স্কুলেব প্রধান শিক্ষক শিতিকণ্ঠ সেনগুপ্ত এস.পি-কে ফোন কবে খুব ধমকেছিলেন বলে পরে জানতে পেরেছি। শিতিকণ্ঠবাবু কেশব ওদের বাড়িতেই পুকুরপাড়ে একটি ঘরে থাকতেন। কেশবেব সঙ্গে আমাকে প্রতিদিন স্কুলে ও কেশব ওদের বাড়িতে দেখে ভাল ছেলে বলেই ঠাহর করেছিলেন। শিতিকণ্ঠবাবু তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহকে ফোনে সব ঘটনা জানানোর পব আমাকে রাত্রি ১০টা নাগাদ থানা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ধলেশ্বব কল্যাণী এলাকা থেকে প্রতিদিন বাবাব সাইকেলের পেছনে চড়ে বা নিজে সাইকেল চালিয়ে লক্ষ্মীনারায়ণবাড়ি রোড ধবে স্কুলে আসতাম। এই ঘটনাব পর বেশ কয়েক মাস লজ্জায় এই পথ আর মাড়াইনি। পাছে না লক্ষ্মীনারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারেব মালিক বা কোন কর্মচারীর মুখোমুখি পড়ে যেতে হয়।

জীবনেব সর্বস্ব এক লহমায় খোযা গেলেও এত দুঃখ হয না যত দুঃখ হয় কৈশোরের, যৌবনেব অকৃত্রিম বন্ধুরা চিবদিনেব জন্য হারিয়ে গেলে। স্বপন-দুলালকে কলেজ জীবনের পবই আস্তে-আস্তে হারিযে ফেলেছি। ওর বাবা ছিলেন পুলিশ ইন্সপেক্টব। এখানকার চেনা-জানা পুলিশ ইন্সপেক্টরদের সঙ্গে কোন মিল ছিল না ওনাব। স্নেহপ্রবণ এক পিতা, যিনি সন্তানেব বন্ধুদেরও পুত্রসম জ্ঞান করতেন। অবসবের পর বাড়ি বিক্রি করে যাদবপুর চলে যায় স্বপন-দুলালের পরিবার। এরপর যখন কোলকাতা আইন পড়তে যাই তখন মাঝে মাঝেই স্বপন-দুলাল মেডিকেল কলেজ হোস্টেল, কলেজ স্ট্রীট, শীল ম্যানসনে ও পরে হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে আসত আমার সঙ্গে দেখা করতে। ও ছিল খুব সরল, সাদাসিধে মনের। মহারাজা বীরবিক্রম কলেজে পড়ার সময পকেটে নিভিয়া ক্রীম রাখত কাগজে মুড়ে। কলেজে ওঠার বাস্তার উঁচু জায়গাটা অতিক্রম কবে একটু জিরোত। তারপব ঘাম মুছে নিভিয়া ক্রীম মাখত। আমবা ওকে খুব ক্ষ্যাপাতাম। কিন্তু কিছুতেই তাকে বাগানো যেত না। আমাদের স্কুলের আরেক সহপাঠী ছিল কুশল দেববর্মা। স্বপন-দুলাল এতই সহজ-সরল ছিল যে কুশল ওকে একদিন ভুজুং-ভাজুং দিয়ে সুলেখা কালি খাইয়ে দিয়েছিল। স্বপনের নাকি ওতেই প্রচণ্ড নেশা হয়ে যায়। সেদিন রাত্রিবেলা আশ্রম চৌমুহনি চায়ের দোকানের আড্ডা থেকে স্বপন-দুলাল কুশলকে দিয়ে তাব বাড়িতে আমাকে ডাকিযে নেয়। আমার কাঁচা হাতে লেখা দু'চারটে কবিতা শোনাতে আমাকে বাধ্য করে। কবিতাপাঠের সময় ওর আহা-উহু শুনেই আমার কেমন অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। সে তো পারলে সেদিনই কবিতাগুলি 'দেশ' পত্রিকায় ছাপিযে দেয়। পরে কুশলের কাছে স্বপন-দুলালের কালি খাওয়ার কথা জেনে ওর হঠাৎ কবিতাপ্রেমী হওয়ার কারণ বুঝতে পেরেছিলাম। কোলকাতায় ও একদিন 'শীল ম্যানসানে' সুবলের মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে এসেছে আমার সঙ্গে দেখা করতে।

আমাকে পায়নি। তার দেখা হয়ে গেছে আমার আরেক অকৃত্রিম, বর্ণময় চরিত্রের বন্ধু আশ্রম চৌমুহনির নিখিল দেবনাথের সঙ্গে। সেটা ১৯৭৪/৭৫ সন হবে। নিখিলের মত এত রসিক এবং বিশাল মনের মানুষ আমি খুব কম পেয়েছি। নিখিল আজ আর বেঁচে নেই। তার প্রসঙ্গে পরে আসব। এই নিখিল খোঁজ-খবর করে জানল স্বপন-দুলালের পকেটে তার বাবার ইনস্যুরেন্স পলিসি জমা দেওয়ার জন্য টাকা পড়ে রয়েছে। সে এখনও সে টাকাটা জমা দেয়নি। নিখিল সেদিন স্বপন-দুলালকে নিয়ে কোলকাতা দেখাতে বেরিয়ে পড়ল। রাত্রি ১২টা নাগাদ নিখিল হোস্টেলে ফিরে এল। কি ব্যাপার, স্বপন-দুলাল কোথায়? নিখিল বলল, শিয়ালদা স্টেশনে বেঞ্চের ওপর বসে—কি আনন্দ, আহা কি আনন্দ বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়েছে। বহু চেষ্টা করেও ওকে ঘুম থেকে তোলা যায়নি। পরদিন ভোরবেলা স্বপনদুলাল হোস্টেলে এসে হাজির ভগ্নদূতের মত। মুখে একটাই প্রলাপ—বন্ধু বাবাকে গিয়ে কি বলব। আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেবে। নিখিল মুচকি হেসে বলল—কেন এত আনন্দ কাল রাতে যে পেয়েছ তার তুলনায় ইনস্যুরেন্সের প্রিমিয়ামের টাকাটা কি খুব বড় ? আমি এবং সুবল জানতাম শেষ পর্যন্ত নিখিলই কোন একটা ব্যবস্থা করবে। কারণ আমাদের সকলের চেয়ে নিখিলের খরচ করার হাতও ছিল অনেক লম্বা ও প্রশস্ত। শেষ পর্যন্ত নিখিল স্বপন-দুলালকে ইনস্যুরেন্সের প্রিমিয়ামের টাকা দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়েছিল। অনেক পরে জানতে পেরেছিলাম স্বপন-দুলাল কোল ইন্ডিয়াতে চাকরি পেয়ে রাঁচিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। বছর পনের আগে ওর একটা কাতরভাবে অনুনয়মিশ্রিত চিঠি পেয়েছিলাম। চিঠিতে সে কাতরভাবে অনুরোধ করেছিল আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ বিহীন হয়ে সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। যদি সম্ভব হয় আমার রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ওকে যাতে পশ্চিমবাংলার কোথাও বদলি করে আনার ব্যবস্থা করি। আমার সে মুরোদ কোনদিনই ছিল না। নিজের বাবা, অসুস্থ ভাই, স্ত্রী কাউকে কোনদিন বামফ্রন্ট সরকারের আমলেও মফঃস্বল থেকে বদলি করে আনার ক্ষমতা দেখাতে পারিনি। সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীকে কি করে বদলি করে আনব? এখন আর জানিনা স্বপন-দুলাল কোথায় আছে। মনে হয় একবার যদি দেখা হোত, তার যৌবনের সেই খিলখিল অনাবিল হাসিতে শেষবারের মত একবার নেচে উঠতাম।

লক্ষ্মীনারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের জিলিপি ভাজার যে কারিগর আমাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছিল তার নাম ছিল লালমোহন। পরে তিনি হরিগঙ্গা বসাক রোডে ন্যাশনাল সুইটস্ হোমে এবং তার পরে ফায়ার সার্ভিস চৌমুহনির মহাদেব মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে মিষ্টির কারিগর হিসাবে কাজ করেছিলেন। ১৯৬৯ সনে অজয় বিশ্বাসের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে মিষ্টান্ন দোকান কর্মচারী সমিতি। সমিতির সম্পাদক ছিলেন মানিক দে। মন্ত্রী মানিক দে নন, তিনি অন্য আরেকজন। পুজোর আগে মিষ্টান্ন দোকান কর্মচারীদের পুজার বোনাস, বেতন বৃদ্ধি, সবেতন ছুটি ইত্যাদি দাবিতে লাগাতর ধর্মঘট শুরু হয়। আমরা তখনকার ত্রিপুরা রাজ্য ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষে মিষ্টান্ন দোকান কর্মচারীদের সমর্থনে জান লড়িয়ে দিয়েছিলাম। প্রতিটি মিষ্টান্ন দোকানের সামনে পিকেটিং, আন্দোলনরত শ্রমিকদের দাবির সমর্থনে মিছিল, মিটিং, পোস্টার, চাঁদার জন্য বক্স কালেকশানে তখন সব আমরাই করেছি। তখনই লালমোহনদার সঙ্গে চরম ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে। পরে লালমোহনদা যখন ন্যাশনাল

সুইটস্ হোমের কর্মচারী তখন আমি, শঙ্করদা, বিশু, বিজয়, মধু, অরবিন্দ, সমীব বা অন্যান্যরা যখনই সদলবলে মিষ্টি খেতে দোকানে গিয়ে কেবিনে বসেছি তখনই লালমোহনদা ঠিক খেয়াল রাখতেন, ৫ টাকার ছানাব পায়েস বা ক্ষীবতোয়ার অর্ডার দিলে চলে আসত ২৫ টাকা পরিমানের ছানার পায়েস বা ক্ষীরতোয়া। যখন বিল দিতে যেতাম তখন ভেতর থেকে যে কর্মচারী আমাদের খাবাব পরিবেশন করত সে হেঁকে বলে দিত ৫ টাকা বা ৭ টাকা। সবটাই ছিল লালমোহনদার ভালোবাসার চাতুরি। ন্যাশনাল সুইটস্ হোমের মালিক অজিতদা পরে ব্যাপারটা ঠিক আঁচ করে ফেলেন। আমরা তার দোকানে ঢুকলেই আমাকে আদব করে তাব পাশের চেয়াবে ক্যাশবাক্সের সঙ্গে বসাতেন, কেবিনে ঢুকতে দিতেন না। প্রতিদিন খাওয়ার টাকা সংগ্রহ করতাম আমরা ঘুরে ঘুরে। সবচেয়ে বেশি টাকা আনতাম প্রাচ্যভারতী স্কুলের প্রয়াত শিক্ষক শ্যামল চক্রবর্তী, তুলসীবতী স্কুল থেকে বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক নিবঞ্জন দাস প্রভৃতি শিক্ষকমশাইদের কাছ থেকে। এরা সস্নেহে আমাদের আব্দার মিটিয়ে গেছেন বছরেব পর বছর।

১৯৬৭ সনে আমাদের ব্যাচের বন্ধুবা উমাকান্ত একাডেমি থেকে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দিলাম। সে সময় শিতিকণ্ঠবাবু প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে অবসর নেওযায় অন্য আরেকজন খ্যাতনামা শিক্ষক শ্রী সুধীর দত্ত উমাকান্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি আমাকে এবং কেশবকে আলাদাভাবে ইংরেজি এবং অন্যানা বিষয়গুলিতে সাহায্য করবেন বলেন। উনি যে রুমে বসতেন তার পেছনে ছোট একটি এন্টি চেম্বার ছিল সেখানে আমাদেরকে পড়ার ব্যবস্থা করে দেন। আমার কেন জানি মনে হয়েছিল, স্যার, ঠিকই ধরে নিয়েছিলেন আমাদের স্কুল চলাকালীন তার রুমে বন্দী না করা গেলে ক্লাশরুমে গিয়ে নষ্টামি করে দু'একটা ভাল ছাত্রের মাথা আমরা খেয়ে নিতে পারি। স্যারের ভেতরের রুমটিতে যেখানে আমাদের বসার জায়গা করে দেওয়া হয়েছিল সেখানে স্যারের জন্য চা করার সব সরঞ্জাম ছিল। আমাদের স্কুলের হেড পিওন গঙ্গাদা স্যারকে চা করে খাওয়াতেন। কনডেনস্‌ড মিল্কের পুরো ডিবিটা আমি আর কেশব দু'দিনে সাবাড় করে দিয়েছিলাম। ভাগ্যিস গঙ্গাদা বহু পুরানো লোক বলে স্যার তাকে সন্দেহ করেননি। আমাদের কিছু না বললেও কীর্তিটা যে আমাদের ঠিকই বুঝে নিয়েছিলেন। স্যার, আমাদের দু'জনকে পড়াতেন ঠিকই কিন্তু আমাদের মন পরে থাকত ক্লাশরুমে যেখানে অন্যান্য সহপাঠীরা একসাথে বসে ক্লাশ করছে। মনে মনে আমাদের বন্দী জীবনযাপনের জন্য স্যারের মুণ্ডপাত করতাম। পরবর্তী জীবনে অনুভব করেছিলাম স্যারের, মাস দু'য়েকের ইংরেজী অবৈতনিক কোচিং-এর জন্যই আজ দু'বেলা ভুল ইংরেজি বলে বা লিখে হলেও কিছু করে খেয়ে যেতে পারছি। এর মধ্যে আমাদের কেন জানি মনে হোল কনডেনস্‌ড মিল্ক খেয়ে ফেলার ব্যাপারটা গঙ্গাদাই স্যারের কানে তুলেছে। গঙ্গাদার একটি হৃষ্ট-পুষ্ট, নধরকান্তি পাঁঠা উমাকান্ত স্কুলমাঠে ঘাস খেয়ে ঘুরে বেড়াত। সবাই জানত এটি গঙ্গাদার পালিত পাঁঠা। গঙ্গাদার স্কুলে এমনই দাপট ছিল যে কেউ সে পাঁঠার দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস ছিল না। আমি আর কেশব সেই পাঁঠা একদিন সন্ধ্যা হয় হয় সময়ে যখন আলো-আঁধারের খেলা চলছে তখন আমাদের চাতুরির খেলায় হাপিজ করে দিয়েছিলাম। কোথায় কিভাবে পাঁঠা কোতল করে খেয়েছিলাম সবিস্তারে সব নামধাম বলে সেইসব কুশীলবদের বিপদে নাইবা ফেললাম।

গঙ্গাদার ব্যাপারে দু'চারটে কথা বলে রাখি নয়ত ইতিহাসের কাছে দায়বদ্ধ থেকে যাব। আমরা যখন স্কুল ত্যাগ করি তখনই গঙ্গাদা অবসরের বয়স পেরিয়ে গেছে বলে আমার স্থির বিশ্বাস। যতটুকু মনে পড়ে ১৯৭৭ সনের নভেম্বর মাসে যখন কোলকাতা থেকে আইন পাশ করে ফিরে আসি তখনও বোধহয় গঙ্গাদা রিটায়ারমেন্টে যাননি। আসলে গঙ্গাদা এরা যখন চাকরিতে যোগ দেন তখন চাকরির বাজার এতটা কঠিন ছিল না। ঠিক মত সার্ভিস বুকও রক্ষিত হত কিনা সন্দেহ। ১৫/২০ বছর চাকরি হয়ে যাওয়ার পর যখন সার্ভিস বুক তৈরি হয় তখন আন্দাজে একটা বয়স লিখিয়ে নিলেই চলত। জন্মের তারিখের প্রামাণ্য দলিলের প্রয়োজন হত না। তাছাড়া গঙ্গাদা ছিল শিতিকণ্ঠবাবুর খাস বেয়ারা।

হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের পরীক্ষার ফলাফল বেরুলো ঠিক সময়ে। যা কিনা ক্যালকাটা বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশানের ক্ষেত্রে ছিল আশাতীত। যাহোক, আমাদের ব্যাচের বন্ধু-বান্ধব সবাই পাশ করলাম, কেশব বাদে। পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুবার পর আমাদের সকলের মন খারাপ কেশব পাশ করতে পারেনি বলে। কেশবকে বাড়িতেও দু'বেলা হানা দিয়ে আমরা খুঁজে বের করতে পারছিলাম না। আমি, বাঁধন, প্রদীপ, স্নেহাংশু, নোটন, পরিমল, অমিত সবাই তখন উমাকান্ত স্কুলের গ্যালারিতে বিকেলবেলা প্রতিদিন মিলিত হয়ে কেশবের খোঁজ কি করে পাওয়া যায় আলোচনা করতাম। কে কোন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করবে সেসব নিয়ে বাড়ির অভিভাবকদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিয়ে আলোচনা করে সময় কাটাতাম। এত কিছুর পরও আমাদের সবার মন ছিল বিষাদে আচ্ছন্ন। যে যেখানেই পড়ি না কেন কেশবকে তো সহপাঠী হিসাবে আমরা আর কেউই পাব না। তখনকার সময়ে এমনটাই ছিল বন্ধুদের প্রতি, সহপাঠীর প্রতি একে অপরের তীব্র অনুভূতি। একদিন বিকেলে আমরা যখন আলোচনায় মগ্ন হঠাৎ আমার নজরে এল আমাদের থেকে দূরে পাশের গ্যালারিতে মুণ্ডিত মস্তক কে একজন একা একা বসে আছে প্রায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায়। চুপি-চুপি কাছে গিয়ে দেখি, তিনি স্বনামধন্য কৃষ্ণকেশব রায়। আমি ইশারায় বন্ধুদের ডাকলাম। সবাই ছুটে এল। আমরা ঘিরে ধরলাম কেশবকে। তার এই কয়দিন অন্তর্ধানের কারণ জিজ্ঞেস করলাম। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার জন্য প্রবোধ দিলাম সকলে মিলে। কেউ কেউ আক্ষেপ করল এ বছর পরীক্ষায় পাশ না করে আমাদের ফেল করাটাই সমীচিন ছিল। তাহলে কেশবের সঙ্গী হওয়া যেত। কেশব যেন মৌনী-বাবা। কিছুতেই তার মুখের 'রা' কাড়া সম্ভব হচ্ছিল না। অনেকক্ষণ পর সে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে দার্শনিকের মত উত্তর দিল—পাশ-ফেল তো আর কারো হাতে নেই যে ফেল করে আমার সঙ্গী হওয়া যাবে। আমরা তার মন জোগাতে সমস্বরে বলে উঠলাম, তা ঠিক। আমাদের মধ্যে কেউ জিজ্ঞেস করল সবই তো বুঝলাম মামা, কিন্তু তোমার ন্যাড়া (বেল) মাথা করার ব্যাপারটা যে বোধগম্য হচ্ছে না। প্রত্যুত্তরে মামা কেশব বলল, পরীক্ষা তো আমি দিইনি, দিয়েছে চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, সমর গুহ, কেশব নাগ এরা। তারপরও আমি পরীক্ষায় পাশ করতে পারলাম না কেন? আসল কারণ হল পাপ। গঙ্গাদার পাঁঠা চুরি থেকে আরম্ভ করে এত পাপ করেছি সেসব যাবে কোথায়? তাই মাথা ন্যাড়া করে প্রায়শ্চিত্ত করছি। আমি মনে মনে যদিও ভাবছিলাম—তোমার কোন কুকর্মের সঙ্গেই তো আমি বিযুক্ত থাকিনি বাপধন, তাহলে আমি পরীক্ষায় কিভাবে পাশ করলাম। সময়ের বিচারে তবু সে সময় নিরুত্তরই ছিলাম।

আমাদের সহপাঠী বন্ধুদের মধ্যে পরিমল ঘোষ, দিলীপ চক্রবর্তী, অমিত ব্যানার্জি, প্রদীপ বসাক এরা ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি এবং অন্যান্য বিষয়ে পড়াশোনার জন্য রাজ্যান্তরী হোলো। বাদ বাকি আমরা সবাই মহারাজা বীরবিক্রম কলেজে পড়ার জন্য ভর্তি হয়ে গেলাম। আমি ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য সুযোগ পেলাম কিন্তু সব বন্ধুরা মহারাজা বীরবিক্রম কলেজে ভর্তি হতে যাচ্ছে বলে সে মুখো আর হলাম না। আমি কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়ে গেলাম। এম.বি.বি কলেজের ক্যান্টিন চালাতেন অধ্যাপক অচিন্ত্য কুমার রায়ের বড় ভাই মণিবাবু। কলেজের নিচে ঢালু জায়গায় ছিল কলেজ ক্যান্টিন। আমার বাড়ি ছিল ধলেশ্বর কল্যাণী এলাকায়। টিলা বেয়ে তখনকার কলেজ প্লে গ্রাউন্ডের পাশ দিয়ে কলেজ ক্যান্টিন অতিক্রম করে কলেজের মূল চৌহদ্দিতে প্রবেশ করতে হতো। আমাদের সময় কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন বিখ্যাত প্রশাসক ও শিক্ষাবিদ প্রয়াত সুশান্ত চৌধুরী। সত্যিকারের অর্থে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খেতে দেখেছি অধ্যক্ষ সুশান্ত চৌধুরীর আমলে। তাঁর বাজখাই গলার আওয়াজ যতদূর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছুত ততদূর পর্যন্ত ছাত্রদের হাড় হিমকরা শীত ধরে যেত।

যাহোক, যে প্রসঙ্গে লিখছিলাম—অনেকদিন কলেজ ক্যান্টিনের সীমানা অতিক্রম করে কলেজেব মূল চৌহদ্দিতে প্রবেশ করতে পারতাম না। আশ্রম চৌমুহনিতে তখন ছিল আমাব সকাল-সন্ধ্যা কৃষ্ণদার চায়ের স্টলে আড্ডা। সেই আড্ডায় গিয়ে সখ্যতা গড়ে ওঠে বোধজং স্কুল থেকে পাশ করা প্রেমানন্দ দেবনাথ, দীপক দেবনাথ, সুবল দেবনাথ, সুদর্শন রায় চৌধুরী; নেতাজী স্কুল থেকে পাশ করে আসা পল্লব হোম চৌধুরী; প্রাচ্যভারতী স্কুল থেকে পাশ করা নিখিল দেবনাথ, গোপাল দত্ত, নারায়ণ দেবনাথ ইত্যাদি বন্ধুদের সঙ্গে। নারায়ণ বাদে এরা সবাই তখন এম.বি.বি কলেজে আমার সহপাঠী। এদের এবং উমাকান্ত স্কুলের পুরানো সহপাঠী বন্ধুদের নিয়ে প্রতিদিন ক্যান্টিনে বসত জমজমাট আড্ডা। সে আড্ডার মোহ ভেঙ্গে টিলা বেয়ে আর কলেজের ক্লাশরুমে পৌঁছানো সম্ভবপর হোতো না।

আমাদের সময় কেমিস্ট্রির জনপ্রিয় অধ্যাপক ছিলেন প্রফেসর কুমার। সুদর্শন এবং ব্যক্তিত্বের অধিকারী অধ্যাপকটি কোন প্রদেশের লোক ছিলেন এই মুহূর্তে ঠিক মনে করতে পারছি না। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন যাতে আমি রসায়ণ শাস্ত্রে অনার্স বজায় রেখে ঠিকভাবে পড়াশোনা চালিয়ে যাই। কিন্তু তখন কি ছাই পড়াশোনা করার কি প্রয়োজন এবং ভবিষ্যত জীবনে তার অসীম মূল্য অনুধাবন করার বোধ আমার ছিল ? কলেজে গিয়ে পরিচয় হলো সুব্রত রায়, চন্দন রায়, মঠ চৌমুহনি এলাকার চন্দন রায়, মধুসূদন দাস, মানিক দেব, মধুসূদন ভট্টাচার্য, হরিপদ চক্রবর্তী, নেপাল ভৌমিক, কাশীনাথ বিশ্বাস-সহ আরো কতসব নূতন বন্ধুদের সঙ্গে। কোনদিন কলেজ ক্যান্টিনে আড্ডা দিয়ে, কোনদিন কলেজ লেকে নৌকা চালিয়ে আবার কখনো-সখনো ইচ্ছে হলে দু'একটা ক্লাশ করে বিকেলে বাড়ি ফিরে যেতাম। কলেজ লেকে আমার সঙ্গে নৌকা চড়ে বেড়ানোর সূত্রেই ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল শিবনগর এলাকার চন্দন রায়ের সঙ্গে। উনি, মধুসূদন দাস (পরে যিনি প্রতাপগড় এলাকা থেকে কংগ্রেস এম.এল.এ হয়েছিলেন), কংগ্রেস সমর্থক সুব্রত রায়, মঠ চৌমুহনির চন্দন রায়, পরবর্তী সময়ে বামপন্থী নেতা হরিপদ চক্রবর্তী এঁরা আমার চেয়ে সিনিয়র ছিলেন। আমাদের সময়ে একাদশ শ্রেণি পাশ করে কলেজে তিনবছরের কোর্স

পাশ করলে গ্র্যাজুয়েট হওয়া যেত। স্কুল ফাইন্যাল পাশ (ক্লাশ টেন পাশ) করলে প্রি-ইউনিভার্সিটি পাশ করার পর বি.এ/বি.এস.সি বা বি.কম কোর্সে ভর্তি হওয়া যেত। কলেজে প্রতিবছর পরীক্ষা দিয়ে পাশ করলে পরবর্তী বর্ষে উন্নীত হওয়া যেত। আমি কলেজে বি.এস.সি (অনার্স) প্রথম বর্ষের বার্ষিক পরীক্ষা দিইনি ফলে দ্বিতীয় বর্ষে উন্নীত হওয়ার কোন সুযোগ আমার হয়নি। প্রথমবর্ষের পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে প্রতিদিন কপালে মা দই বা চন্দনের ফোঁটা দিত, টিফিন করার জন্য পয়সা বা টাকা দিত। সেগুলো পকেটস্থ করে এসে পরীক্ষা না দিয়ে কলেজ লেকে নৌকো বাইতাম। ছিঃ, কি প্রতারণাই না করেছি মা-বাবার সঙ্গে। পরীক্ষার ফল বেরুল। সবাই কলেজের দ্বিতীয় বর্ষে উত্তীর্ণ হয়েছে। বাবা জিজ্ঞেস করলে বলি, এন.সি.সি-র পারসেনটেজের জন্য রেজাল্ট উইথহেল্ড হয়ে আছে, ২/৪ দিনের মধ্যে রেজাল্ট বেরিয়ে যাবে।

বাবা প্রতিদিন মঠ চৌমুহনি বাজারে বাজার করতে যেতেন। একদিন বাজারে দেখা হয়ে যায় আমাদের কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল প্রয়াত সুবোধ চক্রবর্তীর সঙ্গে। তিনি বাবাকে আক্ষেপ করে বলেন, ধীরাজ ছাত্র তো ভালই ছিলো কিন্তু কেন যে পরীক্ষাটা দিল না বুঝতে পারলাম না। বাবা সেদিন খুব মনে ব্যাথা পেয়েছিলেন বুঝেছিলাম। এতদিন তাঁর ভরসা ছিল যত দুষ্টুমিই করি না কেন, পড়াশোনা ঠিকভাবে নিশ্চয়ই চালিয়ে যাচ্ছি। সেই বিশ্বাসে ঘা খাওয়ায় তাঁর মন ভেঙে যায় সাময়িকভাবে। কিন্তু আমি আছি আমাতেই। জীবনে কিছুই যেন গুরুত্ব দিয়ে করার নেই। এরমধ্যেই হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ পেল। দুর্ভাগ্যক্রমে কেশব পরীক্ষায় পাশ করলেও কলেজে বিজ্ঞানবিভাগে ভর্তি হতে পারল না। সে ভর্তি হল কলা বিভাগের প্রথম বর্ষে। আমিও সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান বিভাগ ছেড়ে দিয়ে ভর্তি হয়ে গেলাম প্রথম বর্ষ, কলা বিভাগে। একবছর বরবাদ হয়ে যাক তাতে কি। তবু তো মামা কেশব আর আমি একসাথে পড়তে পারব সেই আনন্দেই মশগুল হয়ে উঠলাম।

১৯৬৮ সনে মানিক সরকার (বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী) রামঠাকুর কলেজ থেকে প্রি-ইউনিভার্সিটি পাশ করে এম.বি.বি কলেজে প্রথম বর্ষ, বি.কম কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য তৎকালিন যুব ফেডারেশনের নেতা অনিল সরকারের (বর্তমান উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী) চিঠি নিয়ে আমার কাছে আসে। মানিক ১৯৬৮-৬৯ সনের শিক্ষাবর্ষে বি.কম প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়। ইতিমধ্যে আমার সঙ্গে বামপন্থী ছাত্র যুব নেতাদের যোগাযোগ হয়ে গেছে। সে সময় ত্রিপুরা রাজ্য ছাত্র ফেডারেশনের সভানেত্রী ছিলেন প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা বীরেন দত্তের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী অরুণা দত্ত। সম্পাদক ছিলেন সুজিত দত্ত (বর্তমানে এডভোকেট এবং বিজেপি'র নেতা)। যুব ফেডারেশনের নেতৃত্বে ছিলেন খগেন দাস, অনিল সরকার, প্রয়াত সুভাষ দাস, প্রয়াত তপন কর প্রমুখ। ১৯৬৮ সনে মহারাজা বীরবিক্রম কলেজে ১ বছরের পুরানো হয়ে গেছি এবং কিছুটা মাতব্বর গোছের হয়ে উঠেছিলাম কলেই হয়ত বা অনিলদা মানিককে আমার কাছে ভর্তি হতে সাহায্য করার জন্য পাঠিয়েছিলেন।

মানিক তখন আগরতলা অফিসার্স কোয়ার্টার্স লেনে সুরজিত চক্রবর্তীদের বাড়িতে ভাড়া থাকত। সুরজিতও এস.এফ.আই-এর প্রথম সারির নেতৃত্বে ছিল পরবর্তী সময়ে। মানিকের দিদিমা খুব রাশভারী এবং বিচক্ষণ মহিলা ছিলেন। আমরা যারাই মানিকের বাড়ি

যেতাম তারা দিদিমাকে খুব সমীহ করে চলতাম। মানিকের মা ছিল আমাদের মায়েদের মতই এক স্নেহপ্রবণ মহিলা। মানিকের ছোটবোন রত্না তখন খুবই ছোট। ফ্রক পরে ঘুরে বেড়ায়। সে সময়ে রাজনীতি আজকের মত চড়া সুরে বাঁধা ছিল না। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকেও গানবাজনা, নাটক, খেলাধুলা, সামাজিক বিভিন্ন ধরণের সম্পর্ক চালিয়ে যাওয়া যেত। তাই কলেজে ভর্তি হওয়ার পরও মানিক বিভিন্ন নাট্যসংস্থার সঙ্গে যুক্ত থেকে নাটক করত বলে জানতাম। আমি অবশ্য তার মঞ্চস্থ নাটক দেখিনি। মানিক কলেজে নিয়মিত ব্যাডমিন্টন ও ক্রিকেট খেলত মনে আছে। তখন ছাত্র ফেডারেশনের অফিস ছিল জয়নগর বীরেনদার বাড়িতে। একচালা টিনের ঘর। কলেজ ছাড়াও ছাত্র ফেডারেশনের অফিসে মানিকের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হত। সিপিআই(এম) দলের বর্তমান রাজ্য সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিজন ধর ও সিপিআই(এম) রাজ্য দলের মুখপাত্র গৌতম দাস ১৯৬৮ সনে এম.বি.বি কলেজে বি.এ কোর্সে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়। বিজন ধর নেতাজী স্কুল থেকে পাশ করে এসে কলেজে ভর্তি হয়। ধলেশ্বর, কল্যাণী এলাকায় যেখানে আমি থাকতাম সেখানেই মুকুন্দ দত্তের বাড়িতে বাড়িভাড়া করে একটি মেসে থাকত। সেই মেসের অন্যতম সদস্য আমাদের আরেক সহপাঠী ও সহযোদ্ধা মনোরঞ্জন পাল। মনোরঞ্জনের মা-বাবা সবাই তখন থাকত তৎকালীন পূর্ব বাংলায়। গৌতম দাসেবও তাই। গৌতম থাকত এম.বি.বি কলেজ ১নং হোস্টেলে। বর্তমান অর্থমন্ত্রী বাদল চৌধুবী আমার এক বছরের সিনিয়র ছিলেন বলে আমাব মনে পড়ছে। বর্তমান বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী তপন চক্রবর্তী মূলত সোনামুড়া মহকুমার বাসিন্দা হলেও পাশ করেছে কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় থেকে। প্রয়াত সিপিআই(এম) নেতা বিমল সিন্‌হা, গৌরমোহন সিন্‌হা-এরা কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় থেকে। তপন, বিমল, গৌরমোহন আমাদের সঙ্গেই একই শিক্ষাবর্ষে স্নাতক হয়েছে। পাঞ্চালী ভট্টাচার্য, মনীষা দাশগুপ্তা এরা ১৯৬৯ সনে মহিলা কলেজে বি.এ প্রথম বর্ষে ভর্তি হন। উদয়পুর নগব পঞ্চায়েতেব চেয়ারপার্সন সুব্রত দেব এম বি.বি কলেজে ১৯৬৮ সনে ভর্তি হয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ কবেন। বর্তমান রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েতসহ বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী মানিক দে আমাদের জুনিয়র। সে ১৯৬৯ সনে বীরবিক্রম সান্ধ্য কলেজের প্রথম ব্যাচের ছাত্র বলে আমার মনে পড়ছে। অপর ছাত্র নেতা বিজয় সিংহরায়ও ১৯৬৮ সনেই এম.বি.বি কলেজে বাণিজ্য বিভাগে ভর্তি হয়। বর্তমানে আগরতলা পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন শঙ্কর দাশ কোলকাতা ভবানিপুর কলেজ থেকে প্রি-ইউনিভার্সিটি পাশ করে এম.বি.বি কলেজে এসে বি.এ কোর্সে ভর্তি হন ১৯৬৬ সনে। তাঁর সহপাঠী ছিলেন মধুসূদন দাস (যিনি পরে প্রতাপগড় কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস বিধায়ক হয়েছিলেন), পরবর্তী সময়ে বামপন্থী আন্দোলনের অন্যতম সেনাপতি হোমিওপ্যাথি ডাক্তার হরিপদ চক্রবর্তী। এরা তিনজনই ছিলেন তখনকার সময়ে জনপ্রিয় ছাত্র সংগঠন ছাত্র-ঐক্য-সংস্থার সভাপতি অবিসম্বাদি, জনপ্রিয় ছাত্রনেতা নিশীথ দাসের সহকর্মী। নিশীথদার সে সময়কার জনপ্রিয়তা ছিল ঈর্ষণীয়। এ ধরণের সৎ, আদর্শবাদী, নির্লোভ, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার অধিকারী মানুষ আজকের দিনে বিরল। নিশীথদা আজো জীবিত এবং আগরতলা শহরতলিতে বসবাস করেন। ফরোয়ার্ড ব্লকের রাজনীতি করতে গিয়ে স্বার্থসর্বস্ব, ক্ষমতার দম্ভের সঙ্গে খাপ খাইয়ে উঠতে পারেননি। সে কারণে আজ কোন দলীয় প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন।

সিপিআই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা রমা দাস, শঙ্কর দাশের জায়া প্রাক্তন ছাত্রনেত্রী ফুলন ভট্টাচার্য, সমীরণ রায়ের স্ত্রী প্রাক্তন ছাত্রনেত্রী বীণা সেনগুপ্তা ১৯৬৮ সনে মহিলা কলেজে বি.এ প্রথম বর্ষে ভর্তি হন। এরা সবাই ছিলেন বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের সূতিকাগারের ধাত্রীর ভূমিকায়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, পাঞ্চালিদির পরিচয় মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী হিসেবে নয়। তিনি প্রাক্তন ছাত্রনেত্রী, মহিলা কলেজে ফুলনদির মতই নির্বাচিত সম্পাদিকা ছিলেন। বর্তমানেও বিভিন্ন সমাজ- সেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত।



দাঁড়িয়ে— মধুসূদন, দীপক, সুবল, গোপাল, প্রদীপ, অমল, যদুনন্দন, প্রেমসুন্দর, মিন্টু, ফণী, নারায়ণ, নিখিল, আশীষ।
বসে— নিতাই, অসীম (বোম), নিখিল, রুহিদাস, সজল, সুদর্শন, বিশ্বনাথ, নিহার, অবিনাশ

মনীষা দাশগুপ্তা ও মহিলা কলেজে ফুলনদি, পাঞ্চালীদির পরবর্তী সময়ে নির্বাচিতা সম্পাদিকা হয়েছিলেন। সে সময়কার ছাত্রনেত্রী সুনন্দা ভট্টাচার্য ১৯৬৯ সনে কৈলাসহরের রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন।

কল্যাণী এলাকার বাসিন্দা হিসাবে আমার ছোটভাই তপন ওরা এম.বি.বি কলেজের ১নং হোস্টেল থেকে সরস্বতী পুজোর চাঁদা আনতে গেলে বাদলদা নাকি তাদের ৪ আনা চাঁদা দিয়েছিলেন। বাদলদা সম্ভবত: বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন কিন্তু রাজনীতির কারণে শেষ পর্যন্ত স্নাতক ডিগ্রি লাভ করতে পারেননি। মাধব সাহাও স্নাতক ডিগ্রি নিতে সক্ষম হয়েছিল কিনা সঠিকভাবে বলতে পারছি না। বোধহয় সেও রাজনৈতিক ও পারিবারিক কারণে বীরবিক্রম সান্ধ্য কলেজ থেকে ফাইনাল পরীক্ষা দেয়নি।

এম.বি.বি কলেজে একটি ট্র্যাডিশন ছিল প্রতিবছর কলেজের ছাত্রদের মধ্যে অনুষ্ঠিত ক্রিকেট খেলায় ২য় বর্ষের ছাত্ররা চাম্পিয়ান হত।

১৯৬৯ সনে এম.বি.বি কলেজে ২য় বর্ষের ছাত্র এবং ৩য় বর্ষের ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনাকর ক্রিকেট ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। আমি যদিও ক্রিকেটের 'ক খ-গ' কিছুই বুঝতাম না তবুও ২য় বর্ষ ক্রিকেট টিমের ম্যানেজার নির্বাচিত হলাম। আমার বন্ধুপ্রীতির কারণে এমন এক টিম তৈরি হল যে, সেবারই ২য় বর্ষেব টিম ফাইন্যালে ৩য় বর্ষের টিমের কাছে পরাজিত হল। ১৯৬৮ সনেব শেষভাগে শীতের সময় কলেজের ক্রিকেট ব্যাট ও প্যাড চুরি করে আশ্রম চৌমুহনি থেকে কলেজের দিকে যেতে হাওড়া নদীর বাঁধের নীচে চর পড়ে যাওয়া মাঠে আমি, নিখিল দেবনাথ, সুদর্শন বায় চৌধুরী, পল্লব হোম চৌধুরী, দীপক দেবনাথ, গোপাল দত্ত, প্রেমানন্দ দেবনাথ অর্থাৎ আশ্রম চৌমুহনির পুরো গ্রুপ ক্রিকেট খেলতাম। ক্রিকেট খেলার সরঞ্জাম কলেজ থেকে আমাব আসকারাতেই সবার অলক্ষ্যে সরিয়ে আনা হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে কলেজেব ক্রীড়া শিক্ষক তখন ছিলেন কমলেশ পাল। ছাত্রসংসদে ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক ছিল আখাউড়া রোডে আই.জি.এম হস্পিটালের বিপরীত দিকে অবস্থিত দত্তবাড়িব ছেলে সুযশ দত্ত। সে ভাল স্পিন বল করত। যাহোক, কমলেশ পালের নির্দেশে সে প্রায়ই বাঁধের পাড়ে আমাদের খেলার সময় ঘোরাঘুরি করত কলেজের ব্যাট এবং প্যাড উদ্ধারের জন্য কিন্তু সাহস করে কিছু বলতে পারত না। আমরা সবাই তার উদ্দেশ্য বুঝতে পারতাম কিন্তু কিছু বুঝতে পারি না ভাব দেখিয়ে তার উপস্থিতি অগ্রাহ্য কবতাম।

একদিন বাঁধের পাড়ে বিকেলে ক্রিকেট খেলার সময় আমি লুঙ্গি পরে খেলতে নেমে গেলাম। লুঙ্গিটা হাঁটুর উপর গুটিয়ে দু'ভাঁজ করে বেঁধে দক্ষিণ ভারতীয়দের কায়দায় ফিল্ডিং করছিলাম। এমন সময় নিখিল দেবনাথেব ব্যাট নিঃসৃত একটি ক্যাচ হাত দিয়ে সুবিধা করতে না পেরে লুঙ্গিব কোঁচায় বলটি বন্দি করে ফেললাম। এই নিয়ে শুরু হল বিতর্ক। নিখিল আউট, না নট আউট। খেলা পণ্ড। সুযশকে ডেকে পরের দিন কলেজেব ক্রিকেট ব্যাট ও প্যাড ফিরিয়ে দেওয়া হল। ক্রিকেট ছেড়ে শুরু হয়ে গেল কৃষ্ণদার চায়ের স্টলে শীতের বিকেলের জমজমাট আড্ডা। সঙ্গে চা ও ডালপুরি খাওয়ার ধুম। সেবার অর্থাৎ ১৯৬৯ সনে দ্বিতীয় বর্ষেব ক্রিকেট টিমে ছিল মধু ভট্টাচার্য, মানিক সরকার, সুযশ দত্ত, জিতেন সাহা, স্নেহাংশু চৌধুরী, সুদর্শন রায় চৌধুবী প্রমুখ। নিখিল দেবনাথ এবং পল্লব হোম চৌধুরী আমার মানসিক দুর্বলতা ও বন্ধুপ্রীতির কাবণে ভালো খেলোয়াড় না হয়েও টিমে ঢুকে গেল। দু'জনেই দাবি করল তারা অল রাউন্ডার এবং টিম জিতিয়ে আনবেই আনবে। মধু এবং মানিক পেস বল করত। সুযশ করত স্পিন বল। জিতেন সাহা ব্যাটসম্যান। মানিক ব্যাটসম্যান হিসাবে ওপেনিং করত। ৩য় বর্ষের ছিল দুর্ধর্ষ টিম। কুশল দেববর্মা ছিল ত্রাস ফাস্ট বোলার, কামান চৌমুহনির পাল ফার্মেসির সুবল পাল ও আমাদের বন্ধু পাঞ্জাবি যুবক অশ্বিনী দত্ত দু'জনেই ছিল তুখোড় ব্যাটসম্যান। রামনগরের পান্না-চুনী যমজ দুইভাইয়ের মধ্যে একজন ছিল ব্যাটসম্যান এবং আরেকজন বোলার। এদের চেহারার এমন সাদৃশ্য ছিল যে, ব্যাটসম্যান ভাইটি আউট হয়ে গেলে বোলার ভাইয়ের নামে সে-ই আবার ব্যাট করতে চলে আসত নির্দ্বিধায়। ধরার কোন উপায় ছিল না। সেবার ফাইনাল খেলার সময় উত্তেজনা ছিল তুঙ্গে। সমস্ত কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, এলাকার লোকজন মিলে প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল। পান্না-চুনী দুই ভাইয়ের প্রক্সি দেওয়ার

ব্যাপার নিয়ে যথেষ্ট উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল খেলা চলাকালীন সময়ে। আমার টিম ম্যানেজারির সুযোগে যে দুই আশ্রম চৌমুহনির বন্ধু নিখিল দেবনাথ ও পল্লব হোম চৌধুরী টিমে ঢুকেছিল, দু'জনেই না করতে পারল উল্লেখযোগ্য রান, না পেল কোন উইকেট। স্বাভাবিক কারণেই ২য় বর্ষের টিম হারল। ট্র্যাডিশন ভেঙে গেল। নিখিল আইন পাশ করে আগরতলা বারে জয়েন করেছিল। সম্ভবত ১৯৯০ বা ১৯৯১ সনে চরম হতাশায় আত্মহত্যা করে ফাঁসি দিয়ে। আমি তখন কোলকাতা কি একটা কাজে গিয়েছিলাম। পল্লব সর্বভারতীয় আই.পি.এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সি.আর.পি.এফ-ব উঁচু পদে কাজে যোগ দিয়েছিল। পরপর চাকরি ছেড়ে বিভিন্ন উঁচুপদে যেমন ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের সিকিউরিটি অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্কের সিকিউরিটি অফিসার ইত্যাদি চাকরি করছিল কোলকাতায়। হঠাৎ কি খেয়াল হল ব্যবসা করে কোটিপতি হবে এবং যে করে হোক আমেরিকা চলে যাবে। এই কামনায় চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায় নামল। ওর আমেরিকা-প্রীতি ছিল অসম্ভব। যদিও ছাত্রজীবনে ছিল নকশাল আন্দোলনের কর্মী। ১৯৯৩/৯৪ সনে পল্লব বিহার চলে যায় কোন এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর আশ্বাসে ব্যবসা করার ধান্ধায়। তারপর থেকেই পল্লব হোম চৌধুরী নিখোঁজ। আদৌ সে বেঁচে আছে কিনা আমবা কেউ জানিনা। পল্লব নেতাজী স্কুলের মেধাবী ছাত্র ছিল। নিখিল ছিল অত্যন্ত উদার মনের, রসিক, আমুদে ও বন্ধুবৎসল। নিখিল ওরা বাংলাদেশ অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে এসে আশ্রম চৌমুহনি বাড়ি করেছিল। ছোটবেলাব এই দুই বন্ধুর বিশেষত নিখিলেব অনুপস্থিতি আমাব জীবনের এক অপরিসীম ক্ষতি।

১৯৬৯ সাল ত্রিপুরা রাজ্যে ছাত্র আন্দোলনের মাইল স্টোন বলা চলে। এব আগে নিশীথ দাসের নেতৃত্বে 'ছাত্র-ঐক্য সংস্থা' খুবই জনপ্রিয় এবং শক্তিশালী ছাত্রসংগঠন হলেও তার কোন রাজনৈতিক স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি বা উদ্দেশ্য ছিল না। অবাজনৈতিক এই ছাত্র সংগঠনটি ইস্যু ভিত্তিক ছাত্রদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে তখনকার শাসকদল কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করলেও কংগ্রেস দলকে ক্ষমতা থেকে অপসারিত করে ক্ষমতা দখল করে রাজ্যের জনগণকে জনপ্রিয় একটি সরকাব উপহার দেবার কর্মসূচি ছিল না। কিন্তু এই ছাত্র সংগঠনটির ইস্যুভিত্তিক আন্দোলনের ফলে ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক গণভিত্তি গড়ে তোলার কারণে ত্রিপুরা রাজ্য ছাত্র ফেডারেশানের অ-উপজাতি বাঙালি অংশের ছাত্রদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তুলতে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছিল। ষাটের দশকে চিররঞ্জন ঘোষ, রানা সেনগুপ্ত, সুভাষ রায়, অমল ভট্টাচার্য, সুজিত দত্ত, অরুণা দত্ত, এরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও ছাত্র ফেডারেশানকে শক্ত জমির উপর দাঁড় করাতে সক্ষম হননি। ধর্মনগরের ছেলে প্রবীর সিনহার কথা আমার খুব মনে পড়ে। প্রবীরদা পড়াশোনার কারণে আগরতলা আসেন এবং বীরবিক্রম কলেজে ভর্তি হন সম্ভবত ১৯৬৬ সনে। আমি কলেজে ঢোকার পরই তার নজর আমার ওপর কি কারণে যেন পড়ে যায়। কলেজে আমার বিপুল সংখ্যক বন্ধুবান্ধবের কারণেই হয়ত বা হবে। তিনি সকাল-সন্ধ্যা আমাকে গুপ্তচরের মত অনুসরণ শুরু করেন। পোস্টঅফিস চৌমুহনির গোলচক্করে যেখানেই আমি থাকি আমাকে খুঁজে বের করে নিয়ে আসতেন। ঘেরা দেওয়া জায়গায় বসে ছাত্র ফেডারেশানের আদর্শ, সাম্যবাদী দর্শন বোঝাতেন। আরেকজন ছিলেন রানিরবাজার স্কুলের প্রাথমিক বিভাগের সাময়িক

বরখাস্ত হওয়া শিক্ষক সুভাষ দাস। যিনি পরবর্তি সময়ে যুব ফেডারেশানের নেতৃত্বে ছিলেন। তিনি ধলেশ্বর, কল্যাণী এলাকায় আমার বাড়ির পাশে ভাড়া উঠেছিলেন। সুভাষদাও সকাল-সন্ধ্যে আমাকে সাম্যবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রমে নিয়োজিত হয়েছিলেন। প্রবীর সিনহা এবং সুভাষদার সাঁড়াশী আক্রমণে আমি ঠিকঠিকই কুপোকাত হয়ে পড়লাম। গুটিগুটি পায়ে ১৯৬৮ সন থেকেই বীরেনদার বাড়ির ত্রিপুরা রাজ্য ছাত্র ফেডারেশানেব অফিসে এবং বটতলা পার্টি অফিসে যাওয়া শুরু করেছিলাম। সুভাষদা হৃদবোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন বেশ কয়েকবছর আগেই। প্রবীরদার কোন খবর জানিনা। যদি তিনি আজো বেঁচে থাকেন এবং ত্রিপুবায় অবস্থানরত থাকেন জানিনা এই লেখা তাঁর চোখে পড়বে কিনা। একবার তাঁর সঙ্গে দেখা হলে বড় ভাল হতো। প্রকৃত অর্থে প্রবীর সিনহা এবং সুভাষ দাস তো আমার রাজনৈতিক শিক্ষাগুরু।

১৯৬৮ সনে মহাবাজা বীরবিক্রম কলেজের ছাত্রসংসদের নির্বাচনেব দিন ঘোষিত হল। ত্রিপুরা রাজ্য ছাত্র ফেডারেশান থেকে সুজিত দত্তকে সাধারণ সম্পাদক পদে এবং ভি.পি পদে বিশ্ববন্ধু মজুমদারকে প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত হল। খোয়াই -এর গজেন্দ্র দেবনাথ এবং বামনগর ৫নং রোডে বাড়ি আমার বন্ধু উমাকান্ত স্কুলের সহপাঠী শ্রীদীপক দত্ত (নোটন) এই দু'জনকে সহঃসাধাবণ সম্পাদক পদে প্রার্থী করা হল। বিরোধী দল এন.এস.ইউ আই অর্থাৎ কংগ্রেস সমর্থিত প্যানেলে সাধারণ সম্পাদক পদে দাঁড়িয়েছিল বর্তমানে এরাজ্যেব বিশিষ্ট রবীন্দ্র গবেষক ও সাহিত্যিক আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু বিকচ চৌধুরী এবং ভি.পি পদে তপন বর্মন। সেসময়ে বন্ধুত্ব গড়ে তোলার জন্য রাজনৈতিক কোন রং দেওয়াল তুলে দাঁড়াতে পাবত না।

সেবছরই কংগ্রেস সমর্থক তপন বর্মন, মানিক দেব এরা হঠাৎ বুঝতে পারল এবারের ছাত্রসংসদ নির্বাচন কঠিন লড়াই -এর সম্মুখীন হবে। পরিস্থিতি যে জায়গায় দাঁড়িয়েছে নির্বাচনে তাদেব হাবার সম্ভাবনাই বেশি। কি একটা তুচ্ছ কারণে এম.বি.বি. কলেজ প্রথম বর্ষ এবং দ্বিতীয় বর্ষের মধ্যে ঝামেলা লাগিযে কলেজে শুরু করে দিল মারামারি। তখনকার সময়ে সদ্য বামপন্থী ছাত্র রাজনীতিতে প্রবেশ করেছে শিবনগর মসজিদ রোডে বসবাসকারী মধুসূদন ভট্টাচার্য যাকে আমবা লম্বা মধু বা ১নং মধু বলে ডাকতাম। মধুর মত সাহসী ছেলে সত্যি বলতে কি আমাব জীবনে আমি দেখিনি। মধুর চরিত্র মাঝে মাঝে আমার মনে হত শবৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হয়ত আগাম কল্পনা করেছিলেন বলেই ইন্দ্রনাথের চরিত্র রচনা করতে পেরেছিলেন। মধু তখন এম.বি.বি. কলেজে দ্বিতীয়বর্ষের ছাত্র। হঠাৎ লক্ষ্য করি মধুর মাথা ফেটে সারা শরীর বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। মধু কলেজ বিল্ডিং-এর সামনের লনে উন্মত্তের মত আক্রোশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোন দিকে তার ভ্রুক্ষেপ নেই। জীবনের পরোয়া নেই। প্রচন্ড জেদে তার চেহারা বীভৎস আকার নিয়েছে, মুখ দিয়ে হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মত ফেনা বেরুচ্ছে। আমার একটা সুবিধা ছিল আমি যদিও তখন দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র কিন্তু প্রথম বর্ষের ছাত্রদের সঙ্গেও আমার গড়ে উঠেছিল চরম সখ্যতা। ২ বছর ধরে কলেজে ঘুরতে ঘুরতে সব মহলেই পরিচিত হয়ে উঠেছিলাম। ভর্তির সময় অযাচিতভাবে ছাত্রদের সাহায্য করতে এগিয়ে যেতাম। এটা একা আমিই করতাম তা নয়। বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সবাই মনে করত এটা অবশ্য করণীয় কর্তব্য। বিতর্ক

সভায় বক্তৃতা দেওয়া, রাজনৈতিক ভাষণ দেওয়া এগুলি আমার এলেমে কুলিয়ে উঠত না— যোগ্যও ছিলাম না হয়ত। শতহস্ত দূরে থাকতাম। মানিক, বাদলদা, বিজন, সমীর, বিজয় এদের কাজ ছিল কলেজে প্রকাশ্যে ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া। আমাদের কাজ ছিল ছাত্রদের মধ্য থেকে আন্দোলনের রসদ জুগিয়ে যাওয়া।

পরবর্তী সময়ে সুজিত দত্তের কাছে জানতে পেরেছি, প্রবীর সিন্হা পরবর্তী সময়ে নকশাল আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে জঙ্গলে চলে গিয়েছিলেন। ১৯৭১ সনে আগ্নেয়াস্ত্রসহ ত্রিপুরার পাহাড়ের কোন জায়গা থেকে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। পরে তিনি মিজোরাম চলে যান এবং সেখানে কিছুদিন ঠিকেদারির কাজ করেন। পরবর্তী সময়ে অনিল সরকার খবর দিয়ে প্রবীর সিন্হাকে মিজোরাম থেকে আনিয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে চাকরি দেন। কিন্তু সে কাজেও প্রবীরদা মন বসাতে পারেননি। কয়েক মাস কাজ করার পর চাকরি ছেড়ে দিয়ে কোথায় যে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন কেউ আর বলতে পারে না। সুভাষ রায় ১৯৬৭-১৯৬৮ শিক্ষাবর্ষে এম.বি.বি কলেজের ছাত্র সংসদে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ত্রিপুরা রাজ্য ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বদানকারী নেতাদের মধ্যে বীরেনদার জ্যেষ্ঠপুত্র সিদ্ধার্থ দত্তও অন্যতম একজন ছিলেন।

অনেক পরিশ্রম করে সেদিন আমরা ছাত্রদের একাংশ এবং অধ্যাপকরা ১ম বর্ষ ও ২য় বর্ষের ছাত্রদের মারামারি থামাতে পেরেছিলাম। সেই মারামারিতে কেউ হত হয়নি তবে অনেকেই অল্পবিস্তর আহত হয়েছিল। কাউকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়নি। কারণটা হোলো মারামারিটা পূর্ব পরিকল্পিত ২/১ জন তথাকথিত ছাত্রনেতার মস্তিষ্কপ্রসূত ছিল। কিন্তু সেই পরিকল্পনায় ছাত্ররা যুক্ত ছিল না। ঘটনার তাৎক্ষণিকতায় উত্তেজিত হয়ে আকস্মিকভাবে ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি দিয়ে ঘটনার শুরু হয়েছিল। তাতেই অনেকে অল্পবিস্তর আহত হয়েছিল। সর্বোপরি, কারোর ওপরই কারোর জাত আক্রোশ ছিল না।

কলেজের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় সুশান্ত চৌধুরী ছাত্রদের এই উচ্ছৃঙ্খলতা মেনে নিতে পারেননি বলে ১৯৬৮-৬৯ বর্ষের কলেজের সাধারণ নির্বাচন বাতিল করে দেন। সেই বছর কলেজে নির্বাচিত কোন ছাত্র সংসদ ছিল না। মনোনীত কাউন্সিল ও বিভিন্ন কমিটি ছাত্র সংসদের কাজ চালিয়েছিল।

সে সময়কার রাজনৈতিক আবহ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের মানসিক পরিমণ্ডলের কিছুটা বর্ণনা দিতে চাই। মঠ চৌমুহনি এলাকা পেরিয়ে আগরতলা শহরের প্রায় সব ছাত্রকে কলেজে যেতে হত। আমাদের সময় শহরে টাউন বাস সার্ভিস চালু ছিল। বাসে করেই আমরা কলেজে যেতাম বা নিজস্ব বাইসাইকেল যাদের ছিল তারা সাইকেল চড়ে। মঠ চৌমুহনিতে দর্জির দোকান ছিল জনৈক জ্যোতিষ সিং-এর। তিনি সবসময় লুঙ্গি পড়েই থাকতেন। হঠাৎ দু'একটা মারামারির ঘটনায় মঠ চৌমুহনির ফ্লাওয়ার্স ক্লাব জড়িয়ে পড়ে জ্যোতিষ সিংহের নেতৃত্বে এবং আগরতলা শহরে জ্যোতিষ সিংহের মাস্তান হিসাবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ ঘটে। মঠ চৌমুহনি এলাকায় বসবাসকারী ও শনিতলা পেরিয়ে মটরস্ট্যান্ডে বসবাসকারী বিমল সিন্হা ও অমল ভৌমিক ছিল আমার ব্যক্তিগত বন্ধু। বিমল-অমল দু'জনেই ছিল আজীবন কংগ্রেসপ্রেমী। দু'জনেই বেশ কয়েক বছর আগে প্রয়াত হয়েছেন। এরা ফ্লাওয়ার্স ক্লাবের সদস্য হিসাবে জ্যোতিষ সিংহের

বামহাত ও ডানহাত ছিল। বর্তমান প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র রতন চক্রবর্তীও ছিল আমাদের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে যাহোক, অমল-বিমলের কারণে জ্যোতিষ সিং আমাকে শুধু ভালই বাসতেন না যথেষ্ট সমীহ করতেন। রাজনৈতিক আনুগত্য যাই থাক না কেন শুধুমাত্র বন্ধুত্বের কারণে অমল-বিমল প্রতিদিন রাত্রিতে এম.বি.বি কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে পোস্টারিং এবং দেওয়াল লেখার সময় আমার পাশে-পাশে থাকত। উদ্দেশ্য একটাই আমার নিরাপত্তা অক্ষুন্ন রাখা। যদিও সে রকম বিপদের কোন সম্ভাবনা ছিলই না। তবু নিছক বন্ধুপ্রীতির কারণেই ওরা এসব করেছিল। একদিন তো বিরাট এক বিপত্তি বন্ধুপ্রীতির কারণে ঘটিয়ে তুলেছিল অমল-বিমল। আমার অনুপস্থিতিতে বিকচ চৌধুরীর সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে পোস্টারিং-এর সময় জায়গা দখল নিয়ে তুমুল ঝগড়া শুরু করে। খবর পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে আমি ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিকচের সহায়তায় পরিস্থিতি আয়ত্তে আনি। আমরা যদিও গজেন্দ্র দেবনাথকে সহঃ-সম্পাদক পদে ভোট দিতে আবেদন জানিয়ে পোস্টারিং করেছিলাম। কিন্তু মাঝে-মাঝে পীচের রাস্তায় আমরাই বন্ধু ও সহযোদ্ধা সমীর চক্রবর্তীর প্ররোচনায় 'গজেন্দ্র চলেছে গজগমনে' এবং 'গজেন্দ্র চলেছে দ্বিরাগমনে' জাতীয় শ্লোগান লিখে রসিকতাপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টিতে উদ্যোগী হয়েছিলাম। সমীর খুব উইটি অর্থাৎ রসিক ছিল। সমীর, মনোরঞ্জন পাল এবং আরো অনেকে আমাকে গোঁসাই ডাকত কারণ আমার অজানা। কেননা যজমানি ব্যবসায় যুক্ত ছিলাম না কোনদিনই। তবে কলেজে পড়ার সময় মামা কেশব, মধু ভট্টাচার্য (২নং) যিনি বর্তমানে এ.জি. অফিসে কর্মরত তাদের সঙ্গে মিলে কত লোককে যে ভুয়ো-তাবিজ, কবচ, কবিরাজী ওষুধ বিক্রি করে রোজগার করেছি তার ইয়ত্তা নেই। তাছাড়া কলেজে বন্ধুদের প্রেমপত্র লিখে দিয়েও খারাপ রোজগার হত না। দীপক দত্ত অর্থাৎ নোটনের বাড়ি ছিল রামনগর ৫ নং রাস্তায়। নোটন খুব আমুদে এবং বিভিন্ন রসের কথা বলে সবাইকে হাসাতে পারত। তাই কলেজে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। নির্বাচন হলে আমাদের গোটা টিম জিতে বেরিয়ে আসত সে বছর। নোটনদের পারিবারিক একটি অ্যাম্বাসাডার ছিল। নোটন সে সময়েই ভাল গাড়ি চালাত। গভীর রাতে নোটন গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। আমি, কল্যাণীর রবীন্দ্র (রবি) চক্রবর্তী, সুভাষ চক্রবর্তী (হো-চি-মিন যার নাম দিয়েছিলাম স্বল্প দাড়ির কারণে), সমীর আরো কয়েকজন মিলে ধলেশ্বর ও রামনগর গোটা এলাকা চষে বেড়িয়ে লোকের বাড়ির ডাব-নারকেল, সুপারি চুরি করে অ্যাম্বাসাডারের ডিকিতে ঢুকিয়ে নিয়ে পালিয়ে আসতাম। আমি খুব তরতর করে উঁচু নারকেল এবং সুপারি গাছে চড়তে পারতাম। তাই চুরির কাজটা আমাকেই করতে হত। অন্যরা থাকত পাহারাদার। এম.বি.বি কলেজের লেকে গোপন জায়গায় সেগুলো লুকিয়ে রাখতাম। সুবিধামত কামান চৌমুহনি ফলের দোকানে দোকানির ধার্য্য করা খুব কম দামে পাইকারি হারে বিক্রি করে দিতাম। এতে যে পয়সা আমাদের হাতে আসত ১৯৬৮ সনের শিক্ষাবর্ষে কলেজের সংসদ নির্বাচনের পুরো খরচটাই শুধু উঠে আসেনি আমাদের বদভ্যাস করার সুযোগও করে দিয়েছিল। পার্টির নেতারা তো নয়ই মানিক, বাদলদা এরাও এই গোপন খবর আজ অবধি জানে না। এই লেখা পড়ে যদি এখন জানতে পারে।

পাঠকদের কাছে আবারও ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, পর্যায়ক্রমিকভাবে লেখাগুলি লিখতে

পারছি না বলে। একবার কলেজে ঢুকে যাচ্ছি, আবার স্কুলের ঘটনায় ফিরে আসতে হচ্ছে। পরিবেশিত ভুল তথ্য সংশোধন করতে হচ্ছে। ৬০-৭০-এর দশকের যারা জীবিত সেইসব পাঠকরা হঠাৎ নস্টালজিক হয়ে উঠেছেন। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বাড়ি আসছেন। তথ্য সংযোজন করছেন। স্কুলের বন্ধু কুশল দেববর্মা, স্নেহাংশু চৌধুরী, প্রতিনিয়ত পরিবেশিত তথ্যে যাতে কিছু বাদ না যায়, ভুল না থাকে সদা সতর্ক রয়েছে। এরা স্কুলের আরো কত ঘটনা মনে করিয়ে দিয়ে আব্দার করে বলেছে সেসব ঘটনার উল্লেখ করতেই হবে।

রামনগরের সুব্রত দত্ত চৌধুরী ডাকনাম গদু আমাদের সহপাঠী। ত্রিপুরা রাজ্যে ফুটবল মাঠে বিখ্যাত রেফারি ছিল। প্রায় প্রতিদিন পড়াশোনা না পারার কারণে কিংবা পড়া শিখে আসেনি এই সন্দেহে আমাদের শিক্ষক দক্ষিণারঞ্জন সাহার হাতে মার খেত। গদু একটু তোতলা ছিল। যেদিন পড়া শিখে যেত পড়া শিখে এসেছি বলতে বলতেই দক্ষিণাবাবুর দু'চার ঘা গাট্টা আগাম মাথায় পড়ে যেত। স্কুলের পথে অন্য কোন ছেলে বা আমরা কেউ দুষ্টুমি করে এলেও আমাদের সহপাঠী গদুর নামটাই দক্ষিণাবাবুব মাথায় ঘুরত। কুশল দেববর্মা ও সুব্রত পাল (বর্তমানে গৌহাটি হাইকোর্টের আগবতলা বেঞ্চের রেজিস্ট্রার) আমাদের এক ক্লাশ সিনিয়র ছিল। ওরা ১৯৬৬ সনেব হায়ার সেকেণ্ডারির ব্যাচ। সুব্রত ছিল হাড়ে হাবমাদ। চোখ দুটো দুষ্টুমিতে সবসময় জ্বলজ্বল কবত। এখনও করে। ক্লাশ মণিটরের খাতায় প্রতিদিন সুব্রতর নাম দুষ্টুমির জন্য সর্বাগ্রে লেখা থাকত এবং শ্রেণি-শিক্ষকেব কাছে রিপোর্টিং হত। সুব্রত এতে গ্রাহ্যও কবত না কোনদিন। জামার সামনেব বোতাম কোনদিন আটকাত না। স্কুলে থাকতেই সে আগবতলা শহরের রোমিও। সুব্রতর নষ্টামির কারণে গোবেচারা গদু মার খেয়েছে অনেক বেশি। সুব্রতর কথা হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের অভিজ্ঞতা বলার সময় সবিস্তারে লিখবো। আমাদের হাড়মাংস সে জ্বালিয়ে খেত। শুধু একটা কথা বলে নিই ১৯৭৮ সনে প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী তাঁর বাল্যবন্ধু সুব্রতর পিতা প্রয়াত নৃপেন পালের জুনিয়ব হিসাবে তাঁর রামনগর বাড়িতে আমাকে সঁপে দিয়ে আসেন। আমি আর সুব্রত (ডাকনাম শামু) একসাথে স্যারের চেম্বারে বসতাম। প্রায়ই স্যার শামুর সামনেই তাকে দেখিয়ে আমাকে বলত, বুঝেছ ধীরাজ এই যে দেখতে পাচ্ছ আমার সামনে বসে আছে দেখতে মানুষের মত আসলে কিন্তু ও মানুষ নয়। আমার দুঃখ হয় স্যার অর্থাৎ শামুর বাবা দেখে যেতে পারেননি তাঁর তথাকথিত অমানুষ ছেলের নাম আজ গৌহাটি হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে প্রস্তাবিত হয়ে চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। ১৯৬৩-৬৪ সনের শিক্ষাবর্ষে আমরা তখন উমাকান্ত স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ি তখন আমাদের ইংরেজি ক্লাশ নিয়মিত নিতেন প্রয়াত দক্ষিণারঞ্জন সাহা। আমাদের এন.সি.সি'র কমান্ডারও ছিলেন দক্ষিণারঞ্জন বাবু। আমাদের হিন্দি শিক্ষক ছিলেন শ্রী হারাধন বর্দ্ধন। মাঝে মাঝে হারাধনবাবু অনুপস্থিত থাকলে দক্ষিণাবাবু হিন্দি ক্লাশও নিতেন। দক্ষিণাবাবু ছিলেন নোয়াখালির লোক। তার কথায় স্পষ্ট নোয়াখালির টান ছিল। আমি আর কেশব তার কথাবার্তা অবিকল নকল করতে পারতাম। কারণ আমাদের পূর্ব পুরুষেরাও ছিল নোয়াখালির লোক। আমার বাড়িতে আমার ঠাকুরমা, কেশবের বাড়িতে ওর বাবা-মা সবাই নোয়াখালি ভাষাতেই কথা বলত।

প্রতিদিন ইংরেজি ক্লাশ করতে এলে দক্ষিণাবাবু ক্লাশে ঢুকেই বলতেন, যে যে দুষ্ট ছেলে

পড়া শিখে আসনি, চটপট বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে যাও। ক্লাশে যে আট-দশজন বেঞ্চের ওপর প্রায় প্রতিনিয়ত দাঁড়াত তার মধ্যে মামা কেশব ও আমি প্রায় কমন ছিলাম। আমি অবশ্য পড়া শিখে গেলেও কেশবের প্রতি সহমর্মিতা জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে পড়তাম। দক্ষিণাবাবু অবাধ্য ছাত্রদের উত্তম-মধ্যম দিয়ে তারপর ক্লাশে পড়ানো শুরু করতেন। তেমনি একদিন শেষের দিকের দু'একটা বেঞ্চ আগে কেশব বেঞ্চের উপর দাঁড়ানো। তার পাশে বসা একদিকে স্নেহাংশু চৌধুরী অন্যদিকে স্বপন দুলাল রায় চৌধুরী। তার পেছনের বেঞ্চের উপর আমি দাঁড়িয়ে। কেশব খুব আস্তে স্নেহাংশুকে বলল, আমাকে ধরিস। তারপরই সে দুম করে স্নেহাংশুর কোলে অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেল। কেশবের আগের বেঞ্চ পর্যন্ত উত্তম-মধ্যম দিয়ে দক্ষিণাবাবু নিবৃত্ত হলেন। কেশবের মাথায় জল ঢালা হল। জ্ঞান আর ফেরে না। পেছনের দিকের আমরা সেদিন মার খাওয়া থেকে বেঁচে গেলাম। আমি, স্নেহাংশু, স্বপন-দুলাল কয়েকজন মিলে কেশবকে রিক্সা করে আই.জি.এম হস্‌পিটালে নিয়ে গেলাম। সেখানে ডাক্তার কেশবকে ইঞ্জেকশন দিতে এলেই তার জ্ঞান ফিরে আসে। ইঞ্জেকশন আর দিতে হয়নি। স্বপন-দুলালের ছিল হাসির রোগ। স্কুলে কেশবের পাশে বসা থাকলেও সে ব্যাপারটা আঁচ করতে পারেনি। হাসপাতালে এসে গোটা ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে হাসতে হাসতে তার মূর্চ্ছা যাওয়ার উপক্রম। সেদিন ভয়ে আর স্বপন-দুলালকে স্কুলে ফিরে আসতে দিইনি। পাছে না তার হাসি দেখে দক্ষিণাবাবু সব ঘটনা বুঝে ফেলেন।

হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষার আগে টেস্ট পরীক্ষা। কেমিস্ট্রির শিক্ষক দুর্গাচরণ দে। সেদিন ছিল কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা। সাইকেলের সামনের সীটে কেশবকে বসিয়ে স্কুলে ঢুকছি, স্কুলের সামনে বসানো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তির কাঁটাতারের বেড়ার বেষ্টনির পূর্ব দিক দিয়ে; দুর্গাবাবু ঢুকছেন সাইকেলে করে পশ্চিম দিক দিয়ে। কেশব বলল তাড়াতাড়ি সাইকেল কাত করে মাটিতে ফেল। আমি কিছু না বুঝেই সাইকেল বাঁদিকে কাত করে মাটিতে ফেললাম। কেশব বাঁহাতের মাটি ঝেড়ে ডানহাত ধরে তার স্বরে চিৎকার শুরু করল। তার নাকি ডান হাত সাইকেল থেকে ফেলে আমি ভেঙে দিয়েছি। দুর্গাবাবু দৌড়ে এসে আমাকেই দায়িত্ব দিলেন কেশবের হাত আই.জি.এম হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিভাগে দেখিয়ে নিয়ে আসার জন্য। ইমারজেন্সির ওয়ার্ডবয়কে বলে-কয়ে, অনুনয়-বিনয় করে কেশবের ডান হাত ব্যাণ্ডেজ করে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা শেষ হয-হয় সময়ে স্কুলে এসে দুর্গাবাবুকে রিপোর্ট করি। বলি কেশবের হাত হয়ত ফ্র্যাকচার হয়েছে, এক্স-রে করলেও করতে হতে পারে। হাতে প্রচণ্ড ব্যথা। আপাতত ব্যাণ্ডেজ করে তাকে নিয়ে এসেছি। কি আর করা যাবে, সে যাত্রায় প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা না দিয়েই কেশব আর আমি হায়ার সেকেণ্ডারি টেস্টে উত্তীর্ণ হলাম।

মামা কেশব প্রায়দিনই টিফিন আওয়ারে বা কোন কারণে স্কুল আগে ভাগে ছুটি হয়ে গেলে ক্লাশের দেওয়ালে একটি লাঠি দিয়ে আমাদের ইংরেজিতে পৃথিবীর ম্যাপ চেনাত। তার ভূগোল ক্লাশে আমাদের এক ক্লাশ সিনিয়র কুশল দেববর্মারা পর্যন্ত এই উদ্ভট ইংরেজি শোনার জন্য আসত। মাঝে মাঝে আবার কেশব জার্মাণিতেও ভাষণ দিত। আমাদের এক ক্লাশ জুনিয়র বিজয় সিংহরায় জার্মানি ভাষা প্রাঞ্জল বাংলায় তার মত করে ব্যাখ্যা করত। কেশবের সেই ইংরেজি বা জার্মাণ ভাষা যে একবার শুনেছে হলপ করে বলা যায় হাসতে

হাসতে তার গলা দিয়ে অন্নপ্রাশনের ভাত একবার না একবার উঠে এসেছেই এসেছে।

তখন উমাকান্ত স্কুলে ক্লাস টেনে পড়ি। ১৯৬৬ সন। ক্লাস ছুটির পর কেশবের বিশ্ব মানচিত্রের ম্যাপ দেওয়ালে লাঠি দিয়ে বোঝানোর আগে হঠাৎ কেশব উত্তম কুমার শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, না সৌমিত্র শ্রেষ্ঠ অভিনেতা— এনিয়ে আমার সঙ্গে তুমুল তর্ক জুড়ে দিল। কেশব উত্তমের পক্ষে, আমি সৌমিত্রর পক্ষে। এখন সেসব ছেলে মানুষির কথা মনে পড়লে হাসি পায়। যাদের নিয়ে তর্ক করছিলাম তারা দু'জনেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বাংলা চলচিত্রেব উজ্জ্বল ভাস্কর। যাহোক, এক সময় যখন তর্কের পারদ তুঙ্গে উঠেছে তখন কেশব খেই হারিয়ে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাল। ছোট একটি ডেস্ক আমার দিকে ছুঁড়ে মারল। আমার থুতনিতে লেগে রক্তারক্তি কাণ্ড। ভি.এম হাসপাতালে গিয়ে সেলাই করতে হল। বাড়িতে গিয়ে কি বলব চিন্তা করতে করতে ফিরলাম। গিয়ে বললাম, কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে কাঁচের জার ভেঙ্গে থুতনি কেটে গেছে। বাবা বাড়ি ফিরে সব শুনে তো ক্ষেপে লাল। এতবড় একটা দুর্ঘটনা হয়ে গেল। স্কুলের কি কোন দায়িত্ব নেই? বাড়িতে বা বাবার অফিসে একটা খবর দিল না। একা একা আমাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিল। মিথ্যে কথা বলতে গিয়ে কি বিপত্তিতে যে পড়লাম। পরের দিন বাবা অফিসের টিফিন টাইমে সচিবালয় থেকে বেরিয়ে স্কুলে এসে হেডমাস্টার শ্রদ্ধেয় সুধীর দত্তের সঙ্গে দেখা করার পর আসল ঘটনা জানতে পারল। আমি বাবাকে স্কুলে দেখে সেদিন আর বাড়ি ফিরিনি। স্কুল থেকে সোজা কৃষ্ণনগর মামার বাড়ি চলে আসি। ২ দিন পর বাবা আমাকে নিতে এলে দিদিমা আমাকে যাতে মারধোর না করে মাথার দিব্যি দিয়ে আমাকে বাবার হাতে তুলে দেয়। আমাব থুতনিব নীচে সেই কাটা দাগ আজও জ্বলজ্বল করছে।

১৯৬৬ সনে খাদ্য আন্দোলন শুরু হল রাজ্যজুড়ে। পুলিশের গুলিতে নিহত হল দিলীপ-তরুণ-অরবিন্দ। যাদের আমরা খাদ্য আন্দোলনেব শহিদ হিসাবে আজো শ্রদ্ধায় স্মরণ করি। অরবিন্দ দত্ত চৌধুরীর ডাক নাম ছিল কার্লিং, জয়নগর বাড়ি। আমাদেব স্কুলের ছাত্র, আমাদের এক ক্লাস সিনিয়র ছিল। প্যারাডাইস চৌমুহনিতে তখন থাকত পুলিশ সুপার এস.সি. কোচার। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে তখন পুলিশের এস.পি বা সুপার একজনই ছিলেন। আগরতলা শহরে থানা একটিই—কোতোয়ালি থানা। এখন যেখানে পশ্চিম আগরতলা থানা অবস্থিত সেখানেই ছিল কোতোয়ালি থানা। অরবিন্দের বড়ভাই বিমল দত্ত চৌধুরী সে সময়ে কোতোয়ালি থানায় সাব-ইন্সপেক্টর হিসাবে কর্মরত ছিলেন। অরবিন্দের ছোটভাই এই রাজ্যের একজন খ্যাতনামা ক্রিকেটার দিলীপ দত্ত চৌধুরী ছিল উমাকান্ত স্কুলে আমাদের সহপাঠি। দিলীপও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে বেশ কয়েক বছর আগে। অরবিন্দের বোন জুয়েল দত্ত চৌধুরী জয়নগর এলাকার পুর পরিষদের কাউন্সিলার। সি.পি.আই(এম) দল থেকে তিনি নির্বাচিত সদস্যা।

পুলিশের গুলিতে অরবিন্দের মৃত্যুর পর বিশেষত উমাকান্ত স্কুলের ছাত্ররা আমরা উত্তেজনায় টগবগ করছিলাম। অরবিন্দের মৃত্যুর বদলা যে করেই হোক নিতে হবে। অরবিন্দের মৃত্যুর পর উমাকান্ত স্কুলে আমরা তার স্মৃতিতে একটি স্মরণসভার আয়োজন করেছিলাম। তখন ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন প্রয়াত শচীন্দ্রলাল সিংহ। শচীনবাবুর বা তৎকালীন কংগ্রেসের দলীয় নেতৃত্ব বোধহয় ভেবে নিয়েছিলেন এই সভা করতে দিলে

কংগ্রেস দলের সমূহ বিপদ হবে। দুপুরে আমিরা যখন শহিদ অরবিন্দ স্মরণে সভার আয়োজন করছি ঠিক তখনই এম.বি.বি কলেজেব তখনকার সময়ের ইতিহাসের অধ্যাপক সত্য ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে কংগ্রেসেব কিছু পেটোয়া লোক উমাকান্ত স্কুলে ঢুকে আমাদেব আয়োজিত স্মবণসভা বানচাল করাব জন্য উত্তেজনা সৃষ্টি করে। আমি, স্নেহাংশু, দীপক দত্ত (নোটন), কেশব, চন্দন বর্দ্ধন (বর্দ্ধন সাইকেল স্টোর্সের মালিকেব ছেলে), নেপাল-সত্যগোপাল সবাই মিলে সেদিন অধ্যাপক সত্য ভট্টাচার্যকে নাজেহাল করে ছেড়েছিলাম। আর তার সঙ্গে যারা ছিল তারা আমাদের রুদ্রমূর্তি দেখে চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা এই নীতি মেনে দ্রুত স্কুল চত্বর ছেড়ে পলায়ন কবেছিল।

তারপর নির্বিঘ্নেই আমরা স্মরণসভা করে অরবিন্দের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানিয়েছিলাম। তখন থেকেই সম্ভবত অবচেতন মনে কংগ্রেসের রাজনীতি সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ শুরু করেছিলাম। একটা প্রতিশোধস্পৃহা মনে জমতে জমতে বারুদ তৈরি করেছিল।

এখন ঠিক সঠিক নাম মনে করতে পারছি না। আমাদের সহপাঠী বিজ্ঞান বিভাগের কোন এক ছাত্র আমার মাথায় ঢোকাল কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টেব প্র্যাকটিক্যাল রুমে কাঁচের জারেব ভেতব বাখা পারদ দিয়ে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিস্ফোরক তৈবি কবা যায়। মনে মনে পবিকল্পনা কবলাম যে করে হোক পাবদ চুরি করে বোমা বানাতে হবে। সেই বোমায ত্রিপুরার পুলিশ সুপার এস.সি. কোচারেব প্যারাডাইস চৌমুহনির কোয়ার্টাব উড়িয়ে দিতে হবে।

সহপাঠী ও বন্ধু মহাবাজগঞ্জবাজাব এলাকার নেপাল সাহাব সঙ্গে আলোচনা করলাম। নেপাল ছিল কমার্সের ছাত্র। তাছাড়া তখন মহারাজগঞ্জ বাজারেব আশেপাশের এলাকায় কিছু উঠতি মাস্তান টুকটাক পটকা মাঝে মাঝে ব্যবহাব করত শুনেছিলাম। এদেব সঙ্গে যোগাযোগ কবে বিস্ফোবক তৈরির কেমিস্ট্রি শিখে নেওয়ার উদ্দেশেই নেপালকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলাম। নেপাল আমার উদ্দেশ্য জেনে আমাকে বরাভয় দিয়ে বলল, তুই কোন চিন্তা করিস না, আমি ঠিক বোমা বানানোর একজন সায়েন্টিস্ট খুঁজে বের করে ফেলব। তুই শুধু কেমিস্ট্রি ল্যাব থেকে পারদের ব্যবস্থাটা করে রাখ। নেপাল আব সত্যগোপাল ছিল আমাদের সহপাঠী। আমাদের সে সময়কার প্রধান শিক্ষক শিতিকণ্ঠবাবু প্রায়ই আক্ষেপ করে বলতেন, তোরা সত্যনারায়ণের ছোটভাই জেনে কোন টেস্ট ছাড়া নির্দ্বিধায় ভর্তি করিয়ে কি বোকামি যে করেছি। তোদের তো সারাদিন পেটে কিল মারলেও এক ছটাক বিদ্যে বেরোয় না। আসলে নেপাল আর সত্যগোপাল তাদের বড়ভাই-এর মতই খুব মেধাবি ছাত্র বলে শিতিকণ্ঠবাবু বিশ্বাস করেছিলেন। কার্যত এরা ছিল আমাদের মতই মিডিওকার। সে কারণেই শিতিকণ্ঠবাবুর এই আক্ষেপ। নেপালের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে অনেক কষ্টে একদিন কেমিস্ট্রির ল্যাবের ভিতরে থাকা কাঁচের জার ভেঙ্গে ছাতার ভেতর পারদ সংগ্রহ করলাম। অনেক কষ্ট করে লুকিয়ে সে পারদ স্কুল বাউন্ডারি থেকে বের করে নিয়ে জমা রাখলাম নেপালের হেপাজতে। পরের দিন তো স্কুলে হৈ-হৈ কাণ্ড। কি করে কেমিস্ট্রি ল্যাবের কাঁচের জার ভাঙ্গল। যদি দুর্ঘটনাজনিত কারণেই ভেঙ্গে থাকে তবে তো ফ্লোরে পারদ থাকার কথা। কোথায় গেল পারদ? যাহোক, আস্তে আস্তে উদ্বেগ আর অনুসন্ধানপর্ব শেষ হয়ে ভাঁটার টান এল। চোর আর ধরা পড়ল না। এদিকে, আমি আর নেপাল সকাল, সন্ধ্যে, দুপুর মহারাজগঞ্জ বাজার, সেন্ট্রাল রোড এক্সটেনশন, হাওড়া নদীর বাঁধের রাস্তা ধরে কলেজটিলা অঞ্চল পর্যন্ত প্রতিদিন

বিস্ফোরক তৈরির সায়েন্টিস্ট খুঁজতে খুঁজতে জুতোর শুকতলি খুইয়ে ফেলেছিলাম। পারদ ব্যবহার করে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক তৈরির কারিগর আর খুঁজে পাইনি। মনের দুঃখে আমি আর নেপাল একদিন সন্ধ্যায় ছাতাসহ চুরি করা পারদ উদাস দার্শনিকতায় হাওড়া নদীতে বিসর্জন দিয়ে এসেছিলাম।

১৯৬৫ সন আমরা ক্লাস নাইনে পড়ি। আমাদের ক্লাস টেন-এ এবং ক্লাস ইলেভেনে তখন নিয়মিত ইংরেজি পড়াতেন জনপ্রিয় ইংরেজি শিক্ষক ক্ষীতাংশু সাহা। সংক্ষেপে আমরা সবাই তাঁকে কে. সাহা ডাকতাম। কালো কুচকুচে, ছোটখাট বেঁটে মানুষ, মাথায় ছিল টাক। সর্বদা সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরতেন। শিক্ষক হিসেবে ছিলেন কালো মানিক পেলে স্বরূপ। বিশ্ব মানচিত্র বোঝাতে গিয়ে কেশব প্রায়ই did and dut শব্দ ব্যবহার করত। স্নেহাংশু, প্রদীপ ওরা জিজ্ঞেস করায় নির্দ্বিধায় ও বলে দিয়েছিল—এর অর্থ 'তোমাকে করিতেই হইবে'। স্নেহাংশু ২/১ দিন পর এসে মামা কেশবকে বলল, মামা অনেক বই এবং ইংলিশ ডিকশনারি খুঁজলাম এমন শব্দ তো পেলাম না। কেশব গম্ভীর হয়ে জবাব দিল জার্মান-ইংলিশ কম্বাইন্ড ডিকশনারি দেখতে হবে। ডিড্ এন্ড ডাট-এর কাহিনী কি করে যেন আমাদের ইংরেজির স্যার ক্ষীতাংশুবাবুর কানেও গিয়ে পৌঁছেছিল। তিনি একদিন ক্লাশে কেশবকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করে নাস্তানাবুদ করেছিলেন।

আমরা যখন ক্লাস নাইনে পড়ি তখন আমাদের স্কুলে পশ্চিমবাংলা থেকে একজন ব্যাচেলর শিক্ষক এসে বাংলা ক্লাস নিতে শুরু করেন। তার নাম ছিল বিশ্বজিৎ সেন। খুবই ভাল বাংলা পড়াতেন। আমরা স্কুল ছাড়ার পর তিনি মহিলা কলেজে বাংলার অধ্যাপক হিসাবে কাজে যোগ দেন। বিশ্বজিৎ স্যার এসে কেশবের বাড়ির পাশেই কোথাও ভাড়া থাকতে শুরু করেন। তিনি প্রতিদিন বিশেষত শীতের দিনে কাপড়ের জুতো-মুজো, সাদা হাফশার্ট, হাফ প্যান্ট পড়ে প্রাতঃভ্রমণে বেরুতেন এবং দৌড়ঝাঁপ করে শরীরের ঘাম ঝরাতেন। আমাদের মধ্যে কেশবও স্বাস্থ্য সচেতন ছিল। কেশবও বিশ্বজিৎ সেন স্যারেব সঙ্গে প্রাতঃভ্রমণ শুরু করেছিল। কয়েকদিন পর খবর পেলাম বিশ্বজিৎ স্যার, যে রাস্তা দিয়ে কেশব প্রাতঃভ্রমণে বেরোয় সে মুখো আর হন না। পরে তো তিনি প্রাতঃভ্রমণই ছেড়ে দিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর জানা গেল, জগিং-এর সময় ২/৩ দিন বিশ্বজিৎ স্যারকে লেংগি মেরে কেশব মাটিতে ফেলে দেওয়ায় তিনি জবরদস্ত ব্যথা পেয়েছিলেন। ক্রমে তিনি মর্ণিং ওয়াকই ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।

আমাদের একজন প্রিয় শিক্ষক ছিলেন নিরঞ্জন স্যার। তার পদবিটা এখন মনে নেই। আমাদের স্কুলের শিক্ষক থাকাকালীনই তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দেয়। আমরা যখন ক্লাস টেন বা ইলেভেনে পড়ি স্কুল চলাকালীন সময়ে একদিন খবর পেলাম মহারাজগঞ্জ বাজারে নিরঞ্জন স্যারকে বেঁধে রাখা হয়েছে। মুহূর্তে সব ছাত্র সমবেত হয়ে প্রায় দৌড়ে পৌঁছে গেলাম মহারাজগঞ্জ বাজারে। পথ প্রদর্শক নেপাল আর সত্যগোপাল দু'ভাই। পৌছে গিয়ে দেখলাম, স্যারকে কেউ মারধোর করেনি তবে তাঁর অপ্রকৃতিস্থ আচরণ দেখে তাকে কোন একটা দোকানে আটকে রাখা হয়েছিল। আমরা স্যারকে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে আসছি। পথে পড়ল 'কামাক্ষ্যা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'। কেশব সবাইকে থামাল। জ্বালাময়ী এক বক্তৃতা দিল। মুহূর্তের মধ্যে কামাক্ষ্যা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার লুঠ হয়ে গেল।

এন.সি.সি প্যারেডের সময় আমাদের শিক্ষক, এন.সি.সি কমাডেন্ট দক্ষিণাবাবুকে কি জ্বালাতনই না করতাম আমি আর কেশব। একদিনও সাবধান-বিশ্রাম ঠিকভাবে পা মেলাতাম না। আমাদের যন্ত্রণায় তিনি আমাদের প্যারেড থেকে ছুটি দিয়ে স্কুলের এন.সি সি রুমে স্টোরকিপারের কাজ করার নির্দেশ দিতেন। সমস্ত গোছালো জিনিসকে অগোছালো করে টিফিন খেয়ে বাড়ি ফিরতাম। প্যারেড না করে এন.সি.সি ড্রেস ওয়াশিং এলাউন্সের টাকাটা সর্বাগ্রে আদায় করে সিনেমা দেখতাম।

কেশব সংক্রান্ত স্কুলের শেষ ঘটনাটি বলে এখনকার মত ইতি টানছি। ১৯৬৭ সনে আমরা সবাই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিলাম। আমাদের সিট পড়েছিল বোধজং স্কুলে। একই রুমে আমি, কেশব, বাঁধন, প্রদীপ, স্নেহাংশু, অমিত ব্যানার্জির সিট পড়েছিল। সেদিন অংক পরীক্ষা। আমাদের রুমে ইনভিজিলেটর ছিল বোধজং স্কুলের শিক্ষক শ্রী পূর্ণেন্দু সাহা। অমিত ব্যানার্জি অংকে তুখোড় ছিল। বরাবর লেটার পেত। পরীক্ষার আগের দিন বিকেলে উমাকান্ত স্কুলের গ্যালারিতে সিদ্ধান্ত হয়, অমিত পরীক্ষার দু'ঘণ্টা পেরিয়ে গেলে অংকের দু'টি লুজ শিট কেশবকে দিয়ে দেবে। কেশব সে অংকগুলো তার খাতায় তুলে অমিতকে লুজ শিট ফিরিয়ে দেবে। এই অংকগুলো খাতায় তুলতে পারলেই কেশব ন্যূনতম চল্লিশ পেয়ে পাশ করে যাবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী পরীক্ষার দিন ২ ঘণ্টার বেল পড়লে অমিত কেশবকে অংকের দু'টি লুজ শিট পৌঁছে দেয়। পরীক্ষা শেষ হতে ১৫ মিনিট বাকি তখনও কেশব অমিতকে লুজ শিট ফেরত দিচ্ছে না। অমিত বারবার ইশারা করলে, কেশব পাল্টা ইশারা দেয় চিন্তা কোরো না দিচ্ছি। পরীক্ষা শেষ হওয়ার ২/৩ মিনিট আগে কেশব অমিতকে অংকের লুজ শিট ফেরত দিলে অমিত কায়ক্লেশে মূল খাতার সঙ্গে লুজ শিট জোড়া দিয়ে পরীক্ষা হলে জমা দিতে পেরেছিল।

পরীক্ষা হল থেকে বেরিয়ে অমিত কেশবের ওপর রাগে ফেটে পড়ে। অমিত ছিল খুব ফর্সা। ওর চোখ মুখ দিয়ে যেন রং ফেটে বেরুবে। অমিত বলেছিল—আমার লুজ শিট আর ১ মিনিটে দেরি হলেই তো জমা দিতে পারতাম না। তাছাড়া মামা, তুমি আমার লুজ শিটের পাশে অনর্থক, খাপছাড়াভাবে জ্যামিতির ডায়গ্রাম এঁকে রেখেছ কেন ? যদি ১৫ মিনিট আগেও লুজ শিট ফেরৎ দিতে তবে আমি নূতন করে অন্য লুজ শিটে তুলে জমা দিতে পারতাম। অনেকক্ষণ শোনার পর কেশব বলল— শোন অমিত, আমার কোন কথা না শুনেই এতক্ষণ যা ইচ্ছে বলে যাচ্ছ। আমি কি করব পূর্ণেন্দুবাবুর কোন কিছু একটা সন্দেহ হওয়াতে উনি আমার সিটের পাশ থেকে নড়ছিলেন না। আমি তখন তাকে ধোঁকা দিতে হাত দিয়ে লুজ শিটের উপর তোমার লেখা চাপা দিয়ে লুজ শিটের পাশে মনে যা আসে জ্যামিতির ডায়গ্রাম আঁকছিলাম। পূর্ণেন্দুবাবুর জন্যই তো তোমাকে লুজ শিট ফেরৎ দিতে দেরি হয়েছে।

অমিত হতাশ ভঙ্গিতে তখন বলেছিল, সবই বুঝলাম- এবার অংকে আমার লেটার মার্কস পাওয়া হবে না। লুজ শিটের পাশে তোমার হিজিবিজি লেখা কেটে জমা দিয়েছি। যে কোন লোক ভাল করে দেখলে বুঝবে খাতার পাশের লেখা আর ভেতরের লেখা একজনের নয়। আমি এক্সপেলও হতে পারি। কেশব অমিতকে বরাভয় দিয়ে বলল, তুমি ভেবো না, ক্যালকাটা বোর্ডে আমার লোক আছে। সব ঠিক করে দেবে। অমিত এতে আরো ক্ষেপে লাল হয়ে উঠেছিল। বলেছিল বাটপাড়ির জায়গা পাওনা ? বোর্ডে তোমার ফিট করা

লোক আছে তাই না? কেশব রহস্যময় হাসি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিল অমিত ছেলেমানুষ, কিছু বোঝে না। পাঠকদের জানিয়ে রাখি, অমিত উচ্চমাধ্যমিকে অংকে লেটার পেয়েছিল, কেশবও অংকে পাশ করেছিল।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার পর শুধু অবসর আর অবসর। অলস দুপুর, বিকেল আর কাটতে চায় না। আমার প্রতিবেশী রবীন্দ্র চক্রবর্তী আর আমি প্রতিদিন কোনভাবে দুপুরের খাওয়া সেরে নস্যির ডিবি নিয়ে দু'জনে বসে যেতাম দাবা খেলায়। খেয়ালই থাকত না কখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল ছুঁয়ে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। পরীক্ষার যেদিন ফল প্রকাশিত হয় সেদিনও আমাদের দাবা খেলার মগ্নতা ছাড়িয়ে ফল প্রকাশের সংবাদ জানাতে হয়েছিল। ছুটে স্কুলে গিয়ে দেখি বেশ কয়েক ঘণ্টা আগেই বন্ধু-বান্ধব সবাই ফলাফল জেনে বাড়ি ফিরে গেছে।

যা বলছিলাম, পরীক্ষা দেওয়া আর ফল প্রকাশের মধ্যবর্তী সময়ে প্রায় ৬/৭ মাসের গ্যাপ। জয়নগরের মধু ভট্টাচার্য ও ভোলা ভট্টাচার্য মাসতুতো-পিসতুতো ভাই, হরিহর আত্মা। মধু বেঁটে আর ভোলা লম্বা। ওরা সমবয়সি এবং সহপাঠী। আমরা এদের লরেল-হার্ডি বলেই ডাকতাম। দু'জনেই ছিল কিচকের এক কাঠি ওপর। এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায়। মধু যাকে আমরা ২ নং মধু ডাকতাম সে আমাকে, কেশবকে এবং অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবদের যেমন নোটন, কালা (বীরচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরিতে কাজ কবত) সবাইকে বোঝাল সন্ধ্যের পর রাজবাড়ির ভেতরে যে কালীমন্দির আছে সেখানে সবাই মিলে মায়ের নামে নামকীর্তন করলে পূণ্য হবে এবং পরীক্ষার ফল ভাল হতে বাধ্য। পাপ আর পুণ্যের কথা পরে। সময়ই কাটতে চায় না। আমরা এককথায় রাজি হয়ে গেলাম। প্রতিদিন সন্ধ্যোয় সবাই মিলিত হতাম কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে। খোল-করতাল, হারমোনিয়াম সবই অন্য ভক্তদের কল্যাণে মজুত থাকত। নূতন কমবয়েসি মা-কালীর ভক্তদের দেখে বয়স্ক কালীভক্তদের উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছিল। মধু, কেশব, নোটন, কালা এরা মিলে গান ধরত—পূজা করে মায়ের চরণ, মাথায় তুলে রাখবি, মাথায় তুলে রাখবি। কেশবের গলা সুরেলা ছিল। সঙ্গে দোহার কাজ মধু, নোটন, কালা ভালই দিতে পারত। প্রতিদিন সন্ধ্যায় কালীবাড়িতে কীর্তনের আসর, মাতৃবন্দনার আসর জমজমাট হয়ে উঠতে লাগল। প্রচার পেয়ে লোক সমাগমও বাড়তে লাগল। প্রকৃত ভক্তরা চোখবুঁজে নিবিষ্ট মনে মাতৃবন্দনা শুনতে শুনতে আনন্দস্রোতে ভাসতেন।

আমাদের দু'একজনের নজর ছিল মন্দিরের পূজারির থাকার ঘরটিতে। সেখানে প্রতিদিন ভক্তদের দেওয়া কলা, পেপে, আম ইত্যাদি ফল পূজারি নিয়ে জমা রাখতেন। কীর্তন চলার সময় সংগৃহীত ফলের একটা মোটা অংশই আমরা সবার অগোচরে সরিয়ে রাখতাম। এছাড়া কেশবের, মধুর শ্যামাসংগীত শুনে অনেক ভক্তই কালীবাড়ি আসার সময় আমাদের যাতে মাতৃভক্তি প্রগাঢ় হয়, অটুট থাকে তার জন্য এটা সেটা হাতে করে নিয়ে আসতেন। মাতৃবন্দনা শেষে আমরা দল বেঁধে কালীমন্দির থেকে বেরিয়ে ভক্তদের কাছ থেকে পাওয়া ফল এবং পূজারির ঘর থেকে চুরি করা ফল ভাগ বাঁটোয়ারা করে খেয়ে নিতাম। কিন্তু উঠতি বয়সের ১০/১২ জন ছেলের এত অল্প ফলাহারে কি আর ক্ষুধা নিবৃত্ত হয় নাকি !

একদিন কেশব এসে জানাল, গত কয়েকটি অমাবস্যায় গভীর রাতে সে বটতলা

শ্মশানে গিয়ে একজন তন্ত্রসাধকের দেখা পেয়েছে। যার শরীর থেকে অন্ধকারের মধ্যেও দ্যুতি বেরুচ্ছিল। অনেক পরিশ্রম করে সে তাঁর দীপ্যমান, শারীরিক সৌন্দর্য্যের অজানা রহস্য উদ্ধার করতে পেরেছে। আমরা সবাই মামা কেশবকে ছেঁকে ধরলাম—অজানা রহস্য খোলসা করে বলার জন্য। মামা যেটা বলল তার মর্মার্থ হল, প্রতিদিন সন্ধ্যের পর তিন/চার ছিলিম গাঁজা খেয়ে তারপর সবরী কলা, দুধ বা ছানা পর্যাপ্ত পরিমাণে খেতে পারলে আমাদের সকলেরই এমনিতর নধরকান্তি, দ্যুতি বিচ্ছুরিত অবয়ব হওয়া সম্ভব। আমরা সবাই ঘটনাটা মোটামোটি বিশ্বাস করলাম। প্রথমত, বয়সটাই ছিল বিশ্বাস করার বয়স। দ্বিতীয়ত, আমাদেব স্কুলে আমাদের সঙ্গেই পড়ত স্বপন ভদ্র নামে একটি ছেলে যে নাকি প্রেমে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যা করবে ঠিক করে ফেলেছিল। কিন্তু কেশব মহাশ্মশান থেকে অমাবস্যার রাত্রিরে তাকে তাবিজ এনে দিয়ে প্রেমে বিজয়ী করে দেবে আশ্বাস দিয়ে আত্মহত্যা করা থেকে নিবৃত্ত করেছিল। স্বপন তখনও কেশবের পেছনে ঘুরছিল, কেননা কেশব তার প্রেমিকার কাপড়েব আঁচলের সুতা, দু'চারখানি চুলের গুচ্ছ ইত্যাদি কিসব সংগ্রহের দায়িত্ব তাকে দিয়েছিল। কিন্তু বেশ কয়েকদিন প্রেমিকার ভাড়াবাড়ির উঠোনে হানা দিয়ে রোদে শুকোতে দেওয়া কাপড়েব আঁচল কেটে এনেও মামা কেশবের মন তখনও সে জোগাতে পারেনি। সে যাহোক, কেশব অমাবস্যায শ্মশানে যায়—যেতে পারে এটাই আমাদেব বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল। আমরা তখন কোথায় পাব গাঁজা আর গাঁজা খাওয়ার ছিলিম। সূর্য চৌমুহনির বেশ কয়েকটি দোকানে সিগারেটের মধ্যে ঢুকিয়ে গাঁজা বিক্রি করত। সেগুলোই পয়সা দিয়ে কিনতে শুরু করলাম। এই পর্যায়ে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল উমাকান্ত স্কুলের আমাদের আরেক সহপাঠী কেব চৌমুহনি এলাকার ভবরঞ্জন ডাক্তাবের বাড়ির উল্টোদিকের গলিতে বসবাসকারী চন্দন চক্রবর্তী। তার গলার স্বর ছিল সবচেয়ে মিষ্টি ও সুরেলা। তাকে পেয়ে আমাদের কীর্তনের টিম আবও চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল।

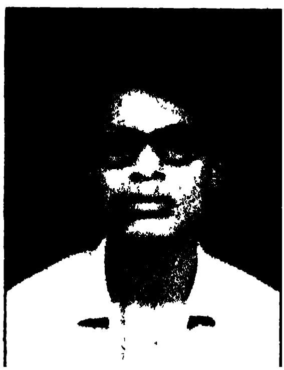
প্রতিদিন কালীবাড়িতে কীর্তন সেরে বেরিয়ে ফলমূল সংগ্রহ যা হোত গাঁজায় টান দিয়ে খেয়েই চলে যেতাম হরিগঙ্গা বসাক রোড। রূপছায়া সিনেমা হলের উল্টোদিকের গলিতে ছিল চণ্ডী হাওয়ালের মিষ্টির দোকান। উঁচু চৌকির ওপর আলমারিতে বা মিট্‌সেফে রাখা থাকত মিষ্টি আর চৌকির নীচে কড়াইতে থাকত রসগোল্লা, লালমোহন ইত্যাদি। ক্যাশ পাহাড়া দিত পৌঢ় চণ্ডী হাওয়াল ও তার যুবতি কমবয়েসি সুন্দরী স্ত্রী। আমরা দোকানে ঢুকলেই চণ্ডী হাওয়াল তার যুবতি স্ত্রীকে ভেতরের ঘরে পাঠিয়ে দিত। এতে সুবিধা হয়ে যেত আমাদের। আমরা সবাই চণ্ডী হাওয়ালকে ক্যাশবাক্স-সহ ঘিরে দাঁড়াতাম। নানা ধরনের প্রসঙ্গ তুলে হৈ চৈ করতাম। এই ফাঁকে মধু, চন্দন, নোটন ঢুকে যেত চৌকির নীচে। এরা বিশেষ ধরনের জামা-প্যান্ট পরে আসত। যার পকেট থাকত অনেকগুলি। এরা রসগোল্লা-লালমোহনের রস যথাসম্ভব চিপে বিভিন্ন পকেটে ঢুকিয়ে নিয়ে যখন চৌকির তল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে যেত তখনই আমরা চণ্ডী হাওয়ালকে কার্যত ঘেরাও মুক্ত করতাম। তারপর সেই চোরাই রসগোল্লা, লালমোহন পোস্ট অফিস চৌমুহনির বৃত্তাকার বেষ্টনির মধ্যে বসে খেতাম।

কেশবের তথাকথিত তান্ত্রিক সাধকের প্রেসক্রিপশন মত মাস তিন-চারেক নধরকান্তি শরীর গড়ে তোলার চেষ্টা করে আমরা সবাই রণে ভঙ্গ দিয়েছিলাম কারণ

কারোরই কোন শারীরিক উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছিল না বলে। তাছাড়া চণ্ডী হাওয়ালকে আর ধোঁকা দেওয়া যাচ্ছিল না। আমাদের তার দোকানে যাওয়ার সময় হলেই সে ক্যাশ বাক্স ছেড়ে স্ত্রীকে ক্যাশ বাক্সে বসিয়ে হাঁটাহাঁটি শুরু করত দোকানের ভেতর। আস্তে আস্তে আমাদের মাতৃবন্দনায়ও ভাঁটার টান দেখা দিয়েছিল।

এম.বি.বি কলেজের ছাত্রসংসদের সাধারণ নির্বাচন বানচাল হয়েছিল ১৯৬৮ সালে। সেবার সাধারণ সম্পাদক পদে ও ভি.পি পদে ছাত্র ফেডারেশন থেকে দাঁড়িয়েছিল যথাক্রমে সুজিত দত্ত ও বিশ্ববন্ধু মজুমদার। এন.এস.ইউ.আই-এর তরফে দাঁড়িয়েছিল যথাক্রমে বিকচ চৌধুরী ও তপন বর্মন। নির্বাচনের দিন সকাল বেলাই কমার্সের ছাত্ররা ভোট দিয়ে দেয়। দুপুরের পর বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্ররা বাসে করে কলেজে ভোট দিতে এলে তাদের ভোট দিতে দেয়া হয়নি। তাই নিয়ে বাঁধে গণ্ডগোল এবং শেষ পর্যন্ত ছাত্রসংসদ নির্বাচন বাতিল হয়ে যায়। সেবারের নির্বাচন ছিল খুব উত্তেজনাপূর্ণ। নির্বাচনের আগে কলেজে পোস্টারিং করার সময় ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী সুজিত দত্ত এবং অন্য কোন একটা পদে প্রার্থী সিদ্ধার্থ দত্ত, এদের কের চৌমুহনির একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে নিয়ে আটকে রাখে এন.এস.ইউ.আই'র ভি.পি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতারত তপন বর্মন। ছাত্র ফেডারেশনের তখনকার সবচেয়ে সক্রিয় এবং গুরুত্বপূর্ণ নেতা প্রবীর সিন্‌হা আমাদের কাছে সুজিত দত্ত ও সিদ্ধার্থ দত্তকে অপহরণের বিষয়ে খবর পাঠান। তপন বর্মনকে এ কাজে সহায়তা করেছিল মঠ চৌমুহনি ফ্লাওয়ার্স ক্লাবের শ্যামল ভৌমিক। তখন আমি শ্যামলের বড়ভাই অমল ভৌমিক, বিমল সিন্‌হা, নোটন এদের সকলকে নিয়ে ছুটে যাই এবং সুজিতদা ও সিদ্ধার্থকে মুক্ত করে আনি। সে বছর মানিক সরকার, বিজয় সিংহরায় এরা আগেই নির্বাচনে শ্রেণি প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিল। পরে অধ্যক্ষ শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মানিক সরকারের নেতৃত্বে যারা শ্রেণি প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিল তাদের নিয়ে একটি মনোনীত কমিটি গড়ে দেন। সেই কমিটি ১৯৬৮ সনে ছাত্রসংসদের দায়িত্ব পালন করেছিল। সেই কমিটিতে সম্ভবত ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকার সম্পাদক সমীরণ রায়, সুব্রত দেব এরা সবাই ছিল।

ছাত্রসংসদ নির্বাচন বাতিল হয়ে যাওয়ার পর, যুদ্ধ অবসানে যখন আমরা সবাই ক্লান্ত তখন গিয়ে দেখি ভয়ে কলেজ ক্যান্টিনের ঝাঁপ বন্ধ করে ক্যান্টিনের মালিক অনেক আগেই বাড়ি চলে গিয়েছেন। খবর নিয়ে জানলাম, গান্ধী স্কুলের সামনে এবং শিবনগর যেখানে কলেজ লেক শুরু হয় সেই মোড়ের চায়ের দোকানের স্টলগুলিও ভয়ে অনেক আগেই ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়েছে। একটু চা খাওয়ার জন্য সবাই হাঁস-ফাঁস করছি। সুভাষ চক্রবর্তী (হো-চি-মিন) বলল, ১নং কলেজ হোস্টেলে চল, তোদের চা খাওয়াব। জিজ্ঞেস করলাম—কার রুমে? বলল, গৌতম দাসের রুমে, ওর এখানে চায়ের সরঞ্জাম, রান্নার স্টোভ সব আছে। আমি চা করে দেব। গৌতম,



সুভাষ (হো-চি-মিন)

সুভাষ দু'জনেই সদ্য বাংলাদেশ থেকে এসেছে। এদের মধ্যে আগে থেকেই একটা সহজ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। পরিশ্রমে আমার শরীরও তখন একটু জিরোতে চাইছিল। বললাম, চল। ১নং কলেজ হোস্টেলে গিয়ে দেখি, গৌতম একটি কম্বল বুকের ওপর দিয়ে খাটে শুয়ে আছে। জিজ্ঞাসায় জানলাম, কলেজের এতসব ঝামেলার কথা ও কিছুই জানে না। সে সকালেই ভোট দিয়ে হোস্টেলে ফিরে এসেছে। সব শুনে হো-চি-মিন গেল ক্ষেপে। সুভাষ সাধারণত পায়জামা-পাঞ্জাবি পরত। বাতাসে ওর কয়েকগাছা অবিন্যস্ত দাড়ি উড়ন্ত অবস্থায় থাকত। ক্ষেপে গেলে সেই দাড়ি নট নড়ন-চড়ন হয়ে নীচে ঝুলে থাকত। দেখলাম ওর দাড়ি ঝুলে পড়েছে। সে গৌতমকে বলল, তোমার জানালা দিয়ে বিপ্লব তোমার ঘরে ঢুকে পড়লে তুমি বিপ্লবকে কম্বল চাপা দিয়ে ধরে রেখ। আমরা যাচ্ছি। চা না তৈরি করেই সুভাষ হনহন করে গৌতমের রুম থেকে বেরিয়ে এল। আমি তাকে অনুসরণ করলাম।

১৯৬৯ সনে ছাত্রসংসদের নির্বাচনে মানিক সরকার সাধারণ সম্পাদক পদে, বর্তমান কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায় সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে ত্রিপুরা রাজ্য ছাত্র ফেডারেশনের প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হন। ভি.পি পদে এনএস.ইউ.আই প্রার্থী আইনজীবী পীযূষ কান্তি বিশ্বাস নির্বাচিত হন। যতদূর মনে পড়ে, বর্তমানে ত্রিপুরা আরক্ষা দপ্তরের ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ শ্রী অমিতাভ কর নকশালপন্থীদের প্যানেলে ছাত্রসংসদের মুখপত্র 'প্রাচী'-র সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিল। অধ্যাপক মিহির দেব ছিলেন 'প্রাচী'র ব্যাপারে ছাত্রসংসদের প্রেসিডেন্ট তথা কলেজের অধ্যক্ষ সুশান্ত চৌধুরীর প্রতিনিধি হিসাবে প্রধান উপদেষ্টা। সেবারই প্রথম 'প্রাচী'র প্রচ্ছদে মাও-সে-তুঙ-এর ছবি ছাপা হয়েছিল। ভেতরের পাতায় মার্কস, লেনিনের ওপর ছবিসহ নিবন্ধ ছাপা হয়েছিল। অধ্যাপক মিহির দেব কোন আপত্তি তোলেননি। তাঁর বক্তব্য ছিল, ছাত্রসংসদের নীতিগত সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করার এক্তিয়ার আমার নেই। টেকনিক্যাল কোন ত্রুটি আছে কিনা সেটা দেখার দায়িত্ব আমার। সেবারে ছাত্রসংসদের তরফে প্রকাশিত 'প্রাচী' নিয়ে আমরা যথেষ্ট গর্ববোধ করেছিলাম। বিজয়ের একটা ধাপ ভেবে নিয়েছিলাম এই ছোট একটি ঘটনা। তখন কত অল্পতেই না সন্তুষ্ট হয়ে যেতাম।

আগেও একবার বলেছিলাম, ১৯৬৯ সন হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে ছাত্র-আন্দোলনে সঠিক দিশায় চলার একটি মাইলস্টোন। সে বছর কল্যাণপুর উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক সতীন্দ্র গুপ্তের অপসারণের দাবিতে সেই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা আন্দোলনে নামে। অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট শুরু হয়। এই স্বেচ্ছাচারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন তৎকালিন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের একান্ত অনুগত ও স্নেহধন্য। কল্যাণপুর এলাকার ডাকসাইটে কংগ্রেস নেতা ধনঞ্জয় সিংহের পেটোয়া লোক। ধনঞ্জয় সিংহের মেয়েকে পরীক্ষার ৭ মাস পর অন্যায়ভাবে পাশ করিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রীরা আন্দোলন শুরু করেছিল। প্রধান শিক্ষককে অনৈতিকভাবে প্রশাসনিক শক্তি জুগিয়েছিলেন ধনঞ্জয় সিং যাতে ছাত্রদের আন্দোলন পুলিশি জুলুম দিয়ে স্তব্ধ করে দেওয়া যায়। ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি মানতে সরকার কোনভাবেই রাজি নয়। আন্দোলনকারী ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের দাবি আদায়ে স্থির প্রতিজ্ঞ ও অনমনীয়। ত্রিপুরা রাজ্য ছাত্র ফেডারেশন কল্যাণপুর স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলনকে সমর্থন জানায়। ক্রমে সারা ত্রিপুরায় এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। কল্যাণপুরের ছাত্র-

ছাত্রীদের আন্দোলনের প্রতি সারা ত্রিপুরার ছাত্রসমাজের সহমর্মিতা আদায়ের ক্ষেত্রে ছোট্ট একটি প্রেক্ষাপট আছে। কল্যাণপুর স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অনির্দিষ্টকাল ধর্মঘট ও স্কুলের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় ছাত্র ফেডারেশনের তরফে আমাকে এবং বাদলদাকে কল্যাণপুর পাঠানো হয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। বিশু আগে থেকেই কল্যাণপুর গিয়ে তার আত্মীয়ের বাড়ি ঘাঁটি গেড়েছিল। একদিন দুপুরে ছাত্র-ছাত্রীদের বিক্ষোভ মিছিল স্কুলে যাওয়ার আগেই কল্যাণপুর বাজারে পুলিশ আটকে দেয়। ছাত্র-ছাত্রীরা রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। এমন সময় কর্তব্যরত পুলিশের পেটে পড়ে একটি মোক্ষম ছাতার গুঁতো। পুলিশ অফিসারটি হুমড়ি খেয়ে পড়ে অন্য আরেকজন পুলিশ কর্মীর উপর। এরপরই শুরু হয় ছাত্র-ছাত্রীদের উপর বেধড়ক লাঠিচার্জ। অনেক ছাত্র-ছাত্রী সেদিন পুলিশের লাঠিচার্জে আহত হয়েছিলেন। এ ঘটনার পরই সারা রাজ্যে কল্যাণপুর ছাত্র-আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশের পেটে ছাতির মোক্ষম গুঁতোটি দিয়েছিল আর কেউ নয়, স্বয়ং বাদল চৌধুরী, বর্তমান রাজ্য বামফ্রন্ট সরকারের অর্থমন্ত্রী। অনেকদিন আন্দোলন চলার পর সরকার আন্দোলনকারীদের চাপের কাছে মাথা নত করে কল্যাণপুর স্কুল থেকে প্রধান শিক্ষক সতীন্দ্র গুপ্ত-কে অপসারণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

কল্যাণপুর ছাত্র আন্দোলন চলাকালীন একটা সময়ে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার ও আমাকে পার্টির নির্দেশে ৫/৬ দিনের জন্য আত্মগোপন করতে হয়েছিল। আহা! এমন সুখকর আত্মগোপনে যদি আরো ২/১ বার জীবনে যেতে পারতাম। সি.পি.আই(এম) দলের রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ শ্রীমতী ইলা ভট্টাচার্যের বাড়িতে একটা ঘরে আমি আর মানিক আত্মগোপন করেছিলাম। ইলা মাসীমা নিজের হাতে রান্না করে কত রকম সুস্বাদু খাওয়ার তৈরি করে যে আমাদের খাইয়েছেন সে কথা উল্লেখ না করলে কৃতঘ্নতার দায়ে দোষী হব। যে ঘরটাতে আমাদের থাকতে দেওয়া হয়েছিল সেই ঘরটিতে সম্ভবত ইলা মাসীমা এদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া খুকু দিদিমণি ও ওনাব মেয়ে শক্তি ভট্টাচার্যকে নিয়ে তখন থাকতেন। আমাদের প্রয়োজনে তাদের কয়েকদিনের জন্য ঘব ত্যাগ করতে হয়েছিল। খুকু দিদিমণি সরকারি হাসপাতালে নার্স হিসাবে কাজ করতেন বলে মনে পড়ছে। যে ঘরে আমরা ছিলাম সে ঘরে বাঁশের বিমের উপর বাঁশের দরমা দেওয়া কাড় ছিল। সেই বাঁশের বিমের মধ্যে ঝোলানো ছিল সবরী কলার একটি ছড়ি চুন লাগানো। কলাতে চুন লাগানো হয়েছিল যাতে তাড়াতাড়ি পেকে ওঠে। কোন কাজ নেই। খাওয়া-দাওয়া, পত্রিকা পড়া বা কোন গল্পের বইয়ের পাতা উল্টিয়ে সময় কাটাতাম। বেশি জোরে আমরা কথাও বলতে পারি না। পাছে না আশেপাশের বাড়িঘরের লোক টের পেয়ে যায়। বাকি সময় চিৎ হয়ে ঘুম আসুক না আসুক বিছানায় পড়ে থাকা। আমার অবশ্য ঘুম আসার ক্ষেত্রে কোন সময়-অসময় ছিল না। না চাইতেও সবসময় ঘুম চলে আসত। কিন্তু বিপত্তি সাধল ঐ কলার ছড়ি। চিৎ হয়ে বিছানায় পড়লেই মোটা মোটা সবরী কলা হাতছানি দিয়ে ডাকত। আর ডাক শুনতে পেলেই মনে হত একটু ক্ষিদে-ক্ষিদে ভাব হয়েছে। আমি তো একটা-দুটো করে সকাল-সন্ধ্যে মিলিয়ে কলা খেতে খেতে গোটা ছড়িটাই সাবাড় করে দিলাম। ইলা মাসীমা বা তাঁর বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা সম্ভবত আস্তে আস্তে কলার ছড়ি নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে দেখে খুশিই হয়েছিলেন অতিথি সৎকারে কাজে লাগছে ভেবে। যে কারণে কলার ছড়িটি

নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে দেখেও স্থানান্তর করেননি। মানিক একটি কলাও খেয়েছে বলে আমার মনে পড়ছে না। সে বোধহয় ভাবছিল আশ্রয়দাতা গৃহস্থ কমরেডের বাড়ির কলা এভাবে না বলে-কয়ে খেয়ে নিলে ঘোরতর অন্যায় কাজ হবে। আমাদের যে গ্রুপটি সারা দিন-রাত একসাথে চলতাম আমাদের আবার ভালো-মন্দের ধ্যান ধারণাটা ছিল অভিনব ধরনের। ক্ষিদে পেয়েছে সুতরাং সহযোদ্ধার বাড়ির কলা খাবো না তো কার বাড়ির খাব—এ ধরনের বোধ আমাদের মধ্যে কাজ করত।

১৯৬৯ সনে আমাদের ত্রিপুরা ছাত্র ফেডারেশনের অন্যতম সহযোদ্ধা মনোরঞ্জন পাল রানীরবাজার স্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে নৈশ কলেজে ভর্তি হয়। তখন সে ও বিজন ধর কল্যাণিতে ক্ষীরগোপাল দে এদের বাড়িতে ঘরভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করে। এই ক্ষীরগোপাল দে-ই ১৯৭১ সনে এম.বি.বি কলেজে শহিদ হয়। মনোরঞ্জন-বিজন ধর ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত কল্যাণি এলাকায় ছিল। পরে বর্তমানে রাজ্য সরকারের মন্ত্রী মানিক দে ও তার বড় ভাই দীপক দে এসে তাদের মেসে যোগ দিলে এরা সবাই ১৯৭২ সনে শিবনগর অন্য একটি ভাড়াবাড়িতে চলে যায়। মনোরঞ্জন পাল আমাদের মধ্যে সবচেয়ে আগে বিয়ে করে ১৯৭৩ সনে। মনোরঞ্জনের সহধর্মিনী রানীরবাজার স্কুলেরই ছাত্রী ছিলেন। এদের প্রণয় ১৯৬৪-৬৫ সন থেকেই। মনোরঞ্জন যখন কলেজে পড়াশোনা করে তখন তার পিতা-মাতা থাকতেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। ১৯৬৯ সনের শেষের দিকে মনোরঞ্জনের বাবা সীমান্ত অতিক্রম করে ছেলেকে দেখতে আগরতলা আসেন। মনোরঞ্জন কল্যাণির মেসে তার বাবার সঙ্গে হবু সহধর্মিনীর পরিচয় করে দেয়। মনোরঞ্জনের পিতা সেকেলে মানুষ। ছেলেকে নিজের পছন্দমত বিয়ে দেওয়ার বাসনা মনে মনে পোষণ করতেন। ছেলেকে বললেন, বাবা মেয়ে আমার পছন্দ হয়নি। তুই পূর্ব পাকিস্তান চল, অনেক সুন্দর পুত্রবধূ আমি তোর জন্য দেখে রেখেছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা ভাল মনোরঞ্জনের হবু সহধর্মিনী মনোরঞ্জনের মতই দেখতে কালো ছিল। মনোরঞ্জন তার পিতাকে উত্তরে বলেছিল, বাবা আপনি যদি আমার চোখ দিয়ে দেখতেন, তবে বুঝতে পারতেন বিশ্বে আপনার হবু বৌমার মত সুন্দরী দ্বিতীয়টি আর নেই। আমাদের চোখে তখন মনোরঞ্জন পাল হিরো। প্রথমত, এত কম বয়সে প্রেম করার মত হিম্মত মুখের কথা নাকি। দ্বিতীয়ত, নিজের মনের মাধুরীকে এত অকপটে বুক ফুলিয়ে পিতার সামনে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। আমি তো মনোরঞ্জনের ফ্যান বনে গেলাম মনে মনে। মনোরঞ্জন বিড়িতে একটা সুখটান দিয়ে তোতলাতে-তোতলাতে বলত—গোঁসাই, শুনেন। তখন মনে হত ও আমাদের সমবয়সী বন্ধু নয়। আমাদের ফিলোসফার, গাইড। প্রায়ই মনোরঞ্জন আমার শারীরিক কুশল জানার জন্য পত্রিকা দপ্তরে আসে। প্রশান্তির এক শীতল হাওয়ায় আমার বুক জুড়িয়ে দিয়ে যায়। মনোরঞ্জনের তোতলামি এখনও রয়ে গেছে। পঞ্চায়েত সচিব পদে দীর্ঘদিন কাজ করে সম্প্রতি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছে। শিবনগর, কলেজ রোডে বাড়ি করেছে। ওর ছেলে কল্যাণিতে মোবাইল সেটের যাবতীয় সরঞ্জামের দোকান দিয়েছে। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ভরপুর সংসারী হলেও বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে এখনও ওর নাড়ির টান রয়ে গেছে। মনোরঞ্জনের বিয়েতে আমি যোগদান করতে পারিনি ১৯৭৩ সনে। কেননা, তার কিছুদিন আগে আমি আইন পড়ব বলে কোলকাতা চলে গিয়েছিলাম।

আরো দুই সহযোদ্ধার বিয়ের কথা বলার জন্য লাফ দিয়ে একটু সামনে এগিয়ে যাচ্ছি। খুব সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের আপ্ত সহায়ক কার্তিক দেবনাথ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন। কার্তিক কৈলাসহরের ছেলে। ১৯৭৮ সনে বৈদ্যনাথদার সি.এ. হিসাবে আগরতলা এসে কাজে যোগ দেয়। কৈলাসহর পড়াশোনা চলাকালীন সময়েই সে এস.এফ.আই সংগঠন এবং সি.পি.আই (এম) দলের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল। আগরতলা এসেই ও প্রেমে পড়ে যায়। কন্যাটি কে ? আগরতলা শহরের অভিজাত ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলে এবং জাঁদরেল পুলিশ অফিসার ইন্সপেক্টর গোবিন্দ গোপাল বসাকের একমাত্র অতীব রূপসী কন্যা। বেচারা কার্তিক মনের মানুষটিকে নিয়ে একান্তে সিনেমা দেখবে তারও জো নেই। মেয়ের বাবা-কাকারা প্রভাবশালী, অতিশয় বিত্তশালী লোক—এরা বিভিন্নভাবে বাধা সৃষ্টি করে। কার্তিক এসে আমার সঙ্গে আলোচনা করে। আমি সদ্য এসে ১৯৭৮ সনে কোর্টে জয়েন করেছি। আমি ওদের রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করে নেওয়ার প্রস্তাব দিই। আনন্দে প্রস্তাব মেনে নেয় কার্তিক এবং তার হবু বধূ। আমার খেয়াল আছে কৃষ্ণনগর লেইক চৌমুহনির বাড়িতে আমার চেম্বারে শাখা সিঁদুর পরে কার্তিকের সহধর্মিনী তাদের বিয়ে রেজেস্ট্রি করতে গিয়েছিল পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক অফিসে। পরবর্তী সময়ে কার্তিকের শ্বশুর এদের বিয়ে মেনে নেয়। সুখেই আছে এরা। কার্তিকের এক মেয়ে ও এক ছেলে।

এই ঘটনার বেশ কয়েক বছর পর ১৯৮৪ সন হবে এখনকার মন্ত্রী মানিক দে এসে জানাল বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বিয়েটা করে নিতে হয়। আলোচনায় ঠিক হল স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট-এ বিয়ে রেজিস্ট্রি করা হবে। মুশকিল দেখা দিল একটা ব্যাপারে। স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টে বিয়ের আগে অন্যূন ৩০ দিন জেলাশাসক অফিসের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ্যে বিয়ের ব্যাপারে বিজ্ঞপ্তি ঝোলানো থাকে জনসাধারণের অবগতির জন্য। কারো বিয়েতে আপত্তি থাকলে জেলাশাসকের অফিসে আপত্তি দাখিলের জন্য। মানিক অনুরোধ করে বলল, নোটিশটার একটা ব্যবস্থা করতে হয়। মেয়ের বাড়িতে জানলে বিপত্তি ঘটানোর চেষ্টা করতে পারে। আমি মানিককে আশ্বস্ত করে বললাম, নিশ্চিন্ত থাক, ব্যবস্থা একটা হবে। তখন যোগেন্দ্রনগরের ফণীভূষণ দেবনাথ নামে একটি যুবক পার্টি কর্মী আমার সেরেস্তায় মুহুরি হিসাবে কাজ করছে। সে অত্যন্ত সাহসী ও ডানপিটে। তাকে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসকের নোটিশ বোর্ড থেকে মানিক দে-র বিবাহ সংক্রান্ত নোটিশ ছিঁড়ে নিয়ে আসার দায়িত্ব দিলাম। ঘণ্টাখানেক পরে দেখি জেলাশাসকের দুই পেয়াদা ফণীর পেছনে দৌড়ুতে দৌড়ুতে আদালত চত্বরে এসে হাজির। ফণী একগাদা কাগজপত্র বুকে চেপে আমার পেছনে এসে দাঁড়াল। কি ব্যাপার? মানিকের বিবাহ সংক্রান্ত নোটিশ কোনটি চিহ্নিত করতে না পেরে নোটিশ বোর্ডে যত নোটিশ ছিল সব ছিঁড়ে নিয়ে চলে এসেছে ফণী। পেছনে দৌড়তে দৌড়তে ডি.এম অফিসের পিওন। সে যাহোক, অনেক কষ্টে ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করতে সক্ষম হয়েছিলাম। সুখেই আছে কর্তা-গিন্নী। আর আমার সেই ফণী এখন ত্রিপুরা সরকারের মৎস্য দপ্তরের অধীনে সরকারি চাকরি করে। সেও স্ত্রী-পুত্র পরিবার পরিজন নিয়ে ভালই আছে। এভাবে সবাই যাতে ভালো থাকতে পারে তার জন্যই তো আমরা রাজনীতি শুরু করেছিলাম। নয় কি?

পার্টি পর্ব

১৯৬৭ সনে ৩০ সদস্যক ত্রিপুরা বিধানসভায় সি.পি আই(এম) দলের প্রতিনিধি ছিল ২ জন। বর্তমানে সদরের মজলিশপুর বিধানসভা আসনটির তখন নাম ছিল উত্তর দেবেন্দ্রনগর বিধানসভা। সেবার উত্তর দেবেন্দ্রনগর বিধানসভা থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন শ্রী অভিরাম দেববর্মা এবং খোয়াই মহকুমার কল্যাণপুর বিধানসভা আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন শ্রী বিদ্যা দেববর্মা। সি.পি আই দলের প্রার্থী হিসাবে সেবার চড়িলাম বিধানসভা আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন শ্রী অঘোর দেববর্মা।

প্রতিটি বিধানসভা অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে সি.পি আই(এম) দলের দু'জন বিধায়ককে নৃপেনদা, দশরথদা, বীরেনদা, নিয়মিত মাসখানেক ধরে বটতলা পার্টি অফিসে প্রশিক্ষণ দিয়ে বিধানসভায় পাঠাতেন। অভিরামদা, বিদ্যাদা নৃপেনদাকে যমের মত ভয় পেতেন। বিশেষত বিধানসভায় কোন একটা ভুল করে ফেললে নৃপেনদার মুখোমুখি হতে চাইতেন না ভয়ে। ১৯৭০ সন। সকাল তখন ১০-১০.৩০ মি. হবে বটতলা পার্টি অফিসের নীচে 'অমৃতায়ণ' মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে বসে চা আর সিগারেট খাচ্ছিলেন অভিরামদা। আসলে পার্টি অফিস থেকে কেউ নামে কিনা লক্ষ্য করছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল নৃপেনদা পার্টি অফিসে আছে কিনা খবর নেওয়া। ঠিক এমন সময়ে পার্টি অফিস থেকে নেমে আমি আর বিজয় সিংহরায় 'অমৃতায়ণ'-এ গিয়ে ঢুকেছি চা খাওয়ার জন্য। অভিরামদা জিজ্ঞেস করলেন, ধীরাজ, নৃপেনদা পার্টি অফিসে আছেন? আমি বিজয়ের সঙ্গে চোখাচোখি করে বলে দিলাম— না, দেখিনি তো। অভিরামদা তাড়াহুড়ো করে সিট ছেড়ে উঠে সিগারেট ধরিয়ে পার্টি অফিসে গিয়ে ঢুকলেন। নৃপেনদার বোধহয় বলা ছিল, অভিরামদা পার্টি



বিশু ও বিদ্যা দেববর্মা

অফিসে ঢুকলে নৃপেনদাকে খবর দেওয়ার জন্য। যেইমাত্র অভিরামদা পার্টি অফিসের বারান্দায় উঠেছেন, নৃপেনদা তাঁর ঘর থেকে হাঁক দিয়ে বললেন, অভিরাম এসেছ ? আমার ঘরে এসো। অভিরামদা বলে উঠলেন—'খাইছে'। তাড়াতাড়ি সিগারেট নিভিয়ে নৃপেনদার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। মিনিট দশেক পরে চা খেয়ে আমি আর বিজয় পার্টি অফিসে ঢুকে শুনি নৃপেনদার ঘরে বজ্রপাত হচ্ছে। আধঘন্টা পরে অভিরামদা নৃপেনদার ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় আমার আর বিজয়ের দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে পার্টি অফিস থেকে বেরিয়ে গেলেন। বুঝলাম, আমাদের উপর ক্ষেপে গেছেন মিথ্যে কথা বলাব জন্য।

এই ঘটনার মাস দুয়েক পরে এক ঘটনা ঘটল। মধু ভট্টাচার্য (২ নং), ভোলাসহ হরিগঙ্গা বসাক রোডে 'ঘোষ কেবিন' যেখানে আমরা আড্ডা মারতাম সেখানে এল। ঘোষ কেবিনের ছাতে তখন আমি, অরবিন্দ ভট্টাচার্য, সুভাষ চক্রবর্তী (হো-চি-মিন), বিশু, বিজয়, কেশব, শঙ্করদা আরো বেশ কয়েকজন আড্ডা মারছিলাম। মধু এসে আমাকে বলল—গোঁসাই এই জীবন আর আমার রাখার ইচ্ছে নেই। আমরা সবাই বললাম কেন? মধু বলল, জয়নগর বাড়ি থেকে আসার সময় আখাউড়া রোডে বর্দ্ধনের বাড়ির সামনে যে ভেড়াটা রাস্তায় শুয়ে থাকে সে আমাকে দেখলে হাসে। আমি বললাম, ভেড়া আপনাকে দেখলে হাসে? ভোলা মধুর সারেঙ্গি হিসাবে বলল, হ্যাঁ ঠিকই হাসে। আমরা সবাই ব্যাপারটা কি বোঝার জন্য মুখ চাওয়া-চাওয়া করছি। মধু বলল, হাসবে না? ভেড়া বলে—তোরা কেমনতর মরদ, এতদিন রাস্তার পাশে শুয়ে আছি আমার একটা গতি করতে পারিস না? আমি বললাম, মধু তোমার জীবন আত্মাহুতির প্রয়োজন নেই। সপ্তাহখানেকের মধ্যে ভেড়ার সদ্‌গতি করছি।

আমি যোগাযোগ করলাম মানিক দে-র সঙ্গে। মানিক ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে পার্টিগতভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। সে মোটরস্ট্যান্ড, মোটর কর্মীসমিতির কেন্দ্রীয় অফিসে নিয়মিত যাঁতায়াত করত। ত্রিপুরা মোটর কর্মী সমিতি তখন আই.এন.টি.ইউ.সি দ্বারা পরিচালিত হত। মানিক, বিশু সাহা, বিভু রায়-সহ আরো অনেকের সম্মিলিত শ্রমে পরবর্তী সময়ে গড়ে ওঠে সি.আই.টি.ইউ অনুমোদিত ত্রিপুরা মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন। মানিককে গিয়ে সব ঘটনা জানিয়ে বললাম, একটি ট্রেলারসহ জীপ চাই আগামী রোববার সন্ধ্যের সময়। তাছাড়া মানিককে দায়িত্ব দিলাম চম্পকনগর হাওড়া নদীর অপর পাড়ে বলরামঠাকুর পাড়া উপজাতি পল্লি



অভিরাম দেববর্মা

যেখানে পার্টির প্রভাব অপরিসীম সেখানে যোগাযোগ করতে যাতে সন্ধ্যের পর ভেড়া নিয়ে গেলে কেটে রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করা যায়। আমাদের পরিকল্পনার খবর কেশব পেয়ে গেল। আমাদের বলল, এত বড় ভেড়া সহজে কব্জা করা যাবে না। ভেড়ার কানে সর্ষে গুঁজে দিতে পারলে ঘুমিয়ে পড়বে। তখন গাড়িতে তুলতে সুবিধে হবে। কেশবের কথামত সর্ষে পকেটে নিয়ে রোববার সন্ধ্যায় জীপসহ গিয়ে হাজির হলাম। আখাউড়া রোডে বর্দ্ধনের বাড়ির সামনে। বিরাট দোতালা বাড়ি। বর্দ্ধনবাবুর তখন বটতলা মদের পাট্টা, মদ মানে দেশি মদের পাইকারি দোকান। আগেই অবশ্য সন্ধ্যের পর ২/৩ দিন লোকেশান জরিপ করে এসেছিলাম। সেদিন গিয়ে দেখি ভেড়া নিশ্চিন্তে পীচের রাস্তার পাশে ঘুমোচ্ছে। কেশবের কথামত আস্তে আস্তে পা টিপে-টিপে ভেড়ার পাশে গিয়ে দিলাম কানে গুঁজে সর্ষে। ভেড়া আমাকে এক গুঁতো দিয়ে হাত দশেক দূরে ফেলে দিল। দুই মধু, ভোলা, আমি, কেশব, অরবিন্দ, রুপু দেববর্মা (দশরথদার ছেলে) প্রয়াত পীযূষ দাশগুপ্ত ও আরো বেশ কয়েকজনে মিলে ভেড়াটি জাপটে ধরে অনেক কষ্টে জিপের ট্রেলারে তুললাম। ভেড়ার চিৎকারে বর্দ্ধনবাড়ির দোতালার জানালা খুলে মেয়েরা উঁকি দিয়ে জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিতে সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ দেখল তাদের পালিত ভেড়া ষণ্ডা-গুণ্ডা মার্কা দশ-বারোজন জিপে করে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। আরম্ভ হল মেয়েলি 'চোর-চোর' তারস্বরে চিৎকার। প্রাণপণে জিপ ছুটিয়ে আমরা মটরস্ট্যান্ড গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে বিশু, শঙ্করদা, বিজয়, হারাধন সংঘ ক্লাব এলাকার দিলীপ দে, নির্মল মোদক, সুভাষ এরা মশলা কিনে অপেক্ষা করছিল। ওদের জিপে তুলে সোজা চলে গেলাম চম্পকনগর। তখন রাস্তাঘাট এত মসৃণ ছিল না। গিয়ে পৌঁছতে পৌঁছতে রাত্রি ৮-৩০ মি. / ৯টা বেজে গেল। অভিরামদা পার্টি অফিস থেকে বাড়ি যেতে গিয়ে আমাদের দেখে ফেলে চম্পকনগর বাজারে ইতস্তত ঘোরাঘুরি করছিলেন। তিনি জিপে ভেড়া দেখে ঠিক বুঝে ফেলেন চোরাই মাল। আমাকে বললেন, তোরা চোর। পার্টির মুখে কালি মাখবি। কালই নৃপেনদাকে সব বলে দেব। আমি আর বিজয় বললাম, খিদে পেয়েছে। পাউরুটি, কলা, চা খাওয়ান সকলকে। তারপর নৃপেনদাকে কেন পার্টির সব নেতাদের জানান, আপত্তি নেই। অভিরামদা আমাদের সকলকে চা-কলা-পাউরুটি খাওয়ালেন। পরে অবশ্য তিনি নৃপেনদাকে কিছু জানাননি। রাত্রি দশটা নাগাদ নদীর জল ভেঙে ভেড়া নিয়ে বলরামঠাকুর পাড়া পার্টি কমরেডদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলাম। ভেড়া কেটে, রান্না-বান্না করে খেতে খেতে প্রায় ভোর হয়ে গিয়েছিল। এত বড় ভেড়া ছিল যে, আমরা যে ১৪/১৫ জন গিয়েছিলাম এরা সহ গোটা বলরামঠাকুর পাড়া গ্রামের মানুষ সেদিন ভেড়ার মাংস খেয়েছিল। উপজাতি এলাকায় দেশি মদ সাবালক পুরুষরা শুধু নয় মহিলাদের মধ্যেও অনেকে পান করত। কোন অতিথি গেলে তাকে মদ দিয়ে আপ্যায়ণ করাটা ছিল উপজাতি সমাজের রেওয়াজ। আমাদেরও সেদিন উপজাতি সহযোদ্ধারা মদ দিয়ে আপ্যায়ণ করেছিল। লম্বা মধু ছাড়া অন্য কেউ সেই আপ্যায়ণ ফিরিয়ে দিয়েছিল কিনা আমার মনে নেই। অন্তত আমি দিইনি সেটা স্পষ্টই মনে আছে।

সম্ভবত ১৯৭১ সন। পার্টির রাজ্য সম্মেলন হয়েছিল খোয়াই-এর রামচন্দ্রঘাট এলাকায়। প্রত্যন্ত গ্রামে রাজ্য সম্মেলনের স্থান নির্বাচন করা হয়েছিল। শঙ্করদা, ফুলনদি অর্থাৎ বর্তমানে শঙ্কর দাশ জায়া ফুলন ভট্টাচার্য, রীনা সেনগুপ্তা এরা সাংস্কৃতিক টিমের

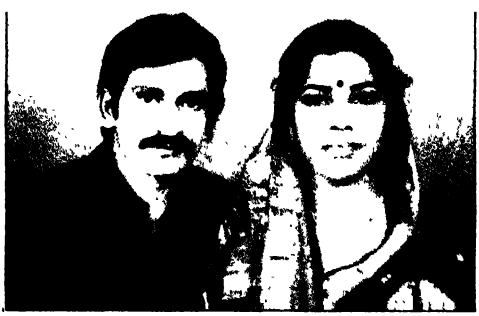


জ্যোতি বসু, শংকরদা ও ফুলনদি

সদস্য হয়ে হীরালাল সেনগুপ্তের নেতৃত্বে সম্মেলনে যোগ দেয়। আমি, দুই মধু ভট্টাচার্য, বিজয় সিংহরায়, সমীরণ রায়, সুভাষ চক্রবর্তী (হো-চি-মিন) আরো কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে সেই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলাম। সে সময় সকালে সম্মেলনের প্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবক, সাংস্কৃতিক টিমের সদস্য সকলের টিফিন ছিল চিঁড়ে-কলা-বাতাসা। মধু ভট্টাচার্য (২ নং) আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খেতে পারত। সে মাঠের মধ্যে পত্রিকার কাগজ পেতে টিফিন করতে বসত। আমরা যারা সবটা টিফিন খেতে পারতাম না মধুর পেতে রাখা পত্রিকা কাগজে ঢেলে দিতাম। মধু নির্দ্ধিধায় খেয়ে নিত সব। সম্মেলনে উপস্থিত সবাই অবাক হয়ে দেখত সেই ঘটনা। নৃপেনদা, অনিলদা পর্যন্ত এই ঘটনা দেখে অবাক হয়ে যান। তাঁরাও তাঁদের ভাগ থেকে চিঁড়ে-কলা-বাতাসা মধুর পাতে প্রতিদিন ঢেলে দিতেন। মধু সব গলাধঃকরণ করত অনায়াসে। সম্মেলনের প্রধান অতিথি জ্যোতি বসুও একদিন মধুর পাতে চিঁড়ে, কলা ঢেলে দিয়েছিলেন।

সম্মেলন স্থলের পাশেই এক বৈষ্ণবের আখড়া ছিল। আমরা সেই আখড়ার বৈরাগীব সঙ্গে ভাব জমিয়ে তার এখানেই আস্তানা গাড়লাম। সকাল হলেই ২ নং মধু, বিজয়, সুভাষ এরা বৈরাগীর একতারা নিয়ে বেরিয়ে পড়ত সংকীর্তন গাইতে- গাইতে। গানেব পদ কি ? রাই জাগো গো, জাগো শ্যামের মনমোহিনী কমলিনি রাই। সম্মেলন শেষ হলে সন্ধে হয় হয় সময়ে এরা গান ধরত—কানাইয়া, সাজাইয়া দেগো, মা নন্দরানী। এক অনাবিল আনন্দ প্রবাহে কেটে যাচ্ছিল আমাদের প্রতি মুহূর্ত।

বৈষ্ণবের আখড়ার পাশেই ছিল নদীর ছড়া। পরিষ্কার, কাকচক্ষুর মত জল। আমরা রোজ চান করতাম সেই ছড়াতে। আমাদের এই গ্রুপটা যখনই কোথাও যেতাম, শুধু দেহটা নিয়েই যেতাম। তেল, সাবান, টুথপেস্ট, টুথব্রাশ ভূতে যোগান দিত। বিজয়কে দিয়ে ফুলনদি, রীনাদি এদের তেল-সাবান, টুথপেস্ট চুরি করিয়ে আনিয়ে নিলাম। মেয়েদের মধ্যে বিজয়ের ছিল অবাধ গতি। কেননা, বিজয় থাকত জয়নগর আর ফুলনদি থাকত আখাউড়া রোড আর রামনগর ১ নং রোডের প্রথম ক্রসিং-এ।



সস্ত্রীক মধু (২নং)

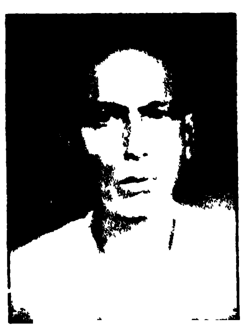
বিজয় প্রতিদিনই ফুলনদিকে নিয়ে বিক্সায় কামান চৌমুহনি ছাত্র ফেডারেশনের অফিসে আসত। ভাড়া অবশ্যই ফুলনদির। যেদিন প্রথম চোরাই তেল-সাবান দিয়ে চান করতে গেলাম ২ নং মধু বলল শরীরে প্রথমে তেল মাখতে হবে তারপর শরীর ভিজিয়ে সাবান দিয়ে সেই তেল তুলতে হবে। এরপর কয়েকবার ডুব দিয়ে উঠে ভিজে শরীরে তেল মেখে আবার স্নান করতে হবে। তাহলে শরীর দিব্যকান্তি হবে। শুরু হয়ে গেল আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ফলে সম্মেলনের কত প্রতিনিধিব যে তেল-সাবান খোয়া গেছে তা বলে আর ইয়ত্তা নেই। আমাদের চান সেরে গেলে যার যাব তেলের শিশি, সাবান বিজয় আবার তাদের অগোচরে বাক্সে রেখে দিয়ে আসত। সম্মেলনেব প্রতিনিধি সম্মেলন শেষে খোযাই টাউনে প্রকাশ্য সমাবেশ। পশ্চিমবাংলা থেকে বক্তা হিসাবে জ্যোতিবাবু এসেছিলেন। সম্মেলনস্থল থেকে পাযে হেঁটে মিছিল করে প্রকাশ্য সমাবেশে যেতে হবে। সমাবেশ শেষে প্রকাশ্য সমাবেশের স্থান থেকে গাড়ি করে আমাদেব ফিরে আসার কথা। সম্মেলনস্থল থেকে মিছিলে না হেঁটে গাড়ি করে যে প্রকাশ্য সমাবেশে যাব তাব পয়সা কারো পকেটে নেই। বিজয় বলল, গাড়িভাড়ার একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এই কথা বলে বিজয় চলে গেল সম্মেলন স্থলের পাশে একটি চায়ের দোকানে। এখানেই আমরা প্রতিদিন চা খেতাম। অবশ্যই বেশিরভাগ দিন নিজের পকেটের পয়সা খরচ না করে। চায়ের দোকানেব মালিক এই কয়দিনে আমাদেব চিনে ফেলেছিল। বিজয় জানত ফুলনদি চায়ের মালিকের কাছে কিছু টাকা জমা দিয়েছিল। সব টাকা খরচ হয়নি কিছু টাকা ফুলনদি পাবে। বিজয় চা-দোকান মালিককে জিজ্ঞেস করল, ফুলনদি তোর কাছে কত টাকা পায় রে? দোকানি জানাল, ১৮ টাকা। বিজয় বলল, আমাকে দিয়ে দে। সে বলল, দিদিমণি জিজ্ঞেস করলে কি বলব? বিজয় বলল কেন আপনাব সঙ্গে রোজ আসে কালো মত লম্বা লোকটা আপনার কথা বলে নিয়ে গেছে—এই কথা বলবি। দোকানি টাকাটা বিজয়ের হাতে দিয়ে দিল। দোকানি ভাবল বিজয় বোধহয় তার নিজের কথাই বলতে বলেছে। আসলে ফুলনদির সঙ্গে চা খেতে বিজয়ও যেত, হীরালাল সেনগুপ্তও যেত। ফুলনদির টাকা দিয়ে আমরা পুরো গ্রুপ গাড়ি চড়ে খোয়াই প্রকাশ্য সমাবেশে এলাম। কিছু টাকা বেঁচেছিল সে টাকা দিয়ে আমরা বাদামও কিনে খেয়েছিলাম। ফুলনদি, রীনাদি এদেরও অবশ্য বাদাম খেতে দিয়েছিলাম। সমাবেশ শেষে যখন গাড়ি করে আগরতলা ফিরছিলাম তখন ফুলনদি তার উষ্মা আমার কাছেই ব্যক্ত করেছিলেন এভাবে তার টাকা দোকান থেকে নিয়ে নেওয়ার জন্য। আশ্বস্ত হলাম, উনি বিজয় বা আমাদের কাউকে সন্দেহ করেননি। লম্বামত কালো লোক বলাতে ফুলনদির সন্দেহ হয়েছিল হীরালালদার ওপর। আমরা সবাই ফুলনদির সঙ্গে তাল মিলিয়ে গেলাম কাজটা ভাল হয়নি বলে। পরে অবশ্য আগরতলা ফিরে এসে কয়েকদিন পর ফুলনদিকে সব কথা আমরা বলে দিই। নয়ত সারাজীবন ফুলনদির হীরালালদার ওপর একটা মিথ্যে সন্দেহ থেকে যাবে সেই পাপবোধ থেকে।

গাড়িতে করে যখন আগরতলা ফিরে আসছি তখন সমীরণের পাশে বসেছে বিজয়। বিজয় লক্ষ্য করল, সমীরণের বুক পকেটে ১০ টাকার একটি নোট একটু বেরিয়ে পড়েছে। বিজয় আস্তে আস্তে সে টাকাটা হস্তগত করে পেছনের সিটে বসা ২ নং মধুর হাতে স্থানান্তর করে দেয়। বিজয় টাকাটা হস্তান্তর করেছিল যাতে সমীরণ টের পেয়ে সার্চ করলেও

বিজয়ের কাছে কিছু না পায়। সার্চ করলেও বিজয়ের কাছে কিছুই পেত না কারণ বিজয়ের পকেটে কোনদিনই পয়সা থাকত না। তেলিয়ামুড়া এসে গাড়ি কিছুক্ষণের জন্য থামে। মধু (২ নং) বাস থেকে নেমে কিছু খাবার কিনে নিয়ে আসে। মধু সবাইকে খাবার ভাগ করে দেয়। সমীরণকেও দেয়। সমীরণসহ সে খাবার সবাই খুব র‍্যালিস করে খাই। যারা ব্যাপারটা বুঝতে পারে তারা সবাই হাসি শুরু করে। হাসির কারণ কিছু বুঝতে না পেরে সমীরণও হাসতে থাকে। এভাবেই সেদিন খুব আনন্দ করতে করতে আমরা পার্টি সম্মেলন শেষে আগরতলা এসে পৌঁছেছিলাম।

সম্মেলনের সময়ে যে বৈষ্ণবের আখড়ায় আমরা উঠেছিলাম সেই বৈষ্ণবের বৈষ্ণবী ছিল। আমাদের মধু (২ নং) ও তাদের দেখাদেখি রামনগরের রবি নামে একজন স্বেচ্ছাসেবক তাকে ১ নং বৈষ্ণবী এবং সমীরণকে ২ নং বৈষ্ণবী বানিয়ে সংকীর্তন করতে বেরুত।

৭০-এর দশকের সেইসব সোনাঝড়া দিনে আমাদের যূথবদ্ধ জীবন কাটানোর আরেকটা মাধ্যম ছিল দেওয়াল লিখন। রাতের পর রাত একসাথে সবাই সংঘবদ্ধ জীবন কাটাতাম। সারাদিন কাজ সেরে আমরা কয়েকজন রাত্রি ১০টা নাগাদ বটতলা থেকে একটি খালি রিক্সায় রং-এর পাতিল, চুন, ব্রাশ ও অন্যান্য সরঞ্জাম তুলে দেওয়াল লিখনে বেরিয়ে পড়তাম। সারারাত দেয়াল লিখে ফিরতাম ভোর ৩/৪টা নাগাদ। রিক্সাটা আবার আগের জায়গায় রেখে দিতাম। রিক্সা চালাত ২ নং মধু ও বিজয়। একদিন ভোরবেলা লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি রোডে মধু রিক্সা চালকের আসনে বসা, এক যাত্রী এসে মধুকে বলল 'ভাই যাবে নাকি' ? মধু উত্তরে বলল, হ্যাঁ। গন্তব্যস্থল বলে যাত্রী কত ভাড়া জিজ্ঞেস করাতে মধু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। পরে এমন ভাড়া দাবি করল যে যাত্রী আর যেতে রাজি হয়নি। সে যাত্রায় মধু রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল। আরেকদিন মহিলা কলেজের সামনে আমরা ভোর হয় হয় সময় দেওয়াল লিখছি, এমন সময় সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন কংগ্রেস নেতা বীরচন্দ্র বর্মন। তাঁর বাড়ি ছিল কের চৌমুহনি এলাকায়। মধু আর বিজয় বীরচন্দ্রবাবুর সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা শুরু করে দিল। এমন একটা ভাব দেখাল যে, যাই রাজনীতি করি না কেন আসলে তো আমরা সবাই এক। তাছাড়া, বীরচন্দ্র বর্মনকে বোঝাল পার্টিও ধরে নিয়েছে সামনের নির্বাচনে তেলিয়ামুড়ায় বীরচন্দ্র বর্মনকে কংগ্রেস প্রার্থী করবে আর তাঁকে আটকানো যাবে না। বীরচন্দ্রবাবু খুশি হয়ে আমাদের সবাইকে সেদিন টিফিন খাইয়েছিলেন। এভাবে মধু আর বিজয় প্রায়ই বিভিন্ন লোককে ধরে টিফিন আদায় করত। একবার অনুকূল সাধু থেকেও টিফিন খেয়েছিলাম আমরা।


চন্দ্রমোহন সাহা

কোলকাতা থেকে আগত শিল্পী বর্তমানে প্রয়াত অশোক দাস (নারীনেত্রী রমাদির ভাই) এবং জয়নগরের প্রখ্যাত শিল্পী শঙ্কর চৌধুরী দেওয়াল লিখতেন। ওঁরাই দেওয়ালে ছক কাটতেন। আমরা তাঁদের নির্দেশ মত ফাঁকা জায়গায় রং দিয়ে ভরাট করতাম। অনেকদিন শঙ্কর



সুকুমার আচার্য

চৌধুরীর সঙ্গে দেখা নেই। জানিনা, জুটমিল থেকে অবসর নেওয়ার পর কেমন আছেন। ভালো থাকুন, এই কামনা করি।

পার্টির রাজ্য সম্মেলনের পূর্বে সারা রাজ্যে সমস্ত ব্রাঞ্চ কমিটি, লোকাল কমিটি এবং বিভাগীয় কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সে বছর আগরতলা লোকাল কমিটির সম্মেলন হয়েছিল যোগেন্দ্রনগরে কমরেড অনিল দে-র বাড়িতে। তখন যোগেন্দ্রনগর এলাকাও আগরতলা লোকাল কমিটির অন্তর্গত ছিল। পার্টি সভ্য এবং একনিষ্ঠ সমর্থক চন্দ্রমোহনদা সম্মেলন স্থান নির্বাচিত করেছিলেন। সে সময় পার্টি অফিসে গেলে যে দু'জনকে প্রতিদিন প্রায় সবসময়ই পাওয়া যেত তারা ছিলেন পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী সুকুমার আচার্য এবং চন্দ্রমোহনদা। চন্দ্রমোহনদা ছিলেন হতদরিদ্র। শিশি-বোতল বিক্রি করে সংসার প্রতিপালনের চেষ্টা করতেন। সে চেষ্টা কতটুকু ফলপ্রসূ হত বলা মুশকিল। ঝড়-জল-বৃষ্টিতেও প্রতিদিন চন্দ্রমোহনদা বিকেলবেলা পার্টি অফিসে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিভিন্ন পত্রিকা পড়তেন। রাত্রিবেলা শিশিবোতলের ঝাঁকা মাথায় করে হেঁটে বাড়ি ফিরতেন। ১৯৬৮-৬৯ সনে মুজিবর রহমানের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির কিছু নেতার বিরুদ্ধে আগরতলা-ষড়যন্ত্র মামলায় চন্দ্রমোহনদাকে নৃপেনদার বিরুদ্ধে এবং পার্টির বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়ার জন্য তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধির তরফে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা উৎকোচ দেওয়ার প্রস্তাব চন্দ্রমোহনদা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন বলে পার্টিনেতাদের কাছেই জেনেছিলাম। চন্দ্রমোহনদাকে নিদারুণ দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করতে প্রতিদিন দেখেছি আর ভেবেছি কতবড় মহান এবং আদর্শবাদী পুরুষ বলে এত বিশাল অঙ্কের টাকার টোপ তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছিলেন। আজকের দিনে সে সময়ের ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার বাজারদর কোটি টাকার ওপর দাঁড়াবে। সুকুমারদা ছিলেন পার্টির সমস্ত ধরনের কাজের দায়িত্বে। সকালবেলা একটি বাই-সাইকেলে চেপে ত্রিপুরা, পশ্চিমবাংলা পার্টির মুখপত্র গ্রাহকদের বাড়িতে-বাড়িতে বিলি করতেন। পার্টি বিধায়কদের বেতন-ভাতা তুলতেন। পার্টির সমস্ত চিঠিপত্র বিভিন্ন জায়গায় পাঠানোর জন্য পোস্ট অফিসে দৌড়ুতেন। এমন কোন কাজ ছিল না যা সুকুমারদাকে করতে হত না। পার্টির সে সময়কার নিদারুণ আর্থিক দুরাবস্থার মধ্যে যে স্বল্প টাকা সুকুমারদা মাসোহারা পেতেন সেই টাকা দিয়ে কি করে সংসার চালাতেন তা আজও আমার বোধগম্য নয়। কিন্তু ভোরবেলা থেকে রাত্রি অবধি কাজ করে যেতেন হাসিমুখে। কোনদিন কোন প্রলোভন তাকে হাতছানি দিয়ে আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। আমার চোখে দেখা সৎ-আদর্শবান হিসাবে এই দুই ব্যক্তিত্ব আজো শ্রেষ্ঠতম হিসাবে বিবেচিত। এদের ধারে কাছে যাওয়ার যোগ্যতা ত্রিপুরা রাজ্যের মাটিতে অন্তত আমার নজরে আর কেউ পড়েনি।

যোগেন্দ্রনগরে অনুষ্ঠিত আগরতলা পার্টি সম্মেলনে পার্টির রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কমরেড দশরথ দেব। সেই সম্মেলনে আমাদের পুরো

গ্রুপসহ সিদ্ধার্থ দত্ত, পীযূষ দাশগুপ্ত এরা সবাই প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দিয়েছিলাম। তখনকার সময় পার্টি সম্মেলনে মেনু থাকত ভাত, ডাল, একটি নিরামিষ তরকারি এবং সিঁদলের চাটনি। বেশি হলে একটি বেগুনভাজার সংযোজন হত্। মাছ-মাংসের বিলাসিতা করার সামর্থ বা মানসিকতা তখন ছিলই না।

সম্মেলনের প্রথমভাগে সম্পাদকীয় রিপোর্টের উপর প্রতিনিধির আলোচনার পর দুপুরের খাওয়া-দাওয়া এবং বিকেলের অধিবেশনে ছিল কমরেড দশরথ দেবের ভাষণ। কমরেড দশরথদা সম্মেলনের প্রথম থেকেই সম্মেলন মঞ্চে বসে প্রতিনিধিদের আলোচনা শুনছিলেন এবং স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে সিগারেট খাচ্ছিলেন। দশরথদার সিগারেট খাওয়ার স্টাইল ছিল অভিনব। সিগারেটে টান দিয়ে একসাথে সব ধোঁয়া সারা মুখ ছড়িয়ে ছেড়ে দিতেন। কেউ দেখলে ভাবত তিনি হাসছেন।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার সময় কোন কোন প্রতিনিধি কমরেড অনিল দে-র বাড়িতে লঙ্কাগাছ থেকে কাঁচালঙ্কা পেড়ে খেয়েছিলেন। এই ব্যাপারটি দশরথদার নজর এড়ায়নি। বিকেলে তাঁর ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি তাঁর নিজস্ব অনবদ্য ভঙ্গিতে আন্তর্জাতিক, দেশীয় এবং রাজ্য রাজনীতির বিশ্লেষণ শেষে প্রতিনিধিদের লঙ্কা পেড়ে খাওয়ার প্রসঙ্গ তুললেন। বললেন,পার্টি কমরেডের বাড়ির গাছ থেকে লঙ্কা পেড়ে নিয়ে খাওয়াটা বড় কথা নয়। সবচেয়ে বড় কথা হল, না বলে অন্যের যত তুচ্ছই হোক না কেন সেই সম্পদ আত্মসাৎ করার মানসিকতা। প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি বললেন— জনশিক্ষা আন্দোলন পরবর্তী পর্যায়ে কংগ্রেসের জনবিরোধী কর্মসূচির বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রতিহত করতে এবং দুর্গম উপজাতি এলাকায় পুলিশ প্রশাসনের নির্বিচারে অত্যাচার প্রতিরোধ করতে পার্টির নির্দেশে গড়ে তুলতে হয়েছিল সশস্ত্র 'শান্তি সেনা'। দু'দিন তিনদিন অভুক্ত শান্তিসেনা কমরেডদেরও নির্দেশ দেওয়া ছিল—গৃহস্থের অনুমতি না নিয়ে গাছের কাঁঠালও খাওয়া যাবে না। শুধু তাই নয়, গৃহস্থের অনুমতি নেওয়ার আগে হাতের অস্ত্র কোথাও লুকিয়ে রেখে গৃহস্থের অনুমতি চাইতে হবে। কেননা, হাতে অস্ত্র দেখলে ইচ্ছে না থাকলেও ভয়ে গৃহস্থ অনুমতি দিয়ে দিতে পারে। এমন ঘটনাও দেখা গেছে যে, গাছ থেকে কাঁঠাল ঝরে মাটিতে পড়ে আছে; গরু-মোষ খেয়ে যাচ্ছে সে কাঁঠাল, কিন্তু পার্টির এবং শান্তিসেনার সর্বোচ্চ নেতৃত্বের নির্দেশ মেনে ক্ষুধার্ত শান্তিসেনার কমরেড কাঁঠাল গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। কখন গৃহস্থ জুমচাষ করে বাড়ি ফিরবে তারপর তার অনুমতি নিয়ে সে ক্ষুন্নিবৃত্তি করবে। সেই শান্তিসেনার কমরেড এতই ক্ষুধার্ত ছিল যে, কয়েক মাইল হেঁটে আরেকটি উঁচু টিলা বেয়ে আরেকজন গৃহস্থ বের করার সেই শক্তি তার তখন ছিল না। সেদিন দশরথদা সবিস্তারে কিভাবে পার্টি শৃঙ্খলা এবং অনুশাসন মেনে পাহাড়ি এলাকায়, উপজাতি মহল্লায় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠেছিল সেই সুদীর্ঘ কাহিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিলাম সেই কাহিনি।

কি কঠিন, কঠোর আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে এ রাজ্যের কমিউনিস্ট আন্দোলন তিল তিল করে গড়ে উঠেছিল বিশেষত উপজাতিদের মধ্যে তার কোন সামগ্রিক ঐতিহাসিক পূর্ণাঙ্গ দলিল আজো রচিত হয়নি। বামপন্থী বিশেষত কমিউনিস্ট আন্দোলনের এটি একটি চরম ব্যর্থতা।

১৯৭৮ সনে পার্টি ক্ষমতায় আসার পর যারা পার্টিতে এসেছেন তারা পঞ্চাশের দশক থেকে সত্তরের দশক অবধি উপজাতি এলাকায় কমিউনিস্ট পার্টির বিশেষত কমরেড দশরথ দেবের কি অপরিসীম প্রভাব ছিল কল্পনায়ও আনতে পারবেন না। দশরথ দেবকে ত্রিপুরা রাজ্যের মুকুটহীন রাজা আখ্যা দেওয়া হয়েছিল খুব যথার্থ কারণেই। ১৯৫২ সনে ভারতবর্ষের প্রথম লোকসভা নির্বাচনে দশরথদা ভারতের কমিউনিস্ট প্রার্থী হিসাবে উপজাতি সংরক্ষিত আসনে আত্মগোপন থাকা অবস্থায় বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়েছিলেন। সরকারের তরফে তখন তাঁর মাথার দাম নির্ণয় করে হুলিয়া জারি করা ছিল। আত্মগোপন থাকা অবস্থায় লুকিয়ে তিনি কি করে লোকসভায় গিয়ে শপথ নিয়েছিলেন সেটিও একটি রোমাঞ্চকর কাহিনি। সেই কাহিনি দশরথদা এবং পার্টির অন্যান্য নেতাদের মুখে শুনেছি কিন্তু এখন সেই ঘটনা বিস্মৃত হয়ে গিয়েছি।

খোয়াই মহকুমার বিভিন্ন বিধানসভা আসনে টাকারজলা বিধানসভা কেন্দ্রে এবং রাজ্যের উপজাতি এলাকার বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলের বহু বুথে উপজাতি এলাকায় ১০০ শতাংশ ভোটার ভোট দিত। তখন দুটি বাক্স থাকত। একটি কংগ্রেসের, আরেকটি কমিউনিস্ট পার্টির। অনেক বুথে ১০০ শতাংশ ভোটার কমিউনিস্ট পার্টিকে ভোট দিত। কংগ্রেসের বাক্সে পোড়া বিড়ির টুকরো গুঁজে দিয়ে যেত।

'৭০ দশকে আমি নিজে খোয়াই মহকুমার বিভিন্ন উপজাতি এলাকায় মাসের পর মাস সংগঠনের কাজে থেকেছি। শুধুমাত্র দশরথ দেবের পার্টি করি শুধুমাত্র এই পরিচিতিতে কী সম্মান এবং আতিথেয়তা পেয়েছি সেটা ভাষায় বর্ণনার অতীত।

আমাদের ২ নং মধু একবার ১৯৭০/৭১ সনে আমবাসায় যাত্রা বিরতি দিতে বাধ্য হয়েছিল কয়েক ঘণ্টার জন্য। পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা কিন্তু পকেটে পয়সা নেই। আমবাসা বাজারে সেদিন ছিল হাটবার। তখন আমবাসায় প্রতিদিন বাজার বসত না। মধু খুঁজে খুঁজে এক উপজাতি দোকানির সঙ্গে ভাব জমাল। সেই উপজাতি সরল মানুষটি গাছের পাকা পেপে নিয়ে হাটবারে রাস্তার পাশে বসে বিক্রির জন্য এসেছিল। মধুর মুখে যখন শুনল সে রাজধানী আগরতলা থাকে এবং দশরথ দেবের পার্টি করে তখন মধুকে পরম মমতায় ও যত্নে নিজের হাতে সবচেয়ে বড়, সরস পেপেটি কেটে খাইয়েছিলেন। মধুর কোন ওজর আপত্তিই সেই উপজাতি কমরেডটি শোনেননি।

১৯৭৫-৭৬ সনে জরুরি অবস্থা চলার সময় পর্যন্ত পার্টির ডাকে আগরতলা শহরে যে কোন সমাবেশে ৯৯ শতাংশ উপজাতি অংশের মানুষ সমাবেশস্থলে এলে মাঠ ভরত। বিভিন্ন দুর্গম এলাকা থেকে পায়ে হেঁটে বা পার্টির দেওয়া গাড়িতে চেপে উপজাতি কমরেডরা আসতেন। শহরে কিছু বাঙালি অংশের লোক সমাবেশস্থল থেকে দূরে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে পার্টিনেতাদের বক্তৃতা শুনত। যাহোক, সে অন্য প্রসঙ্গ। আবার ফিরে যাচ্ছি ছাত্র আন্দোলনের ঘটনায়।

১৯৬৯-৭০ সনে যখন ছাত্র আন্দোলন বাঙালি অধ্যুষিত এলাকাতে ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে দানা বাঁধতে শুরু করে তখন বামপন্থী কিছু ছাত্র-যুবক নকশাল আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। সে সময় সুব্রত বল, বিমান দত্ত, অনিল দাস নামে তিনজন নকশাল আন্দোলনের নেতা কোলকাতা থেকে ত্রিপুরায় আসেন নকশাল আন্দোলন



নিখিল (পাণ্ডব)-এর বিয়েতে অসীম (বোম), নারায়ণ, নিখিল, নিখিলের বৌ, সুবল, ও নিখিল (পাণ্ডব)

শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্য। ধলেশ্বর-কল্যাণী এলাকায় বহু পরিশ্রম করে অনেক ছাত্র-যুবককে যুব ফেডারেশন ও ছাত্র ফেডারেশনের সংগঠনের আওতায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলাম আমরা। ১৯৭০ সনের সেপ্টেম্বর কি অক্টোবর মাসে কোলকাতায় সি.আই.টি.ইউ-র প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং নূতন এই সর্বভারতীয় শ্রমিক সংগঠনটি আত্মপ্রকাশ করে। আমি, তপন কর, আরো অনেকে ছাতার বাঁট ইউনিয়নের সদস্য হিসাবে চিত্ত চন্দের নেতৃত্বে সেই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলাম। সম্মেলন শেষে তপনদা আর আমি আরো ৭/৮ দিন কোলকাতায় ছিলাম। অর্থাৎ সর্বমোট দিন পনের কোলকাতায় ছিলাম। ফিরে এসে দেখি আশ্রম চৌমুহনি যুব ফেডারেশনের পুরো গ্রুপ নিখিল দেবনাথের সঙ্গে নকশাল আন্দোলনের সমর্থক হয়ে পড়েছে। এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে আমার স্কুলের সহপাঠী স্বপন দুলাল রায় চৌধুরী। এসে খবর পেলাম নকশাল নেতারা আমার সহযোদ্ধা বন্ধু, নিখিল দেবনাথ, রুহিদাস দেবনাথ, সুদর্শন রায় চৌধুরী, প্রেমানন্দ দেবনাথ, সজল দেবনাথ, স্বপন দুলাল এদের বুঝিয়েছে সি.পি.আই(এম) দলের সভ্য সমর্থক মানেই শ্রেণি শত্রু। অর্থাৎ সেই অর্থে আমিও আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের শ্রেণি শত্রু। এই ব্যাখ্যা সম্ভবত ওই এলাকার নব্য নকশাল কর্মীদের মনঃপুত হয়নি। পরবর্তী সময়ে সে কারণেই নকশাল আন্দোলন ওই এলাকায় মুখ থুবড়ে পড়ে। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় প্রতিদিন কল্যাণী এলাকায় নকশালরা কল্যাণী এলাকার আমার বাড়িঘর সন্ধ্যের পর আক্রমণ করত। বাড়ির বেড়া ভেঙে দিত। পরে জেনেছি নকশাল পার্টি নেতাদের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য এরা একাজ করত। কোনদিন ইচ্ছে করে এরা আমি বাড়ি থাকাকালীন আমার বাড়ি আক্রমণ করেনি। খবর নিয়ে যখন জানত আমি বাড়ি নেই তখন আমার বাড়িতে আক্রমণ করত। আমার মার নেতৃত্বে আমার ছোটভাই তপন ওই এলাকার রবি চক্রবর্তী, অর্জুন লস্কর, সুখু চক্রবর্তী, কানু দাস এরা অসীম সাহসিকতার সঙ্গে সেসব আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন। একবার পার্টি অফিসে খবর পাই সন্ধ্যায় আমার বাড়ি আক্রমণ হয়েছে। আমি, লম্বা মধু, রুনু দেববর্মা, অরবিন্দ ভট্টাচার্য, শঙ্করদা পার্টি অফিসের জিপে ছুটে যাই কল্যাণী। গিয়ে দেখি কল্যাণী এলাকায় আমাদের বাড়ি যেতে যে পুকুর তার পাড়ে নকশালরা জমায়েত হয়ে আমার বাড়িতে আক্রমণ চালাচ্ছে। আমরা জিপ থেকে নেমে তাদের ধাওয়া করলে এরা দৌড়ে পুকুরের অন্য পাড় দিয়ে পালিয়ে যায়। একজনকে আমার মা ধরে ফেলে এবং তাকে আমরা জিপে তুলে নিই।

বাড়ির গেটে গিয়ে দেখি মা পিতলের একটা গ্লাস হাতে ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাব অর্থ হল নকশালদেব উৎপাত ঠেকানোর জন্য মা পিতলের গ্লাসই সেদিন অস্ত্র হিসাবে বাবহার করেছিলেন। মা'র ছিঁটেফোটা সাহসও আমরা কোন ভাই পাইনি। যাহোক, যে নকশালটিকে ধরলাম সে আশ্রম চৌমুহনি এলাকার। নাম ইচ্ছে করে লিখলাম না। আমি কোনভাবেই মধুর রাগ থামাতে পারছিলাম না। সে ছেলেটিকে খুব মারল। তাকে আমি প্রগতি স্কুলেব কাছে কাটাখালের ব্রীজের পাশে ফেলে এসেছিলাম। ভাগ্যিস সে মরেনি। আজো সে আমার ভালো বন্ধু।

১৯৬৯ এবং '৭০ সনে এম.বি.বি কলেজ ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিল মানিক সরকার। ১৯৭০ সনে ভি.পি কে হয়েছিল মনে নেই। এম.বি.বি কলেজে খোঁজ নিয়েও তথ্য সংগ্রহ কবতে পারিনি। পুরোনো কোন রেকর্ড নাকি সংরক্ষিত নেই। ১৯৭১ সনে কলেজে ভর্তি হতে গিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে কংগ্রেস সমর্থক ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের হাতে খুন হন কল্যাণী এলাকাব ক্ষীবগোপাল দে, তার ডাক নাম ছিল শনি। খুব সাহসী ছেলে ছিল ক্ষীরগোপাল। কল্যাণী-ধলেশ্বর এলাকার বামপন্থী ছাত্র-যুব আন্দোলনের অগ্রণী সৈনিক ছিল ক্ষীরগোপাল। ক্ষীরগোপাল খুন হওয়ার কিছুদিন আগে কল্যাণী বাসস্টপে এসে নামে এম.বি.বি কলেজেব ১ নং হোস্টেলেব কিছু ছাত্র। এরা বাসের ভাড়া না দিয়ে চলে যেতে চায়। তখন টি আব.এস. ২৩৪ নং বাসেব কন্ডাক্টর ছিলেন প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক দীপক বায়। তাব বাসে চেপেই এসেছিল হোস্টেলের ছাত্ররা। ভাড়া নিয়ে দীপক রায়েব সঙ্গে বচসা বেঁধে যায় হোস্টেলেব ছাত্রদেব। হোস্টেলেব ছাত্ররা দীপক রায এবং অন্যান্য বাসকর্মীদের শারীরিকভাবে নিগৃহীত কবতে উদ্যত হলে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ক্ষীরগোপাল দে-র নেতৃত্বে কল্যাণীব ছেলেরা হোস্টেলের ছেলেদের বাধা দেয়। ফলে তারা দীপক রায় এবং অন্যান্য বাসকর্মীদের শারীরিকভাবে নিগৃহীত করতে পারেনি। এ ঘটনা নিয়ে কল্যাণী এলাকার ছেলেদের সঙ্গে এম.বি বি কলেজ ১ নং হোস্টেলের ছেলেদের মধ্যে একটা উত্তেজনা বিরাজ করছিল। তখনই হোস্টেলের ছেলেরা ক্ষীরগোপালকে টার্গেট করে নেয়। তার ফলশ্রুতিতেই এম.বি.বি কলেজে ভর্তি হতে গেলে ক্ষীরগোপাল নৃশংসভাবে খুন হয়।



শহীদ ক্ষীরগোপাল দে

১৯৬৯ সনে পশ্চিমবঙ্গের বিরাটী থেকে সুব্রত বল এসে আশ্রয় নেয় উদয়পুর সি.পি.আই(এম) দলের নেতা প্রয়াত নরেশ ঘোষের বাড়িতে। নিজের রাজনৈতিক পরিচয় লুকিয়ে রেখে উদয়পুর মহকুমার মহারাণী এলাকায় সি.পি.আই (এম-এল) দলের সংগঠন গড়ার কাজ শুরু করে। পরবর্তী সময়ে এলফুস মিঞা নামে একজন কৃষককে হত্যা করে জোতদার খতম অভিযান শুরু হয়েছে বলে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচার সংগঠিত করে। যুবক বয়সের ধর্মই হোলো এ্যাডভেঞ্চারিজমের প্রতি মোহ এবং তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। সে কারণে বেশকিছু ছাত্র যুবক সারা রাজ্যে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল নকশালের আন্দোলনেব প্রতি। শান্তিগণ চৌধুরী, রাণা যোধবীর জং, অমিতাভ কর, ননী চন্দ, বিপ্রজিত পুরকায়স্থ,

স্বপন ভট্টাচার্য, প্রদীপ রায়, বাঁধন রায়, স্বপনদুলাল রায় চৌধুরী, পীযূষ চক্রবর্তী (পপি) এরা সবাই ভাল ছাত্র এবং অত্যন্ত শিক্ষিত ভদ্র পরিবারের ছেলে। এরাই মূলত আগরতলা শহরে নকশাল আন্দোলনে ছাত্র-যুবদের নেতৃত্ব দিয়েছিল।

১৯৬৯ সনে এম.বি.বি কলেজের ছাত্রসংসদের নির্বাচনে সি.পি.আই(এম-এল) দলের তরফে যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল বিভিন্ন পদে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ননী চন্দ, বিপ্রজিত পুরকায়স্থ ও অমিতাভ কর। একমাত্র অমিতাভ করই নির্বাচনে জয়ী হয়েছিল।

'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায় ত্রিপুরায় নকশাল আন্দোলনের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে সমালোচনা করে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সনের ডিসেম্বর মাসে। তার কয়েকদিন পর আগরতলা সেন্ট্রাল জেলের দক্ষিণ-পূর্ব কোণায় মালদার বাড়ির কালভার্টে আগরতলা শহরের নকশাল ছাত্র যুবদের একসভা অনুষ্ঠিত হয়। নেতা হিসাবে কোলকাতা থেকে আগত অনিল দাস সেই সভায় অংশগ্রহণ করেন। সেখানে সিদ্ধান্ত হয় 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকা আক্রমণ করতে হবে। যথারীতি পরদিন জগন্নাথবাড়ি রোডে 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকা অফিস আক্রান্ত হয়। ভূপেন দত্ত ভৌমিককে শারীরিকভাবে সামান্য নিগ্রহ করা হয়। তাঁর টেবিলে রাখা কাগজপত্র ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। ভূপেনদাকে সি.পি.আই (এম-এল) দলের পক্ষ থেকে নকশাল আন্দোলনের সমর্থনে প্রচারিত একটি বিবৃতি গুরুত্ব দিয়ে ছাপার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই ঘটনার পর পুলিশ যারা এম.বি.বি কলেজের নির্বাচনে সি.পি.আই (এম-এল) দলের প্যানেল থেকে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিল সেই তিনজনকে অর্থাৎ ননী চন্দ, বিপ্রজিৎ পুরকায়স্থ ও অমিতাভ করকে এবং এর বাইরে পীযূষ চক্রবর্তীকে পি.ডি. অ্যাক্টে গ্রেপ্তার করে। তারও বেশ কিছুদিন পর এম বি.বি কলেজের ২ নং হোস্টেল থেকে নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছাত্র-যুবদের হোস্টেলে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে হোস্টেল সুপার অধ্যাপক সত্য ভট্টাচার্য (ইতিহাস), স্বপন ভট্টাচার্যকে হোস্টেল থেকে বহিষ্কার করেন। স্বপন তখন বড়দোয়ালি এলাকায় একটি ভাড়াবাড়িতে চলে যায়। সেই বাড়িতে তার কিছু জিনিষ একদিন চুরি হওয়ায় স্বপন যখন আগরতলা কোতোয়ালি থানায় এফ.আই.আর করতে আসে তখন তাকে পুলিশ পি.ডি অ্যাক্টে গ্রেপ্তার করে এবং কিছুদিন পর আগরতলা সেন্ট্রাল জেল থেকে তাকে কৈলাসহর সাব-জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। এরা সবাই প্রায় বছরখানেক জেল খাটার পর মুক্তি পায়। স্বপন ভট্টাচার্য এরপর চাকরির উদ্দেশে রাজ্যান্তরী হয়। তারপর ননী চন্দ, বিপ্রজিত, অমিতাভ, পীযূষ আস্তে আস্তে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তখন বেশ কিছুদিন রাণা যোধবীর জং খুব দায়িত্ব নিয়ে নকশাল আন্দোলন জিইয়ে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু তখন আর সেই প্রচেষ্টা বেশিদিন ফলপ্রসূ হয়নি। পরবর্তী সময়ে রাণা নিজেও এলাহাবাদ চলে যায় এবং দীর্ঘদিন সেখানে অবস্থান করে গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য। ইতোমধ্যে নকশালদের মধ্যে তীব্র অন্তর্কলহ দেখা দেয় এবং নকশাল আন্দোলন উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। নকশাল আন্দোলনের শক্তিশালী গ্রুপটি 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায় এক বিবৃতি দিয়ে ঘোষণা করে যে সি.পি.আই (এম-এল) দলের নেতৃত্বে গণআদালতের বিচারে অমিতাভ করকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। খুব শীগগিরই সেই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা হবে। ১৯৭০ সনের অক্টোবর মাসে ভাইফোঁটার দিন গান্ধীঘাট এলাকায় বিবেকানন্দ ব্যায়ামাগারের সামনে সন্ধ্যের সময় অমিতাভ করকে নকশালদের

একটি গ্রুপ ছুরিকাঘাত করে গুরুতরভাবে আহত করে। সৌভাগ্যক্রমে এই ঘটনায় অমিতাভ করের প্রাণহানি হয়নি। নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যারা সত্তরের দশকে যুক্ত ছিল তারা প্রায় সকলেই আজ নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

সুব্রত বল দীর্ঘদিন আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা জেলে বন্দি ছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের পর প্রয়াত সি.পি.আই (এম) নেতা নৃপেন চক্রবর্তীর উদ্যোগে তিনি ঢাকা জেল থেকে মুক্তি পান। আশ্রম চৌমুহনি এবং ধলেশ্বর এলাকায় নকশাল আন্দোলনের নেতৃত্ব দিত আমার অকৃত্রিম বন্ধু প্রয়াত নিখিল দেবনাথ ও প্রয়াত সুবল পাল। এছাড়াও যারা ঐ এলাকাতে নকশাল আন্দোলনে যুক্ত ছিল সবাই আমার অভিন্ন হৃদয়বন্ধু ছিল এবং আজো আছে। এরা কিছুদিনের জন্য নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তারপর যখন নকশাল আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আমাকে শ্রেণিশত্রু হিসাবে ঘোষণা করে আমাকে খুন করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য আশ্রম চৌমুহনি-ধলেশ্বর এলাকার ইউনিটকে দায়িত্ব দেয় তারপরই ধলেশ্বর-আশ্রম চৌমুহনি এলাকার নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছাত্র-যুবদের মধ্যে প্রচণ্ড অসন্তোষ দেখা দেয় এবং এরা সকলে নকশাল আন্দোলন থেকে নিজেদের আস্তে-আস্তে বিযুক্ত করে নেয়। এরপর নিখিল দেবনাথের নেতৃত্বে এরা সকলে তৎকালীন ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্তের সঙ্গে যোগাযোগ করে কংগ্রেস দলে যোগ দেয়। সজল দাশগুপ্ত, রুহিদাস দেবনাথ, প্রেমানন্দ দেবনাথ, মিন্টু হোমচৌধুরী, গোপাল দত্ত, সুদর্শন রায় চৌধুরীকে প্রয়াত নিখিল সে সময় সচিবালয়ে চাকরির ব্যবস্থা করে দেয়। সুবল পাল পরবর্তী সময়ে কোলকাতা গিয়ে রবীন্দ্রভারতী হোস্টেলে থেকে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর কোর্সে ভর্তি হয়। আমিও তার সঙ্গে সেই হোস্টেলে বেশ কিছুদিন ছিলাম। ১৯৭৪ সনের ১২ ফেব্রুয়ারি সুবল আগরতলায় আততায়ীর হাতে খুন হয়ে যায়। সুবল ছুটিতে কয়েকদিনের জন্য আগরতলা এসেছিল। আমি তখন রবীন্দ্রভারতী হোস্টেলে ছিলাম। আশ্রম চৌমুহনি এলাকার আমার অন্য আরেক বন্ধু যদুনন্দন দাস চৌধুরী আগরতলা থেকে কোলকাতা গিয়ে হোস্টেলে আমাকে এই খবর জানায়। বন্ধু বিয়োগের এই সংবাদ বজ্রাঘাতের মত মনে হয়েছিল। নিখিল দেবনাথ পরবর্তী সময়ে আমার সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ ল' কলেজ থেকে আইনে স্নাতক ডিগ্রি নিয়ে আগরতলা কোর্টে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। সে তখন আমাদের সঙ্গে বামগণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মী হিসাবে কাজ শুরু করে। আমরা যখন রবীন্দ্রভারতী হোস্টেলে এবং হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে থাকতাম তখন সুবল আর নিখিল আমাদের থেকে আর্থিকভাবে অনেক স্বচ্ছল ছিল। এই দু'জনই ছিল অত্যন্ত বড় মনের মানুষ। বন্ধু-বান্ধবের জন্য নির্দ্বিধায় খরচ করত। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতায় এম.এ কোর্সে যখন আমি টাকার জন্য ভর্তি হব না ঠিক করেছিলাম তখন নিখিল টাকা দিয়ে আমাকে একপ্রকার জোর করে সাংবাদিকতার এম.এ কোর্সে ভর্তি করে। পরে অবশ্য আমি আর সাংবাদিকতার কোর্সে পড়াশোনা চালিয়ে যাইনি। জানিনা, নিখিলের মনে কি দুঃখ লুকিয়ে ছিল। সে ১৯৯১ সনে তার নিজবাড়িতে রাত্রিতে ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করে। আমি সেদিন কোলকাতা ছিলাম। খবর পেয়ে পরদিন সকালে আগরতলা চলে আসি। কিন্তু শ্মশানে গিয়ে নিখিলের মৃতদেহ

দেখার সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারিনি। সুবল ওদের ছিল কামান চৌমুহনি এলাকায় পাল ফার্মেসি ওষুধের দোকান। যৌথ পরিবার। নিখিলের বাবা, দাদাও ছিলেন সফল ব্যবসায়ী। এঁরাও ছিল সবাই যৌথ পরিবারের সদস্য। সুবল এবং নিখিলের অকাল প্রয়াণ আমার জীবনে এক অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করেছে।

১৯৭০ সালে ননী নন্দ, অমিতাভ কর, বিপ্রজিত পুরকায়স্থ, পীযূষ চক্রবর্তী, স্বপন ভট্টাচার্য এরা পি ডি অ্যাক্টে যখন গ্রেপ্তার হয় তখন আগরতলা জেলখানার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে মালদার বাড়ির পাশেই ছিল আমাদের সহপাঠী বাচ্চু দত্ত এদের বাড়ি। দত্ত পবিবাব ছিল সে সময়ে আগরতলা শহরে স্বচ্ছল এবং সম্ভ্রান্ত পবিবারগুলির মধ্যে অন্যতম। বাচ্চু দত্তের বাবা, কাকা, জেঠা সবাই তখন ঠিকাদারির ব্যবসা করতেন। শহরে হাতেগোনা কয়েকটি পাকাবাড়ির মধ্যে দত্তবাড়ি ছিল অন্যতম। ননী চন্দ-সহ পুবো গ্রুপটা পি ডি অ্যাক্টে গ্রেপ্তার হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে বাচ্চু দত্তসহ আরো কয়েকজনকে নকশাল আন্দোলনেব সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে পুলিশ বিভিন্ন কেসে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠায়। বাচ্চুর বাবা, কাকা, জেঠারা সে সময় আগরতলা শহরে প্রভাবশালী ছিলেন। সে কারণে বাচ্চু এদের বেশি দিন জেলে থাকতে হয়নি। জামিনে মুক্তি পেয়ে জেলখানা থেকে বেরিয়ে আসে। তখন আগরতলা সেন্ট্রাল জেলের ডেপুটি সুপার ছিলেন মধুসূদন চক্রবর্তী, কৃষ্ণনগর নূতনপল্লি এলাকার বাসিন্দা। সরকারি নির্দেশে জেল সুপারের প্রশ্রয়ে জেলখানার ভেতবে দাগি আসামি এবং সাজাপ্রাপ্ত কয়েদিদের দ্বারা নকশাল এবং বামপন্থী কর্মীদের পেটানোব জন্য একটি ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনী গঠিত হয়েছিল। এই বাহিনীর সদস্য ছিল গেদু মিঞা (মসজিদ রোডের বিখ্যাত বাসিন্দা গেদু মিঞা নয়), কালা মিঞা, সোনারাম দেববর্মা প্রমুখ।

১৯৭০ সালে ননী চন্দ এরা পি.ডি অ্যাক্টে ১ বছর জেল খেটে ছাড়া পাওয়াব কিছুদিন পরেই পুলিশ বিভিন্ন মামলায় আমাকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠায়। তার কিছুদিন আগেই বাচ্চু দত্ত এরাও জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়ে গেছে। তখন আগরতলা কোর্টে আমাদের বামপন্থী কোন আঁইনজীবী ছিলেন না। বড় মামলা এবং গুরুত্বপূর্ণ মামলা হলে সেগুলো লড়তেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমীর রঞ্জন বর্মনের পিতা প্রয়াত সুধীর রঞ্জন বর্মন। নিম্ন আদালতে পার্টি যখন যাকে পারত নিয়োগ করত। আমার মামলা লড়েছিলেন প্রয়াত আইনজীবী প্রয়াত মধুসূদন মজুমদার। তাকে আমি ১৯৭৮ সনে আইন ব্যবসায় যোগ দেওয়ার পর দীর্ঘদিন সহকর্মী হিসেবে পেয়েছিলাম। সেবার সর্বমোট ১৯ কি ২০ দিন জেলে ছিলাম। কোন একজনের কান কেটে দেওয়ার অভিযোগ ছিল আমার বিরুদ্ধে। সেই কানকাটা ব্যক্তির পূর্ণ বিবরণ এবং জখমি রিপোর্ট আদালতে পুলিশ ধার্য তারিখে জমা দিতে না পারায় জামিন পেয়ে যাই। তারপর আর কোনদিন কোর্টে যেতে হয়নি। সেই মামলাও পুলিশ আর চালায়নি। তখন জেলখানার ভেতরের অবস্থা ছিল নরকে বর্ণিত অবস্থার চেয়ে অনেক খারাপ। খাওয়া-দাওয়া ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। বিচারাধীন আটক ব্যক্তি, সাজাপ্রাপ্ত কয়েদি সকলকে একসাথে পাকা উঁচু মেঝের ওপর কম্বল বিছিয়ে ঘুমোতে হত। সকাল ৮টায় সবাইকে ঘর থেকে বের করে বাইরে এনে সাজাপ্রাপ্ত কয়েদিদের দিয়ে রুম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তালা দিয়ে রাখা হত। সকাল ৯টা নাগাদ সবাইকে পাতলা ডাল এবং সব্জি দিয়ে ভাত খেতে বসিয়ে দেওয়া হত। সূর্যাস্তের আগে রাতের খাওয়ার

খেয়ে রুমে ঢুকে যেতে হত। যাদেব জেল ক্যান্টিনে টাকা জমা দেওয়া হত তারা চা টিফিন পয়সা দিয়ে ক্যান্টিনে খেতে পারত। বিনোদনেব জন্য কোন রকমের ব্যবস্থা ছিল না। সন্ধ্যের পর কয়েদি, আসামি সবাইকে রুম থেকে বেব করে এনে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুণতি করা হোত। সব কয়েদি বিচারাধীন আসামিকে অসুস্থ না থাকলে অবশ্যই গুণতির সময় হাজির হতে হোতো। সে সময় জেলসুপার প্রয়াত ননী গোপাল কর ভৌমিক উপস্থিত থাকতেন সাহেবি লম্বা গাউন পবে। প্রত্যেক আসামির বা কয়েদির নাম ডাকলে তাকে জেল সুপারের সামনে প্রায় কোমর পর্যন্ত নত হয়ে 'হাজির হুজুর' বলতে হত। প্রথম যেদিন আমি জেলে যাই তখন সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল। তাই গুণতির সময় উপস্থিত থাকতে হয়নি। জেলখানায় আমি ঢোকার আগেই যেহেতু সবাইকে রাতের খাওয়ার খাইয়ে দেওয়া হয়েছিল সে কারণে আমাকে চিঁড়ে আর গুড় খেতে দেওয়া হয়। চিঁড়ের মধ্যে পোকা কিলবিল করছিল। আমি পোকার জন্য চিঁড়ে ও গুড় নিতে অস্বীকার করি। কোর্ট থেকে আসামি সেদিন দেরিতে জেলখানায় নেওয়ার জন্য তখনও জেলখানার কয়েদিদের সব রুম বন্ধ করা হয়নি। কয়েদিরা বাইরে ইতস্তত ঘোরাঘুরি কবছিল। আমি চিঁড়ে-গুড় খেতে অস্বীকার কবায় কয়েদি কালা মিএগ বলে ওঠে—টিযা যেমন ট্যা, ট্যা করে রে। এরপরই গেদু, কালা, সোনারাম এরা চুলের মুঠি ধরে বেধড়ক মার দেয় আমাকে। আমি কোন কারণ বুঝে উঠতে পারিনি। পরে জানতে পেরেছিলাম বাচ্চু দত্ত এদেরও এই গ্রুপটাই প্রচণ্ড মারপিট কবত ওরা জেলে থাকার সময়। মারের চোটে আমার অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার অবস্থা। প্রায় দু'দিন বিছানা থেকে উঠতে অসুবিধা হয়েছিল। গায়ে জ্বর চলে এসেছিল। আমাব জেলে থাকার তৃতীয় দিনে সকাল ৮-৩০ মিঃ নাগাদ যখন আমাদের বের করে দিয়ে রুম সাফাই-এর কাজ চলছে তখন আমি পাহারারত জেল ওয়ার্ডারের অনুমতি নিয়ে রুমের ভেতর বাথরুমে যাই প্রাতঃকৃত্য করার জন্য। বাথরুম থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে রুম সাফাইরত কয়েদি গেদু মিএগ আমাকে আবার মারতে উদ্যত হয়। তখন আমার বয়েস মাত্র ১৯ বছর, স্বাস্থ্য ও মোটামোটি ভালই বলা চলে। আমি রাগ সম্বরণ করতে পারিনি। হাতের টিনের মগ দিয়ে গেদু মিএগকে পাল্টা মার দেই। এরপর কালা, সোনারাম এবং এদের অন্যান্য সাঙ্গপাঙ্গরা এসে আমাকে বেধড়ক মার দেয়। আমার ডান কানের পর্দা ফুটো হয়ে যায়, জ্বর চলে আসে। একটু সুস্থ হয়ে আমি ক্যান্টিনে সোনারাম দেববর্মাকে চা-বিস্কিট, বিড়ি ইত্যাদি খাইয়ে হাত করি। তার কাছ থেকে জানতে পারি জেল কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে কিছু লাভ নেই। এদের জ্ঞাতসারে এবং প্রশ্রয়েই সব হচ্ছে। সোনারামকে দিয়ে গেদু মিএগর বিড়ির প্যাকেট, কালা মিএগর বিছানার তলায় রাখলাম। সেই ঘটনা নিয়ে এক প্রস্থ মারামারি হয়ে গেল কালা মিএগর গ্রুপ আর গেদু মিএগর গ্রুপের মধ্যে। পাশাপাশি আমি মোটামুটি শিক্ষিত কয়েদি যারা তাদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে রেখেছিলাম। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সাহায্য আমাকে করেছিল বিলোনীয়ার ধর্ষণ মামলায় ৭ বছরের সাজাপ্রাপ্ত কয়েদি বিনয়, তার পদবী ভুলে গেছি। কালা আর গেদুর মারামারির পর সমস্ত কয়েদিদের নিয়ে সভা করে কালা আর গেদুকে কান ধরে ওঠ-বসের শাস্তি দেওয়া হল। কয়েদিদের মধ্যে কয়েকজনকে নিয়ে স্থায়ী কমিটি করে দেওয়া হয় কয়েদিদের মধ্যে কোন মতান্তর হলে সেই সমস্যা মিটানোর জন্য। এরপর দিন সাতেক জেলে শান্তিতেই কাটিয়ে, জামিনে জেল

থেকে মুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরি। বাড়ি ফিরে ডান কানে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করি। ডাক্তার দেখিয়ে জানতে পারি কানের পর্দা ফুটো হয়ে গেছে। ইঞ্জেকশান নিয়ে, ওষুধ খেয়েও কিছু হয়নি বহুদিন। এরমধ্যে মামা কেশব বলল, কানের মধ্যে পেঁপে গাছের সরু ডগা ঢুকিয়ে অন্যপ্রান্তে কাপড়ের টুকরো পুড়িয়ে আগুন জ্বালালে সেই উত্তাপে কানের ভেতর ঢুকে থাকা জল বাষ্প হয়ে বেরিয়ে আসবে। আমার কান ফুটো হয়নি, কানে জল ঢুকে বিপত্তি বাধিয়েছে বলে মামার ধারণা। মামার দেওয়া নিদান ফেলি কি করে ? মামার কথামত পরীক্ষা করতে গিয়ে কানের ফুটো আরো বড় হয়েছে বলে আমার ধারণা। খুব জ্বালিয়েছে এই কান। প্রায়ই কান দিয়ে জল পড়ত। প্রচণ্ড ব্যথা হত, অস্বস্তি হত।

১৯৯১ সনে মাদ্রাজে গিয়ে মাইক্রোসার্জারি করি এবং কানের পর্দায় গ্রাফটিং হয়। কোলকাতা থেকে সড়কপথে আগরতলা আসতে গিয়ে ঠাণ্ডা লেগে কানের পর্দার গ্রাফটিং ছুটে যায়। এরপর ৬/৭ বছর পর আমার ছোট ভাই ডাঃ তরুণ গুহ যখন দিল্লির এইমস্ হাসপাতালে মাস্টার ডিগ্রি করতে যায় তখন তার তত্ত্বাবধানে আবার আমার কানের পর্দা মাইক্রোসার্জারি করে গ্রাফটিং করা হয়। তারপর থেকে এখন পর্যন্ত ভাল আছি। জেল থেকে বেরুবার পরও বহুবার গেদু মিঞা, কালা মিঞা, সোনারাম এদের কোর্টে বিভিন্ন কেসে আসতে হত। আমি কোর্টে যোগ দেওয়ার পর এরা সর্বদা আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। সাজা খেটে বেবিয়ে সোনারাম রিক্সা চালাত। থাকত বনমালীপুর। যখনই তাব রিক্সায় উঠতাম জোর করেও ভাড়া দিতে পারতাম না। আমার জেলখানা থাকার সময় তখনকার ছাত্র-যুব কর্মীরা এবং পার্টি সমর্থক কর্মচারী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সহযোদ্ধারা প্রতিনিয়ত আমার খবর নিয়েছেন। সে সময়ে কর্মচারী আন্দোলনের নেতা বর্তমানে আইনজীবী ভবেশ দাসের তেজস্বিতা এবং সাহস যাঁরা না দেখেছেন তাঁরা কল্পনাও করতে পারবেন না সে সময়ের ভবেশ দাসের চেহারা। যত বড় হোমরা-চোমবা হোক না কেন উচিত কথা মুখের উপর বলে দেওয়ার সাহস একমাত্র ভবেশদারই ছিল। জেলের ভেতরে আমার ওপর শারীরিক নিগ্রহের খবর পার্টি আগেই জেনে গিয়েছিল। আমি যেদিন জেলখানা থেকে বেরুলাম সেদিন বেরিয়ে দেখি অন্য আরো অনেকের সঙ্গে জেলখানার সামনে বটগাছের নীচে ভবেশদাও আমার প্রতীক্ষায় বসে আছেন। ভবেশদা আমার কাছে জেলের ভেতরের সব ঘটনা শুনে সেদিনই যে ভাষায় জেলের ডেপুটি সুপার মধুসূদন চক্রবর্তীকে সামনা-সামনি গালাগাল করেছিলেন আমারই কান দুটো লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য এতে মধুবাবুর কোন ভাবান্তর হয়েছিল কিনা বোঝা যায়নি।

১৯৬৭ সনে সদর মহকুমায় শুধু নয়, সারা রাজ্যে বাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় একমাত্র রানীরবাজার স্কুল ছিল ছাত্র ফেডারেশনের শক্ত ঘাঁটি। সেই স্কুলের ছাত্ররা রাজনৈতিক কারণে নয়, ছাত্র ফেডারেশনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল মূলত সেই স্কুলের শিক্ষকদের আকর্ষণে। রানীরবাজার স্কুলের তখনকার সময় শিক্ষকতা করতেন বর্তমান কৃষিমন্ত্রী অনিল সরকার, বর্তমান সাংসদ খগেন দাস, সি.পি.আই (এম) রাজ্য কমিটির সদস্য শ্রীশ ভট্টাচার্য, রানীরবাজার এলাকার পার্টিনেতা জগদীশ দে, অরুণ মজুমদার, সুভাষ দাস ইত্যাদি কৃতি শিক্ষকরা। তখন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন রাজ্যের অগ্রণী শিক্ষাবিদ প্রয়াত অনন্ত কৃষ্ণ ধর।

১৯৬৭ সনে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে সি.পি.আই (এম) দল সুখময় সেনগুপ্তের নেতৃত্বে গঠিত নূতন দল ত্রিপুরা কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তেলিয়ামুড়া বিধানসভা আসনে সি.পি.আই (এম) দলের প্রার্থী হিসাবে দাঁড়ান তৎকালীন রানীরবাজার স্কুলের শিক্ষক অনিল সরকার। তার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন কংগ্রেসের প্রফুল্ল দাস। তেলিয়ামুড়া বিধানসভা আসনে শিক্ষক অনিল সরকারের সমর্থনে সেবার রানীরবাজার স্কুলের ছাত্র (বর্তমান মন্ত্রী মানিক দে-র বড়ভাই) দীপক দে, জিতেন দাস, সুদর্শন দাস ও আরো কয়েকজন নির্বাচনেব কাজ করতে গিয়েছিলেন। সোনামুড়া মহকুমায় তখন ২টি বিধানসভা আসন ছিল। কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে সেবার দাঁড়িয়েছিলেন মনসুর আলি ও দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী। সি.পি.আই (এম) সমর্থিত নির্দল হিসাবে বরদাচরণ পাল এবং সি.পি.আই (এম) দলেব সমর্থনে ত্রিপুরা কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন ধীরেন সেন। সি.পি.আই (এম) সমর্থিত নির্দল এবং ত্রিপুরা কংগ্রেসের প্রার্থীদের সমর্থনে নির্বাচনী কাজ করার জন্য তৎকালীন রানীরবাজার স্কুলের ছাত্র বিজন ধর, মানিক দে, মনোরঞ্জন পাল এরা গিয়েছিলেন। ১৯৬৭ সনের নির্বাচনে ৩০টি বিধানসভা আসনেব মধ্যে মাত্র দু'টি আসন সি.পি.আই(এম) দল এবং সি.পি.আই ১টি আসন পেয়েছিল। সদরেব উত্তর দেবেন্দ্রনগর বিধানসভা আসন থেকে প্রয়াত অভিরাম দেববর্মা এবং খোয়াই মহকুমাব কল্যাণপুর বিধানসভা আসন থেকে বিদ্যা দেববর্মা সি.পি.আই(এম) প্রার্থী হিসাবে বিজয়ী হয়েছিলেন। চড়িলাম বিধানসভা আসনে সি.পি.আই প্রার্থী হিসাবে বিজয়ী হয়েছিলেন প্রয়াত অঘোর দেববর্মা। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণাব পর রানীরবাজার স্কুলের তৎকালীন প্রধানশিক্ষক প্রয়াত অনন্ত কৃষ্ণ ধর মানিক দে, দীপক দে, সুদর্শন দাস ও জিতেন দাসকে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির তরফে ফোর্স ট্রান্সফার সার্টিফিকেট ধরিয়ে দেন। সেই ট্রান্সফার সার্টিফিকেটে কারণ হিসাবে লেখা ছিল— 'you are undesirable to the interest of the School'। রানীরবাজার স্কুল ম্যানেজমেন্টের এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পেছনে কারণ ছিল উপরোক্ত ছাত্ররা বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচনি কাজে অংশগ্রহণ করেছিল। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সমস্ত সদর মহকুমা এবং রাজ্যজুড়ে ছাত্র বিক্ষোভ দেখা দেয়। সদর মহকুমায় ২৮ দিন লাগাতর ছাত্র ধর্মঘটের পর স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের দাবির কাছে মাথা নত করে রানীরবাজার স্কুলের ৪ জন ছাত্রের উপর থেকে ফোর্স ট্রান্সফার সার্টিফিকেট প্রত্যাহার করে নেয়। সে সময় নরসিংগড় পলিটেকনিক কলেজ এবং এম.বি.বি কলেজের ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদক এবং সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে দুলাল দাস ও নিশীথরঞ্জন দাস। তাঁরা দু'জনও রানীরবাজার স্কুলের বিতাড়িত ছাত্রদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন। বিজন ধর স্কুল থেকে ফোর্স টি.সি না পেলেও ১৯৬৭ সনেই নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনে এসে ভর্তি হয়ে যায়। সে সময় জেলাশাসক ছিলেন মিঃ কানোয়ার, শিক্ষা অধিকর্তা ছিলেন জি.এন. চ্যাটার্জি, অতিরিক্ত জেলাশাসক ছিলেন এম.এল দাসগুপ্ত এবং মহকুমাশাসক ছিলেন এস.আর চক্রবর্তী। সমগ্র প্রশাসন ছিল ভীষণভাবে কংগ্রেস দল দ্বারা প্রভাবিত এবং পক্ষপাতদুষ্ট। ক্রমাগত স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে রানীরবাজার স্কুলের তৎকালীন প্রধানশিক্ষক প্রয়াত অনন্ত কৃষ্ণ ধরের ওপর রাজনৈতিক চাপ চলতে থাকায় তিনি তিতিবিরক্ত হয়ে রানীরবাজার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের



আশুতোষ দে, বিমল সিনহা, বিভাস কিলিকদার ও গুরুদাস চৌধুরী

পদ থেকে পদত্যাগ করে বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ স্কুলে ১৯৬৮ সনে প্রধান শিক্ষক পদে যোগ দেন।

১৯৭০ সনে বানীরবাজার এলাকায় ননী সাহা নামে একজন কংগ্রেস কর্মী আততায়ীদের হাতে খুন হন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঐ এলাকার বিশেষত রানীরবাজার স্কুলের বামপন্থী শিক্ষক ও ছাত্রদের উপর শুরু হয় প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক নগ্ন আক্রমণ। শিক্ষক অনিল সরকার, খগেন দাস, শ্রীশ ভট্টাচার্য, সুভাষ দাস, জগদীশ দে ও অরুণ মজুমদারকে স্কুল কর্তৃপক্ষ চাকরি থেকে বরখাস্ত করে। বামপন্থী ছাত্ররা রানীরবাজার স্কুল হোস্টেল ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। সুদর্শন দাস চলে আসে কাশীপুব। এবং অন্যান্যরা যার যার বাড়িতে চলে যেতে বাধ্য হয়। জিতেন দাস রাজনৈতিক চাপ সহ্য করতে না পেরে কংগ্রেস দলের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

১৯৭০ সনে মানিক দে চম্পকনগব এলাকার রেশনশপ ডিলার জনৈক মতিলাল দে-র বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। ঐ বেশনশপ ডিলার সরল, নিরীহ উপজাতিদেব রেশনেব নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বরাদ্দেব চেয়ে অনেক কম বিলি কবত। ঐ রেশনশপ ডিলার মানিক দে-র বিরুদ্ধে তাকে শাবীরিক নিগ্রহ করেছে বলে মামলা দায়ের করে। সেই মামলায মানিক দে-কে গ্রেপ্তার কবে এ.ডি.এম, এম. এল দাশগুপ্তের কোর্টে তোলা হয়। যথাবীতি তার জামিন নামঞ্জুর করে মানিককে জেলহাজতে পাঠানো হয়। সে সময় বিচারব্যবস্থা প্রশাসন থেকে আলাদা ছিল না বলে রাজনৈতিক প্রভাব বিচার ব্যবস্থার ওপর ভীষণভাবে ক্রিয়াশীল হত।

মানিক দে-র গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সদর পূর্বাঞ্চলের ছাত্ররা ৭ দিন লাগাতব ছাত্র ধর্মঘট করে। রেশনশপ ডিলার মতিলাল দে ছিল আগরতলা বোধজং স্কুল এলাকা বনমালীপুরের বাসিন্দা। সে সময় আমার বাবা ছিলেন ফুড ইন্সপেক্টর। সেই সুবাদে আমি মতিলাল দে-র সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মানিক দে-র বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারে সম্মত করাই। থানায় এবং এম.এল. দাশগুপ্তের কোর্টে মতিলাল দে-র মামলা প্রত্যাহারের লিখিত আবেদন জমা দিই। তারপর মানিক দে জেল থেকে মুক্তি পায় প্রায় ১৪ দিন পর।

সে বছরই মানিক বীরবিক্রম সান্ধ্য কলেজে বি.এ পার্ট ওয়ানের মাত্র দু'টি পরীক্ষা দিয়েছিল। তারপর এসব মামলা মোকদ্দমার ঝামেলায় সে আর পরীক্ষা দিতে পারেনি, তার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। পার্টির নির্দেশে মানিক ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টে কাজ শুরু করে। মটরস্ট্যান্ড, মোটর কর্মী সমিতি অফিসে নিয়মিত ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী হিসাবে কাজ শুরু করে।

আজ সে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়ন নেতা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করতে পেরেছে। তার এতদিনের সংগ্রাম ও নিরলস পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।

১৯৬৯ সনে উদয়পুরে ত্রিপুরা রাজ্য ছাত্র ফেডারেশনের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে বীরেন দত্ত'র জ্যেষ্ঠা কন্যা অরুণা দত্ত সংগঠনের সভানেত্রী এবং সুজিত দত্ত (বর্তমানে প্রথিতযশা আইনজীবী ও বি.জে.পি নেতা) সম্পাদক পদ থেকে অব্যাহতি নেন। তাদের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় ত্রিপুরা রাজ্য ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি পদে বাদল চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক পদে মানিক সরকারকে। ১৯৭০ সনে সি.পি.আই (এম) দল সিদ্ধান্ত নেয় সর্বভারতীয় ছাত্র সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। সে অনুযায়ী ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯৭০ সনের ২৭, ২৮, ২৯, ৩০ ডিসেম্বর কেরলের রাজধানী ত্রিবান্দ্রমের 'টেগোর হলে'। মোট ৪ দিন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে আমরা ই.এম.এস নাম্বুদ্রিপাদ, এ.কে. গোপালন, পি. সুন্দরাইয়ার মত প্রবাদপ্রতিম সৎ, আদর্শবাদী, কমিউনিস্ট নেতাদের সংস্পর্শ পাই।

এই সম্মেলনে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের শতাধিক বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিনিধিরা যোগ দেন। ৩০৩টি কলেজ এবং ৩৯টি স্কুলের প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেছিল। ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিল। সম্মেলনে মহিলা প্রতিনিধি এবং দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মোট ৪৯ জন।

ত্রিপুরা থেকে আমরা মোট ৪৯ জন প্রতিনিধি ট্রেনে করে ৪/৫ দিন দীর্ঘ সফর শেষে এস.এফ.আই-এর প্রথম আত্মপ্রকাশের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলাম। ছাত্রী প্রতিনিধি ছিল ৭ জন, ছাত্র প্রতিনিধি ছিল ৪২ জন।

মহিলা প্রতিনিধি হিসেবে যারা সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন তারা হলেন পাঞ্চালী ভট্টাচার্য, ফুলন ভট্টাচার্য, রীনা সেনগুপ্তা, রমা দাস, মনীষা দাশগুপ্তা, কৈলাসহরের সুনন্দা ভট্টাচার্য এবং বিলোনীয়ার রাধা দাস। সেই সম্মেলনে বাদল চৌধুরী, মানিক সরকার, বিজন ধর, মানিক দে, সমীরণ রায়, শঙ্করদা, আমি, মনোরঞ্জন পাল, সুভাষ চক্রবর্তী (হো-চি-মিন) এবং আরো অনেকেই যোগ দিয়েছিলাম। অন্যান্য মহকুমাভিত্তিক প্রতিনিধি তালিকা মনে করতে পারছি না। তবে কমলপুর বিভাগ থেকে রণজিত ঘোষ গিয়েছিল মনে আছে। কৈলাসহর থেকে সুনন্দা ভট্টাচার্য ছাড়াও প্রতিনিধি হিসাবে গিয়েছিল বিমল সিন্‌হা, রসরঞ্জন বণিক, গুরুদাস চৌধুরী, পান্নালাল



এস. এফ. আই কনফারেন্স ১৯৭০ : রমা দাস, পাঞ্চালী ভট্টাচার্য, মণীষা দাশগুপ্ত, ফুলন ভট্টাচার্য, শঙ্কর দাস, ধীরাজ গুহ, সুদর্শন দাস ও মানিক দে

ভট্টাচার্য ও জনৈক নীলু যার পদবি এখন মনে নেই।

সম্মেলন চলাকালিন সময়ে দেখেছি ই.এম.এস নাম্বুদ্রিপাদ, এ.কে. গোপালন এবং কেরলের প্রথম সারির নেতারা ত্রিবান্দ্রম শহরে দোকানে দোকানে আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছেন। এই কিংবদন্তী নেতারা যখন সম্মেলনের জন্য প্রকাশ্যে চাঁদা সংগ্রহে বেরিয়েছেন হাজার-হাজাব লোক জড়ো হয়েছিলেন তাদের দেখতে। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। ১৯৭০ সনে কেরলে চলছিল সম্ভবত কংগ্রেস শাসন। ১৯৫৯ সনে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে বিমোচন আন্দোলনের ফলে কেরলে ই.এম.এস নাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ কমিউনিস্ট সরকারকে বরখাস্ত করে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু অগণতান্ত্রিকভাবে কংগ্রেস সরকারকে ক্ষমতায় আসার সুযোগ করে দিয়েছিলেন রাজ্য শাসনের জন্য।

কিন্তু জনগণের শ্রদ্ধা, সমীহ ছিল কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের প্রতি। বিশেষত তাঁদের সততা এবং আত্মত্যাগের কারণে।

সম্মেলন চলাকালিন সময়ে রাত্রিবেলা কেরলের বিভিন্ন সমুদ্রতটে জনসভা অনুষ্ঠিত হত। লোকেরা রাত্রিবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর জনসভায় এসে যোগ দিত। এই অভূতপূর্ব দৃশ্য একমাত্র দক্ষিণ ভারতেই আজও দেখা যায়।

ত্রিপুরা থেকে আমরা যখন সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলনে যোগ দিতে যাচ্ছি তখন তামিলনাড়ুর এগমোর রেলস্টেশনে পুলিশ বিনা কারণে আমাদের ওপর লাঠিচার্জ করে। কারণ তৎকালীন জনসংঘ নামক সাম্প্রদায়িক দলের ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সম্মেলনের প্রতিনিধিরাও একই ট্রেনে যাচ্ছিল এবং ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদের সঙ্গে বিবাদ সৃষ্টি করেছিল।

এস.এফ.আই প্রথম সম্মেলনে নির্বাচিত ২৯ জন কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সদস্যের মধ্যে নিম্নোক্ত ১৪ জনের নাম মনে করতে পারছি।

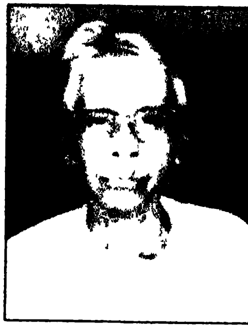
সভাপতি	:	সি. ভাস্করণ (কেরালা)
সাধারণ সম্পাদক	:	বিমান বসু (পঃবাংলা)
সহ-সভাপতি	:	এন. রাম (তামিলনাড়ু)
		পি. মধু (অন্ধ্রপ্রদেশ)
		উমেন্দ্র কুমার সিং (বিহার)
		বলদেব সিং (পাঞ্জাব)
		সুভাষ চক্রবর্তী (পঃবঙ্গ)
যুগ্ম সম্পাদক	:	বাবু হরদয়াল (কেরালা)
		শক্তিধর দাস (ওড়িশা)
		মানিক সরকার (ত্রিপুরা)
		শ্যামল চক্রবর্তী (পঃবঙ্গ)
		রঞ্জন গোস্বামী (পঃবঙ্গ)
সদস্য	:	বাদল চৌধুরী (ত্রিপুরা)
		নৃপেন সেন (পঃবঙ্গ)

১৯৭১ সনের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু প্রয়াত শেখ মুজিবর রহমান ঢাকার রমনা ময়দানে এক ঐতিহাসিক সমাবেশে বাংলাদেশকে পাকিস্তানি শাসকদের হাত থেকে মুক্ত করতে মুক্তিযুদ্ধের আহ্বান জানালেন। বাংলাদেশে শুরু হয়ে গেল মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রাম। ২৫শে মার্চ, ১৯৭১ পাকসেনারা গ্রেপ্তার করল শেখ মুজিবকে। সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্য বিশেষত আগরতলা শহর তখন হয়ে দাঁড়াল বাংলাদেশি মুক্তিযোদ্ধাদের স্বাধীন বিচরণক্ষেত্র। তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সরাসরি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন জানালেন। সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত হয়ে গেল বাংলাদেশের মুক্তিকামী জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অবারিত দ্বার। পাক সেনাদের বীভৎস অত্যাচারের হাত থেকে বিশেষত মহিলাদের সম্ভ্রম এবং ইজ্জত বাঁচানোর জন্য দলে দলে হাজার হাজার শরণার্থী এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন আমাদের রাজ্যে। বিশালগড় সংলগ্ন গকুলনগর এলাকায় গড়ে উঠেছিল একটি শরণার্থী শিবির। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তেই অসংখ্য শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন বাংলাদেশের নিরীহ, অসহায় জনগণ। ত্রিপুরা রাজ্য প্রকৃত অর্থেই সে সময় হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশি মুক্তিকামী মানুষের কাছে দ্বিতীয় স্বদেশ।


কানু ঘোষ

১৯৭১ সনে খোয়াই রামচন্দ্রঘাট এলাকায় সি.পি.আই (এম) দলের রাজ্য সম্মেলনের প্রাক্কালে সারা রাজ্যজুড়ে সি.পি.আই (এম) দলের ব্রাঞ্চ, লোক্যাল কমিটি, জেলা কমিটি প্রভৃতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত করতে হয়েছিল দলীয় কর্মসূচি এবং গঠনতন্ত্র অনুযায়ী। তারই প্রস্তুতি হিসাবে গকুলনগর শরণার্থী শিবিরের কোল ঘেঁষে যে রাস্তা চলে গিয়েছিল নেহালচন্দ্রনগর সেখানে পার্টি কমরেড দেবেন্দ্র রুদ্রপালের বাড়িতে পার্টি লোক্যাল কমিটির সভা করতে একদিন বিকেলে গিয়েছিলেন চিত্ত চন্দ, প্রয়াত কানু ঘোষ এবং আমার অকৃত্রিম বন্ধু সহযোদ্ধা হরিবল দেবনাথ (বর্তমানে আইনজীবী, আগরতলা বারে কর্মরত)। সভা শেষ হতে হতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। চিত্তদা, কানুদা এবং হরিবল পায়ে হাঁটা একটি শর্টকাট রোড ধরে বিশালগড় আসার জন্য রওনা দেয়। উদ্দেশ্য ছিল বিশালগড় পৌঁছলে কোন একটি গাড়ি ধরে আগরতলা শহরে পৌঁছুতে পারবেন। পথপ্রদর্শক ছিলেন কানুদা। প্রায় একঘণ্টা হাঁটার পর চিত্তদা বারবার জিজ্ঞেস করছিলেন কানুদাকে—আপনি সঠিক রাস্তা চেনেন তো? কানুদা স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে উত্তর দিয়েছিলেন এ সমস্ত এলাকা আমার হাতের তালুর মত চেনা। আরও অনেকক্ষণ হাঁটার পর দেখা গেল এরা তিনজনই গভীর জঙ্গল এবং অসমান চড়াই উতরাই, লুঙ্গার মধ্যে হারিয়ে গেছেন।

হরিবল বলে কানুদা, চিত্তদা রাত্রি শেষ না হলে আর কিছু করার নেই। আমরা রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। ভোর না হলে রাস্তা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। আমাদের গাছে উঠে রাত কাটাতে হবে, কেননা এসব জঙ্গলে বাঘ বা অন্য যে কোন হিংস্র জানোয়ার আমাদের



চিত্ত চন্দ

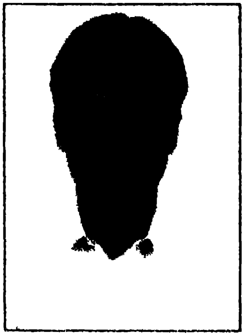
আক্রমণের সুযোগ নিতে পারে। কানুদা বললেন, অসম্ভব। গাছের কোটরে বিষধর সাপ থাকে, সুতরাং গাছে ওঠা যাবে না। চিত্তদা ক্ষেপে ওঠেন—বললেন, কানুবাবু বারবার জিজ্ঞেস করলাম রাস্তা চেনেন কিনা? এমন একটা ভাব করলেন যেন আপনার জমিদারি, ক্ষেত-খামার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছি। এখন কী দুর্বিসহ অবস্থায় আমাদের ফেলেছেন বলুন তো! কানুদা মোটেও চিত্তদার কথায় রাগ করলেন না। বললেন, চিত্তবাবু বাঘেই খাক আর সাপেই কাটুক, মরে গেলে পার্টির কাছে কি জবাব দেব ? চিত্তদা বললেন, মরে গেলে আপনার কাছে জবাব চাইতে আসবে কে? হরিবল চিন্তা করল— চোর, ডাকাতদেব নিরাপদ আশ্রয়স্থল হল এসব ঘন জঙ্গল। এদের হাতে পড়লে তো আরও বিপদ হতে পারে। সে তখন জোরে চিৎকার করল কে আছ, আমাদের বাঁচাও, সাহায্য কর। কিছুক্ষণ পর বাঁশের মশাল নিয়ে দু'জন উপজাতি লোক কানুদা, চিত্তদা এবং হরিবল যেখানে বসেছিল সেখানে এল। হরিবল উপজাতি দেখে বুদ্ধি করে বলল, আমরা দশরথ দেবের পার্টি করি। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। সে দু'জন উপজাতি সহযোদ্ধা হরিবল, কানুদা, চিত্তদাকে জল খেতে দেয়। তাঁরা জল খেয়ে হাতে-পায়ে লেগে থাকা কাদা ধুয়ে নেন এবং এক উপজাতি কমরেডের বাড়িতে চা খায়। তারপর উপজাতি সেই দু'জন সহযোদ্ধার কাছ থেকে জানতে পারে তারা এতক্ষণ কোনাবন এলাকায় জঙ্গলে অবস্থান করছিলেন। উপজাতি কমরেডরা হেঁটে কানুদা এদের আগরতলা ও বিশালগড় রাস্তার উপর গকুলনগর শরণার্থী ক্যাম্পেব পাশে তুলে দিয়ে যায়। তখন রাত প্রায় ৯টা হবে। রাজ্যে তখন উগ্রপন্থী সমস্যা ছিল না। কানুদা এঁরা শরণার্থী শিবিরে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসা একটি গাড়ি পেয়ে সেই গাড়িতে আগরতলা ফিরে আসেন। কানুদাকে মৃত্যুর পর কিভাবে তাঁদের মৃত্যু হল তার জবাব পার্টিতে দেবার বিড়ম্বনা আর সহ্য করতে হয়নি সেটাই রক্ষা।



হরিবল দেবনাথ

২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সনে এম.বি.বি কলেজে প্রথম বর্ষ বি.এ ক্লাশে ভর্তি হতে গিয়ে ধলেশ্বর কল্যাণী এলাকার বামপন্থী আন্দোলনের অগ্রণী সৈনিক ক্ষীরগোপাল দে (শনি) খুন হয়ে যায় প্রকাশ্য দিবালোকে কংগ্রেস সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের দ্বারা। তখন একটা সন্ত্রস্ত, টালমাটাল রাজনৈতিক আবহাওয়া চলছিল কলেজে। ক্ষীরগোপাল খুনের পর সে বছর ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ হয়ে যায়।

বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছাত্রদের কলেজে ক্লাশ করতে যাওয়া ঝুঁকির ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। একদিকে নকশাল অন্যদিকে কংগ্রেসীদের সাঁড়াশি আক্রমণে সবাই তখন একটা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে শুরু করেছিল। আমাদের কল্যাণীর বাড়িতে তখন আমরা



মধুসূদন ভট্টাচার্য

সবাই যে ঘরে বসবাস করতাম তার বাইরে নূতন একটি টিনের ঘর, বাঁশের বেড়া, মাটির মেঝে দিয়ে আমার জন্য তৈরি হয়েছিল। আমি সে ঘরে একা থাকতাম। অবশ্যই আমার কলেজের সহপাঠীরা এবং পার্টি সহযোদ্ধারা কেউ কেউ মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে থাকত। শিবনগরের লম্বা মধু ছিল দুর্দান্ত সাহসী এবং বেপরোয়া। ক্ষীরগোপালের মৃত্যুর কয়েকদিন পর মধু আমার ছোটভাই তপন, কল্যাণী এলাকার পার্টিকর্মী তপনের সমবয়সী বন্ধু অর্জুন লস্কর, সন্তোষ দেবনাথ, কানু দাস এদের নিয়ে আমার টিনের ঘরে বোমা বানাতে বসে গেল দুপুরবেলা। আমি তখন বাড়িতে ছিলাম না। পার্টি অফিসে ছিলাম। গ্রীষ্মের অলস দুপুর। মা কাজকর্ম সেরে দুপুরে একটু জিরিয়ে নিচ্ছেন। বাবা অফিসে। এরই মধ্যে আমার ঘরে যে এত কিছুর প্রস্তুতি চলছে সেটা মা টেরও পাননি। বিকেল গড়িয়ে যখন সন্ধ্যা হয় হয় তখন অসতর্কতার জন্য তৈরি হয়ে যাওয়া একটি বোমা হঠাৎ বিস্ফোরিত হয়। গুরুতর আহত হয় মধু। ওর বাঁ-হাতের ৪টি আঙুল উড়ে যায়। মধু আমার ছোটভাই তপন এরা নিতান্ত কমবয়েসি ১৫/১৬ বছরের ছেলে ছিল বলে ওদের কোন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ না দিয়ে নিজেই ঝুঁকির কাজ কাঁধে তুলে নিয়েছিল। সে কারণে বোমা বিস্ফোরণে মধু একাই আহত হয়। তপন, অর্জুন, সন্তোষ, কানু এদের কারো কিছু হয়নি। তখনও মোবাইল আবিষ্কার হয়নি। টেলিফোন পরিষেবাও ছিল সীমাবদ্ধ। সে যাহোক আমরা পার্টি অফিসে খবর পেয়ে যাই। তখন পার্টি অফিসে নৃপেন চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করি। নৃপেনদাকে বিজয় সিংহরায় ও আমি মিথ্যে কথা বলি। ওঁকে জানাই কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে মধুকে কংগ্রেস সমর্থক ছাত্ররা বোমা ছুঁড়ে মেরেছে, সেই বোমা হাত দিয়ে আটকাতে গিয়ে ওর হাত জখম হয়েছে। নৃপেনদা মধুকে তৎক্ষণাৎ জি.বি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। আমি, বিজয়, অরবিন্দ ভট্টাচার্য এবং আরো কয়েকজন মিলে একটি এম্বাসাডার গাড়ি রিজার্ভ করে মধুকে জি.বি হাসপাতালে নিয়ে যাই। ওর বাঁ-হাতের তখন বীভৎস অবস্থা। ৪টি আঙুল নেই। রক্তে ভেসে যাচ্ছে। একটি গামছা ক্ষতস্থানে চেপে ওকে নিয়ে গেলাম হাসপাতালে। মধুর মুখে টুঁ শব্দ নেই, কোন অভিব্যক্তি নেই যন্ত্রণার। কি প্রচণ্ড সহ্যশক্তি ছিল ওর, না দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না। হাসপাতালে বেড নেই। মেঝেতে কম্বল পেতে ওকে বেশ কয়েকদিন কাটাতে হয়েছিল। পরের দিন সকালে মধুর হাতের অপারেশন হল। রাত্রিতে বিজয় এবং অরবিন্দ হাসপাতালে মধুর সঙ্গে ছিল। মেঝেতে একটি লাল কম্বলে মধু শুয়েছিল। সারারাত্রি মধুর হাত থেকে রক্তক্ষরণের ব্যাপারটা লাল কম্বলের জন্য বোঝা যায়নি। সকালবেলা অপারেশন থিয়েটারের সামনে যখন স্ট্রেচার থেকে কম্বল সরিয়ে মধুকে অপারেশনের পোশাক পরানো হয়েছিল তখন বোঝা গেল সারারাত্রি নিঃশব্দে মধু কি অপরিসীম যন্ত্রণা ভোগ করেছে। কি পরিমাণ রক্তপাত তার হয়েছে। ভোরের আলোয় মধুর কম্বলে এত রক্ত দেখে বিজয় অজ্ঞানের মত হয়ে যায়। তাকে চোখে-মুখে জলের

ঝাপ্‌টা দিয়ে সুস্থ করে বাড়িতে পাঠিয়ে দিই। মধুকে প্রায় একমাসের ওপর হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হয়েছিল। তারপর সুস্থ হয়ে সে বাড়ি ফিরে আসে। কিন্তু বাঁ-হাতের ৪টি আঙুল তার কেটে বাদ দিয়ে দিতে হয়। পরবর্তী সময়েও ওকে কোনদিন আক্ষেপ করতে দেখিনি এই ঘটনার জন্য। কিংবা কোনদিন কাউকে এই ঘটনার দায়ভার চাপিয়ে দেওয়াব কোন চেষ্টা সে করেনি।

আমার বাড়িতে সেদিন বোমাটি বিস্ফোরিত হয়েছিল বিকট আওয়াজ করে। গোটা এলাকা কেঁপে উঠেছিল। মা বিকট আওয়াজে ঘুম থেকে উঠে ঘটনার আকস্মিকতায় প্রাথমিকভাবে হতভম্ব হয়ে পড়েন। বিস্ময়ের ঘোর কাটার পর মা তাড়াতাড়ি আমার ঘরে ঢুকে মধুর হাতের উড়ে যাওয়া মাংসের টুকরো পরিষ্কার করেন। ঘরে ছড়ানো-ছিটানো বোমার মশলা এবং অন্যান্য সব সরঞ্জাম সরিয়ে ফেলেন। ঘরের মেঝে তাড়াতাড়ি গোবর দিয়ে লেপে ঠাকুরের মূর্তি ও ঘট বসিয়ে ধূপ-ধূনো জ্বেলে দেন। কোতোয়ালি থানা থেকে পুলিশ আমাদের বাড়িতে বিস্ফোরণের ঘণ্টাখানেক পরে যান। বোধহয় কোন লোক বোমার আওয়াজ পেয়ে থানায় খবর দিয়েছিল। পুলিশ বাড়িতে গিয়ে বাড়িঘর তল্লাশি করে বিস্ফোরণের চিহ্নমাত্রও খুঁজে বের করতে না পেরে হতাশ হয়ে ফিরে আসে। তারপবও মাস দুই-তিনেক পুলিশ হন্যে হয়ে সন্দেহবশতঃ আমাকে খুঁজেছিল।

আমাদের বাড়িতে এবং ঘরে যেহেতু বোমাটি বিস্ফোরিত হয়েছিল সে কারণে পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করবে এ ধরনের একটা আশঙ্কা আমার মনে ক্রিয়াশীল ছিল। এই ঘটনাব পর বি.এ. কোর্সের ফাইনাল পরীক্ষার কয়েকদিন জগজ্জ্যোতি রায়-এর (বিশু) কাকার বাড়ি নন্দননগরে আত্মগোপন থাকা অবস্থায় পরীক্ষা দিয়েছিলাম। বিশুর কাকার বাড়ির যে গোয়াল ঘরের পাশের ঘরটিতে থাকতাম সেখানে প্রচুর মশা আমাকে কামড়াত বলে সেই আশ্রয়স্থল ছেড়ে আমাদের অন্যতম সহযোদ্ধা তখন মহিলা কলেজের সাধারণ সম্পাদিকা মণীষা দাশগুপ্তাদের আগরতলা কদমতলীর ভাড়াবাড়িতে এসে আশ্রয় নেই। কদমতলীর মণীষাদের ভাড়াবাড়ির গুদামে থেকেই আমি বি.এ ফাইনালের বাকি পরীক্ষাগুলি দিয়েছিলাম। খুব ভাল ভাল খাওয়ার তৈরি করে মণীষা আমাকে খাইয়েছিল সে সময়।

আমি ১৯৭১ সনে বি.এ. ফাইনাল পরীক্ষা দিই। সম্ভবত পুজোর ছুটির পর অক্টোবরের শেষভাগে বা নভেম্বরের প্রথমার্ধে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সনের মাঝামাঝি। ১৯৭১ সনের বি.এ. ফাইনাল পরীক্ষায় কিছু ছাত্র পরীক্ষায় নকল করা শুরু করে। পরীক্ষায় প্রহরারত অধ্যাপকরা এই অপ্রত্যাশিত ঘটনা দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। যতদূর মনে পড়ে সে সময়ে কর্মরত অধ্যাপক মিহির দেব, বিজন চৌধুরী এবং তাঁদের কয়েকজন সাহসী অধ্যাপক নকল করনেওয়ালা ছাত্রদের পরীক্ষা হলে গার্ড দেওয়ার সময় ধরে ফেলেন। সেই ঘটনা নিয়ে আরম্ভ হয়ে যায় গণ্ডগোল। পরীক্ষা হলের বাইরে প্রহরারত সি.আর.পি.এফ জওয়ানরা প্রিন্সিপ্যালের অনুমতি ছাড়াই অধ্যাপক এবং ছাত্রদের বচসা শুনে ঢুকে যায় পরীক্ষা হলে। অধ্যাপকদের ঘেরাও করে রাখা ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ শুরু করে। আমার আশ্রম চৌমুহনি এলাকার বন্ধু দীপক দেবনাথ (বর্তমানে এস.সি / এস.টি কর্পোরেশনের অ্যাকাউন্ট্যান্ট বাবু) পরীক্ষার খাতা থেকে মুখ তুলে দেখে অরবিন্দ ভট্টাচার্য (প্রয়াত ভীষ্মদেব ভট্টাচার্যের

ছোটভাই এবং আমাদের সহযোদ্ধা) সি.আর.পি.এফ-এর লাঠিকে নমস্কার করছে। দীপক দোতালার পরীক্ষা হল থেকে সি.আর পি.এফের ভয়ে লাফ দিয়ে নীচে লাফ দিয়ে পড়ে। একটি পায়ের হাড় ভেঙ্গে যায়। ও ল্যাংড়াতে ল্যাংড়াতে আশ্রম চৌমুহনি কৃষ্ণদার চায়ের স্টলে এসে খবর দেয় সি.আর.পি.এফ-র লাঠিচার্জে পরীক্ষা ভণ্ডুল। মার থেকে বাঁচতে সি.আর.পি.এফ-র লাঠিকে কিভাবে অববিন্দ নমস্কার দিচ্ছিল সেই ঘটনা সবিস্তারে সকলের কাছে বর্ণনা করতে গিয়ে দীপক হাসতে হাসতে মূর্ছা যাওয়ার উপক্রম। পায়ের হাড় ভেঙ্গে পা যে ফুলে ঢোল হয়ে রয়েছে সে খেয়ালও ওর ছিল না। সবাই মিলে ওকে ডাক্তারের কাছে পাঠানো হল। এক্স-রে করে দেখা গেল পায়ের হাড়ে চিড় ধরেছে। প্রায় দেড়মাস পা প্লাস্টার করে তারপর ও সুস্থ হয়েছে। আসলে সেদিন পরীক্ষা ভণ্ডুল হয়নি। পরিস্থিতি শান্ত হলে আধঘণ্টা পরেই আবার পরীক্ষা আরম্ভ হয়। সে খবর তো আর দীপক জানেনা। সে তো ভাঙ্গা পা নিয়ে কলেজ চত্বর ছেড়ে চলে এসেছে। মাঝখান থেকে দীপকের একটি শিক্ষাবর্ষ নষ্ট হয়েছিল। বি.এ. ফাইনাল দেওয়ার আগে ক্লাশ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্বাভাবিক কারণেই প্রতিদিন আর কলেজে যাই না। মাঝে মাঝে কলেজ ক্যান্টিনে গিয়ে আড্ডা দিই। ১৯৭১ সনের আগস্ট বা সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমভাগে একদিন দুপর ২/২-৩০ মিঃ সময়ে বিজয় সিংহ্ রায় দৌড়ে আমার বাড়িতে এল এবং খবব দিল মানিক সরকারকে নকশালের ছেলেরা কলেজ ক্যাম্পাসের সামনে পিঠে বোমা মারে। এরপর মানিককে বাঁধেব পাড় দিয়ে আশ্রম চৌমুহনিব দিকে নিয়ে গেছে। আমি সেদিন কলেজে যাইনি। বাড়িতেই ছিলাম। ধলেশ্বর কল্যাণী এলাকায় যেখানে আমার বাড়ি সেখান থেকে একটি ছোট টিলা অতিক্রম করে ২ মিনিটে কলেজ যাওয়া সম্ভব হত। যে কোন ধবনের বড় আওয়াজ কলেজ চত্বরে ঘটলে আমাদের বাড়ি থেকে শোনা যেত। কিন্তু সেদিন কোন বোমা বিস্ফোরণের আওয়াজ আমি শুনতে পাইনি। মনে মনে আমি আশ্বস্ত হলাম মানিকের পিঠে বিস্ফোরিত বোমাটি খুব বেশি বিপজ্জনক বিস্ফোরক হবে না ভেবে। বিজয় থেকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জেনে গেলাম মানিককে নকশাল সমর্থক ছেলেরা হাঁটিয়ে কলেজ থেকে নিয়ে গেছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে বটতলা পার্টি অফিসে যোগাযোগ করলাম। আধ ঘণ্টার মধ্যে পার্টি অফিস থেকে বাসে চেপে কল্যাণী বাস স্টপেজে এসে নামল শঙ্কর দাশ, অরবিন্দ ভট্টাচার্য, সুরজিত চক্রবর্তী, ভূপতি ভৌমিক (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত টি.আর.টি.সি কর্মী), রুনু দেববর্মা (প্রয়াত দশরথ দেবের বড় ছেলে) এবং আরো কয়েকজন। এর মধ্যেই খবর পেয়ে গেলাম আমাদের বাড়ির সামনে কল্যাণীর রাস্তা দিয়েই নকশালরা মানিককে হাঁটিয়ে নিয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, যাওয়ার পথে কল্যাণী বাস স্টপেজ থেকে আমাদের এলাকার পার্টিকর্মী সন্তোষ দেবনাথকেও নকশালরা ধরে আশ্রম চৌমুহনির দিকে নিয়ে গেছে।

আমি, আমার ছোটভাই তপন, সুখু চক্রবর্তী, কানু দাস, অর্জুন লস্কর এবং ক্ষীরগোপালকে আশ্রম চৌমুহনি নকশালদের ডেরার দিকে মার্চ করার জন্য পাঠিয়ে দিলাম। আমাদের বয়সে ছোট এই গ্রুপটি খুব বেপরোয়া এবং সাহসী ছিল। এরা প্রস্তুত হয়েই আশ্রম চৌমুহনির দিকে মার্চ করল। এর আগে তপন ওদের ছোট গ্রুপের নিতান্ত বালক শ্যামল দত্ত (বর্তমানে হোমিওপ্যাথি ডাক্তার), নারায়ণ কর্মকার (সরকার অধিগৃহীত সংস্থার কর্মী), মনোরঞ্জন দাস (বর্তমানে টি.সি.এস অফিসার) এদের পিঠে ঘাসের বস্তা

চাপিয়ে তার মধ্যে বোমা সেট করে এদের পাঠিয়ে দিলাম যাতে বাঁধের উপর দিয়ে হেঁটে আশ্রম চৌমুহনি হয়ে মানিক কোথায় আছে সঠিক স্থানটা জেনে আসে। বিপদে পড়লে যাতে ঘাসের বস্তা খুলে বোমা ফাটায়। এরা সুদক্ষ অভিনেতার মত ঘাস কুড়ানো ছেলে হয়ে গোটা আশ্রম চৌমুহনি এলাকা জরিপ করে এসে খবর দিল মানিক সরকার আশ্রম চৌমুহনির কৃষ্ণদার চায়ের স্টলে বন্দী। সুখু চক্রবর্তীর বড়ভাই রবি চক্রবর্তী আমাদের সঙ্গে ছিল। আমার ছোটভাইদের গ্রুপটির সঙ্গে কথা ছিল—কোন বিস্ফোরণের আওয়াজ পেলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে আশ্রম চৌমুহনি গিয়ে পৌঁছাব নয়ত মিনিট পাঁচ/সাতেক পরে আমরা আশ্রম চৌমুহনি হেঁটে পৌঁছে যাব। কল্যাণী বাস স্টপেজ থেকে হেঁটে আশ্রম চৌমুহনি যেতে ৩/৪ মিঃ-এর বেশি সময় লাগত না। বিস্ফোরণের কোন আওয়াজ না পাওয়ায় মিনিট পাঁচ-সাতেক পরে আমরা সবাই হেঁটে আশ্রম চৌমুহনির দিকে রওয়ানা দিই। আমরা যখন আশ্রম চৌমুহনির আগে আসাম অয়েলের পেট্রোলপাম্পটির সামনে পৌঁছাই তখন দেখি মানিক সরকারকে তপন ও শ্যামলদের গ্রুপ সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসছে। সন্তোষ দেবনাথকে নকশালের ছেলেরা আসাম অয়েলের ছাদের কার্ণিশে 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান'—এই শ্লোগানটির উপরে মেখে দেওয়া কালি মুছতে কাজে লাগিয়েছিল। নকশালরা বোধহয় ধারণা করেছিল তাদের লেখা শ্লোগানের ওপর আমাদের পার্টির ছেলেরা কালি লেপে দিয়েছিল। আমরা সন্তোষকে আসাম অয়েলের ছাদের কার্ণিশ থেকে নামিয়ে আমাদের সঙ্গে নিয়ে নিই। পরে মানিকের মুখ থেকে এবং তপন এদের কাছ থেকে জানতে পারি আশ্রম চৌমুহনি কৃষ্ণদার চায়ের স্টলে ঐ এলাকার নকশাল নেতা নিখিল দেবনাথ, রুহিদাস দেবনাথ, সজল দাশগুপ্ত, অবিনাশ দেবনাথ, গোপাল দত্ত-এরা মানিককে বসিয়ে তাদের কতগুলো রাজনৈতিক প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য চাপ দিচ্ছিল। মানিকের পিঠে বোমা ছুঁড়ে মারা ছাড়া অন্য কোনভাবে তাকে কেউ শারীরিকভাবে নিগ্রহ করেনি। ঠিক তখনি তপন ওদের গ্রুপটি কৃষ্ণদার দোকানের সামনে গিয়ে হুমকি দেয়, মানিককে এক্ষুণি না ছেড়ে দিলে কৃষ্ণদার দোকান উড়িয়ে দেওয়া হবে। ওদের রণংদেহি মূর্তি দেখে নকশাল নেতারা নিজেদের মধ্যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে মানিককে ছেড়ে দেয়। মানিককে নিয়ে আমরা সবাই আমাদের বাড়িতে চলে আসি। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আমরা সবাই পার্টি অফিসে ফিরে যাই। মানিকের পিঠে বোমার আঘাতে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল। সেই ক্ষতচিহ্ন আজো মানিক দুঃসময়ের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে পিঠে বয়ে বেড়াচ্ছে বলে আমার বিশ্বাস।

১৯৭০ সনে তপন করের নেতৃত্বে ভারতীয় গণ নাট্য সঙ্ঘের, কের চৌমুহনি ইউনিট গঠিত হয়। প্রাথমিক সভ্য ছিল শঙ্কর দাস, পার্থ রায়, শঙ্কর চৌধুরী, প্রয়াত অশোক দাস, চন্দন চক্রবর্তী, বিশু রায়, পঙ্কজ দে, শ্যামল দেববর্মা প্রভৃতি কমরেডরা। এই দলটি সারা আগরতলা শহরে অনেক নামজাদা শিল্পীদের সমবেত করে পাড়ায়, পাড়ায়, বাজারে পথ নাটিকা সংগঠিত করেছিল। এদের অভিনীত বিভিন্ন নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—'অভ্যুত্থান' সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা অবলম্বনে রচিত গীতিনাট্য 'অভিযান' এবং 'আমি লেনিন' ও 'কঙ্গোর কারাগারে'। ১৯৭০ সনে এই দলটি লেনিন জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জায়গায় মঞ্চস্থ করেছিল 'জুলিয়াস ফুচিক' নাটকটি। প্রচণ্ড সাড়া জাগিয়েছিল



সস্ত্রীক তপন কর

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এই সাংস্কৃতিক কর্মীরা। যতদূর মনে পড়ে জুলিয়াস ফুচিক নাটকে শঙ্কর দাস অভিনয় করেছিলেন ডাঃ হিম্যানের চরিত্র, পার্থ রায় জুলিয়াস ফুচিক, শিশির মজুমদার পেসেক, মিলিটারি কমিশনার পঙ্কজ দে এবং মার্গারেট আর্থার চরিত্রে লিলি সেন। সবগুলো নাটকেরই রিহার্সাল হত কের চৌমুহনি তপন করের বাড়িতে। রিহার্সালের যন্ত্রণায় বাড়ির লোকেদের খাওয়া-দাওয়া ভুলে যাওয়ার উপক্রম। কম অত্যাচার করিনি আমরা তপনদার বৃদ্ধা মা, বড় দাদা-বৌদির উপর। এত কিছুর পরও পরম স্নেহে চা করে খাওয়াতেন তাঁরা। রাতে বাড়ির সকলের খাওয়ার থেকে আমাদের মত দু'একজন শরণার্থীর খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতেন।

'অভ্যুত্থান' নাটকে বৃদ্ধ শ্রমিকের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শঙ্কর দাস, পার্থ রায়-তরুণ শ্রমিক, শিশির মজুমদার-শ্রমিক নেতা, শঙ্কর চৌধুরী ও বিশু রায়-শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য এবং কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী, চন্দন চক্রবর্তী-কারখানার মালিক। ত্রিপুরার অন্যতম বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ পরিবারের ছেলে চন্দন সেনগুপ্ত আবহ সংগীত হিসেবে নাটকটিতে সরোদ বাজিয়েছিলেন এবং প্রয়াত সরকারি কর্মচারী আন্দোলনের নেতা দিগ্বীজয় ভট্টাচার্যের ছোট ভাই দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য বাজিয়েছিলেন সেতার।

১৯৭০ সনে উদয়পুরে সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলন উপলক্ষ্যে রাজ্যে এসেছিলেন জনপ্রিয় কৃষক নেতা হরেকৃষ্ণ কোনার। নৃপেন চক্রবর্তীর বড়ভাই নন্দলাল চক্রবর্তীর একটি ফিয়াট গাড়িতে আমরা সন্ধ্যার দিকে উদয়পুর রওয়ানা দিই। স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে নৃপেন দা এবং হরেকৃষ্ণ কোনারের সঙ্গে যাই আমি, ১ নং এবং ২নং মধু ভট্টাচার্য। বিশালগড় গিয়ে যখন আমরা পৌঁছি তখন সন্ধ্যে পেরিয়ে রাত হয়ে গেছে। আনন্দ মার্গী কিছু সমর্থক রাস্তায় জড়ো হয়ে হরেকৃষ্ণ কোনারকে কালো পতাকা দেখায় এবং আমাদের গাড়ি আটকে দেওয়ার চেষ্টা করে। আমরা স্বেচ্ছাসেবকরা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিই যদি গাড়ির ওপর বা নেতাদের ওপর আক্রমণ করে আনন্দমার্গীরা তবে আমাদের জীবন গেলে যাক কিন্তু আমরা সর্বশক্তি



চন্দন চক্রবর্তী

দিয়ে প্রতিরোধ করব। শেষ পর্যন্ত পুলিশ এসে শ্লোগানরত আনন্দমার্গী কর্মীও নেতাদের সরিয়ে দেয়। আমরা উদয়পুরের দিকে রওয়ানা দিই। তখন রাস্তার অবস্থা এত খারাপ ছিল যে সড়ক পথে উদয়পুর যেতে ঘণ্টা তিনেক লেগে যেত। আমাদের গাড়ি যখন বিশালগড় ছেড়ে উদয়পুরের দিকে রওয়ানা দেয় তখন রাত্রি প্রায় ৮-৩০ মিঃ/৯টা হয়ে গিয়েছিল। বাগমা গিয়ে যখন আমরা পৌঁছি তখন প্রায় ১১টা বেজে গেছে। আমাদের গাড়ি খারাপ হয়ে যায়। তখনকার সময়ে এই দুর্গম অঞ্চলে গাড়ি ঠিক করার কোন উপায় ছিল না। আমরা সবাই মনে মনে প্রমাদ গুণলাম। রাস্তায় এত রাতে আর কোন গাড়ি পাব কিনা ভেবে সবাই শংকিত হয়ে উঠেছিলাম। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর একটি যাত্রীবাহী জীপ ট্রেলরসহ উদয়পুরের দিকে যাচ্ছিল সেটিকে হাত দেখিয়ে আমরা থামালাম। জীপের ড্রাইভারকে অনুরোধ করলাম আমাদের খারাপ হয়ে যাওয়া গাড়িটি মেরামতিতে সাহায্য করতে। সে নেমে গিয়ে আমাদেব গাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর জানিয়েছিল সকাল না হলে কিছু করার নেই। সকালে আগরতলা থেকে মেকানিক আনিয়ে গাড়ি ঠিক করতে হবে। তখন আমরা অনেক অনুরোধ করাব পর গাড়িব ড্রাইভার জীপের ট্রেলারে হরেকৃষ্ণ কোনাব এবং নৃপেনদাকে তুলে নিল। বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও সত্যি ঘটনা হলো নৃপেনদা এবং হরেকৃষ্ণ কোনার জীপের ট্রেলারে দাঁড়িয়ে সেদিন উদয়পুর গিয়েছিলেন। তখন না ছিল মোবাইল না ছিল কাছাকাছি কোথাও ল্যান্ডফোন যাব সাহায্য নিয়ে উদয়পুর বা আগরতলা থেকে আরেকটি গাড়ি আনিয়ে নিতে পারি।

আমি আর দুই মধু শেষ পর্যন্ত এই নিশুতি রাতে পাহাড়ের চড়াই উতবাই ভেঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে, গল্প করতে করতে প্রায় ভোর হয় হয় সময়ে উদয়পুর সম্মেলন স্থলে যেখানে আমাদের জন্য জায়গা নির্দিষ্ট ছিল সেখানে গিয়ে পৌঁছেছিলাম। আমরা সম্মেলন স্থলে পৌঁছে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম নৃপেনদা আমাদের জন্য জেগে রয়েছেন। সম্মেলনের কাজে নির্বাচিত বেশ কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক আমাদের জন্য রাত জেগে আগুন পোহাচ্ছিলেন। তখন ছিল শীতকাল। আমরা খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমোতে যাওয়ার সময় নৃপেন-দা আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেন। আমরা পার্টির শীর্ষস্থানীয় নেতার কাছ থেকে এ ধরনের সহৃদয় ব্যবহার পেয়ে এবং তাঁর চোখে আমাদের জন্য উদ্বেগের ছায়া দেখে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম।

কৃষক সভার এই সম্মেলনে ভারতীয় গণ নাট্য সঙ্ঘের, কের চৌমুহনি ইউনিটের তরফে শঙ্কর দাস ও শিশির মজুমদারের নেতৃত্বে 'জুলিয়াস ফুচিক' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল। পার্থ রায় কি একটা অসুবিধার জন্য যেতে না পারায় সম্মেলনে জুলিয়াস ফুচিকের অভিনয় করেছিল বর্তমানে শারীর শিক্ষক, মটর স্ট্যান্ড এলাকায় বাড়ি শ্রী সুবীর সেনগুপ্ত। এই টিমটির অভিনয় দেখে মাঠের সমস্ত দর্শক তো বটেই এমনকি হরেকৃষ্ণ কোনার এবং নৃপেন চক্রবর্তী পর্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। নৃপেনদার মুখে পরে জেনেছি হরেকৃষ্ণ কোনার নাটক দেখে মন্তব্য করেছিলেন কোলকাতাতেও সচরাচর এত সুন্দর প্রযোজনা সম্ভব হয়না। আমাদের সবার গর্বে সেদিন বুক ভরে উঠেছিল।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, কের চৌমুহনি ইউনিটের সবচেয়ে বড় সাফল্য ছিল ১৯৭০ সনে কৈলাসহরের হীরাছড়া চা-বাগানের ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকদের সাহায্যার্থে অভিনীত

'জ্বালা' নাটকের প্রযোজনা। উমাকান্ত স্কুলের ক্যাম্পাস হলে মঞ্চস্থ হয়েছিল নাটকটি। ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকদের সাহায্যের জন্য লাল এবং সাদা ডোনেশান কার্ড ছাপানো হয়েছিল। লালকার্ড ১০ টাকা এবং সাদা কার্ড ৫ টাকা। ডোনেশান কার্ড বিক্রি করতে করতে বিশু রায়, কল্যাণী এলাকার ববি চক্রবর্তী এবং কের চৌমুহনির হাবলু ভট্টাচার্য, টুটু ঢুকে পড়েছিল সেলস ট্যাক্স দপ্তরে। দপ্তরের কর্মচারীদের ডোনেশান কার্ড কেনার আবেদন জানাতেই একজন বেরসিক কর্মচারী জানতে চেয়েছিল ডোনেশান কার্ড বিক্রির ব্যাপারে বিক্রয়কর জমা দেওয়া হয়েছে কি না? দপ্তরের অনুমতি আছে কিনা জিজ্ঞেস করে ভদ্রলোক বিশু-ওদের অপেক্ষা করতে বলে বিক্রয়কর দপ্তরের কমিশনারের রুমে ঢুকলে বিশু ওরা বিপদ বুঝে বিক্রয়কর দপ্তরের অফিসে থেকে পালিয়ে আসে।

আমি এবং তপন কর ১৯৭০ সনে সি.আই.টি.ইউ-র সর্বভারতীয় প্রথম সম্মেলনে যোগ দিতে কোলকাতা গিয়েছিলাম 'ছাতার বাঁট ইউনিয়নে'র কর্মী হিসাবে অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে। শঙ্করদা, বিশু ওরা সিদ্ধান্ত নিল তপনদা কোলকাতা থেকে ফেরার আগেই ঋত্বিক ঘটকের লিখিত 'জ্বালা' নাটকটি মঞ্চস্থ করে ফেলতে হবে।

বিশু ওদের এমনই দুর্ভাগ্য নাটকটি যেদিন মঞ্চস্থ হবে সেদিনই দুপুরের বিমানে ১২টা নাগাদ তপনদা এবং আমি আগরতলা ফিরে আসি। ফিরে এসেই তপনদা বায়না ধরলেন, তিনি একটি নূতন গণসংগীত শিখে এসেছেন সেটি তিনি চন্দন চক্রবর্তীকে নিয়ে নাটক শুরুর আগে গাইবেন। তপনদাকে বারণ করে কার সাধ্যি। প্রথমে চন্দন কিছুতেই রাজি হয় না। চন্দনের গানের গলা ছিল চমৎকার সুরেলা। আমরা সবাই চন্দনকে বলে কয়ে রাজি করালাম। কেননা, তপনদা একা গান গাইলে সেটি কেমন শ্রুতিমধুর হবে আন্দাজ করেই আমরা শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম। দুপুর ১টা থেকে টানা ৫টা পর্যন্ত চন্দন আর তপনদা গানের রিহার্সাল দিল। সন্ধ্যায় উমাকান্ত স্কুলের ক্যাম্পাস হলে দর্শকাসন পুরো ভরে যায়। আমরা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠি। ডোনেশান কার্ড অনেকেই অনুরোধে ঢেঁকি গেলার মত কিনে ফেলে কিন্তু অনুষ্ঠানে যায় না। এত দর্শক সমাগম হবে আঁচও করতে পারিনি।

যথাসময়ে তপন কর এবং চন্দন চক্রবর্তী উদ্বোধনী সংগীত গাইতে মঞ্চে ওঠে। ২/৪ লাইন গেয়ে দু'জনেই গানের পদ ভুলে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলে। পরে কাগজ দেখে গানের পদগুলি আবৃত্তি করে মঞ্চ থেকে দু'জনে নেমে পড়ে। আমরা সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। ঋত্বিক ঘটক রচিত 'জ্বালা' নাটকে মোট চরিত্র ছিল ৫টি। নাটকে শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকে মাত্র ১টি চরিত্র এবং সেই পাগল চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শিশির মজুমদার। বাকি ৪টি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শঙ্কর দাস, তিনি উঁচু একটি টিলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। শিশুশিল্পী তপন রায় একটি বালকের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন এবং সে ট্রেনের নীচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে, বিজয়া দাস আমাদের সবার বিজুদি একটি নারী চরিত্রে অভিনয় করে আগুনে পুড়ে আত্মহত্যা করেন এবং পার্থ রায় পিওনের চরিত্রে অভিনয় করে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেন। সে সময়ের খ্যাতনামা শিল্পী সত্য নন্দী ছিলেন নাটকের মেক-আপ ম্যান। আপনাদের সবার নিশ্চয়ই কৌতূহল দেখা দিচ্ছে বিশু রায় অভিনয় করেছিল কিনা জানতে। না সে কোন অভিনয় করেনি। তবে নাটককি মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে তার পরিশ্রম এবং প্রয়াস ছিল সর্বাধিক। তপনদার অনুপস্থিতিতে প্রতিদিন

তপনদার বাড়িতে রিহার্সালের ব্যবস্থা করা, অভিনেতাদের সঠিক সময়ে রিহার্সালে হাজির করানো, ঘুরে ঘুরে টিম নিয়ে টিকিট বিক্রি, মাইকিং করে নাটকের প্রচার করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশুর ভূমিকা ছিল সর্বাধিক। নাটকে সে লাইটম্যানের গুরুদায়িত্বও পালন করেছিল। লাইটম্যানের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বিশু কি পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল জানাচ্ছি। সে ট্যালকম পাউডারের কৌটায় আঠা দিয়ে কাগজ সেঁটে তার ওপর লিখেছিল শিশিরদা মুখের উপর ফোকাস, পন্ডস পাউডারের কৌটার ওপর লেখা ছিল শঙ্কর দাশের মুখে, রেল অ্যাক্সিডেন্ট দেখানোর জন্য টিনের পাত কেটে অর্ধেক করে তার উপর লিখেছিল— তপন রায়ের শরীরে। এভাবে প্রস্তুতি নিয়ে সবগুলির বেড সুইচসহ বিশু উমাকান্ত স্কুলের ক্যাম্পাস হলের ছাদের উপর গিয়ে উঠেছিল। সেদিন খুব সুচারুভাবেই বিশু লাইটম্যানের দায়িত্ব পালন করেছিল। যে কারণে তপন কর সেদিন আর তাঁর ভাগ্নে বিশুকে নাটকের পর নিত্যদিনের মত বকাঝকা করার সুযোগ পাননি। মূলত বিশুর উদ্যোগে নাটকের টিকিট বিক্রিতে লাভ হিসাবে আমরা সি.আই.টি.ইউ নেতা বীরেন দত্তের হাতে ১ হাজারের বেশি টাকা হীরাছড়া চা-বাগানের ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকদের জন্য তুলে দিতে পেরেছিলাম। 'জ্বালা' নাটকটির মঞ্চসফল প্রযোজনা এবং দর্শক সমাগম সে সময় আমাদের উদ্দীপিত করেছিল। যদিও পরে আর এই নাটকটি অন্য কোথাও আমরা মঞ্চস্থ করতে পারিনি বিভিন্ন কারণে। নূতন সংগঠন গড়ে অন্য নাটক মঞ্চস্থ করেছিলাম আমরা। সে প্রসঙ্গে পরে আসব।

এবার একটি অন্য ঘটনা আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি। তপনদা এবং আমি সি.আই.টি.ইউ-র সম্মেলন শেষ হওয়ার পরও বেশ কিছুদিন কোলকাতা থেকে যাই। বৌবাজার ছানাপট্টির গলিতে তখন সি.পি.আই (এম)-এর একটি দলের জমজমাট আড্ডা। দেবু দত্তগুপ্ত, তপন সেন, ছোটন, সুতান, পরিমলদা, আরো অনেকেই ছিলেন সেই আড্ডায় এই মুহূর্তে তাদের নাম মনে আসছে না। এদের সঙ্গে দীর্ঘসময় আড্ডা দিয়ে বিভিন্ন দেশের, আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজ্যের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রগতি, ব্যর্থতা সব কিছু হাঁ করে গোগ্রাসে গিলতাম। তপনদা ফাঁকে ফাঁকে নূতন কিছু চমকপ্রদ শ্লোগান যেগুলো পশ্চিমবাংলায় আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলো টুকে নিতেন। নূতন গণসংগীত লিখে তার সুর গলায় ভাজতেন যাতে আগরতলা এসে সবাইকে চমকে দিতে পারেন। আমার কাজ ছিল শুধু বুঁদ হয়ে আড্ডা দেওয়া।

অবশ্য অন্য একটি কু-কাজে তপনদাকে প্ররোচিত করেছিলাম, তার জন্য দায়ি অবশ্যই শঙ্কর দাশ। তিনি একদিন গল্প করেছিলেন মহাকবি কালিদাসের উপর নাকি সরস্বতীর অভিশাপ ছিল কোন রাজসভায় কোন তর্কযুদ্ধে কালিদাস জয়ী হতে পারবেন না। কালিদাস একদিন শুনলেন এক বিখ্যাত কবিয়াল তার্কিক কালিদাসকে রাজসভায় তর্ক করে হারানোর জন্য জলপথে বজরা দিয়ে রাজসভায় আসছেন। যথারীতি কালিদাস মলিন বেশে, লুঙ্গি পরিধান করে নদীর পাড়ে গিয়ে বসলেন কখন কবিয়াল তার্কিকের বজরা পাড়ে এসে ভিড়বে। যখন বজরা এসে ভিড়ল তখন কালিদাস লুঙ্গি তুলে নদীর জলে প্রস্রাব আরম্ভ করলেন। এ ঘটনা দেখে বজরায় উপবিষ্ট তার্কিক কালিদাসের উদ্দেশ্যে বললেন, আরে মূর্খ, জলে বিষ্ণুর অবস্থান আর তুই তাতে মূত্রত্যাগ করছিস, তোর যে

নরকবাস হবে। কালিদাস তখন নাকি উত্তর দিয়েছিলেন—জলে বিষ্ণু, স্থলে বিষ্ণু, ব্রহ্মা সর্বভূতে - তবে কি মুক্তিব শালা তোমার কপালে? তার্কিক কালিদাসকে জিজ্ঞেস করলেন তুই কেরে? কালিদাস বলল, আমি কালিদাসের বাগান সাফ করি। তার্কিক বুঝল কালিদাসের বাগান সাফ করনেওয়ালা যদি এমন তার্কিক হয় তবে কালিদাসের চেহারা কেমন হবে। তিনি আর কালিদাসের মুখোমুখি হওয়ার সাহস না করে বজরা ঘুরিয়ে ফিরে গেলেন।

সি.আই.টি.ইউ সম্মেলনে যাওয়ার সময় ত্রিপুরা মিষ্টান্ন দোকান কর্মচারী সমিতির সম্পাদক বর্তমানে প্রয়াত মানিক দে তপনদাকে তাঁর কোন একজন আত্মীয়ের অস্থি গঙ্গায় বিসর্জনের জন্য দিয়েছিলেন। যেদিন আগরতলা ফিরে আসব তার আগের দিন তপনদা আর আমি অস্থি নিয়ে বেরিয়ে প্রচণ্ড বৃষ্টির জন্য গড়ের মাঠের পাশে গাছের নীচে আশ্রয় নিই। বৃষ্টিতে সারাশরীর, জামাকাপড় ভিজে জ্বর আসার উপক্রম। দু'জনেই শীতে কাঁপা আরম্ভ করি। যানবাহনও প্রায় নেই বললেই চলে। এর মধ্যে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হয়ে গেছে। হঠাৎ শঙ্করদার কাছ থেকে শোনা কালিদাসের স্তোত্র বা কবিতাটি মনে পড়ে যায়। তপনদাকে ঘটনাটি বলে প্রভাবিত করি। আমি বলি গড়ের মাঠের পাশ দিয়ে প্রশস্ত নালা দিয়ে বয়ে যাওয়া সব জল গঙ্গায় গিয়ে পড়বে। এখানেই অস্থি বিসর্জন দিন ঠিক গঙ্গায় চলে যাবে। তপনদা তাই করলেন। আমরা দু'জন ভিজে কাপড়ে ফিরে এলাম ডেরায়।

প্যারাডাইস চৌমুহনি পেরিয়ে গান্ধীঘাট এবং বিবেকানন্দ ব্যায়ামাগারের মাঝখান দিয়ে যেই রাস্তাটা সোজা বাঁধের কাছে পৌছে গিয়েছে তার শেষ প্রান্তে ছিল আমার মেশোমশাই শ্রী সুনীল মজুমদারের বাড়ি। ১৯৭১ সনেব আগে থেকেই উনি ডিব্রুগড়ে ফুড কর্পোরেশনের অফিসে চাকরি করতেন। ডিব্রুগড়েই মাসি ও মাসতুতো ভাইদের নিয়ে থাকতেন। তার বাড়িটি আমার মাধ্যমে পার্টি মাসিক ৩০০ টাকাব বিনিময়ে ভাড়া নিয়ে সেখান থেকে পিপলস্ রিলিফ কমিটির অফিসের কাজ চালাতেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ১৯৭১ সনে কাজি জাফর, রাশেদ খান মেনন, গোফরান ভাই সহ বহু বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা এই অফিসে পার্টির সাহায্যে বহুদিন আশ্রিত হিসাবে ছিলেন। আমাদের সঙ্গে সেইসব নেতাদের একটি আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় ঢাকার রমনা ময়দানে ভারত-বাংলাদেশের যৌথ কমান্ডের সর্বাধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরার কাছে পাক-ফৌজের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এ.এ.কে নিয়াজি আত্ম সমর্পণ করেন। বাংলাদেশে গঠিত হয় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। আস্তে আস্তে বাংলাদেশে ফিরে যান এদেশে আশ্রিত বাংলাদেশের কমিউনিস্ট নেতারা। ১৯৭২ সনের গোড়ার দিক থেকেই পিপলস রিলিফ কমিটির অফিসটি 'সংশপ্তক' নামে একটি নাট্য গোষ্ঠী গঠন করে আমরা বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত উপন্যাসিক সমরেশ বসুর 'আবর্ত' নাটকটির রিহার্সাল শুরু করে দিই। এই নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে মূল উদ্যোক্তা ছিলাম আমি, শঙ্কর দাস, বিশু ও অন্যান্য সহযোদ্ধারা। নাটক অভিনয় করেছিলেন ১৯৭২ সনে পশ্চিমবাংলা থেকে সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের জমানায় বিতাড়িত খড়দহের বামপন্থী উঁচু মানের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সঞ্জীব ব্যানার্জী। তিনি আমাদের রাজ্যের প্রবাদ প্রতিম সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শিবদাস

ব্যানার্জীর খুড়তোতো ভাই। এছাড়া অভিনয়ে ছিলেন পার্থ রায়, ২ নং মধু ভট্টাচার্য, শিশির মজুমদার, কৃষ্ণ কেশব রায়, বিজয় সিং রায়, শঙ্কর দাস প্রমুখ। বিদ্রোহী 'রাজা' নামক তরুণ কৃষকের চরিত্রে অভিনয় করে মাতিয়ে দিয়েছিল সঞ্জীব। এছাড়া অন্য সবাই ছিল সাবলীল ও প্রাণবন্ত অভিনয়ের প্রতিমূর্তি। ২নং মধু করেছিল পন্ডিত বাচস্পতির রোল। কৃষ্ণ কেশব রায় করেছিলেন একজন বয়স্ক, বঞ্চিত কৃষকের অভিনয়। অভিনয়ের চরিত্রটি ছিল অনেকটা যাত্রার বিবেকের মত। অন্যরা কে কোন চরিত্রে অভিনয় করেছিল ঠিক মনে করতে পারছি না।

যা হোক নাটকটির সফল প্রযোজনা হিসাবে প্রথম মঞ্চস্থ হয় আগরতলা মিউজিক কলেজের ক্যাম্পাস হলে ১৯৭২ সনের মাঝামাঝি সময়ে। হল ভর্তি দর্শক দেখে এবং নাটক শেষে দর্শকদের বাহবা কুড়িয়ে মনে আত্ম প্রসাদ লাভ করি। ২/৩ মাস পর আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে 'আবর্ত' নাটকের দ্বিতীয় প্রযোজনা ও দর্শকদের দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছিল।

রবীন্দ্র ভবনে যেদিন নাটকটি মঞ্চস্থ হয় তার আধ ঘণ্টা আগেও নাটকের অভিনেতা বিজয় সিংহ রায় রবীন্দ্র ভবনে এসে পৌঁছেনি। আমি শঙ্করদা সহ সবাই রাগে ফুঁসছি। এমন সময় বিজয় তার বন্ধু সমরজিত রায়কে নিয়ে গদাই লস্করি চালে রিক্সা থেকে এসে নামল। আমাদের রাগ আরো বেড়ে গেল। রাগত ভাবে আমি এবং শঙ্করদা বকাঝকা শুরুর আগেই বিজয় বলল- বকতে পারবে পরে, আগে আমার কথা শুনে নাও। ওর হাবভাব দেখে একটু চিন্তায় পড়ে গেলাম। বললাম কি বলবে, তাড়াতাড়ি বল। তোমার মেক্-আপ এখনো বাকি। সে তার এবং সমরজিত রায়ের ভেজা মাথা দেখিয়ে বলল-তার বোনের শ্বশুর মশাই মারা গেছে। দাহকার্য সম্পন্ন করে বটতলা শ্মশান থেকে সোজা রবীন্দ্র ভবনে চলে এসেছে। খাওয়া দাওয়াও হয়নি। ৫ টাকা রিক্সা ভাড়া মিটিয়ে দেওয়ার জন্য বিজয় আমাকে নির্দেশ দিল। আমি হতভম্ব হয়ে রিক্সা ভাড়া মিটিয়ে দিলাম। তারপর বিজয় শঙ্করদার কাছে থেকে ১০ টাকা চেয়ে নিয়ে সমরজিত রায়কে নিয়ে চলে গেল গিরিধারী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে টিফিন খেতে। যথারীতি নাটক মঞ্চস্থ হল। সফল প্রযোজনায় আমরা সবাই খুশি। পরে জানলাম বিজয়ের বোনের শ্বশুর ১২ বছর আগেই মারা গেছেন। এ পর্যন্ত বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য সে বোনের শ্বশুরকে বার পনের মেরে ফেলেছে বিভিন্ন কারণে। বাস্তবে ওর ভেজা মাথা এবং ক্ষুধার্ত করুণ মুখ দেখে আমরা যে প্রতারিত হচ্ছি বিন্দু বিসর্গ বুঝতে পারিনি। বিজয়ের ছিল তাস খেলার নেশা। পরে জেনেছি সে তার বন্ধু সমর সহ তাস খেলে, মাথার চুল ভিজিয়ে এসেছিল আমাদের ধোঁকা দিতে। যখন সমস্ত ঘটনা জানলাম রাগ হল খুব কিন্তু তখন আর আমাদের কিছু করার নেই। কেননা বিজয় সেদিন নাটকে খুবই ভাল অভিনয় করেছিল।

এর দু'একদিন পর হরিগঙ্গা বসাক রোডে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জলযোগ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে বসে আমি আর শঙ্করদা চা খাচ্ছি। বিজয় এসে হাজির। বলল, দাশুদা ক্ষীরতোয়া খাওয়ার জন্য ৫ টাকা দাও। শঙ্কর দা খেপে গেল। টাকা নেই, পাবে না। বিজয় তারপরেও বলল দাও না ম্যানেজ করে। শঙ্করদা এবার সত্যি রেগে গিয়ে বলল, প্রত্যেকদিন আমি কোথা

থেকে টাকা পাব? আমি কি টাকার গাছ পুঁতেছি নাকি? বিজয় মুচকি হেসে বলল, রাগছো কেন দাশু দা। ক্ষীরটা তুমি খেও, শুধু তোয়াটা আমায় দিও। আর কি বেশিক্ষণ রাগ করে থাকা যায়। শঙ্করদা বিজয়কে ৫ টাকা দিয়ে বললেন, এই শেষ কিন্তু। এ মাসে আর টাকা পাবে না। বিজয় বলেছিল দেখা যাক। শঙ্করদাকে আমরা সবাই আদর করে ডাকতাম 'দাশুদা'। শঙ্করদা ছিলেন আমাদের থেকে বয়সে বছর দু'য়েকের বড়। তিনি ছিলেন আমাদের ফিলোসফার, গাইড।

কমিউনিস্ট পার্টিতে এবং তার শাখা সংগঠনগুলোতে কেউ সাফল্য পেতে থাকলে বা প্রশংসিত হতে শুরু করলে সংগঠনের মধ্যেই ঈর্ষা, দলাদলি শুরু হয়ে যায়। বিশেষতঃ সাংস্কৃতিক বুদ্ধিজীবিদের ফ্রন্টেই এই কাজটি বেশি হয় বলে আমার বিশ্বাস। কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক যখন পি সি যোশী ছিলেন তখন ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘে পৃথ্বিরাজ কাপুর, বলরাজ সাহনি, উৎপল দত্ত, শম্ভু মিত্র, সলিল চৌধুরী জাতীয় দিকপালেরা সমবেত হয়েছিলেন। পি সি যোশী কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক পদ থেকে সরে গেলে আবার গণ নাট্য সংঘ সঠিক পরিচালনার অভাবে ভেঙ্গে যায়। আমাদের ভারতীয় গণ নাট্য সংঘের কের চৌমুহনি ইউনিটের ও এসব কারণেই সলিল সমাধি ঘটে। বাধ্য হয়ে আমরা গঠন করেছিলাম 'সংশপ্তক' নাট্য গোষ্ঠী।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কের চৌমুহনী ইউনিট বা আমাদের সংশপ্তক গোষ্ঠীর কাজ ছিল সীমাবদ্ধ এবং ধারাবাহিকতাহীন। সবচেয়ে বড় কথা পার্টির ওপেন ফ্রন্টে আমরা সবাই কাজ করে, খানিকটা অবসর বের করে সাংস্কৃতিক কাজে নিজেদের সাময়িকভাবে যুক্ত করতে পারতাম। বামপন্থী, প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনের ধারাকে রাজ্যে মূলত পরিপুষ্ট করে তুলেছিল অন্যান্য বেশ কয়েকটি নাট্য সংগঠন। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রূপম, লিটল ড্রামা গ্রুপ, সাংস্কৃতিক পরিষদ, আনন্দম, সি. এ সি. টি প্রভৃতি নাট্য সংস্থা। ১৯৬৮-'৬৯ সাল থেকে টানা প্রায় ২০ বছর এই নাট্য সংস্থাগুলো রাজ্যে বামপন্থী-প্রগতিশীল চিন্তাধারা প্রসারে, উদার-বৈজ্ঞানিক মনন এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার মর্যাদা স্থাপনে নিরলস পরিশ্রম করে গেছে। ১৯৭৮ সালে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর আস্তে আস্তে নাট্য আন্দোলনে ভাঁটার টান দেখা যায়। একটি ভ্রান্ত ধারণা গড়ে তোলা হয় যে রাজ্যে যেহেতু এখন বন্ধু বামপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং প্রতিষ্ঠান বিরোধী যে কোনও নাটক বামফ্রন্ট সরকার বিরোধী মনোভাব গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। সুতরাং, পার্টির অনুমোদন ছাড়া বা নাটকের স্ক্রিপ্ট পড়িয়ে নেওয়া ছাড়া নাটক মঞ্চস্থ করা সমীচিন হবে না। ছাত্র জীবন, ব্যক্তিগত জীবন, রাজনৈতিক জীবনে যার নাটক বা সংস্কৃতির সঙ্গে কোনও ধরনের যোগাযোগ ছিল না এমন একজন রাজ্য পার্টি সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্যকে রাজ্যের সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এ ধরনের কাজে ক্ষমতাসীন লোকদের চাটুকার বৃত্তি করার জন্য লোকও জুটে যায়। বুদ্ধিজীবী ফ্রন্টের কিছু নামজাদা অথচ ব্যক্তিত্বহীন ব্যক্তিদের নিয়ে তৈরি হয়ে যায় কোটারি। এরাই ছড়ি ঘুরিয়ে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের ওপর পার্টি শৃঙ্খলার নামে শৃঙ্খল আরোপের চেষ্টা করে। ফলে যাই হওয়ার তাই হয়েছে। স্বাধীনচেতা, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী, নাট্য ব্যক্তিত্বরা নিজেদের বিভিন্ন নাট্য

সংস্থা থেকে বিযুক্ত করে নিয়েছেন। শক্তিশালী বিভিন্ন নাট্য সংস্থাগুলোর ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেছে, অকাল মৃত্যু হয়েছে।

সত্তরের দশকে নাট্যোন্মাদনা এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে নাটকের টিকিট ব্ল্যাক হত। অগ্রিম কিনে না-রাখলে লাইন ধরে টিকিট পাওয়া যেত না। কিন্তু আজ ত্রিপুরা রাজ্যে সাংস্কৃতিক জগতে চলছে প্রচণ্ড খরার দিন। কোনও ভাল নাটক আর মঞ্চস্থ হয় না। কারোর প্রেরণাও আর হয় না একটি ভাল নাট্য দল গড়ে তোলার। মাঝে মাঝে দু'একটি ভালো নাটক কেউ মঞ্চস্থ করলে কেউ খবরও রাখে না। দর্শকের অভাবে উদ্যোক্তারা হতাশ হয়ে পড়েন। নতুন কোনও প্রযোজনায় আর আগ্রহ প্রকাশ করেন না। শুধুমাত্র অবিবেচনাপ্রসূত পার্টির ডিক্টাম বা পার্টির নির্দেশ পালনে বাধ্য করতে গিয়ে সম্ভাবনাময়, নাট্য আন্দোলনের বিকাশকে গলা টিপে খুন করা হয়েছে। কিন্তু হন্তারকরা ভাবলেশহীন, অনুতাপহীন বিলাসী জীবনে, আরাম-আয়েশে জীবন কাটিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করে চলেছেন। ভাবছেন পার্টি তো ক্ষমতায় আছে। তা হলেই হলো। চোখ মেলে পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকাচ্ছেন না—বোঝার চেষ্টাও করছেন না কি ঘটতে চলেছে সেখানে। রাজ্য পার্টির অন্যান্য নেতারাও এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন বলে মনে হয় না।

এই প্রসঙ্গে আমার প্রিয়তম কবি প্রয়াত সুভাষ মুখোপাধ্যায়েব একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তি খুবই প্রণিধান যোগ্য বলে মনে হয়—নিচে যার উল্লেখ করলাম।

একদিকে জল, একদিকে দানা,
বসিয়ে খাঁচায় ওরা লেখা চায়;
খাঁচা ভেঙে তাই
মেলেছি ডানা।

ঠিক এই কারণেই একে একে সৃষ্টিশীল মানুষেরা কমিউনিস্ট পার্টি থেকে নিজেদের এবং সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট থেকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। আমেরিকার বিখ্যাত কমিউনিস্ট লেখক হাওয়ার্ড ফাস্টকেও শেষ জীবনে তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে লিখতে হয়েছিল 'নেকেড গড'। পৃথিবীর বিখ্যাত কমিউনিস্ট লেখক 'মা' উপন্যাসের স্রষ্টা ম্যাক্সিম গোর্কিও জীবনের শেষ প্রান্তে এসে রাশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সদভাব বজায় রাখতে পারেননি।

আমাদের দেশেও পৃথ্বীরাজ কাপুর, বলরাজ সাহানি, উৎপল দত্ত, শম্ভু মিত্র, সলিল চৌধুরী জাতীয় সাংস্কৃতিক নক্ষত্ররা নিরবচ্ছিন্নভাবে কমিউনিস্ট পার্টির বা তার সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারেননি বা অভ্যন্তরীণ পরিবেশের জন্য সংযোগ বজায় রাখা সম্ভবপর হয়নি নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

'৭০-এর দশকে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন '৮০-র দশক পর্যন্ত যাঁরা নিতান্তই শিশু বা বালক ছিলেন, তাঁদের জ্ঞাতার্থে বলতে পারি, আমাদের রাজ্যের উল্লিখিত অপেশাদারি নাট্য সংস্থাগুলো শুধুমাত্র আদর্শগত দায়বদ্ধতার কারণে নিঃস্বার্থভাবে নাট্য আন্দোলনকে পরিপুষ্ট এবং স্রোতস্বিনী করতে ব্রতী হয়েছিলেন। পরিচালক সুবোধ দে-র নেতৃত্বে এবং পরিচালনায় প্রয়াত মানস গাঙ্গুলি, ইরা গাঙ্গুলিসহ এক ঝাঁক নাট্য ব্যক্তিত্ব রাজ্যের বিভিন্ন মঞ্চ দাপিয়ে বেড়িয়েছেন। আমি নিজে এদের অভিনীত 'ক্যাপ্টেন হুররা' নাটক লাইন ধরে

টিকিট কেটে দেখেছি। সারা আগরতলা শহরে রূপম-এর যে কোনও নাটক মঞ্চস্থ হলেই তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হত। মানস গাঙ্গুলি প্রয়াত হয়েছেন। সুবোধ দে আজও এই শহরে বসবাস করেন। এই টিমের অন্য সব অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও প্রায় সবাই জীবিত। আজ কোথায় রূপম নাট্য গোষ্ঠী? আরেকটি নাটক 'চাক ভাঙ্গা মধু' সম্ভবত নাট্যকার অজিত মজুমদারের পরিচালনায় 'আনন্দম' নাট্যগোষ্ঠী করেছিল। সেটিতে অভিনয় করেছিলেন, প্রয়াত মানস গাঙ্গুলি, ইরা গাঙ্গুলি, শিশির মজুমদার প্রমুখ। কি বলিষ্ঠ প্রযোজনা না-দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সেই নাটকটি মঞ্চস্থ হলেও সব টিকিট নিঃশেষিত হয়ে যেত। আজ কোথায় সে নাট্য গোষ্ঠী? এছাড়াও রূপম স্যামুয়েল বেকেট-এর ওয়েটিং ফর গোদোর ভাষান্তর করে অভিনীত করেছিলেন 'ঈশ্বরবাবু আসছেন'। খুব জনপ্রিয় হয়েছিল নাটকটি।

প্রয়াত অশোক চক্রবর্তীর উদ্দীপনায় গড়ে উঠেছিল লিটল ড্রামা গ্রুপ। এতে যুক্ত ছিলেন বামাপদ মুখার্জি, প্রয়াত অধ্যাপক অহীন চক্রবর্তী, মানস দেববর্মন, প্রয়াত শারীর শিক্ষক প্রদীপ দাশগুপ্ত এবং আরও অনেক বামপন্থী মনোভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবীরা। এই সংস্থাটির অভিনীত উৎপল দত্ত রচিত নাটক 'ফেরারি ফৌজ' ও 'ঘুম নেই' যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। 'ঘুম নেই' নাটকে প্রয়াত ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য অভিনয় করে খুব জনপ্রিয় হয়েছিলেন। এই সংস্থার অভিনীত 'লৌহ মানব' নাটকটি স্তালিনের সহকর্মী কিছু সহযোদ্ধার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিচার হয়েছিল রাশিয়ায়। সেই পট ভূমিতে লেখা হয়েছিল নাটকটি। খুবই রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম নাটকটি দেখে। এরপর লিটল ড্রামা গ্রুপ ভেঙে যায়। অশোকদা'র নেতৃত্বে তৈরি হয় ---সি এ. সি টি। এই সংস্থায় যোগ দেন মানস দেববর্মন, কৃষ্ণা দেববর্মন, প্রয়াত যুগললতা বৈদ্য, কোর্টের কর্মী দিলীপ সিনহা, প্রয়াত মৃণাল সেনগুপ্ত, দেবরাজ হালদার, প্রখ্যাত রবীন্দ্র সংগীত গায়িকা সবিতা দাস, আইনজীবী দিলীপ সরকার, রীতা সরকার প্রমুখ নাট্যামোদী শিল্পীরা। এই সংস্থার উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয় নাটক ছিল উৎপল দত্ত রচিত 'টিনের তলোয়ার'। মনোজ মিত্র রচিত নাটক 'শিবের অসাধ্যি' ও 'সাজানো বাগান'। আরেকটি নাটকেরও সফল প্রযোজনা 'আনন্দম' নাট্য সংস্থাটি করেছিল সেটি হল 'আমি মন্ত্রী হব'। মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন আইনজীবী দিলীপ সরকার।

এ রাজ্যের আরেকটি উল্লেখযোগ্য নাট্য সংস্থা 'সংস্কৃতি পরিষদ'। যাদের অবদান অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই ত্রিপুরা রাজ্যের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মানুষজনের। যে সংস্থাটির পুরোধা ব্যক্তিরা ছিলেন প্রয়াত হীরালাল সেনগুপ্ত, শিবদাস ব্যানার্জি, কল্যাণ রায়, প্রয়াত শ্যামল চক্রবর্তী, ধীরেন্দ্র দেবনাথ, কমলবরণ দে, সঞ্জীব ব্যানার্জি, শিবপ্রসাদ ধর, মিঠু ভট্টাচার্য, নান্টু পাল, দুর্গাপ্রসাদ দে, প্রশান্ত দেব এবং আরও অনেক নাট্যামোদী সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। এছাড়াও আরও কয়েকটি নাট্য দল অজিত মজুমদার এবং পার্থ রায়ের নেতৃত্ব নাট্য আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করতে ৭০-এর দশক এবং পরবর্তী দশকে কিছুদিন নিয়োজিত ছিল।

কোলকাতার বিখ্যাত নাট্যসংস্থা 'নান্দীকার'-এর স্রষ্টা এবং পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন প্রয়াত অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন সি পি আই (এম) দলের সদস্য। কোলকাতায় এবং সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী নাট্য আন্দোলনের ধারাকে পরিপুষ্ট

করে তুলতে পার্টিগতভাবে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। '৬০-এর দশক থেকে অর্থাৎ ১৯৬৪ সালে সি পি আই (এম) দল গঠিত হওয়ার অব্যবহিত পর থেকেই গণনাট্য সংঘের দায়িত্ব নিয়ে কাজ শুরু করেন। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন সময় শিল্পী-স্বাধীনতার ওপর পার্টির অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপে সব ছেড়ে দিয়ে তিনি 'নান্দীকার' নাট্য সংস্থাটির সৃষ্টি করেন এবং স্বাধীনভাবে বামপন্থী নাট্য আন্দোলনকে বলিষ্ঠ এবং বেগবান হয়ে উঠতে সাহায্যকারীর ভূমিকা গ্রহণ করেন। এখন অবশ্য পশ্চিমবঙ্গেও সাংস্কৃতিক ও নাট্য আন্দোলনের বামপন্থী ধারা খুবই দুর্বল অবস্থায় আছে, আমাদের রাজ্যের মতই। শুনেছি 'রূপম' নাট্য সংস্থাটিকে আবার শিশির দেব, আশীষ মোদক, শিশির মজুমদার, বিভু ভট্টাচার্য প্রমুখ আবার সচল করার উদ্যোগ নিয়েছেন। কোনও একটি নাটকের রিহার্সালও চলছে। তবে 'রূপম'-এর স্রষ্টা সুবোধ দে-কে এবারের নব প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত করা হয়নি। সম্ভবত সুবোধ বাবুর মত স্বাধীনচেতা শিল্পীকে তথাকথিত পার্টি শৃঙ্খলায় বেঁধে রাখা সম্ভব নয় বিবেচনা করে।

৬০-এর দশকের শেষ থেকে ৭০-এর দশক এবং ৮০-র দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের বামপন্থী নাট্য আন্দোলনের রূপরেখার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র মোটামুটিভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। ১৯৬৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর 'রূপম' নাট্য গোষ্ঠীর জন্ম হয়। এই সংস্থাটি ১৯৬৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি সুবোধ দে-র পরিচালনায় তুলসীবতি স্কুলে প্রথম প্রযোজনা করে 'এক বায়স কথা'। এতে অভিনয় করেছিলেন সুবোধ দে, কাননবিহারী গোস্বামী, দেবব্রত ব্যানার্জি, শিশির দেব প্রমুখ। এই সংস্থাটির দ্বিতীয় প্রযোজনা তুলসীবতী বিদ্যালয়ে ১৬ জুন ১৯৬৮ সালে জগদীশ চক্রবর্তীর লেখা নাটক 'প্রতিনিধি'। জগদীশ চক্রবর্তী হলেন সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা চরিত্রে বর্তমানে অভিনয়রত সব্যসাচী চক্রবর্তীর প্রয়াত পিতা। এই নাটকে সুবোধ দে, প্রয়াত মানস গাঙ্গুলি, অশোক মুখার্জি, শিশির দেব প্রভৃতি অভিনয় করেছিলেন। 'রূপম'-এর পর মঞ্চস্থ করে 'রাজরক্ত', 'শের আফগান', 'সারা রাত্রির', 'এবং ইন্দ্রজিৎ', 'টেরাডাকটিল'। রূপম-এর শেষ প্রযোজনা ছিল 'অমিতাক্ষর'। এই নাটকটি দু'বার রবীন্দ্র ভবনে মঞ্চস্থ হয়। প্রথমটি হয় ২৩ আগস্ট ১৯৮১ সালে এবং দ্বিতীয়টি হয় ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ সালে। ১৯৮১ সালে মোটামুটি সুবোধ দে রাজ্য ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। তাই এই নাটকে মূল চরিত্রে অভিনয় করেন আশিস মোদক। সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন মানস গাঙ্গুলি, শুভ্রা ধর, তপশ্রী গাঙ্গুলি, সুমিতা ভট্টাচার্য, আর্নেন্দু বিকাশ ধর প্রমুখ। ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিকে সুবোধ দে ত্রিপুরা ছেড়ে কোলকাতা চলে যান। পাপিয়া বসু নামে এই রাজ্যের একজন সম্ভাবনাময়ী নাট্যকর্মী 'রূপম' প্রযোজিত 'রাজরক্ত' নাটকে ১৯৭৪ সালে অভিনয় করেছিলেন। ১৯৭৭ সালে দিল্লির ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামায় সুযোগ পেয়ে তিনি দিল্লি চলে যান। পড়াশোনা শেষ করে তিনি আশিস চক্রবর্তীকে বিয়ে করে কোলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং 'আকাশবাণী'-র প্রোগ্রাম এগজিকিউটিভ অফিসার হিসেবে কাজ শুরু করেন। কোলকাতার বিখ্যাত নাট্যগোষ্ঠী 'চেতনা'-র সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চেতনা-র পরিচালক জগন্নাথ বসুর বাড়ি সরস্বতী পুজোর দিন স্বামী, সন্তানদের নিয়ে

যাওয়ার সময় অটো এবং রিক্সার সংঘর্ষে আহত হন এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 'রূপম' নাট্য সংস্থাটি দীর্ঘ ১৫ বছর যাবৎ এ রাজ্যে বহু সমৃদ্ধ নাটক রাজ্যবাসীকে উপহার দিয়েছে। এই সংস্থাটির সাংগঠনিক শক্তি এবং উৎকর্ষতার মূল চাবিকাঠি ছিল দুই শ্রেষ্ঠ নাট্য ব্যক্তিত্ব সুবোধ দে এবং প্রয়াত মানস গাঙ্গুলির একে অপরের প্রতিভার ওপর অগাধ শ্রদ্ধা। এদের মধ্যে সংগঠন চালাতে গিয়ে কোনও সংঘাত কোনও দিন হয়নি। কারণ দু'জনের প্রতি দু'জনেই ছিলেন শ্রদ্ধাশীল, বিশ্বস্ত।

'রঙ্গম' নামক আরেকটি নাট্য সংস্থা ঠিক একই সময়ে গড়ে উঠেছিল প্রশান্ত গাঙ্গুলি, সলিল দেববর্মন, অধ্যাপক বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য, বামাপদ মুখার্জি, জলধর মল্লিক এবং প্রাক্তন শিক্ষা অধিকর্তা সুকুমার দাস----তাঁদের প্রয়াসে। তাঁদের মঞ্চস্থ জনপ্রিয় নাটক ছিল বামাপদ মুখার্জির পরিচালনায় সমরেশ বসু রচিত 'ছুটির ফাঁদে'। 'আনন্দম' নাট্য সংস্থা গঠনের পূর্বে অজিত মজুমদার এদের নাট্য সংস্থার নাম ছিল 'ঘরোয়া'। তাঁদের জনপ্রিয় প্রযোজনা ছিল 'আলিবাবা'। এতে আবদাল্লার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন আইনজীবী দিলীপ সরকার এবং মর্জিনার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন বীতা সরকার। অন্যান্য চরিত্রে অজিতবাবুর স্ত্রী সবিতা মজুমদার, কমল মজুমদার প্রমুখ অভিনয় করেছিলেন।

'তিয়াস' নামক নাট্য সংস্থাটির প্রাণপুরুষ ছিলেন এই শহরের জনপ্রিয় চিকিৎসক ডা. এইচ. এস. রায় চৌধুরী। তাঁদের জনপ্রিয় প্রযোজনা ছিল ডা. রায়চৌধুরী পরিচালিত বাদল সরকার লিখিত নাটক 'পাগলা ঘোড়া'। এতে অভিনয় করেছিলেন ডাক্তারবাবুর স্ত্রী শ্রীমতী দীপ্তি রায়চৌধুরী, রেখা ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শেখরেশ ভট্টাচার্য, তাঁর স্ত্রী রুনা বাণা, অধ্যাপক অমিতাভ দেববায়, তন্ময় দত্ত প্রমুখ।

রবীন্দ্র পরিষদ মঞ্চস্থ করেছিল রবীন্দ্রনাথের 'মুক্ত ধারা'। এতে অভিনয় করেছিলেন প্রয়াত অধ্যাপক বিজন চৌধুরী, সত্যব্রত ভট্টাচার্য, জলধর মল্লিক এবং প্রাক্তন শিক্ষা অধিকর্তা সুকুমার দাস প্রমুখ।

'৭০-এর দশকে উমাকান্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক শক্তি হালদারের উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল 'রূপারোপ' নাট্য গোষ্ঠী। শক্তি হালদারের পরিচালনায় এই সংস্থার জনপ্রিয় প্রযোজনা ছিল 'সীতাহরণ পালা'। এতে অভিনয় করেছিলেন নরেশ পোদ্দার, অমলেন্দু সেনগুপ্ত প্রমুখ। এছাড়াও বীরচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরির তৎকালীন লাইব্রেরিয়ান বিমল গুপ্তের উদ্যোগে আরেকটি নাট্য সংস্থা গড়ে উঠেছিল, যার নাম এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না। তবে বিমল গুপ্ত তাঁদের নাট্যান্দোলন থেকে যাত্রা শিল্পে অবদান অনেক বেশি ছিল।

প্রয়াত অশোক চক্রবর্তীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা সংস্থা সি. এ. সি. টি.-র পুরো নাম ছিল সেন্টার অব আর্ট অ্যান্ড কালচার অব ত্রিপুরা।

সিপিআই (এম) দল এই রাজ্যে প্রথম ক্ষমতায় আসীন হয় ১৯৭৮ সালে। ক্ষমতায় আসীন হওয়ার আগে রাজ্যের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পার্টির তরফে দায়িত্ব পালন করতেন প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা ভানু ঘোষ। তিনি প্রকাশ্যেই বলতেন—আমি নাটক-ফাটক কিছু বুঝি না। কিন্তু তিনি প্রতিটি শিল্পীর নাড়ির স্পন্দন, তাদের সুখ-দুঃখ, ব্যক্তিগত অনুভূতির খোঁজ রাখতেন। ফলে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে ভানুদার নেতৃত্ব দেওয়ার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে

কোনও দিন কোনও প্রশ্ন তোলার স্পর্ধা কেউ দেখাতে পারেনি। সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে ভানুদা শেকড়হীন লতা-গুল্ম ছিলেন না। তিনি ছিলেন অভিভাবক সদৃশ মহীরূহ। পার্টি ক্ষমতায় আসার পর ভানুদার কাজকর্মের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়ে পড়ায় তিনি অন্যান্য কাজে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের কাজে আর মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সুতরাং, পার্টিকে নতুন নেতার ওপর সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের দায়িত্ব সমর্পণ করতে হয়। আর সেখানেই দেখা দেয় মূল গলদ। শেকড়হীন আগাছার মত সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে এবং শিল্পীদের স্বাধীন সত্তায় অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ করতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি বিপত্তির সৃষ্টি হয়েছে। শিল্পীদের আত্মমর্যাদা বোধ আহত হয়েছে বার বার। তাসের প্রাসাদের মতে ভেঙে পড়েছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সৌধগুলো। কিভাবে ভবিষ্যতে সেই ক্ষতিপূরণ হবে অন্তত আমার জানা নেই।

আগরতলা অমিয় সাগর পাড়ে জেলেদের একটি ঘর ছিল। সেই ঘরে ১৯৬৬ সনে ত্রিপুরা সাংস্কৃতিক পরিষদের জন্ম হয়। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরা হলেন, শিবদাস ব্যানার্জি, হীরালাল সেনগুপ্ত, শ্যামলবরণ চক্রবর্তী, ননী দাশগুপ্ত, বনমালী ভট্টাচার্য, ইলা ভট্টাচার্য, কল্যাণ পাল, কল্যাণ রায়, দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য, ধীরেন্দ্র দেবনাথ, অমল দাশগুপ্ত, শৈলেন চৌধুরী, নৃপেন দে, বিদ্যুৎ বিকাশ দে প্রমুখ। এদের প্রথম নাটক উৎপল দত্তের 'রাতের অতিথি' অভিনীত হয় উদয়পুর ১৯৬৯ সনে। তারপর মঞ্চস্থ হয় '২০শে জুন', 'রাহুমুক্তি', 'মহেশ'। রাহুমুক্তিতে একটি পরিবারের সদস্য হিসাবে অভিনয় করতেন সুপ্রিয় ভৌমিক, দিপালী চক্রবর্তী, ভীষ্মদেব ভট্টাচার্যের ছোট ভাই। পরপব দু'টি দুর্ঘটনায় দিপালী চক্রবর্তী ও ভীষ্মদার ছোটভাই নিহত হন। সুপ্রিয়দাকে সংস্কার ঘিরে ধরে যদি তাঁরও কিছু হয়ে যায়। যাহোক, পরবর্তী সময়ে সংস্কার কাটিয়ে নাটকটি পুনর্বার মঞ্চস্থ হয়েছিল। পরের প্রযোজনা শুভঙ্কর চক্রবর্তীর 'চাঁদ সওদাগরেব পালা'। বর্ণাঢ্য সংগীতমুখর নাটক। অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রী ছিল এই নাটকে। তখন 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকার ১ম পাতায় ভূপেন দত্ত ভৌমিক এবং ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য লিখেছিলেন কোলকাতার বাবুরা এসে দেখে যান ২৭টি গান নেচে গেয়ে কথক ঠাকুরের ভূমিকায় কি সাবলীলভাবে অভিনয় করেছে কল্যাণ রায়। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' নাটকে ঐতিহাসিক গফুরের চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় করতেন শিবদাস ব্যানার্জি, আমিনার চরিত্রে বর্ষা দাশগুপ্তা, ধুরন্ধব পুরোহিত চরিত্রে কল্যাণ রায়। ত্রিপুরা সংস্কৃতি পরিষদের এরপর মঞ্চস্থ বহু নাটকের মধ্যে ঐতিহাসিক ও উল্লেখযোগ্য মঞ্চস্থাপনা অরুণ মুখোপাধ্যায় লিখিত 'মারীচ সংবাদ'। ত্রিপুরা রাজ্যের নাট্য আন্দোলনে যে নাটক আজো মাইলস্টোন হিসাবে চিহ্নিত। সেই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে সাংস্কৃতিক পরিষদের অন্যান্য প্রযোজনা সম্পর্কে বলে নিই। সাংস্কৃতিক পরিষদ একে একে মঞ্চস্থ করে রবিঠাকুরের 'রথের রশি', ম্যাক্সিম গর্কির 'লো ল্যান্ড ম্যান' অবলম্বনে নাটক 'সামান্য অসামান্য', ধীরেন্দ্র দেবনাথের লেখা নাটক 'কবর'। রবিঠাকুরের 'গুপ্তধন' অবলম্বনে শুভাশিষ তলাপাত্রের লেখা 'দাহনবেলা'। চাঁদ সওদাগরের পালা এবং রাহুমুক্তিতে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের ছোটবোন রত্না সরকার ও জ্যেষ্ঠ্য শ্যালিকা গার্গী ভট্টাচার্য দাপটের সঙ্গে অভিনয় করেছিল। এছাড়া এদের মঞ্চস্থ জনপ্রিয় পথনাটিকা 'বাস্তব শাস্ত্র', 'দিনবদলের পালা', 'আর হবে না দেরি', কল্যাণ রায় রচিত 'বেচারামের বাঞ্ছাপূরণ',

'শনিঠাকুরের পালা', 'মাচাং বাবা' ও 'এবার রাজার পালা'। সংস্কৃতি পরিষদের মঞ্চস্থ উল্লেখযোগ্য গীতিনাট্য হল—সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'রাণার', 'অবাক পৃথিবী'। রাণারের অভিনয় করেছিলেন কল্যাণ রায়, অবাক পৃথিবীতে হীরালাল সেনগুপ্ত। জন হেনরি গীতিনাট্যে সঞ্জীব ব্যানার্জি। এছাড়া মঞ্চস্থ হয়েছে কোরাসধর্মী গীতিনাট্য 'শঙ্খচিল'। রবিঠাকুরের গীতিনাট্য 'রক্তকরবী'। এতে অভিনয় করেছিলেন শংকর দাশ, কৃষ্ণকেশব রায়, ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য, উদয়শঙ্কর ভট্টাচার্য, কল্যাণ রায়, সুভাশিষ তলাপাত্র, হীরালাল সেনগুপ্ত ও শিবদাস ব্যানার্জি। ত্রিপুরা রাজ্যে সর্বপ্রথম ১৯৮৬ সনে গণসংগীতের ক্যাসেট 'পথের নিশানা' বের করে ত্রিপুরা সংস্কৃতি পরিষদ। উদ্যোক্তা ছিলেন কল্যাণ রায়, জওহর ব্যানার্জি, শিবু ধর, উদয়শঙ্কর ভট্টাচার্য। ২০০১ সালের নভেম্বর মাসে শিবদাস ব্যানার্জির পরিচালনায় সংস্কৃতি পরিষদ আগরতলা ও কমলপুরে মঞ্চস্থ করে মাইকেল মধুসূদনের 'শেষ সংলাপ'। এতে একক অভিনয় করেছিলেন শুভাশিষ তলাপাত্র। সম্ভবত এটিই সংস্কৃতি পরিষদের শেষ নূতন নাটক উপস্থাপনা। এদের অভিনীত বিভিন্ন নাটকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জন পরিচালনার দায়িত্বে থাকলেও সুরকার ছিলেন সবসময় হীরালাল সেনগুপ্ত এবং অধিকাংশ নাটক তিনিই পরিচালনা করেছেন।

সাংস্কৃতিক পরিষদের কালজয়ী প্রযোজনা ছিল 'মারীচ সংবাদ'। '৭০-এর দশক থেকে শুরু করে '৮০-র দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যের গণআন্দোলন এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে গতিপথ দেখিয়েছে এই নাটকের অগণিত দর্শক, যোদ্ধা এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। এতবড়, বিপুল প্রযোজনা করতে গিয়ে সাংস্কৃতিক পরিষদকে অন্যান্য নাট্য সংস্থা থেকে অতিথি শিল্পী নিয়োগ করতে হয়েছিল। কোলকাতার নাট্যগোষ্ঠী 'চেতনা'র অরুণ মুখোপাধ্যায় রচিত এই নাটক বর্ণাঢ্য এবং জাঁকজমকপূর্ণই শুধু নয়, এত অর্থবহ ছিল যে বারবার দেখে আশ মিটত না। আমি নিজে কতবার দেখেছি তার ইয়ত্তা



দশরথ দেব, মানিক সরকার ও হীরালাল সেনগুপ্ত ও অন্যান্য

নেই। কমিউনিস্ট নেতা চিত্ত চন্দের নাটক পড়ার অভ্যেস ছিল। তিনি শিবদাস ব্যানার্জির কাছ থেকে 'মারীচ সংবাদ' নাটকটি নিয়ে পড়েন এবং চমৎকৃত হন। তিনিই শিববাবুকে বলেন, বহুদিন এত ভাল নাটক পড়িনি। এরপর ত্রিপুরা সংস্কৃতি পরিষদের কর্ণধারবা এই নাটক পড়ে মঞ্চস্থ করবেন সিদ্ধান্ত নেন। এই নাটকটি ত্রিপুরাতে সর্বাধিক ৩৬ বার মঞ্চস্থ হয়েছে। এর মধ্যে উদয়পুরে হয়েছে ২বার। প্রায় প্রতিটি শো 'হাউসফুল' যেত। এতে অভিনয় করেছেন—যাদুকর ঃ হীরালাল সেনগুপ্ত, ১ নং সাকরেদ ঃ বাবুল দত্ত, ২ নং সাকরেদ ঃ নান্টু পাল, বাল্মীকি ঃ প্রশান্ত দেব/সত্যপ্রসাদ চক্রবর্তী, মুণি বালক-১ ঃ টুলু দে, মুণি বালক-২ ঃ শিবশঙ্কর দে'র ভাইঝি। পোস্টার বয় ঃ অমল চক্রবর্তী/শিবশঙ্কর দে।

মেরীবাবা ঃ সঞ্জীব ব্যানার্জি / শ্যামল চৌধুরী / শিবপ্রসাদ ধর। সঞ্জীব ব্যানার্জি ২৫বার মেরীবাবার অভিনয় করে রাজ্যত্যাগ করে কোলকাতা চলে যান।

কোরাস গান ঃ নেপাল কর, বিদ্যুৎবিকাশ দে, অসিত চক্রবর্তী, শ্যামল ভট্টাচার্য, অমলবরণ চক্রবর্তী, শিবশঙ্কর দে।

বাদ্যযন্ত্রে ঃ মীরকাশেম মিঞা (করনেট), অনিল ঋষিদাস (ঢোল), হীরা মিঞা, চুনু মিঞা, শঙ্কর ঋষিদাস।

মারীচ ঃ শ্যামল চক্রবর্তী, কালনেমি ঃ শঙ্কর চৌধুরী, রাবণ ঃ ডাঃ প্রিয়তোষ ভট্টাচার্য / সুধাংশু বিকাশ সাহা / শিশির মজুমদার / মনোরঞ্জন দে।

ঈশ্বর লেঠেল ঃ কমলবরণ দে, ধুরন্ধর নায়েব ঃ কল্যাণ রায়, জমিদার ঃ নিত্য গাঙ্গুলি / শিশির মজুমদার। ঈশ্বর লেঠেলের বাবা ঃ শিবদাস ব্যানার্জি। বিবেক ঃ শিবপ্রসাদ ধর / কমলবরণ চক্রবর্তী / বিদ্যুৎবিকাশ দে।

গ্রেগরী (সাংবাদিক) ঃ স্বপন ভট্টাচার্য / আশিস চক্রবর্তী / উত্তম চক্রবর্তী (পটলা)।

ম্যাকী ঃ প্রহ্লাদ দে, উইলিয়াম ঃ অহিন্দ্র চক্রবর্তী / শঙ্কর দাশ । পরিচালনা ও সুরকার ঃ হীরালাল সেনগুপ্ত।

ব্রেখটের জন্মশতবর্ষে কল্যাণ রায়ের পরিচালনায় 'কাব্যলোক' একবার 'মারীচ সংবাদ' নাটকটি মঞ্চস্থ করে। বলাবাহুল্য সেই প্রযোজনাটি ত্রিপুরা সংস্কৃতি পরিষদের ধারেকাছে যেতে পারেনি। ১৯৭৩ সনে রবীন্দ্রভবনে ত্রিপুরা সংস্কৃতি পরিষদ প্রথম মারীচ সংবাদ মঞ্চস্থ করে। শেষ প্রযোজনা সংস্কৃতি পরিষদের তরফে নাটকটি মঞ্চস্থ হয় ১৯৯২ সনে। নাটকটির মেক-আপ ম্যান ছিলেন সত্য নন্দী। মঞ্চসজ্জায় শংকর চৌধুরী। আলোকসম্পাত করেছেন হরিপদ দাস ও দেবল চ্যাটার্জি।

সি.এ.সি.টি বা সেন্টার অব কালচার এ্যান্ড আর্ট অব ত্রিপুরা অশোক চক্রবর্তীর নির্দেশনায় উৎপল দত্তের 'মেঘ' নাটকটি ১৯৭৩ সন থেকে মোট ৮ বার মঞ্চস্থ করেছিল। ১৯৮০ সনে রাজ্যে ভ্রাতৃঘাতি দাঙ্গার পটভূমিকায় সি.এ.সি.টি রচিত নাটক 'অনুসন্ধান' মোট ৪বার ১৯৮১-৮২ সনে অভিনীত হয়। এর পূর্বে ১৯৭০-৭১ সনে শরৎচন্দ্রের 'রমা' এবং গীতিআলেখ্য 'শরত আলোর কমল বনে' অভিনীত হয়। এছাড়া এই টিমটি পার্টির এবং গণসংগঠনের বিভিন্ন কর্মসূচিতে গণসংগীত পরিবেশন করত। ১৯৭৪ সন থেকে উৎপল দত্তের 'টিনের তলোয়ার' নাটকটির সার্থক প্রযোজনা হয় মোট ১০ বার। ১৯৭৬ সনে মনোজ মিত্রের 'পরবাস' অভিনীতহয় ৬ বার। ১৯৭৯ সন থেকে ১৯৮৪

সনে মনোজ মিত্রের 'শিবের অসাধ্যি' অভিনীত হয় ৮ বার। ১৯৮৬-৮৭ সনে মনোজ মিত্রের 'প্রস্তুতি' নাটক মঞ্চস্থ হয়। ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৫ মনোজ মিত্রের 'সাজানো বাগান' অভিনীত হয় মোট ৯ বার। এর পূর্বে ১৯৭৫ সনে অজিত বন্দোপাধ্যায়ের 'থানা থেকে আসছি' মঞ্চস্থ হয় ২ বার। ১৯৭১-৭২ সনে অভিনীত হয় মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'। 'টিনের তলোয়ার' নাটকে সুরকার ছিলেন হীরালাল সেনগুপ্ত। সি.এ.সি.টি অভিনীত সুকান্তের সব গীতিআলেখ্যে সুর দিয়েছেন হীরালালদা। বিভিন্ন সময়ে সি.এ.সি.টি-তে যারা অভিনয় করেছেন তাঁরা হলেন—অশোক চক্রবর্তী, দেবরাজ হালদার, মানস দেববর্মণ, দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য, সলিল দেববর্মণ, দিলীপ সিন্‌হা, দিলীপ সরকার, স্বপন চক্রবর্তী (২ জন), যুগললতা বৈদ্য, কমল মজুমদার, হাবুল বর্মন, নন্দন ঘোষ, চামেলী চক্রবর্তী, তাপসী দাস, রীতা সিংহরায়, কৃষ্ণা দেববর্মণ, লিলি সেনগুপ্তা, লক্ষ্মী সিংহরায়, মিঠু সিংহরায়, ইরা গাঙ্গুলি, ফুলন ভট্টাচার্য, মানস গাঙ্গুলি, শিশির মজুমদার, শঙ্কর দাশ প্রভৃতি।

লিট্‌ল ড্রামা গ্রুপ (এল.ডি.জি) সম্পর্কে কিছু কথা :

লিট্‌ল ড্রামা গ্রুপ (এল ডি.জি) ১৯৬৭ সনের জানুয়ারি মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ঐ সালেরই নভেম্বর মাসে মহাবাণী তুলসীবতী স্কুলে প্রথম মঞ্চস্থ করে উৎপল দত্তের নাটক 'কিউবা'। পরিচালনায় ছিলেন অশোক চক্রবর্তী। তাতে অভিনয়ে অংশ নেন 'অশোক চক্রবর্তী, অমূল্য বণিক, কমল মজুমদার, মৃণাল দে সরকার, প্রশান্ত দেব, বদ্রীলাল দেববর্মা এবং ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য। এই নাটকটি তিনবার মঞ্চস্থ হয়। এই গ্রুপটির দ্বিতীয় প্রযোজনা 'চপট' মঞ্চস্থ হয় তুলসীবতী স্কুলে ঐ একই সনের ডিসেম্বর মাসে। তারপর ১৯৬৮ সনে 'রাজাধিরাজ দর্শন' (তিনবার), ব্রেখটের 'সমাধান'। উৎপল দত্তের 'মেঘ' (৬৯ সনে তিনবার), উৎপল দত্তের 'সভ্যনামিক' (৭০ সন), 'হারাধনের দশটি ছেলে' (৭১), 'ঠিকানা' (৭৩), 'ঘুম নেই' (৭৩), ব্রেখটের 'নিয়ম ও ব্যতিক্রম' (৭৪)। প্রথম দুটি ছাড়া বাকি সবই মঞ্চস্থ হয় রবীন্দ্রভবনে। সবকটি নাটকেরই পরিচালক ছিলেন অশোক চক্রবর্তী। এই নাটকগুলিতে যাঁরা অভিনয় করেন তাঁরা হলেন—অশোক চক্রবর্তী, অহীন্দ্র চক্রবর্তী, অমূল্য বণিক, প্রদীপ বসু, প্রশান্ত দেব, প্রদীপ দাশগুপ্ত, ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য, অমিত রায়, ফুলন ভট্টাচার্য, লিলি সেনগুপ্ত, মানস দেববর্মা, কমল রায়, শিবানী চৌধুরী, অনিতা হাজরা, যুগললতা বৈদ্য, জ্ঞানানন্দ রায়, পরেশনাথ ভট্টাচার্য, নিরঞ্জন দাস, সুশীল দাস, হরিপদ ভট্টাচার্য, পীযূষ ধর, মিতা দাস, অসিতবরণ চক্রবর্তী প্রমুখ। ১৯৭৪ সনে অশোক চক্রবর্তী এল.ডি.জি'র সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে সি.এ.সি.টি নামক নাট্যসংস্থা গঠন করেন। তারপর ১৯৭৪ সনেই এল.ডি.জি প্রযোজনা করে উৎপল দত্তের বিখ্যাত নাটক 'ফেরারী ফৌজ'। এর মোট তিনটি অভিনয় হয়। '৭৫ সালে জরুরি অবস্থার সময় এর ৪র্থ শো আরম্ভ হওয়ার প্রাক্ মুহূর্তে এক সরকারি আদেশে এর মঞ্চায়ন বন্ধ করে দেয়া হয়। এই নাটকটি পরিচালনা করেন অহীন্দ্র চক্রবর্তী। জরুরি অবস্থার সময় নাট্যসংস্থাটি টিকিয়ে রাখার জন্য

কৌশল পরিবর্তন করে কিছু অরাজনৈতিক নাটক করা হয়। তার মধ্যে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল প্রশান্ত দেব পরিচালিত বাদল সরকারের হাসির নাটক 'বল্লভপুরের রূপকথা' (৭৫-৭৬ সন)। এর মোট ৪টি অভিনয় হয়। তখন থেকে নতুন কিছু শিল্পী এল.ডি.জি-তে যোগ দেন—বিনয় ধর, বর্ষা সেনগুপ্তা, মণিকা চক্রবর্তী, মিনা রায়, গৌরী মোদক প্রমুখ। ১৯৭৮ সন পর্যন্ত আরও উল্লেখযোগ্য কিছু নাটক হল শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী' (৭৫), নারায়ণ সান্যালের 'পাষণ্ডপণ্ডিত' (৭৬), উৎপল দত্তের 'কাকদ্বীপের এক মা' (৭৮), 'মরুঝঞ্ঝা' (৭৮), উৎপল দত্তের বিখ্যাত নাটক 'লৌহ মানব' (৭৮)-এর মোট ৬টি অভিনয় হয়। অধ্যাপক বামাপদ মুখোপাধ্যায় '৭৮ সালে এল.ডি.জি-তে যোগদান করেন এবং প্রথম 'লৌহমানব' নাটকে অভিনয় করেন এবং নাটকটি পরিচালনা করেন। এল.ডি.জি-র শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা, বামাপদ মুখার্জি পরিচালিত শুভঙ্কর চক্রবর্তীর নাটক 'বিদ্রোহী চার্বাক' (৮২) ৮৪ সাল পর্যন্ত এর মোট আটটি অভিনয় হয়। ৬৭ থেকে ৮৪ পর্যন্ত এল ডি জি মোট ৪২ বার নাটক প্রযোজনা করে।

১৯৭৭ সনে সি.এফ.ডি-সি.পি.আই (এম) কোয়ালিশন সরকারের আমলে যখন প্রয়াত প্রফুল্ল কুমার দাস মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন সমাজতান্ত্রিক ভিয়েতনামের প্রতিনিধিদলকে উমাকান্ত স্কুল ময়দানে সি.পি.আই (এম) দলের ছাত্র-যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে এক বিশাল সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। সেই সংবর্ধনাসভায় শিশির মজুমদার, পার্থ রায়, পঙ্কজ দে, দক্ষিণারঞ্জন দে প্রমুখ অভিনেতারা অভিনয় করেছিলেন 'অজেয় ভিয়েতনাম'। ভিয়েতনামের প্রতিনিধিরা নাটকটি দেখে আপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন। অভিনেতাদের তাদের দেশের ব্যাজ এবং উত্তরীয় পরিয়ে তারা অভিনন্দিত করেছিলেন।

১৯৭১ সনে অধুনা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন প্রথমদিকে সেই সংগ্রামের তীব্রতা, আবেগ ভালো করে ঠাহর করে উঠতে পারিনি। যুদ্ধকালীন সময়ে শঙ্কর দাশ হঠাৎ প্রস্তাব করল ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর ঘুরে আসার জন্য। শঙ্করদার পিতামহ ডাঃ কে.সি. দাস এই শহরের অত্যন্ত সম্মানিত এবং নামজাদা বিত্তশালী লোক ছিলেন। ডাঃ কে.সি দাসের মৃত্যুর পর শঙ্করদার বাবা, কাকারা সম্পত্তি বিনিময় করে আগরতলা চলে আসেন। আমি তো শঙ্করদার প্রস্তাব শুনে একপায়ে খাড়া। কোনদিন পূর্ব পুরুষের মাতৃভূমিতে পা রাখিনি। পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশকে নিয়ে আগেই একটি বিশেষ অনুভূতি মনে স্থান করে নিয়েছিল। আমার সঙ্গে সমীর চক্রবর্তী, মধুসূদন ভট্টাচার্য (১ নং), অরবিন্দ ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া যেতে রাজি হয়ে গেল। ১৯৭১ সনের এপ্রিল মাসের শেষদিকে সকাল বেলা শিঙ্গারবিল (বর্তমানে এয়ারপোর্ট) এলাকার বিল থেকে গয়না নৌকা ভাড়া নিয়ে বিকেলের দিকে গিয়ে পৌঁছলাম ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাস নদীর কোম্পানিঘাটে। সেখানে পৌঁছে নিউ সিনেমা রোডে শঙ্করদার বাল্যবন্ধু ননী করের মেডিসিন শপে সবেমাত্র আমরা সবাই চায়ের কাপে চুমুক দিয়েছি এর মধ্যেই সেদিনই প্রথম ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে পাক বিমানবাহিনীর বোমাবর্ষণ শুরু হয়ে গেল। মুহূর্তে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর শ্মশানে পরিণত হল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যে যেমন পারে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটছে। অগণিত মানুষ কোম্পানিঘাটে তিতাসের জলে আশ্রয় নিয়েছে। এই অবস্থায় ননী করও আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া থাকা সমীচিন ও নিরাপদ মনে না করায়

আমরা আবার কোম্পানিঘাটে ফিরে এলাম। বিমান হানা চলছে। অদক্ষ কিন্তু দেশপ্রেমিক মুক্তিসেনা বিমান থেকে বোমা ফেলার সময় যখন গোঁত্তা খেয়ে বিমান নীচে নামে তখন সবাই গাদাবন্দুক, থ্রি-নট-থ্রি সহ নদীর জলে ডুব দিচ্ছে। বোমা ফেলে বিমান যখন আবার ওপরে উঠে বন্দুকের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে তখন জল থেকে মাথা তুলে বিমানের উদ্দেশ্যে গুলি ছুঁড়ছে। মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রের ও প্রশিক্ষণের অভাবে এই অসম লড়াই আমাদের সবার মনকে আবেগে ছুঁয়ে গেছিল। সন্ধ্যা নেমে এলে বিমান হানা বন্ধ হল। আমরা অনেক কষ্টে একটি নৌকার মাঝিকে রাজি করিয়ে সেই রাতেই সিঙ্গারবিলের দিকে যাত্রা করলাম। বেশ খানিকটা জলপথ অতিক্রম করে যখন ভাদুগড় পৌঁছলাম তখন নদীর পারে এম্বুশ করে থাকা মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের তিরস্কার করল। বলল, মাতৃভূমি যখন বিপন্ন তখন কোন লজ্জায় আমরা পালিয়ে যাচ্ছি। কোনভাবেই এদের বিশ্বাস করাতে পারলাম না আমরা ভারতীয়। এরা নির্দেশ দিল নৌকা একটু এগোনোর চেষ্টা করলে গুলি করবে। নিরুপায় হয়ে ফিরে এলাম কোম্পানিঘাট। তখন রাত হয়ে গেছে। নৌকা থেকে নেমে শ্রান্ত দেহে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে ঢুকলাম। যেন জনমানবহীন, প্রেতপুরী। কোন আলোর রেখাও দেখা যায় না। নিকষ কালো আঁধারে ঢাকা ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে যেন প্রাণের কোন অস্তিত্ব নেই। খিদেয় আমাদের পা চলছিল না। হঠাৎ একটি ক্ষীণ আলোর রেখা দেখে আমরা ৫ জনে ঢুকে গেলাম সেই আলোর উৎসস্থলে। গিয়ে দেখি সেটি একটি হোটেল। থরে থরে সুস্বাদু খাওয়ার তৈরি হয়ে খদ্দেরের আশায় সাজানো রয়েছে। ২/৩ জন কর্মচারী ভয়ে গুটিশুটি মেরে রয়েছে। আমাদের দেখে যেন ইদের চাঁদের দেখা পেল। পাত পেড়ে ভুরিভোজ করালো বিনে পয়সায়। আমি আর মধু জন্মের শেষ খাওয়ার মত বিপুল পরিমাণ খাওয়ার খেয়ে নিলাম। উটের কুঁজোয় জলের মত সঞ্চয় করে নিলাম অতিরিক্ত আহার উদরভর্তি করে যাতে ২/৩ দিন খাওয়া না জুটলেও কিছু না হয়। অরবিন্দ, সমীর আর শঙ্করদা উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় বেশি খেতে পারেনি। খেতে খেতে শঙ্করদা প্রস্তাব দিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর থেকে ১০ মাইল দূরে কালিকচ্ছ গ্রামে ওনার মামারবাড়ি। সেখানে গেলে ২/১ দিন বিশ্রাম নিয়ে পরিস্থিতি বুঝে আগরতলা ফেরা যাবে। বিকল্প কোন পথ তো তখন আমাদের কাছে খোলা নেই। আমরা সবাই রাজি হয়ে গেলাম। আমি আর মধু তো খেয়ে দেয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠেছি। বললাম, ১০ মাইল কোন ব্যাপার না। রাত্রি ১১/১২টা হবে। কালিকচ্ছ গ্রামের উদ্দেশ্যে হাঁটা শুরু করলাম। পথপ্রদর্শক শঙ্করদা। রাস্তা ভুল হলে কাউকে জিজ্ঞেস করব সে উপায় নেই। তার মধ্যে শুরু হল টিপটিপ বৃষ্টি। বৃষ্টি মাথায় নিয়ে হাঁটছি। কোন ভয়ডর মনে নেই। এক রোমাঞ্চ অনুভব করছি মনেপ্রাণে। যেন এক অ্যাডভেঞ্চারের অভিযাত্রী আমরা। পথে যেতে যেতে ট্রাকের বা গাড়ির আওয়াজ শুনতে পেলেই ভাবি খান সেনারা আসছে। আমরা পথের ধারে কবরের পাশে তুলে রাখা গম্বুজের আড়ালে লুকিয়ে যাই। গাড়ি আমাদের অতিক্রম করে চলে গেলে আবার হাঁটা শুরু করি। এভাবে হাঁটতে হাঁটতে ভোররাতে কালিকচ্ছ গ্রামের প্রবেশদ্বারে যখন ঢুকতে যাব তখন গ্রামের নৈশপ্রহরী বর্শা হাতে আমাদের পথ রুখে দাঁড়াল। শঙ্করদা মামারবাড়ি এবং তাঁর মেসো ধরণী করের নাম উল্লেখ করলেন। বৃদ্ধ নৈশপ্রহরী বলল, পাশের স্কুলঘরে অপেক্ষা করুন। দিনকাল ভাল না। যাদের নাম বললেন,

তেনাদের জিজ্ঞেস করে আসি। পথ হাঁটার পরিশ্রমে ক্লান্ত আমি স্কুলঘরের মেঝেতেই নাকডাকিয়ে ঘুমিয়ে নিলাম। ভোরবেলা শঙ্করদার মেসো ধরণী কর আমাদের সকলকে আপ্যায়ণ করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। ভোরের আলোতে চোখ মেলে দেখলাম রূপসী বাংলার অপরূপ, মনোহারিণী রূপ মাধুর্য্য। যেন সবুজের ঢল, সবুজের গালিচা। কালিকচ্ছ গ্রামে বাবুর বাড়ির পুষ্করিণীর ঘাটে দল বেঁধে সাঁতার কেটে স্নান সারলাম। এত ভয়ঙ্কর, ভয়াবহ পরিস্থিতি কিছুই আমাদের স্পর্শ করতে পারল না। বাংলাদেশ দেখার আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে রইলাম। আমরা যখন স্নান করছি তখনই ভৈরবের ব্রীজের ওপর খানসেনারা বোমা বর্ষণ করছিল। প্রচণ্ড আওয়াজ শুধু নয়, অস্পষ্ট বিমান হামলাও আমরা দেখতে পেয়েছিলাম। তারপরের দিনও আমরা কালিকচ্ছ গ্রামে শঙ্করদার মেসোব বাড়িতে ছিলাম। তাঁরা রাস্তাঘাটের সব খবরাখবর নিয়ে এরপর দিন ভোরবেলা আমাদের চিঁড়েগুড় দিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-সিলেট রোড ধরে আগরতলার দিকে সড়কপথে যাত্রা করিয়ে দিলেন। রাস্তায় নেমে দেখলাম হাজার-হাজার নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধের ভারতবর্ষের সীমান্তের দিকে মিছিল। পথে যেতে যেতে অনেকের সঙ্গে আলাপ হল। এরা বলল, মিঞাভাই, একটু সবুব করুন। বর্ষা আসুক। খানসেনাদের বড়শিতে গেঁথে তুলব, আর টপাটপ শিকার কবব। মাঝখানের কয়দিন একটু আত্মগোপন করে থাকতে হবে নিরাপদ স্থানে। আমরা নির্বিঘ্নে ভারত সরকারের হয়ে সবাইকে সীমান্তের এপারে নিরাপদ আশ্রয়েব প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলাম আন্তরিক ভালোবাসায়। শাহাবাজপুরের কাছে এসে যখন পৌছি তখন মুক্তি যোদ্ধাবা আমাদের যুবক দেখে পথ আটকে দাঁড়াল। দেশ ছেড়ে পালাচ্ছি দেখে বিদ্রূপ করল। অনেক কষ্টে এদের বোঝালাম আমরা ভারতীয়। বাংলাদেশে এসে আটকা পড়ে গেছি। এরা বিশ্বাস করে, আমাদের কাছে আকুল কাকুতি জানাল যে করে হোক বোমা এবং বোমার মশলা এদের সরবরাহ করার জন্য। হয়ত সেই মুক্তিযোদ্ধাদের মাধ্যমেই ভারত সীমান্ত সংলগ্ন গ্রামের মাধবপুর থানার ওসি এবং এস.ডি.ও আমাদের আগমন জেনে গিয়েছিল। তারা আমাদের আপ্যায়ন করে থানায় নিয়ে বসাল। সেখানেই তাবা আমাদের দুপুরে ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা করল। করুন মিনতি জানাল মুক্তিযোদ্ধাদের যাতে যে কোন ধরনের সাহায্যের জন্য আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করি। তাদের সবাইকে আশ্বস্ত করে কাতলামারা সীমান্ত দিয়ে দুপুরের পরে ভারতের মাটিতে এসে পৌছি। মুড়ির টিনের বাসের ছাদে আমরা বসেছি। ভেতরে আসন সংখ্যার তিনগুণ বাংলাদেশ থেকে আগত লোকদের তোলা হয়েছে। ভাড়া দাবি করা হচ্ছে ৪/৫ গুণ বেশি। ক্ষুধার্ত শিশুরা চিৎকার করছে, বৃদ্ধরা ধুঁকছে তবু ঘন্টার পর ঘণ্টা গাড়ির ভেতরে সওয়ারি তুলে আরো সওয়ারির আশায় বাস দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাদের বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও বাস ছাড়ছে না। আমাদেরও হয়ত বাংলাদেশি ভেবেছিল। হঠাৎ গাড়ির অ্যাসিস্ট্যান্ট মধুর সঙ্গে নীচে দাঁড়িয়ে কু-তর্ক জুড়ে দেয়। মধু অধৈর্য্য হয়ে গাড়ির ছাদ থেকে লাফ দিয়ে নীচে নামে। আমি তাকে আটকাতে গিয়ে তার গায়ের জামা আমার হাতে উঠে আসে। গাড়ির অ্যাসিস্ট্যান্টকে মধু এক চড় কষায়। ড্রাইভার বাধা দিলে ড্রাইভারকে একটি ঘুষি দেয়। ড্রাইভারের কপাল ফেটে চৌচির। রক্তে তার চোখ মুখ ভেসে যায়। ভয়ার্ত যাত্রীদের চিৎকার। গাড়ির অ্যাসিস্ট্যান্টের চিৎকারে বাজার থেকে লোকজন ছুটে আসে। অরবিন্দ, আমি, সমীর গাড়ির ছাদ থেকে

নীচে নেমে আসি। আমি শঙ্করদাকে না নামতে ইশারা দিই। তেমন কিছু হলে পার্টি অফিসে তো খবর দিতে হবে। অরবিন্দ পাশেই বি.এস.এফ ক্যাম্পে ফুটবল খেলায় মত্ত জওয়ানদের কাছে সাহায্যের জন্য ছুটে যায়। সমীর কোমর থেকে বিরাট এক ছুরি বের করে বাজারের লোকদের নিবৃত্ত করার জন্য ছুরি ঘুরিয়ে ধূপতি নাচের মত অনেক কসরত করে ব্যর্থ হয়। আমাকে বলে আমি চা বাগানে ঢুকছি এবং সি.আই.টি.ইউ'র তীরন্দাজ বাহিনী নিয়ে আসছি। এর মধ্যেই বাজারের লোকের নিক্ষিপ্ত ইটে মধুর মাথা ফেটে যায় এবং দরদর করে রক্ত পড়তে আরম্ভ করে। এই রক্ত দেখার কারণে মধু আরো বেশি মার খাওয়া থেকে বেঁচে যায়। একটি বাচ্চা ছেলে আমাকে দেখিয়ে বলে ছোরাওলাকে এই লোকটিই বাগানে পালানোর জন্য ঢুকিয়ে দিয়েছে। সেই বাচ্চা ছেলেটি সজোরে এই কথা বলে আমার গালে চড় কষিয়ে দেয়। আমি নিরুপায় হয়ে চড় হজম করি। অরবিন্দ বি.এস.এফের জওয়ানদের বলে- হাম লোগ কলেজকা আদমি হ্যাঁয়, বাজারকা লোগ হামকো খামোখা মারতা। মুঝে সাহায্য করো। বি.এস.এফ জওয়ানরা বলে, কলেজকা আদমিই তো হারামি হোতা হ্যাঁয়। এই কথা বলেই অরবিন্দের পাছায় দু'চার ঘা লাঠি বসিয়ে দেয়। এমন সময় দেখি সমীরের পেছনে যারা চা বাগানের ভেতর ধাওয়া করেছিল তারা সমীরকে সাপ যেভাবে মারে সেভাবে বাঁশের ভার দিয়ে মারতে মারতে নিয়ে আসছে। সমীরের ছোটখাটো অবয়বে মারার আর কোন জায়গা অবশিষ্ট নেই।

ঠিক এমন সময়ে কাতলামারা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গাড়ির ড্রাইভার চিকিৎসিত হয়ে ফিরে আসে। লোকটি সত্যিই ভদ্রলোক ছিল। আমাদের বলে -যা হয়েছে-হয়েছে। গাড়িতে উঠে বসুন-আগরতলা রওয়ানা দেব। আমরা সবাই গাড়ির ছাদে উঠে বসি। আমি এবং অরবিন্দ সমীরকে কোলে তুলে নিই।

গাড়ি যখন ভোলাগিরি আশ্রমের কাছে পৌঁছে তখন সমীর আমাকে বলে গোঁসাই মটরস্ট্যান্ড নেমে গাড়ির ড্রাইভার এবং এ্যাসিস্টেন্টকে শিক্ষা দিতে হবে। আমি, মধু, শঙ্করদা, অরবিন্দ, সমীরকে পরিস্থিতি বুঝিয়ে শান্ত করি। ড্রাইভারের ভদ্রতার কথা ওকে উল্লেখ করে কোন ধরনের ঝামেলা থেকে নিবৃত্ত করি। প্রথমবারের বাংলাদেশের সফর এভাবেই আমার স্মৃতির মণিকোঠায় আজো জ্বলজ্বল করছে।

বাংলাদেশ (তখনও হয়নি) রোমাঞ্চকর সফর শেষে গণপিটুনি সহ্য করে ফিরে এলাম আগরতলায়। ফিরে এসে দেখি বাংলাদেশ থেকে অতিথির আগমনে আগরতলা শহর, শহরতলি লোকে থিকথিক করছে। আমাদের সহপাঠী, বন্ধু-বান্ধব অনেকেই শরণার্থী শিবির নির্মাণের কাজ, শরণার্থীদের রেশন সরবরাহের কাজ ইত্যাদি আরম্ভ করে দিয়েছে। অনেক কলেজ পড়ুয়া ছেলে ও পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে দু'পয়সা কামাই-এর ধান্ধায় ঢুকে পড়েছে। যতটুকু স্মরণ আছে উমাকান্ত স্কুলে এবং বীরবিক্রম কলেজে আমার সহপাঠী দীপক দত্ত (নোটন), কলেজের সহপাঠী পরিতোষ পাল (বাবুল), (পরবর্তী সময়ে আমার সাথেই আইন পাশ করে এডভোকেট হিসাবে আগরতলা বারে যোগ দেয়) প্রভৃতি যুবকরা সরকারি ঠিকেদারিতে নেমে পড়েছিল। আমরা তো এর আগেই প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলাম, স্বপ্ন ছিল আমাদের দেশে একদিন বিপ্লব হবে। আমরা সেই বিপ্লবের কেউ সেনানি, কেউ সেনাপতি হব। দেশে কোন দুঃখ, দারিদ্র, বঞ্চনা ইত্যাদি থাকবে না।

আমরা সব অসাম্য ঘুচিয়ে দিতে পারব। সুতরাং অর্থোপার্জনের কোন মোহ সেদিন আমাদের কাউকে গ্রাস করতে পারেনি।

আমি, সমীর আর মধু বোমার মশলা খুঁজে বেড়াই বাংলাদেশের মুক্তি যোদ্ধাদের প্রতিশ্রুতিমত সাহায্যেব জন্য। অনেক কষ্টে মশলা সংগ্রহ করে ২০/২৫টি তাজা বোমা তৈরি করে আখাউড়া সীমান্ত পেরিয়ে, ঐ স্থানে অবস্থানরত মুক্তিসেনাদের হাতে পৌঁছে দিই। সেই বোমাগুলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আদৌ কাজে লেগেছিল কি না জানতে পারিনি। তবে মুক্তিযোদ্ধারা খুব উৎসাহিত হয়েছিল। আগরতলা গান্ধীঘাটের সন্নিকটে পিপলস রিলিফ কমিটিব অফিস তখন জমজমাট। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা কাজী জাফর, রাশেদ খান মেনন, কমিউনিস্ট পার্টি মণি সিং গ্রুপ ও ফণী মজুমদারের গ্রুপের বেশ কয়েকজন প্রথম সারির নেতা সি.পি.আই (এম) দলের আশ্রয়ে তখন পি.আর.সি অফিসে থাকত। এরা দফায় দফায় নৃপেনদা, বীরেনদা, দশরথদা এদের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনায় বসতেন। আমরা খুব উৎসাহিত বোধ করতাম এই ভেবে যে, পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে সি.পি.আই (এম) দল ঐক্যবদ্ধ করে নেতৃত্বদানে সক্ষম হবে। এছাড়া কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী কাজী গোফরান, ফরিদ ভাই এবং আরেকজন মধ্যবয়সী, পাজামা-পাঞ্জাবি পরিহিত, খাদ্যরসিক কমিউনিস্ট কর্মী পার্টির আশ্রয়ে ছিলেন। তাঁর নামটা কিছুতেই মনে করতে পারছি না। কাজী জাফর খুবই সুদর্শন ছিলেন। রাশেদ খান মেননের ছিল ছিপছিপে বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। ফরিদ ভাই ছিলেন খুব রসিক। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে মহম্মদ এরশাদ যখন রাষ্ট্রপতি তখন তার মন্ত্রিসভায় কাজী জাফর প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়ে কাজ করেছিলেন।

সে সময় আমার আর শঙ্করদার প্রায় রোজকার রুটিন ছিল সকালবেলা হয় অশোকা রেস্টুরেন্ট নয়ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া জলযোগ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে টিফিন সেরে তারপর বটতলা পার্টি অফিসে যাওয়া। প্রায়দিনই বাংলাদেশের মাঝবয়সী সেই কমরেডটিকে অশোকাতে বা ব্রাহ্মণবাড়িয়া জলযোগ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে টিফিন করার সময় পেয়ে যেতাম। গল্প-গুজব করে প্রায় প্রতিদিনই আমি নয়ত শঙ্করদা তার বিল মিটিয়ে দিতাম। তিনি টিফিন সেরে বেরিয়ে যাওয়ার পরও আমি ও শঙ্করদা বেশ কিছুক্ষণ আড্ডা মেরে বেরুবার পর দেখতাম উনি সেদিন যে দোকানে টিফিন করেছেন ঠিক তার উল্টোদিকের দোকানে বসে আবার টিফিন করছেন। অশোকা রেস্টুরেন্ট এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জলযোগ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার হরিগঙ্গা বসাক রোডের উত্তরে এবং দক্ষিণে প্রায় মুখোমুখি অবস্থিত ছিল। বুঝতাম ঐ ভদ্রলোকের টিফিনের মাঝখানে আমরা এসে পড়ে তাঁর টিফিনের ব্যাঘাত ঘটিয়েছি। তিনি চক্ষুলজ্জায় অর্ধেক টিফিন আমাদের সঙ্গে করে অন্য দোকানে গিয়ে বাকি টিফিনটুকু সেরে নিতেন। ফরিদ ভাই খুব রসিক ছিল বলেছিলাম। মজার মজার গল্প শোনাত। একটি গল্প শুধু উল্লেখ করছি। তিনি বলেছিলেন, এক সম্ভ্রান্ত মিএগভাই পাক সেনাধ্বা বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করলেই খুব উত্তেজিত হয়ে পড়তেন। যখনই সোঁ শব্দ করে বোমা মাটিতে পড়ার আওয়াজ হত তিনি সিগারেট ধরাতেন। একদিন এমনই এক মুহূর্তে তিনি সিগারেট ধরানোর জন্য দেশলাই-এর কাঠি জ্বালিয়েছেন কিন্তু হাত মুখের সামনে জ্বলন্ত দেশলাই-এর কাঠি নিয়ে

এসে দেখে মিএরা ভাই-এর মুণ্ডও নেই, ঠোঁটে সিগারেটও নেই অর্থাৎ বোমার আঘাতে ধড় থেকে মুণ্ড আলাদা হয়ে অন্যত্র কোথাও ছিটকে পড়ে গেছে।

একদিন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জলযোগ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে সন্ধ্যের সময় আমি, শঙ্করদা, ফরিদভাই আড্ডা দিচ্ছি এমন সময় ৩/৪টি বাংলাদেশ থেকে আগত যুবক এসে আমি তাদের বন্ধু সিরাজ না কি যেন একটি নাম বলে আমি কেন আগরতলা এসে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি না তার জন্য গালমন্দ শুরু করল। আমি তো হতবাক। আমি যত এদের বোঝাতে যাই আমি মুসলিম নই এবং ভারতীয়, তারা আমাকে এই মারে তো সেই মারে। ফরিদভাই এবং শঙ্করদা অনেক কষ্টে আমাকে সেদিন রক্ষা করেছিলেন। পরে ওদের চা-মিষ্টি খাইয়ে অনেকক্ষণ ওদের সঙ্গে আড্ডা মেরে বুঝেছিলাম ঠিকই আমার মত হুবহু চেহারার এক বন্ধু ওদের আছে। ওরা নিজেদের চোখকে আমার সঙ্গে তাদের বন্ধুর চেহারার সাদৃশ্য দেখে বিশ্বাস করতে পারছিল না। এরপরেও দু'একবার আমাকে মুসলিম ভেবে দু'এক জায়গায় বিভ্রম ঘটেছিল।

পশ্চিমবাংলা থেকে ১৯৭০-৭১ সনে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়াতে কাজ করতেন এমন একজন বামপন্থী কর্মচারী ত্রিপুরাতে বদলি হয়ে এসে ২/৩ বছরের জন্য ত্রিপুরাতে ছিলেন। তিনি সর্বদা আমাকে ছায়ার মত অনুসরণ করতেন। আমার খুব অস্বস্তি হত। আমি তাঁর সঙ্গে বিরক্তি থেকে রুক্ষ ব্যবহার করতাম। আমার সঙ্গে সব সহযোদ্ধা বন্ধুরা ঐ ভদ্রলোকের আমার প্রতি দুর্বলতা উপভোগ করত। ভদ্রলোকও নিশ্চিতভাবে ব্যাপারটা বুঝতে পারতেন কিন্তু কোনভাবেই আমার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হতে চাইতেন না। পরে তিনি কোলকাতা যখন আবার বদলি হয়ে ফিরে যান তখন আমাকে এক চিঠি দিয়ে জানান ওনার এক ঘনিষ্ঠ মুসলিম বন্ধু ছিলেন যিনি অবিকল আমার মত দেখতে কিন্তু সেই বন্ধুটির অকাল মৃত্যু হয়। আগরতলা এসে আমাকে দেখে ওনার মনে হয়েছিল পুরনো বন্ধুর সঙ্গে তার আবার পুনর্মিলন হয়েছে। আমি তাঁর সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহারের জন্য খুব লজ্জিত বোধ করেছিলাম।

একদিন কাজী গোফরানসহ সবাই সন্ধ্যায় বটতলা পার্টি অফিসে আড্ডা মারছি। এমন সময় পাক বিমানবাহিনীর বোমা আছড়ে পড়ল আগরতলা শহরে। মুহূর্তে শুরু হয়ে গেল লোডশেডিং অর্থাৎ বিদ্যুৎ দপ্তর ইচ্ছে করেই শহর এলাকা নিষ্প্রদীপ করে দিয়েছিল। কিছুক্ষণ পর মোমবাতি জ্বেলে দেখি পার্টি অফিসে সবাই আছে, নেই শুধু গোফরান ভাই। সবাই চিন্তিত হয়ে পড়লাম এই অন্ধকারে তিনি কোথায় গেলেন। অনেকক্ষণ পর গোফরান ভাই টেবিলের তলায় রাখা স্তূপীকৃত কাগজের নীচ থেকে মাথা তুলে বেরিয়ে এলেন। এর আগে তিনি মুক্তিযুদ্ধে তার অংশগ্রহণের কত অসীম সাহসি ঘটনার কথা যে গল্প করেছিলেন তার ইয়ত্তা নেই।

১৯৭১ সনের ১৬শে ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশের কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীরা তাঁদের দেশে ফিরে যান। কাজী জাফর ও রাশেদ খান মেনন ওদের আমন্ত্রণে আমি শঙ্করদা, ত্রিপুরা দর্পণের সম্পাদক সমীরণ রায়ের বড় ভাই স্বপন রায় বাংলাদেশ সফরে যাই ১৯৭২ সনের জানুয়ারি কি ফেব্রুয়ারি মাসে। আর কেউ আমাদের সঙ্গে গিয়েছিল কি না ঠিক মনে করতে পারছি না। আরেকটি গ্রুপে গিয়েছিল

অনিল সরকার, অজয় বিশ্বাস ও মানিক সরকার। বিত্তশালী পশ্চিম পাকিস্তানীর ফেলে যাওয়া এক পরিত্যক্ত বাড়িতে আমাদের থাকার জায়গা দেওয়া হয়েছিল। খুব আরাম আয়েশ করে রাখা হয়েছিল আমাদের। ঢাকার পাঁচতারা হোটেল 'সোনার বাংলা'-য় একদিন জানি না কে যেন লাঞ্চের ব্যবস্থা করেছিল। সেখানে গিয়ে দেখা পেয়েছিলাম বাংলাদেশের বহু সিনেমার চিত্র তারকা, টিভি আর্টিস্ট চকলেট ভাই এবং চলচ্চিত্রের সুরকার সত্য সাহার সঙ্গে। অনেকক্ষণ তাদের সঙ্গে সেদিন আড্ডা মেরেছিলাম। খুব আতিথেয়তা দেখিয়েছিল সবাই আমাদের। কিন্তু সবচেয়ে বেশি আন্তরিক, উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়েছিলাম গোফরান ভাইয়ের বাড়িতে প্রাতঃরাশ করতে গিয়ে। যখন আমরা ফিরে আসি বাড়ির প্রতিটি লোকের সজল চোখ আমাদের বুকের ভিতর মোচড় দিচ্ছিল। সেবার কোন পথে যে সীমান্ত অতিক্রম করে ঢাকা গিয়েছিলাম বা কোন সীমান্ত পথে আবার ফিরে এসেছিলাম কিছুতেই মনে করতে পারছি না।

বাংলাদেশের টি.ভি আর্টিস্ট চকলেট ভাইয়ের সঙ্গে আমার এবং শঙ্করদার পরিচয় হয়েছিল আগরতলায় এক অভিনব পরিস্থিতিতে। শঙ্করদার খুব সিনেমা দেখার নেশা ছিল। সিনেমা দেখার ব্যাপারে আমাকেই একমাত্র স্থায়ী সাকরেদ বানাতে পেরেছিলেন। ১৯৭১ সনে অক্টোবর কি নভেম্বর মাসে শীতের সময় 'রূপসী' সিনেমা হলে রাত্রি ৯টা ১২টার শো-য়ে শঙ্করদা ফুঁসলে আমাকে অভিনেত্রী পদ্মিনী অভিনীত এক অখাদ্য সিনেমা দেখতে নিয়ে গেলেন। সিনেমা দেখতে দেখতে বিরক্তিতে যখন হাই তুলছি তখন দেখি আমাদেব সামনের সারিতে বসা ২/৩ জন দর্শক প্রচণ্ড উত্তেজনায় টগবগ করছে এবং প্রতিটি সিনে মুহুর্মুহু হাততালি দিচ্ছে। ভাবলাম এই অপদার্থ দর্শক কোথা থেকে এল। সিনেমাব যখন ইন্টারমিশন দিল তখন সামনের সারিতে বসা সেই ২/৩ জন দর্শকের সঙ্গে পরিচিত হলাম। জানলাম এরা বাংলাদেশ থেকে আগত, আপাতত আমাদের রাজ্যে আশ্রিত। এরমধ্যেই ছিলেন বাংলাদেশ টি.ভি তারকা চকলেট ভাই। চকলেট তার পপুলার নাম। চকলেট ভাই আমাদের ভারতীয় চলচিত্রের উন্নতমানের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। সিনেমা থেকে বেরিয়ে চকলেট ভাই এবং তার সঙ্গীদের নিয়ে গেলাম প্যাবাডাইস চৌমুহনির হোলনাইট টি স্টল জীবনের দোকানে। সেখানে একপ্রস্থ জমাট আড্ডা দিয়ে রাত্রি ৩টে নাগাদ তাদের বিদায় দিলাম। তখন আগরতলা শহরে প্যারাডাইস চৌমুহনি ও মটরস্ট্যান্ড এলাকায় দু'টি হোলনাইট টি স্টল ছিল। প্রায়ই আমি আর শঙ্করদা রাত্রি ৯টা-১২টার সিনেমা দেখে বা পার্টির ওয়ালিং বা পোস্টারিং সেরে আরো ২/৪ জন যাদের রাজি করাতে পারতাম তাদের নিয়ে এই দুটি দোকানে পালা করে আড্ডা দিয়ে, চা খেয়ে রাত কাবার করে ভোরবেলা বাড়ি ফিরতাম। তখন দেখতাম স্বাস্থ্যসচেতন লোকেরা প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন। যাহোক, এরপরেও ২/৪ বার আগরতলায় চকলেট ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল এবং অল্পবিস্তর আড্ডা দিয়েছিলাম। ঢাকায় 'সোনার গাঁও' হোটেলে আমাদের পেয়ে চকলেট ভাই আমাদের সঙ্গে স্বল্প পরিচয়ের যে স্বীকৃতি আন্তরিক ভালোবাসায় স্বীকার করে নিয়েছিল তাতে আমরা সবাই আপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম। তিনি আমাদের সম্মানে বারবার অনুরোধ করেছিলেন ঢাকার যে কোন একটি পাঁচতারা হোটেলে লাঞ্চ বা ডিনারের পার্টি দিতে কিন্তু সময়ের অভাবে আমরা সম্মত হতে পারিনি।

ঢাকায় সে যাত্রায় যে ২/৪ দিন ছিলাম, আমরা সন্ধ্যায় ওয়ার্কার্স পার্টির অফিসে বেশ কিছুক্ষণ কাটাতাম। সে সময় জ্যোতি বসুর ওয়ার্কার্স পার্টি এবং কমিউনিস্ট পার্টির যৌথ আমন্ত্রণে বাংলাদেশ সফরে যাওয়ার কথা হয়েছিল এবং ঢাকায় একটি জনসভায় তাঁর ভাষণ দেওয়ার কথা ছিল। সেই খবরে ঢাকা শহরে প্রচণ্ড উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছিল। তখনই জ্যোতিবাবুর কি জনপ্রিয়তা এমনকি বাংলাদেশেও তার আঁচ পেয়েছিলাম। প্রতিদিন ওয়ার্কার্স পার্টি অফিসে অসংখ্য ফোন আসত, অনেক লোক সশরীরে এসে খোঁজ নিত সত্যিই জ্যোতিবাবু ঢাকায় আসবেন কি না জানতে। শেষ পর্যন্ত সে সময় জ্যোতিবাবু বাংলাদেশ সফরে কি কারণে যেন যেতে পারেননি। তবে অন্য দুটি জনসভায় আমরা ঢাকা থাকাকালীন সময়ে শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত থাকতে পেরেছিলাম। তার মধ্যে অন্যতম ঢাকার রমনা ময়দানে বিকেলে মওলানা ভাসানীর এক জনসভা। লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়েছিল সেই জনসভায়। মৌলানা ভাসানী তখনই প্রায় অশীতিপর বৃদ্ধ। সামান্য কিছুক্ষণ বক্তৃতা দিলে ক্লান্ত হয়ে পড়তেন এবং তখনই কোরানের মত সুর করে বিভিন্ন কায়দায় স্ববক্ষেপণ করে বক্তৃতা দিতেন। মাঠভর্তি লোক মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর বক্তৃতা শুনছিল। আমরাও মোহাবিষ্টের মত তাঁর বক্তৃতা শুনেছিলাম। সেই জনসভার মিছিলে প্রথম শ্লোগান শুনেছিলাম—'কেউ খাবে, কেউ খাবে না, তা হবে না, তা হবে না'। এই শ্লোগান দারুণভাবে আকৃষ্ট করেছিল আমাদের। আগরতলা ফিরে এসে আমরা এই শ্লোগান চালু করি। সেই জনসভায় মৌলানা ভাসানী বারবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, মুজিব তুমি তো আমার দলের ম্যানেজার ছিলে। গোমস্তার কাজকর্ম তো তুমি ভালই পার। আমরা অবাক হয়েছিলাম বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে যখন শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে তখন তাঁকে কেউ এভাবে ম্যানেজার বা গোমস্তা হিসাবে সম্বোধন করতে পারে। পরে বুঝেছিলাম, হ্যাঁ একজনই পারে বাংলাদেশে একাজ করতে। তিনি হলেন আবদুল মওলানা ভাসানী। কারণ সত্যিই তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু।

আগরতলা পি.আর.সি ক্যাম্পে মওলানা ভাসানীর অনুগত একজন রাজনৈতিক কর্মীও আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি গল্পচ্ছলে আমাদের বলেছিলেন, বাংলাদেশে মওলানা ভাসানীর কোন জনসভায় সমাগত শ্রোতাদের মৌলানা যদি জিজ্ঞেস করে তারা তাঁর বক্তব্য সমর্থন করে কিনা তবে সমবেত শ্রোতারা শুধু দু'হাত নয় পারলে দু'পা তুলে তাকে সমর্থন জানায়। রমনা ময়দানের জনসভা দেখে মনে হয়েছিল ভদ্রলোক বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি করেননি।

দ্বিতীয় জনসভাটি ছিল ঢাকা শহর থেকে ৫০/৬০ কি.মি. দূরে একটি শিল্প এলাকা টঙ্গিতে দুপুর ১১/১২টা নাগাদ। ঐ এলাকার শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকনেতা ছিলেন কাজী জাফর। তিনি আমাদের সম্মানে এবং ভারতবর্ষের প্রতি সংহতি জ্ঞাপনের জন্য ঐ জনসভার আয়োজন করেছিলেন। একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মার্সিডিজ গাড়িতে আমাদের জনসভাস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। গাড়িটিও ছিল কোন পাক নাগরিকের পরিত্যক্ত গাড়ি। জনসভায় দুপুর বেলায়ও হাজার পাঁচেক লোক হয়েছিল। আমাদের পক্ষ থেকে সে

সভায় অজয় বিশ্বাস দু'চার কথা বক্তব্য রেখেছিলেন। মানিক সরকার খালি গলায় একটি গণসংগীত পরিবেশন করেছিলেন। টঙ্গি যাওয়ার সময় আমাদের গাড়িতে কাজী জাফর সঙ্গী হয়েছিলেন। যেতে যেতে পথে তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে করে বলেছিলেন- 'আই এম দি কিং অব টংগি'। একজন কমিউনিস্ট নেতার এ ধরনের সদম্ভ উক্তি আমাদের কানে খুব শ্রুতিকটু শুনিয়েছিল। কিন্তু সৌজন্যবশতঃ আমরা নিশ্চুপ ছিলাম।

যাওয়ার সময় এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলাম আমরা। তখনও ভৈরবের এবং আশুগঞ্জের সেতুটি ভগ্ন অবস্থায় ছিল। পাক সেনাদের বোমা বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর মেরামত করা হয়নি। সন্ধ্যে হয় হয় সময়ে আমি, শঙ্করদা ও স্বপন রায় (ত্রিপুরা দর্পণের সম্পাদক সমীরণ রায়ের বড় ভাই) বড় একটি যাত্রীবাহী নৌকোয় উঠলাম মেঘনা পারাপারের জন্য। হঠাৎ আকাশ কালো করে ঝড় এলো। ভয়ানক ঝড়ে সেদিন মেঘনা যেন আহ্লাদে ফুলে ফেঁপে সমুদ্রের মত গর্জন শুরু করল। কি ভয়াবহ রূপ দেখেছিলাম মেঘনার। এক-একটা ঢেউ যেন বাসুকির ফণার মত বিশাল ও ভয়ংকর। মেঘনার নিকষ কালো জল আরো কালো হয়ে মৃত্যুর হিমশীতলতায় আছড়ে পড়ছিল নৌকোর উপর। মাঝি হেঁকে বলল— 'ভয় করবেন না। সবাই আল্লার দোয়া মাঙ্গেন'।

যাত্রীরা সবাই 'আল্লা-আল্লা' উচ্চারণ করে দোয়া মাঙ্গতে শুরু করল। স্বপন রায় আমাদের কানে কানে বলল, আমি সাঁতার জানি না। ভয়ে আমি হার্টফেল করে ফেলতে পারি। আমার পকেটে অনেকগুলো স্লিপিং পিল আছে আমি বরঞ্চ খেয়ে ফেলি। তাহলে আমি শান্তিতে মরতে পারব। আমি আর শঙ্করদা, স্বপনদাকে প্রবোধ দিলাম যে আমরা দু'জনেই সাঁতার জানি। তেমন কিছু হলে সাঁতরে স্বপন রায়কে নিয়ে পাড়ে উঠতে পারব। স্লিপিং পিল খেয়ে নিলে তার অচেতন শরীর ভারী হয়ে গেলে সাঁতার কেটে তাকে পিঠে বইতে পারব না। যাহোক, অনেক বুঝিয়ে স্বপনদাকে সেদিন নিবৃত্ত করেছিলাম। তারপরই আমি একটি উল্লুকের মত কাজ করে বসেছিলাম। প্রকৃতির ভয়ংকর রূপ উপভোগ করার জন্য মনের সুখে একটি সিগারেট ধরিয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে নৌকোর মাঝিসহ যাত্রীদের অনেকেই আমাকে ধমকে উঠে বলল, মিঞা ভাই আপনের কি কোন আক্কেল নাই। আমরা সবাই আল্লার দোয়া মাংগাতাছি আর আপনে সিগারেট ধরাইছেন। ফেলেন এক্ষুণি। তাড়াতাড়ি মেঘনার জলে স্বাদের সিগারেট ফেলে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। অবশ্যই শেষ সুখ টানটি দিয়ে। ঝড় আস্তে আস্তে থামল। হয়তো বা আল্লা সকলের দোয়া মঞ্জুর করেছিলেন। নির্ধারিত সময়ের আগেই নৌকা ঢেউয়ের প্রাবল্যে তীরে এসে ভিড়েছিল। আমি আর শঙ্করদা খুব উপভোগ করেছিলাম সেদিনের নৌকা সফর। তীরে নেমে নৌকার মাঝিকে ইন্ডিয়ান সিগারেট খাইয়ে বাহ্‌বা দিয়েছিলাম তার সাহসের জন্য।

সেবারের যাত্রাতেই ঢাকার সদরঘাট থেকে স্টিমারে চেপে পদ্মা-মেঘনার সংগমস্থলে মাঝদরিয়ায় পৌঁছে অন্য একটি ডিঙ্গি নৌকায় চেপে ইলিশমাছ ভাজা খেয়েছিলাম। নৌকোতেই ভাজা হয়েছিল সেই ইলিশ। এরপরও দু'বার গেছি ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, বরিশাল। কিন্তু প্রথম দু'বারের বাংলাদেশ সফরের আনন্দই ছিল আলাদা।

১৯৯৯ সনের জুলাই মাসে আমি, শঙ্করদা এবং কবি রাতুল দেববর্মা ঢাকা যাই। ঢাকা কমলাপুর স্টেশনের পাশে সর্দার হোটেলে উঠি। অধ্যাপক সফি আহমেদ এবং

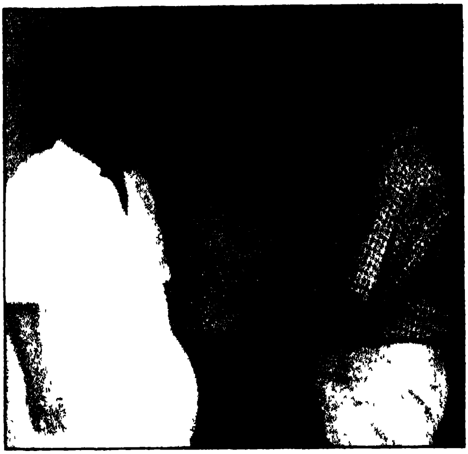
বাংলাদেশের খ্যাতনামা পুস্তক প্রকাশক মাজাহারুল ইসলাম আমাদের সঙ্গ দিয়েছিল ঢাকার এবং আশেপাশের দ্রষ্টব্য স্থান দেখার জন্য। একদিন এক বোবা রিক্সাচালককে টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে তাড়াহুড়ো করে ১০ টাকার নোটের বদলে ১০০ ডলার দিয়ে দিই। পরে খুব কামনা করেছিলাম বোবা ছেলেটি যেন সেই টাকা দিয়ে একটি রিক্সা কিনে নেয়। নারায়ণগঞ্জে আমাদেব বন্ধু স্বপন দাশগুপ্ত, বুলবুল, এডভোকেট চন্দন আমাদের সব ঘুরিয়ে দেখিয়েছিল। ওদের আন্তরিক আতিথেয়তা আজও ভোলা সম্ভব নয়। এবপর আমবা চলে যাই চট্টগ্রাম। কক্সবাজার সমুদ্রতটে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ৪৮ ঘণ্টাব বাংলা বন্‌ধ থাকাতে কক্সবাজাব সী বীচে আর যাওয়া হয়নি। আখাউড়া হয়ে ফিরে আসি আগরতলা।

তাবপর আবাব ২০০৪ সনে আমি, শঙ্করদা, সেনা ভট্টাচার্য, ফুলন ভট্টাচার্য, মিঠু চৌধুরী ঢাকা যাই এবং সফি আহমেদের ফ্ল্যাটে উঠি। তখন শঙ্করদা আগরতলা পুবপরিষদের চেয়াবমান। ঢাকার বিভিন্ন জায়গা ঘুরে লঞ্চে করে চলে যাই বরিশাল। জীবনানন্দ দাশের বাড়ি, তাঁর কর্মক্ষেত্র স্কুল, ধান সিঁড়ি নদীর কোল বেয়ে নৌকা চড়ার



মিঠু চৌধুরী, সেনা ভট্টাচার্য, ধীরাজ গুহ, শঙ্কর দাস, সফি আহমেদ ও অন্যান্য

ঘটনা স্মরণ করলে আজো শিহরিত হয়ে উঠি। সারারাত্রি লঞ্চে চড়ে বরিশাল পৌঁছানোর ঘটনা, বরিশালের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ আমৃত্যু স্মৃতির মণিকোঠায় সঞ্চিত থাকবে। ধানসিঁড়ি নদীর বিস্তীর্ণ বক্ষপট, জীবনানন্দের বাড়ির নিকানো উঠান, তালপাতায় ছাওয়া বৈঠকখানার ঘর যেখানে বসে তিনি লিখতেন বা তাঁর বাড়ি থেকে স্কুলে যাওয়ার পথে দীর্ঘ নারকেল-সুপুরি গাছের ছায়া-শীতল পথ স্মৃতি বিলুপ্ত না হলে কি ভোলা সম্ভব? এখনো মনে মনে আওড়াই—আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়ি নদীটির তীরে। জানিনা এই জন্মে আর সেই বাসনা পুরিত হবে কি না। বরিশালের লোকজন এবং বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা



জীবনানন্দের জন্মভিটেয় : ধীরাজ গুহ ও সফি আহমেদ

খবর পেয়ে যায় শঙ্করদা আগরতলা পুরসভার চেয়ারম্যান। তারা শঙ্করদার সম্মানে সংবর্ধনা সভার আয়োজন করে। আমরাও বিশেষ সম্মানিত অতিথি হিসাবে সেই সব সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত থাকি। ফেরার সময় শঙ্করদার নিজের শহর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়ও শঙ্করদাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। সময়াভাব দেখিয়ে আমরা আখাউড়া হয়ে ফিরে আসি আগরতলায়।

আমরা যখন বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির আমন্ত্রণে ১৯৭২ সনে ঢাকা শহরে একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রাসাদোপম বাড়িতে অবস্থান করছিলাম তখন আমরা আগরতলা ফিরে আসার ১/২ দিন আগে বিজয় সিংহ রায় এবং অরবিন্দ ভট্টাচার্য আমাদের আস্তানায় ধূমকেতুর মত গিয়ে উদয় হয়। ওদের কাছে জেনেছিলাম আখাউড়া হয়ে ওরা একরাত্রি কুমিল্লা কাটিয়ে দাউদকান্দি ও নারায়ণগঞ্জ হয়ে ঢাকা পৌঁছেছিল। আমাদের উপরের তলায় থাকতো বাংলাদেশ চলচিত্রের একজন প্রযোজক ও পরিচালক। আমরা আগরতলা ফিরে আসার আগের দিন রাত্রিতে



ধানসিঁড়ি নদীটির তীরে..

তারা আমাদের তাদের ফ্ল্যাটে ডিনারে আপ্যায়ন করেছিল। আমরা চলে আসার পর ২/৩ দিন ঢাকায় থেকে বিজয় ও অরবিন্দ আগরতলা ফিরে আসে।

২০০৪ সনে যখন শেষবারের মত বাংলাদেশ যাই তখন শঙ্করদার এক পরিচিত ফরিদভাই আমাদের গাড়ি দিয়ে এবং বিভিন্নভাবে কি সাহায্য যে করেছে ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। ফুলনদির সঙ্গে কথা হয়েছিল ২২শে শ্রাবণ আবার বাংলাদেশ যাব। শিলাইদহে রাত কাটাব। যেতে পারিনি আজো। যদিও মনে সেই ইচ্ছে আজো জাগরুক আছে।

পাঠকদের কাছে আগেই ক্ষমা চেয়ে রাখি কোন একটা বিশেষ সময়ের কথা লিখতে লিখতে যদি অতীতের কোন ঘটনা হঠাৎ মনে পড়ে যায় তবে আবার আমি অতীতে ফিরে যাব। আচ্ছা আজকের দিনে কি এমন একটা দৃশ্য আমরা কল্পনা করতে পারি যে, কোন কমিউনিস্ট নেতার ছেলে বা মেয়ের বিয়ে আর এলাকার সব কংগ্রেস নেতারা সেই বিয়ের সব হ্যাপা সামলাচ্ছেন সানন্দে। হ্যাঁ ঠিক তাই ঘটেছিল বীরেন দত্তের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতি অরুনা দত্তের বিয়েতে ১৯৬৯ সনের ১লা জুন। উদয়পুরের শিক্ষক বিমানবিহারী ধরের সঙ্গে বিয়ে হয় অরুণাদির। বিয়েতে শুধু সরবত আর দু'এক টুকরো ফল খাওয়ানো হয়েছিল অতিথি-অভ্যাগতদের। কাঁঠালপাতার মধ্যে কলার টুকরো, দু'এক কোয়া কাঁঠাল ইত্যাদি ২/৪টি ফল দেওয়া হয়েছিল। বাম-ডান কোন নেতা নেই যারা সেই বিয়েতে যাননি। সেই বিয়ের সমস্ত দায়িত্বই প্রায় কাঁধে তুলে নিয়েছিল জয়নগর এলাকার কংগ্রেসের প্রবীন নেতারা। বীরেনদার মুখেই জেনেছিলাম ১৯৫৯ সনে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে বিমোচন আন্দোলনের ফলে কেরালার প্রথম কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচিত ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদের সরকারকে অগণতান্ত্রিকভাবে বরখাস্ত করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু। এই ঘটনার পর সিদ্ধান্ত হয় দেশব্যাপী কংগ্রেস দলের অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী ভূমিকার প্রতিবাদে জনমত সংগঠিত করা হবে। সেই কর্মসূচী রূপায়নে ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদকে আগরতলা আনার সিদ্ধান্ত হয়। জনসভা না হয় মাঠে হল কিন্তু কর্মীসভার জন্য একটি হল বা বড় ঘর চাই। তখন না ছিল রবীন্দ্রভবন, না ছিল টাউন হল বা সুকান্ত একাডেমী ও নজরুল কলাক্ষেত্র। বীরেনদা হন্যে হয়ে কর্মীসভার জন্য বড় একটি ঘর খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। তখন কংগ্রেস নেতা প্রিয়দাস চক্রবর্তীর বড়ভাই হরিদাস চক্রবর্তী বীরেন দাকে ডেকে তাঁর বাড়ীতে ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদের সভা করার অনুমতি দেন। পরে তাঁর বাড়ীতেই কর্মীসভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

ত্রিপুরা মোটর ওনার্স সিন্ডিকেটের প্রাক্তন সম্পাদক কংগ্রেস নেতা, জয়নগর নিবাসী গোপাল করের কাছে শুনেছিলাম ১৯৬২ সনে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের সময় যেদিন রাতে বীরেনদাকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করা হয় সেদিনই না কি তখনকার মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ গোপাল করকে ফোন করে বলেছিলেন বীরেনবাবুকে তো গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হলাম, তোরা সবাই বীরেনবাবুর পরিবারকে দেখিস। ঠিক তেমনি বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেখেছি নৃপেনদা, বীরেনদা, দশরথদা কোনদিন রাজনৈতিক সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন তো হনইনি বরঞ্চ এঁদের রাজনৈতিক উদারতা ছিল অসীম। যে কোন কংগ্রেস নেতা বা কর্মী এদের সঙ্গে আমাদের আগে দেখা করার অ্যাপয়ন্টমেন্ট পেতেন,

রাজনৈতিক মর্যাদা পেতেন। কংগ্রেস পরিবারের লোকদের চাকরী বা বদলী সংক্রান্ত সমস্যা বামপন্থী নেতা কর্মীদের আগে এঁরা সমাধান করে নিয়ে যেতে পারতেন।

১৯৮১ সনে বা ১৯৮২ সনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুখময় বাবু যখন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন নৃপেনদা নিজে উদ্যোগী হয়ে সুখময়বাবুকে এসকর্ট দিয়ে দিল্লির ত্রিপুরা ভবনে রেখে সরকারী খরচে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আমাদের কৃষ্ণনগর এলাকাব কংগ্রেস নেতা রবীন্দ্র চক্রবর্তীর দুই ছেলের চাকুরী তাদের বাবার পরিচয় দেওয়ার পর বীরেন দা এবং নৃপেনদা এক সপ্তাহের মধ্যে টি আর টি সি এবং সেটেলমেন্ট অফিসে করে দিয়েছিলেন। সুখময়বাবুর ভাইপোর বদলী যখন তৎকালীন রাজস্বমন্ত্রী খগেন দাসকে দিয়ে রদ করানো সম্ভব হয়নি তখন সুখময়বাবুর পরিচয় দেওয়ার পর নৃপেনদা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে হস্তক্ষেপ করে সেল্‌স ট্যাক্স দপ্তরে সেই বদলী রদ করেছিলেন। প্রথম বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৮ সনে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর নৃপেন চক্রবর্তী যখন মুখ্যমন্ত্রী তখন আমার দেখা কংগ্রেসের দৃঢ়, স্বাধীনচেতা এবং সৎ নেতাদের মধ্যে অন্যতম মোহনলাল রায়ের আখাউড়া রোডের বাড়ীতে বামফ্রন্টের কিছু অত্যুৎসাহী নব্য কর্মী চাঁদার নাম করে জুলুম শুরু করে দেয়। মোহনবাবু সরাসরি নৃপেনদার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। নৃপেনদা মোহনবাবুর কাছ থেকে ঘটনা জেনে অনতিবিলম্বে আরক্ষা দপ্তর ও প্রশাসনকে নির্দেশ দেন রাজনীতির নাম করে এই উচ্ছৃঙ্খলতা এবং ইতরসুলভ আচরণ বন্ধ করার ব্যবস্থা নেওয়াব জন্য। শুধু তাই নয় তিনি এও নির্দেশ দেন যতবড় পার্টি নেতাই এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকুক না কেন কোনভাবেই যাতে রেহাই না পায়। সেই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কুশীলববা প্রশাসন ও পুলিশেব চাপে এমন ল্যাজে গোবরে হয়ে পড়ে যে মোহনবাবুর কাছে ক্ষমা চেয়ে সে যাত্রা রক্ষা পায়। এরপর আর কোনদিন এরা মোহনবাবুকে বা তাঁর পত্নী এরাজ্যের কিংবদন্তী সাহিত্যিক অপরাজিতা রায়কে বিরক্ত করার সাহস পায়নি। এই ঘটনার কথাটি আমি অপরাজিতাদির মুখেই প্রথম শুনি। আর আজ বিরোধী দল তো কোন ছার, নিজের দলের কর্মী বা সমর্থকরা ও বামপন্থী নব্যসংস্কৃতির ধারক বাহকদের হাত থেকে জমির দালালির কমিশন, ঠিকাদারির নিগোশিয়েশানের কমিশন, চাঁদা ইত্যাদির হাত থেকে রেহাই পায় না। দশরথদার সময়েও এধরনের রাজনৈতিক উদারতার আকছার ঘটনা ঘটেছে। সামান্য কিছু উদাহরণ দিলাম শুধুমাত্র আমাদের পূর্বসূরী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের ঔদার্য্য এবং সেসময়কার রাজনৈতিক পরিমন্ডল বোঝানোর জন্য।

আমার যতদূর মনেপড়ে রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের কলেজ জীবনে খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল তুষার চন্দ এবং সুব্রত চক্রবর্তী নামে দুইজন সহপাঠী। এই সুব্রত চক্রবর্তী হল সদর উত্তরাঞ্চলের চা বাগান মেখলিবনের তৎকালীন মালিক প্রয়াত বেদব্রত চক্রবর্তীর সর্বকনিষ্ঠ ভাই। বর্তমানে বেদব্রত বাবুর অন্য ছোটভাই বি জে পি নেতা শান্তিব্রত চক্রবর্তী কৈলাসহরের রাংরুং চা বাগান চালান। পারিবারিক সম্পত্তি বণ্টনের ফলে মেখলিবন চা বাগান পেয়েছিলেন বেদব্রত চক্রবর্তীর খুড়তুতো ভাই যোগব্রত চক্রবর্তী যিনি ১৯৯৬ সনে মেখলিবন চা বাগান থেকে উগ্রপন্থীদের দ্বারা অপহৃত হয়ে ঐ বছরের ৬ই জুন উগ্রপন্থীদের কবলে থাকাকালীন মৃত্যুবরণ করেন। যোগব্রতবাবু এবং শান্তিবাবুর পরিবারের পক্ষ থেকে উগ্রপন্থীদের হাতে মুক্তিপণ হিসাবে ২৯ লাখ টাকা তুলে

দেওয়ার আগেই যোগব্রত বাবু মারা যান। কিন্তু সেই খবর গোপন রেখে উগ্রপন্থীরা মুক্তিপণের টাকা হাতিয়ে নেয়। এখন মেখলিবন চা বাগান দেখার দায়িত্বে আছেন প্রয়াত যোগব্রত বাবুর স্ত্রী। কৃষ্ণনগর পুরাতন কালীবাড়ী রোডে ছিল সুব্রতদের বিশাল বাড়ী। সমগ্র পরিবারটি ছিল কংগ্রেসের ঘোর সমর্থক কিন্তু মানিক সরকারের রাজনৈতিক পরিচয় জানা সত্বেও ঐ বাড়ীতে মানিক সরকারের যাতায়ত, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি ছিল ঐ পরিবারের সদস্যদের মতই। মানিক-তুষার-সুব্রত তখন কলেজ থেকে আরম্ভ করে প্রাইভেট টিউশন পড়া ইত্যাদি সব ব্যাপারে এমনভাবে চলাফেরা করত যে আমরা আড়ালে এদের থ্রি মাস্‌কেটিয়ার্স নাম দিয়েছিলাম। বি জে পি নেতা হওয়া সত্বেও সুব্রতর বড়ভাই শান্তিব্রত চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের কাছে এবং বর্ষীয়ান কম্যুনিস্ট নেতা বৈদ্যনাথ মজুমদারের কাছে আজও যথেষ্ট সম্মান পেয়ে থাকেন বলে জানি। তুষার চন্দ ও সুব্রতের সঙ্গে আজো আমার যোগাযোগ আছে। এরা এখনও কলেজ জীবনের সুখকর স্মৃতি মন্থন করে পুলকিত হয়। জানি না মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এদের আজকাল যোগাযোগ আছে কিনা। আমাদের পার্টি জীবনে দেখেছি যখনই বীরেনদা বা নৃপেন দা চা বাগান শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে বেদব্রতবাবু বা যোগব্রত বাবুর কাছে যেতেন তখন এরা বিশেষভাবে সমাদর করতেন কমিউনিস্ট নেতৃদ্বয়কে। এঁদের সঙ্গে আলোচনা করে চা-শ্রমিকদের কিছু কিছু উপশমও দিতেন। উদারভাবে এঁরা বীরেনদা, নৃপেনদা এবং পরবর্তীসময়ে আমাদের পার্টির জন্য চাঁদা দিতেন। কিন্তু যখনই চা মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে কোন চুক্তি করতেন তখন সেই দ্বিপাক্ষিক বা ত্রিপাক্ষিক চুক্তি করতেন কংগ্রেস দল নিয়ন্ত্রিত শ্রমিক সংগঠন চা মজদুর ইউনিয়নের নেতা নীরদবরণ দাসের সঙ্গে। এই রহস্যের কোন আপাতগ্রাহ্য কারণ কোন দিন সেসময় খুঁজে বের করতে পারিনি। আজকাল সেই রহস্যভেদ করতে পেরেছি বলে মনে হয়। যোগব্রতবাবু এবং বেদব্রত বাবুর অগাধ শ্রদ্ধা ছিল কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের সততার প্রতি কিন্তু কংগ্রেস দলের রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি আনুগত্যের বাধ্যবাধকতার কারণে শ্রমিক মালিক চুক্তি সম্পাদন করতেন কংগ্রেসে দলের শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে।

আজকাল যেমন আমাদেরও মানসিক প্রতিক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রেই অনুরূপভাবে ক্রিয়াশীল। ক্ষমতাসীন বামফ্রন্টের বা সি পি আই (এম) দলের এখনকার অনেক কাজ, অনেক সিদ্ধান্ত মন থেকে মেনে নিতে পারিনা। কিন্তু রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি আনুগত্যের বাধ্যবাধকতার কারণে তেতো গেলার মত বামফ্রন্টের শাসন বা রাজ্যের সর্ববৃহৎ বামপন্থী রাজনৈতিক দলটির প্রতি সমর্থন যুগিয়ে যেতে হয়।

মেখলিবন চা বাগান মালিকদের পরিবারটির কথা একটু বিস্তৃতভাবে একারণে লিখলাম কারণ চা বাগান মালিক হিসাবে কংগ্রেস দলের প্রতি এদের শ্রেণীগত আনুগত্য যেমন নিখাদ ছিল তেমনি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে ৭০-এর দশকের প্রাক মুহূর্ত থেকে বামপন্থী আন্দোলনের কর্মী হিসাবে আমরাও শ্রেণীগত আনুগত্যের কারণেই যত বিষাদময় ঘটনায় যন্ত্রণাবিদ্ধ হইনা কেন, যত বিপন্ন সময়ের মুখোমুখি হই না কেন কমিউনিস্ট আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে অক্ষম।

১৯৭০ সনে ত্রিপুরা রাজ্যকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দানের দাবিতে, ত্রিপুরাতে রেল ও

শিল্প স্থাপনেব দাবিতে সারা রাজ্য জুড়ে আন্দোলনে নেমেছিল সিপিআই (এম) দল। আইন অমান্য, কৃষক জাঠা বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরনের সংগ্রামে উত্তাল হয়ে উঠেছিল রাজ্য। সাধারণ জনসাধারণ তো বটেই এমনকি কংগ্রেসের সাধারণ সমর্থকরাও এই আন্দোলনের পেছনে তাদের নীরব সমর্থন জুগিয়েছিলেন।

আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তুতিতে বিভিন্ন পাড়ায়, বাজারে পথসভা সংগঠিত করা হয়েছিল পার্টির আগরতলা শহর লোক্যাল কমিটিব উদ্যোগে। তখন আগরতলা শহরে একটি লোক্যাল কমিটি ছিল। লোক্যাল কমিটির সম্পাদক ছিলেন প্রয়াত কমরেড কানু ঘোষ। তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট নেতা ভানু ঘোষের বড় ভাই ।

একদিন বিকেলে আশ্রম চৌমুহনি পথসভা ছিল। তখন আমাদের মধ্যে ভাল বক্তা খুব একটা ছিল না। ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সমীর চক্রবর্তী এবং বিজয় সিংহ রায় ভাল বক্তৃতা করতে পারত। অনিলদা বা মানিক সরকার এদের লোক্যাল স্তরে বক্তৃতার জন্য কমই পাওয়া যেত। যুব সংগঠনের তরফে ভাল বক্তা হিসাবে শঙ্করদাকে বক্তৃতার জন্য ব্যবহার করা হত।

সেদিনের পথসভায় আমি শঙ্করদা, বিশু, বিজয়, কানু ঘোষ, বিজয়া দাস, সাধনা চক্রবর্তী (নৃপেনদার বৌদি, ডাক্তার নন্দলাল চক্রবর্তীর স্ত্রী) প্রভৃতি উপস্থিত ছিলাম। প্রথমে পথসভার সভাপতি হিসাবে কানুদা সাধনা মাসীমাকে বক্তৃতা দিতে আহ্বান জানান। তখনকার দিনে আশ্রম চৌমুহনিতে ৫০/৬০ জন শ্রোতা পেয়ে মাসীমা উৎসাহিত হয়ে প্রায় ৪০/৪৫ মিনিট বক্তৃতা দিয়ে ফেলেন। মাসীমার পরে শঙ্করদা এবং বিজয়ের বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেদিন মাসিমার বক্তৃতা চলাকালীন আকাশ কালো করে মেঘ ঘনিয়ে আসে। সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া। আমি কানুদাকে কানে কানে গিয়ে বলি আকাশের যে পরিস্থিতি মাসীমার পর আপনি দু'এক কথা বলে সভা শেষ করে দিন। কানুদা মাসীমার বক্তৃতা দীর্ঘায়িত হওয়ার কড়মড় করছিলেন। যাহোক মাসীমার বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর কানুদার বক্তব্য ছিল ঐতিহাসিক। বললেন, আজকের আকাশের মতই দেশের দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি। অনেক কথা বলার ছিল কিন্তু মেঘে আকাশ কালো হয়ে ঝড় আসছে তাই বেশি কিছু বলা গেল না। বিজয় এবং শঙ্কর পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সুন্দরভাবে বক্তৃতা রাখার কথা ছিল কিন্তু মাসীমা খামোকা বেশি সময় নেওয়ায় তারা বলতে পারল না। সে কারণে আমি দুঃখিত। রেলের দাবি, শিল্পের দাবি, পূর্ণরাজ্যের দাবি, স্বৈরাচারী, আলুলায়িত কুন্তলা ইন্দিরা গান্ধী সহজে মেনে নেবে না, যদি না আমরা আন্দোলনের জোয়ারে তার কানে জল ঢোকাতে পারি। সুতরাং আপনারা দলে দলে পার্টির ডাকে....... তারিখে....... সময় চিলড্রেন্স পার্ক ময়দানে আইন অমান্যের জন্য জমায়েত হোন। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। সভা এখানেই শেষ। এমনটাই সরল ছিলেন কানু দা। যেটা ভাল লাগতনা মুখের উপর বলে দিতেন। এতে সাধনা মাসিমা কেন, কেউই কিছু মনে করার সুযোগ পেতেন না। আমাদের সঙ্গে ছিল কানুদার অসমবয়সি বন্ধুত্ব। দুর্গা চৌমুহনির বাড়ি থেকে এক একদিন বিশু, আমি, বিজয় বা অরবিন্দ সাইকেল চালিয়ে ওনাকে পার্টি অফিসে নিয়ে আসতাম। তিনি সাইকেলের সামনের হাতলে বসতেন। সাইকেল শঙ্কর চৌমুহনি থাকার সময় হয়ত কের চৌমুহনির দিক থেকে একটি গাড়ি আসছে, পারলে তিনি আমাদের ধমকে ড্রেনে নামিয়ে ছাড়তেন।

যেই গাড়িটা সাইকেল পেবিয়ে চলে যেত দুর্ঘটনা ছাড়া, তখন বলতেন- বাঃ তোমার মত এক্সপার্ট সাইকেল চালক আব দেখিনি। পরের দিন আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

৭০ সনের শেষভাগে শীতের সময় রাজ্যের তিন প্রান্ত থেকে তিনটি জাঠা হেঁটে আগরতলা শহরে এসে ঢোকে উপরে উল্লেখিত দাবি আদায়ের সংগ্রামে। একই দিনে জাঠা তিনটি আগরতলা শহরে ঢোকে এবং দাবির সমর্থনে বিশাল জনজমায়েত হয়। এর আগে দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বাজারে বাজারে দাবির সমর্থনে সভা করতে করতে জাঠাগুলি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে। ধর্মনগব থেকে যে জাঠাটি প্রায় ৮/১০ দিন হেঁটে শেষ দিন রাত্রিরে মোহনপুর থেমে বিশ্রাম নিয়েছিল সেই মিছিলটির নেতৃত্ব দিয়ে এসেছিলেন নৃপেন চক্রবর্তী। খোয়াই মহকুমা সহ সদর উত্তরাঞ্চলের মোহনপুর-কামালঘাট প্রভৃতি অঞ্চল হয়ে যে জাঠাটি আগরতলা পৌছেছিল তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন দশরথ দেব। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাব জাঠাটির নেতৃত্ব দিযেছিলেন বীরেন দত্ত।

আমাদেব মধ্যে চন্দন চক্রবর্তী ধর্মনগর থেকে আসা মিছিলটিকে অভ্যর্থনা জানাতে আগের দিন সন্ধ্যায় মোহনপুর পৌছেছিল। সন্ধ্যের পর মিছিলটি মোহনপুর এসে থামে এবং সেদিন রাতে মোহনপুর বিশ্রাম নিয়ে পরের দিন মিছিল করে আগরতলা জন সমাবেশে অংশগ্রহণ করে। ৮/১০ দিন হেঁটে মিছিলের অধিকাংশ লোক ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে মোহনপুর স্কুল মাঠে এবং সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকায়। মাঠের মাঝে মাঝে কমরেডরা আবর্জনা, কাগজ পুড়িয়ে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিল শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে। নৃপেনদার তখনই ৬০-এর ওপরে বয়স হয়ে গেছে। তিনিও ধর্মনগর থেকে পায়ে হেঁটে এসেছেন। কিন্তু তাঁর চোখে মুখে কোন ক্লান্তির ছাপ নেই। গভীব রাত পর্যন্ত হেঁটে হেঁটে অসুস্থ কমরেডদের খোঁজখবর নিচ্ছেন, জ্বর, মাথাব্যথা, পেট খারাপ এসবের জন্য ওষুধ বিলি করছেন। আদর্শের প্রতি কি অসীম এবং অগাধ আস্থা থাকলে এই বয়সেও কোন পরিশ্রম শরীরে ক্লান্তির ছাপ ফেলতে পারে না।

পরের দিন চিলড্রেন্স পার্কের জনসভায় নৃপেনদার সঙ্গে বীরেন দত্ত ও দশরথ দেবকে ও দেখেছিলাম। অন্য দু'জন নেতার ও একই অবস্থা। এঁরা তিনজনেই সমাবেশে বক্তব্য রেখেছিলেন। আমাদের যৌবন লজ্জা পাচ্ছিল।

১৯৭১ সনে চিলড্রেন্স পার্কের কমিউনিটি হলে এস.এফ.আই-এর প্রথম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিকেল থেকে শুরু হয়েছিল প্রতিনিধি সম্মেলন। সম্মেলন শেষে প্রকাশ্য অধিবেশন হত তখন। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন ছাত্র নেতা ও বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী। প্রথম দিনের সম্মেলন শেষে রাত্রিতে প্রতিনিধিদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল বটতলার জয়দুর্গা হোটেলে। কয়েকজন মহিলা কমরেডের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল ফুলনদির আখাউড়া রোডের বাড়িতে। আমরা সবাই খেতে বসবো এমন সময় ভানুদা বিজয়কে ডেকে বলল, রাত হয়ে গেছে মহিলা প্রতিনিধিদের ফুলনের বাড়িতে দিয়ে আয়। বিজয় না খেয়েই তাড়াহুড়ো করে ভানুদার নির্দেশমত মহিলা প্রতিনিধিদের ফুলনদির বাসায় পৌছে দিতে চলে গেল। ফিরে এসে বেচারা বিজয় সেদিন আর ভাত খেতে পারেনি। কারণ সম্মেলনে প্রতিনিধিদের মধ্যে যারা পার্টি সদস্য তাদের নিয়ে বটতলা পার্টি অফিসে পার্টি ফ্র্যাকশান মিটিং শুরু হয়ে

গেছে। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন ভানুদা ও সুভাষ চক্রবর্তী। ভানুদা সেই সভায় ১৯৬৯ সনে নির্বাচিত সভাপতি বাদল চৌধুরী ও সম্পাদক মানিক সরকারের নাম পুনরায় সভাপতি ও সম্পাদক হিসাবে পার্টির তরফে প্রস্তাব করলেন। উপস্থিত পার্টি সদস্যদের মধ্যে কেউ সম্পাদক হিসাবে মানিক সরকারের নামের বিরোধীতা করেনি। আমি, বিজয় সিংহ রায়, মধুসূদন ভট্টাচার্য ১নং ও ২নং এবং ফুলনদি সভাপতি পদে বাদলদার নামের বিরোধীতা করি। আমাদের বক্তব্য ছিল বাদলদা সভাপতি হলে ছাত্র সংগঠনের প্রতি সময় কম দিতে পারবেন। কারণ বিলোনীয়া বিভাগে পার্টির সাংগঠনিক দায়িত্ব বাদলদার উপরই তখন নির্ভরশীল ছিল। আমরা সভাপতি পদে বিজন ধরের নাম প্রস্তাব করে বললাম- সোনামুড়ায় সমর চৌধুরীর মত পোড় খাওয়া প্রবীণ নেতা পার্টির সাংগঠনিক দায়িত্বে আছেন সুতরাং সোনামুড়া বিভাগ থেকে বিজন ধরকে ছাত্র সংগঠনের সভাপতি করলে বিজন অনেক বেশি সময় সংগঠনের জন্য দিতে পারবে। নেতৃবৃন্দ আমাদের বক্তব্য মন দিয়ে শুনলেন। আরো অনেক পার্টি সদস্য আমাদের সমর্থন করল। সেদিন রাতে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া গেল না। পরের দিন রাত্রিতে আবার প্রতিনিধিদের পার্টি ফ্র্যাকশন সভা বসল। ভানুদা জানালেন রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীকে তিনি আমাদের বক্তব্য জানিয়েছেন এবং রাজ্য সম্পাদক-মন্ডলী পুনরায় বিস্তারিত আলোচনা করে দেখেছেন আমাদের প্রস্তাব সংগঠনের স্বার্থে অনেক বেশি কার্যকরী হবে। সুতরাং বিজন ধরই এস.এফ. আই. ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সভাপতি এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। পরের দিনের সম্মেলনে সভাপতি বিজন ধর এবং সম্পাদক মানিক সরকার নির্বাচিত হলেন।

তখন পার্টির মধ্যে একটি গণতান্ত্রিক সুস্থ বাতাবরণ ছিল যার ফলে পার্টির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশের সুযোগ ছিল। শুধু তাই নয় বিরুদ্ধ মতকে গুরুত্ব দিয়ে পার্টি নেতৃত্ব বিবেচনা করতেন। কোন বিরোধীতার অর্থই পার্টি বিরোধীতা, এই মানসিকতা একেবারেই ছিল না। অসুস্থ, অগণতান্ত্রিক পরিবেশ পার্টির মধ্যে আস্তে আস্তে সংক্রামিত হয় ১৯৭৮ সনে পার্টি রাজ্যে ক্ষমতা দখলের পর।

১৯৭১ সনে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সমর্থনে পাকিস্তানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি ভারত সরকারের ব্যাপক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার দাবিতে পার্টির তরফে ২৪ ঘণ্টার 'ত্রিপুরা বন্ধ' ডাকা হয়েছিল। সঠিক তারিখটা মনে করতে পারছি না।

বন্ধের দিন আগরতলা সচিবালয়ের সামনে পিকেটিং করতে গিয়ে সকাল ১১টা নাগাদ মানিক সরকার ও ফুলন ভট্টাচার্য গ্রেপ্তার হয়ে যান। দুপুরবেলা ভানু ঘোষ আমাদের নিয়ে মিটিং করলেন। বললেন বিকেলের মধ্যে মানিক এবং ফুলনকে বিনা শর্তে মুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে। তোরা সকলে গ্রেপ্তার হয়ে যা। তখন শহরে ১৪৪ ধারা বলবৎ ছিল। ভানুদা বললেন তোরা রাস্তায় নেমে জড়ো হয়ে শ্লোগান দিলেই পুলিশ তোদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবে। যথারীতি আমরা বেশ কয়েকজন কিছুক্ষণের মধ্যে খবরাখবর দিয়ে জমায়েতের ব্যবস্থা করলাম। বিকেলবেলা সবাই যখন বটতলা পার্টি অফিস থেকে রাস্তায় নেমেছি মিছিল করে ১৪৪ ধারা ভেঙে গ্রেপ্তার হব। তখন জয়নগরের একজন পুলিশ অফিসার বিজয় সিংহরায় ও মধু ভট্টাচার্য (২নং)-কে ডেকে বলল তোমরা আমার পাড়ার

ছেলে। আমি তোমাদের গ্রেপ্তার করতে পারব না। তোমরা মদনমোহন মন্দির পেরিয়ে গিয়ে শ্লোগান দাও। ঐটুকু পর্যন্তই আমার দায়িত্ব। আমরা ভদ্রলোকের কথা মেনে মদনমোহন মন্দিব পেরিয়ে মিছিল ও শ্লোগান দেওয়া শুরু করেছিলাম। উত্তেজনায় আমাদের শরীরের রক্ত টগবগ করছিল। পারলে মানিক আর ফুলনদিকে সিনেমার দেখা দৃশ্যের মত জেলখানা থেকেই যেন ছিনিয়ে আনতে পারি। শ্লোগান দিতে দিতে কোতোয়ালি থানার সামনে (অর্থাৎ বর্তমান পশ্চিম আগরতলা থানা) এলাম তখন পুলিশ মিছিলে লাঠিচার্জ করল। প্রথম লাঠিব বাড়ী পড়ল সুভাষ চক্রবর্তীর (হো-চি-মিনের) হাতে। ওর হাত ভেঙে গিয়েছিল। আমরা উত্তেজিত হয়ে আরো জোরে শ্লোগান দিতে দিতে থানার কর্ডন ভাঙার চেষ্টা করি। তখন পুলিশ আমাদের গ্রেপ্তার করে কোতোয়ালি থানার গারদে পুরে দেয়। থানা লক আপে থাকার সময় আমরা শ্লোগানে শ্লোগানে এলাকা মুখরিত করে তুলি। পথচলতি উৎসুক মানুষের ভিড় জমে যায় থানার সামনে। কিছুক্ষণ পর দু'টো বড় ভ্যান গাড়ি করে আমাদের কোর্টে নিয়ে আসে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তোলে। ম্যাজিস্ট্রেট আমাদের জামিন দেওয়ার প্রস্তাব করলে আমরা প্রস্তাব গ্রহণে অসম্মতি জানাই। আমাদের দাবি ছিল আমাদের এবং মানিক সরকার ও ফুলনদিকে বিনাশর্তে মুক্তি দিতে হবে। সন্ধ্যের পর ভ্যান গাড়িতে তুলে আমাদের আগরতলা সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে গেল। জেলের ভেতরেও আমাদেব শ্লোগানে জেলখানার কয়েদিদেব এবং জেলস্টাফদের কানে তালা লাগার উপক্রম। কিন্তু আমাদের উৎসাহেব ঘাটতি নেই। শেষ পর্যন্ত সেদিনই বেশি রাতে আমাদের সকলকে পুলিশ বিনা শর্তে মুক্তি দেয়। তখন শহরে রাতের বেলা কার্ফ্যু চলছিল। আমরা দাবি করলাম আমাদের সবাইকে বাড়ি পৌছে দিতে হবে। অথবা নিদেনপক্ষে সবাইকে বটতলা পার্টি অফিসে গাড়ি করে পৌছে দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত আমাদের চাপের ফলে পুলিশ ও জেল কর্তৃপক্ষ শেষ রাত্রিতে আমাদের সবাইকে বটতলা পার্টি অফিসে পৌছে দেয়। আমরা সেদিন বাকি সময়টুকু হৈ-হুল্লোড় করে যুদ্ধ জয়ের আনন্দে পার্টি অফিসে কাটিয়ে দিই। সেদিনই সিদ্ধান্ত হল পরের দিন আমাদের সকলের বিনাদোষে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ কবে, শহবের স্কুল বর্জন করে মিছিল সংগঠিত করা হবে। পরের দিন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ছাত্রদের বিশাল মিছিল সংগঠিত হয়েছিল। শহর পরিক্রমা করে সেই মিছিল বটতলা এসে শেষ হয়। সেখানে ত্রিপুরা রাজ্য ছাত্র ফেডারেশনের তৎকালীন বিভাগীয় সম্পাদক সমীর চক্রবর্তী ও আগরতলা শহর কমিটির সম্পাদক বিজয় সিংহরায় জ্বালাময়ী ভাষণ রাখেন।

আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করছি। ১৯৭১ সনে লোকসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে পার্টির তরফে প্রার্থী বীরেন দত্ত এবং পূর্ব ত্রিপুরা (সংরক্ষিত) আসনে প্রার্থী হয়েছিলেন দশরথ দেব। বীরেনদা যখন প্রচারের কাজে সদরের বিভিন্ন জায়গায় বা উদয়পুর শহরের আশেপাশে যেতেন তখন প্রায়ই আমরা কেউ না কেউ পালা করে তাঁর ছায়াসঙ্গী হতাম। এমন সরল, সাদাসিধে মানুষটির কি প্রচন্ড জনপ্রিয়তা ছিল আঁচ করার চেষ্টা করতাম আর বীরেনদার কোন জাদু তাকে এত জনপ্রিয় করে তুলতে পেরেছে বোঝার চেষ্টা করতাম। একদিন বীরেনদার সঙ্গী হলাম আমি, বিজয়, মধু (২নং) ও আমার সর্বদা ছায়াসঙ্গী কল্যাণীর রবি চক্রবর্তী। রবি সবাইকে বন্ধু বলে ডাকত।



বিশু রায় ও রবি চক্রবর্তী

এই রবি একদিন সন্ধ্যায় আমি আর ও যখন হেঁটে ধলেশ্বর স্কুলের সামনে দিয়ে কল্যাণীর দিকে আসছিলাম তখন হঠাৎ একটি ছেলে (যে মূলতঃ কংগ্রেস সমর্থক কিন্তু মাঝখানে কিছুদিনের জন্য নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল) পেছন থেকে দৌড়ে এসে আমার মাথায় রড দিয়ে আঘাত করে। রবি ঘটনাটি দেখতে পেয়ে তড়িৎগতিতে লাফ দিয়ে এসে ওর হাত আমার মাথার ওপর পেতে দেয়। রবির হাতের হাড় ভেঙে চৌচির হয়ে যায়। কিন্তু আমার মাথা বেঁচে যায়। রবিকে প্রায় দু'মাস প্লাস্টার বেঁধে রাখতে হয়েছিল হাতে। সেই ছেলেটির নাম মনে আছে। লিখছিনা কারণ ওর ছেলেমেয়েরা এখন প্রতিষ্ঠিত এবং সে নিজে অনেক পরিবর্তিত সংসারী মানুষ।

আগের দিন রাতেই রবি বিজয়কে বলে দিয়েছিল বন্ধু, আমার জন্য একটি প্যান্ট আনবে। যথারীতি বিজয় রবির জন্য একটি প্যান্ট এনেছিল যার ডান পকেট ছেঁড়া। সেটা রবি জানত না। সেই প্যান্ট পরেই রবি আমাদের সঙ্গে সেদিন উদয়পুর বীরেনদাসহ রওয়ানা হল। সময় সময় গাড়ি থামিয়ে বীরেনদার সঙ্গে আমরা পায়ে হেঁটে গ্রামে ঢুকছি। বীরেনদা খুব জোরে হাঁটতেন। আমরা প্রায়ই পেছনে পড়ে যেতাম। আমরা বিস্কুট, চকলেট বা সিগারেট কিনে সবাই ভাগ করে খেতাম। আমাদের তখন আস্ত সিগারেট কমই জুটত। ১টি সিগারেট ২/৩ জনে মিলে খেতাম। মাঝে মাঝে অবশ্য তেমন বিলাসী মেজাজ দেখা দিলে সবাই আস্ত সিগারেটও খেতাম। একটি সিগারেটের গোটা প্যাকেট কিনে আমরা বিজয়ের কাছে গচ্ছিত রাখলাম। সে আমাদের সবাইকে একটি করে সিগারেট দিল। আমরা সিগারেট ধরালাম। রবি কিন্তু সিগারেট ধরাল না। সে তার প্যান্টের পকেটে সিগারেট রেখে দিয়ে আমাদের সবার হাত থেকে সিগারেট নিয়ে ২/৩ টান করে সুখটান দিল। আমি আর রবি আগে আগে আর বিজয় ও মধু পেছনে হাঁটছিল। কিছুক্ষণ পর দেখি বিজয় আর মধু ভাগাভাগি করে একটি সিগারেট খাচ্ছে। আমি বললাম, কি হল - আমাদের দিলে না। বিজয় বলল এটি আমাদের প্যাকেটের সিগারেট নয়। বলে ও আমার প্যাকেট খুলে দেখাল যে ৪টি সিগারেট আগে বিলি করেছে তারপর প্যাকেটে ৬টি সিগারেট রয়ে গেছে। আমি তো ধন্দে পরে গেলাম। ভাবছিলাম ওরা তাহলে এক্সট্রা সিগারেট পেল কোথায়? পরে বুঝলাম রবিকে যে সিগারেটটা দেওয়া হয়েছিল সেটা ও প্যান্টের পকেটে সযত্নে সঞ্চয় করে রেখেছিল পরে খাবে বলে। কিন্তু পকেট ছেঁড়া থাকায় সে সিগারেট ফাঁক গলিয়ে

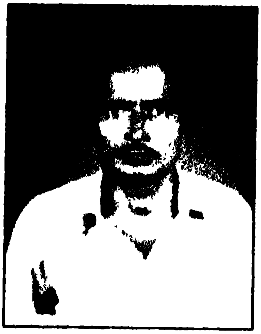
মাটিতে পড়ে যায়। বিজয় আব মধু যেহেতু রবিব পেছনে হাঁটছিল ওরা কুড়িয়ে নেয় সেই সিগারেট এবং এটিই এখন ওরা মনের সুখে টানছে।

যেহেতু বিজয় জানত রবির প্যান্টের পকেট ছেঁড়া তাই সে আর মধু রবির পেছন পেছন হাঁটছিল রাস্তা থেকে সিগারেট কুড়িয়ে নেওয়ার জন্য। রবি বরাবরই একটু সঞ্চয়ী ছিল। আসলে বেচারার হাতে কখনই হাত খরচের টাকা থাকত না। আমাদের সঙ্গে থাকার সময়ই সিগারেট কিংবা এটা-সেটা খেত। এভাবে তো ওর সিগারেট খাওয়ার নেশা হয়ে গিয়েছিল। তাই দু'একটা সিগারেটও সঞ্চয় করে রাখত বাড়িতে ফিরে গিয়ে খাওয়ার জন্য।

যা হোক, সেদিন এই ব্যাপার নিয়ে আমরা খুব হাসি-ঠাট্টা করেছিলাম। বিজয় ঐ সিগারেট থেকে রবিকে ২/১ টি সুখটান দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল। এভাবে নির্মল আনন্দে আমাদের দিন কাটত বলে কোন কাজই পরিশ্রম মনে হত না। পার্টি অফিসটাকেই বাড়িঘর মনে হত এবং পার্টি কমরেডদের মনে হত প্রাণাধিক বন্ধু, সহযোদ্ধা।

১৯৭১ সনের লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসন থেকে বীরেনদা এবং পূর্ব ত্রিপুরা (উপজাতি সংরক্ষিত) আসন থেকে দশরথদা নির্বাচিত হয়েছিলেন।

কৃষক জাঠায় অংশগ্রহণকাবী পদযাত্রীরা যাবা বিভিন্নপ্রান্ত থেকে পদযাত্রা কবে আসবেন তাদের জমায়েতেব দিন খাওয়া দাওয়ার জন্য এবং জমায়েতের ব্যয় নির্বাহ করার জন্য আগরতলা শহরের ছাত্র-যুবকের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল চাঁদা সংগ্রহের। আমরা বিভিন্ন এলাকায ভাগ হয়ে চাঁদা তুলেছিলাম। শুধু টাকা সংগ্রহ নয় আমরা বাড়িবাড়ি মুষ্টি ভিক্ষা ও সংগ্রহ করেছি তখন। পার্টি অফিসে কানুদার কাছে আমরা টাকা জমা দিতাম আব সংগৃহীত মুষ্টি ভিক্ষার চাল, ডাল এবং অন্যান্য সংগৃহীত জিনিস জমা দিতে হত চন্দ্রমোহন সাহার কাছে। চন্দ্রমোহন দার কথা আগেই বলেছিলাম। যোগেন্দ্রনগর বাড়ি ছিল তাঁব। শিশি বোতল বিক্রি করে সংসার চালাতেন। দারিদ্র ছিল তার নিত্য সঙ্গী কিন্তু অসততা তাঁকে কোনদিন স্পর্শ করতে পারেনি। আমরা সেবারের চাঁদা সংগ্রহ অভিযানে নগদ টাকা থেকে মুষ্টি ভিক্ষা পেয়েছিলাম অনেক বেশি। সারা রাজ্য থেকে মোট ১,৫০০ (দেড় হাজার)পদযাত্রী এসেছিল। তাদের সবাইকে খাওয়ানোর পরও মুষ্টি ভিক্ষার সংগৃহীত কিছু সামগ্রী উদ্বৃত্ত ছিল। চাঁদা সংগ্রহ অভিযানের ৪/৫ দিন চলে যাওয়ার পর একদিন দুপুরে মুষ্টিভিক্ষার সংগৃহীত জিনিস বটতলা পার্টি অফিসে বিশু, হাবলু ভট্টাচার্য, বাদল বণিক, চন্দন চক্রবর্তী, এরা জমা দিতে গেলে কানুদা এদের বলেন চন্দ্রমোহন কোথায় বলত? আসলে চন্দ্রমোহন দা ছিলেন বেঁটে, ছোটখাটো মানুষ। সেই সময়ে তিনি সংগৃহীত মুষ্টি ভিক্ষার স্তূপের মাঝখানে বসে থাকায় তাকে দেখা যাচ্ছিল না। কানুদা বললেন, চন্দ্রমোহন সেই সকাল থেকে এই স্তূপের মধ্যে ঠায় বসে আছে। এখনো কিছু খায়নি। ও এত সৎ যে ক্ষুধায় মরে গেলে ও একটি চালের দানা মুখে দেবে না। কানুদা নিজেও আমাদের শেখাতেন চাঁদা-দাতা যে টাকাটা বা পয়সা চাঁদা হিসাবে দেবেন ঠিক সেই টাকা এবং পয়সাটিই পার্টি অফিসে এনে জমা দিতে হবে। পরিবর্তন করা চলবে না। সে সময়কার পার্টি নেতা ও কর্মীদের সততা ছিল চারিত্রিক সহজাত বৈশিষ্ট্য। সততাকে বিশেষ গুণ হিসাবে কেউ বিবেচনা করতেনা, ভাবতেন এটাই স্বাভাবিক। এতে বিশেষত্বের কিছু নেই।



সুরেন্দ্র সরকার

জমায়েতের দিন পার্টি থেকে নির্দেশ দেওয়া হল- সমাবেশের পর দূরদূরান্ত থেকে আগত পদযাত্রী কমরেড যাদের সাদা ব্যাজ আছে তারাই ভাত খেতে পারবে। স্বেচ্ছাসেবকরা যাতে সেভাবেই মাইকে ঘোষণা দিয়ে ভাত খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে। মাইকে ঘোষনা দিয়ে যখন খাওয়ার পাত বিছানো হল তখন দেখা গেল সাদা ব্যাজ পরিহিত কমরেডরা ছাড়া অন্য একজন ও ভাত খেতে বসেনি। আমরা স্বেচ্ছাসেবকরা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কারণ আমরা জানতাম সদর উত্তরাঞ্চল বা অন্যান্য জায়গা থেকে জাঠার সঙ্গে হেঁটে এমন অনেক কমরেড সমাবেশে এসেছেন যাঁদের মধ্যে অনেকেই অভুক্ত বা বাড়ি ফিরে গিয়ে খেতে পাবেন তার নিশ্চয়তা ছিল না। কিন্তু তবু খাওয়ার জন্য তাঁদের প্রলুব্ধ করে তুলতে পারেনি। তখনকার সময়ে পার্টির প্রতি সভ্য -সমর্থকদের ভালোবাসা ছিল নিখাদ। সে কারণে পার্টির নির্দেশ, অনুশাসন সবাই নির্দ্বিধায় মেনে নিত।

সুরেন্দ্র সরকার নামে একজন মোটর শ্রমিক কর্মী ছিলেন। যিনি ছিলেন পার্টিব অন্ধ সমর্থক। ছোটখাটো-বেঁটে মানুষ। তিনি আগরতলা-তেলিয়ামুড়া রুটে অ্যাম্বাসাডার গাড়ি চালাতেন। কতজন প্যাসেঞ্জার যে তুলতেন তার হিসেব থাকত না। তিনি এত ছোটখাটো ছিলেন যে ড্রাইভারের সিটে প্যাসেঞ্জার বসিয়ে তার কোলে বসে অনায়াসে গাড়ি ড্রাইভ করতে পারতেন। ১৯৭০ সনে একদিন বিকেলে আমি আর সমীর চক্রবর্তী এস.এফ.আই সংগঠনের কাজ সেরে তেলিয়ামুড়া থেকে ফেরার সময় সুরেন্দ্রদার অ্যাম্বাসাডারে চড়লাম। সন্ধ্যে হয় হয় সময়ে গাড়ি যখন বড়মুড়া পাহাড়ে ঢুকেছে তখন একজন যাত্রীর সঙ্গে আমার আর সমীরের রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। গাড়ি যখন বড়মুড়া পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় তখন হঠাৎ সুরেন্দ্র দা গাড়ির ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়ে ফেলল। আমাদের সঙ্গে যে যাত্রীটি তর্ক করছিল তাকে উদ্দেশ্য করে বলল গাড়ি থেকে নামেন মশাই। আপনে যখন গাড়িতে উঠছেন তখনই আমার ডাউন হইছিল আমনে বেতারা মাল। আমনেরে আমি আমার গাড়িতে কইরা নিতাম না। সুরেন্দ্রদা আসলে ডাউন হইছিল শব্দটা উচ্চারণ করেছিলেন ডাউট হইছিল বোঝাতে গিয়ে। আমি আর সমীর খুব লজ্জিত হয়ে পড়লাম। অনেক অনুনয়, বিনয় করে সুরেন্দ্রদাকে রাজি করিয়ে সেই প্যাসেঞ্জার ভদ্রলোককে আগরতলা পর্যন্ত আনতে রাজী করিয়েছিলাম।

১৯৭১ সনে লোকসভা নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় জমায়েতে বক্তব্য রাখার জন্য জ্যোতিবাবু আগরতলা এসেছিলেন। আমি, শঙ্করদা, দুই মধু, বিজয় সিংহরায়, সমীর চক্রবর্তী এরা ছিলাম জ্যোতিবাবুর নিরাপত্তা দায়িত্বে। জ্যোতিবাবু বিমান থেকে নেমে গাড়িতে উঠেই হাসতে হাসতে আমাদের জিজ্ঞেস করল আমাকে যে গার্ড দেবে কি আছে তোমাদের কাছে। বোমা আছে? এর আগে এবং পরে বহুবার জ্যোতিবাবুকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি তাঁর নিরাপত্তার রক্ষার সুবাদে কিন্তু এত ভাল মুডে তাঁকে আর কোন দিন দেখিনি। সে যাত্রা আগরতলা থেকে ফিরে গিয়েই জ্যোতিবাবু এক জনসভায়

বলেছিলেন, কংগ্রেসীরা যদি আমাদের বোমা মারে তাহলে আমাদের ছেলেরা কি তাদের উদ্দেশ্যে রসগোল্লা ছুঁড়বে? সেবার জ্যোতিবাবু উঠেছিলেন নৃপেনদার বড়ভাই ডাঃ নন্দলাল চক্রবর্তীর বনমালীপুরের বাড়িতে। যেদিন জ্যোতিবাবু কোলকাতা ফিরে যাবেন সেদিন ছিল দুপুরের ফ্লাইট । যাওয়ার আগে জ্যোতি বাবু ভাত খেতে বসেছেন, আমরা স্বেচ্ছাসেবকরা ও তারই সঙ্গে খেতে বসেছি। ডাঃ নন্দলাল চক্রবর্তীর স্ত্রী সাধনা মাসীমা মনের সুখে বিভিন্ন পদ রেঁধে আমাদেরও জ্যোতিবাবুকে খেতে দিয়েছিলেন। এর মধ্যে সুস্বাদু মাছের পদই ছিল ৩/৪ রকমের। আমাদের খাওয়া যখন মাঝামাঝি পর্যায়ে তখন নন্দলাল চক্রবর্তীর বড় ছেলে আশীস চক্রবর্তী এসে ঢোকেন রান্নাঘরে। আশীসদা আমাদের উদ্দেশ্য করে জি বি বাজারের ৩/৪ জন যুবকের নাম বলেন। আমাদের অনুরোধ করেন ওঁদের সঙ্গে যাতে অবিলম্বে যোগাযোগ করি। ছেলেগুলি খুব সাহসী এবং মাস্তান প্রকৃতির সুতরাং ওদের পার্টিতে ঢোকাতে পারলে পার্টি শক্তিশালী হবে। জ্যোতিবাবু হঠাৎ খাওয়া বন্ধ করে আমাদের জিজ্ঞেস করেন তোমাদের খাওয়া হয়েছে? প্রশ্নের ধরণ দেখেই আমরা থতমত খেয়ে বলে উঠি - হ্যাঁ, হয়ে গেছে। জ্যোতিবাবু বল্লেন তোমরা হাত-মুখ ধুয়ে রেডি হয়ে যাও। আমাদের সাধের খাওয়া আশীসদার জন্য মাথায় উঠল। আমরা তড়িঘড়ি করে খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়লাম। সাধনা মাসীমা অসহায়ের মত ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন।

জ্যোতিবাবুকে নিয়ে যখন আমরা আগরতলা বিমান বন্দরে পৌঁছে দিতে যাই তখন আমাদের সঙ্গে ভানু ঘোষও বিমান বন্দরে গিয়েছিলেন। জ্যোতিবাবুর জন্য ভি. আই. পি.-রুম বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষ খুলে দিয়েছিল। জোতিবাবু, ভানুদাসহ অন্যান্যরা ভি. আই. পি রুমে বসে কথাবার্তা বলছিলেন এমন সময় মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা সুরেন্দ্র সরকার কয়েকজন মোটর ড্রাইভার নিয়ে বিমান বন্দরে এসে হাজির। আমি এবং শঙ্করদা, সমীর ভি. আই. পি. রুমের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। সুরেন্দ্রদা এসে আমাদের বলল- জ্যোতিদার সঙ্গে একটু দেখা করব। আমরা জিজ্ঞেস করলাম কেন? তিনি জানালেন ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত ব্যাপারে একটু আলোচনা আছে। আমরা পড়লাম বিপত্তিতে। কেননা আমাদের বারণ করে দেওয়া হয়েছিল কাউকে যাতে ঢুকতে না দেওয়া হয়। আমি তখন ভানুদাকে ভি. আই. পি. রুমের ভেতর থেকে ডেকে নিয়ে আসি। সুরেন্দ্রদা ভানুদাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন সঙ্গের গাড়ির ড্রাইভাররা কংগ্রেস দলের মোটরকর্মী সমিতির সদস্য। সুরেন্দ্রদা গতকাল এদের জ্যোতিবাবুর জনসভায় নিয়ে গিয়েছিলেন। এরা জ্যোতিবাবুর ভাষণ শুনে খুব উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে এবং গতকাল রাত্রেই 'মাল খাইয়া, মোটর কর্মী সমিতির অফিসে হাম্বুর-দুম্বুর লাথি মারে'। এই পর্যন্ত শুনেই ভানুদা সুরেন্দ্রদাকে ধমকে বিমান বন্দর চত্বর থেকে চলে যেতে বলেন এবং সুরেন্দ্র দাকে বলেন যদি তেমন কোন প্রয়োজন হয় তবে যাতে তিনি বীরেনদার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সুরেন্দ্রদার এই ঘটনার কথা উল্লেখ করলাম এই কারণে যে, সুরেন্দ্রদা নিজে কোন দিন মদ ছোঁন নি বলেই জানি। কিন্তু অদ্ভুত সারল্য ছিল সুরেন্দ্রদার মধ্যে আর ছিল পার্টির প্রতি অগাধ ভালোবাসা, শ্রদ্ধা। পার্টির প্রতি কেউ অনুরক্ত হলে তিনি প্রাণ দিয়ে চাইতেন তার সেই অনুরাগ শ্রদ্ধায় পর্যবসিত হোক। পার্টির নেতার কাছে সাবলীলভাবে সব কথা বলতে বিন্দুমাত্র সংকোচ বোধ করতেন না।

আগের ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের সিটি অফিস ছিল আগরতলা সেন্ট্রাল রোডে। এই অফিসের জনপ্রিয় নাম ছিল 'খোশমহল'। খোশমহলের সামনেই ছিল পার্টির প্রেস জনশিক্ষা। প্রেসের পেছনে খোশমহলের লাগোয়া উত্তর দিকে ছিল কমরেড রাধেশ্যাম সাহার চায়ের স্টল। বাঁশের বেড়া টিনের ছাউনি। তিনিও ছিলেন পার্টির অন্ধঅনুগামী সমর্থক। তাঁর দোকানে প্রায়ই আমি আর শঙ্করদা চা খেতে যেতাম। চায়ের অর্ডার দিলেই বলতেন, আগে পয়সা ছাড়। পয়সা দিলে দুধ বা চিনি আনতে পাঠাতেন। এলে চা করে দিতেন। যে কোন পার্টির নেতা এলে রাধেশ্যামদাকে বলতে হতনা। রোগা ছিপছিপে লম্বাশরীর এবং দীর্ঘ টাক মাথায় গলায় লাল স্কার্ফ ঝুলিয়ে বিমান বন্দরে সবার আগে গিয়ে হাজির হতেন। সিটি অফিসের ড্রাইভাররা ও রাধেশ্যামদাকে খুব ভালবাসতেন। বিমান বন্দরে আসতে যেতে তাঁর পয়সা লাগত না।

১৯৭০ সনে যখন পূর্ণরাজ্যের দাবী, রেল ও শিল্পের দাবীতে পার্টি আইন-অমান্য আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল তখন একদিন আমি আর শঙ্করদা খোশমহল রাধেশ্যামদার দোকানে চা খেতে যাই। আমাদের চা দিয়ে রাধেশ্যামদা আমাদের কাছে এসে বসল। বলল, আচ্ছা নৃপেন ঠাকুরের কি মাথা ঠিক আছে? আমরা বললাম কেন? রাধেশ্যামদা অক্লেশে বলল, নয়ত কোন দুঃখে আইন অমান্য করছে। দেশে কি আইন আছে যে অমান্য করতে হবে?

১৯৭১ সনে সারা ভারতবর্ষব্যাপী ইন্দিরার নেতৃত্বে গঠিত ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে সি. পি. আই-এর রাজনৈতিক আঁতাত হয়। ফলে সি. পি. আই (এম) দলের সঙ্গে সে সময় সি. পি. আই-এর রাজনৈতিক সম্পর্ক খুব তিক্ত হয়ে ওঠে।

সি. পি. আই. (এম) দলের ছত্রছায়ায় ত্রিপুরা রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন নামে রিক্সা শ্রমিকদের একটি সংগঠন ১৯৬৯ সনে গঠন করা হয়েছিল। চন্দ্রপুরে ছিল রিক্সা শ্রমিক সংগঠনের অফিস এবং শক্তিশালী একটি ইউনিট। রিক্সা শ্রমিকের নেতা ছিলেন মাক্কু মিঞা নামে একজন রিক্সা শ্রমিক। সি. আই. টি. ইউ থেকে রিক্সা শ্রমিক সংগঠন পরিচর্যা এবং নেতৃত্বদান করার দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিলেন সুদর্শন দাস। ১৯৭১ সনে রিক্সা শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবি দাওয়ার সমর্থনে রিক্সা শ্রমিক ধর্মঘট ডাকা হয়। কংগ্রেস এবং সি. পি. আই. সেই ধর্মঘটের বিরোধিতা করে। ধর্মঘটের দিন বিকেল বেলা সন্ধে হয় হয় সময়ে মামা কেশব বটতলা পার্টি অফিসে এসে ঘরের মেঝেতে শুয়ে লুটোপুটি খেতে আরম্ভ করে। সে নাকি যখন তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্যারাডাইস চৌমুহনিতে ধর্মঘট ভঙ্গকারী ২/৪ টি রিক্সা চালককে রিক্সা না চালাতে অনুরোধ করছিল তখন সি. পি. আই-এর কিছু কর্মী তাকে আক্রমণ করে, সাইকেলের চেইন দিয়ে তাকে মারধোর করে। আমি বা আমাদের গ্রুপের অনেকেই তখন এখন যেখানে বিধানসভার মূল ফটক সেখানে ওয়ালিং করছিলাম। আমি, সমীর, মধু, রবি অনেকেই সেখানে ওয়ালিং-এর কাজে ব্যস্ত ছিলাম। ভগ্নদূতের মত বিশু এসে কেশবের উপর আক্রমণের ঘটনাটি আমাদের জানায়। আমরা তো অবাক। আগরতলা শহরে সি. পি. আই'র কোন কর্মী আমাদের কোন কর্মীর উপর আক্রমণ করতে সাহস পাবে এই ঘটনা ছিল আমাদের কাছে অভাবনীয়। আমরা সবাই ওয়ালিং বন্ধ করে ছুটে গেলাম কামান চৌমুহনি সি. পি. আই-এর সদর দপ্তরে। যাওয়ার পথে পেয়ে গেলাম

সি. পি. আই নেতা বিভাস ভট্টাচার্যকে। তাকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে দোতালায় সি. পি. আই অফিসে উঠে পেলাম সি. পি আই. নেতা শিবনগরের বাসিন্দা প্রিয়লাল পালকে। আমাদের মধ্যে কে যেন হুড়োহুড়ির মধ্যে প্রিয়লাল পালের মাথায় আঘাত করে। তার মাথা বেয়ে যখন রক্ত বেরুতে আরম্ভ করে তখন আমাদের সম্বিত ফিরে আসে। আমরা নীচে নেমে আসি। সি পি. আই. পার্টি অফিস আক্রমণের ঘটনা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বীরবিক্রম সান্ধ্য কলেজেও খবর চলে যায়। পার্টিকর্মী এবং বীরবিক্রম সান্ধ্য কলেজের পাঠরত এস. এফ. আই নেতা উৎপলেন্দু বিকাশ সাহাকে সি পি আই-এর ছাত্র সংগঠন এ আই এস এফ অর্থাৎ অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্ট ফেডারেশনের কিছু কর্মী শারীরিকভাবে নিগৃহীত করে। এ. আই. এস. এফ কর্মীরা উৎপলকে মারার এই সাহস পেয়েছিল যেহেতু তাদের পেছনে এন. এস. ইউ. আই-র মদত ছিল।

এর পূর্বেও মানিক সরকারকে যখন নকশালরা এম বি বি কলেজ থেকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল তার ২/৪ দিন পর বীর বিক্রম সান্ধ্য কলেজে নকশালপন্থী ছেলেরা উৎপলকে এস এফ আই নেতা হিসাবে শ্রেণিশত্রু বিবেচনায় মারধোর করেছিল।

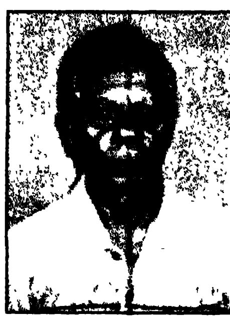
রিক্সা শ্রমিক ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে সি. পি. আই এবং সি পি. আই (এম) দলের বিরোধ চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। তখন সি. পি. আই দলের সাংগঠনিক শক্তি সবচেয়ে বেশি ছিল বিলোনীয়া মহকুমায়। আগরতলা শহরের ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বিলোনীয়াতে সি. পি. আই (এম) দলের নেতা ও কর্মীরা সি. পি. আই কর্মীদের দ্বারা আক্রান্ত হতে শুরু করে। আর আমরা তার বদলা হিসাবে বটতলা বাস স্ট্যান্ডে কোন সি. পি. আই নেতা বা কর্মী বিলোনীয়া থেকে এসে নামলে তাদের ওপর শারীরিক নিগ্রহ শুরু করি। সে সময় আমাদের সঙ্গে রামনগর বিধানসভার বর্তমান কংগ্রেস বিধায়ক সুরজিত দত্ত যুবকর্মী হিসাবে সমস্ত কাজে অংশগ্রহণ করত। যা হোক, একটা সময়ে দুই পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্বের আন্তরিক ইচ্ছায় এবং উদ্যোগে এই সন্ত্রাসজনিত, অশোভন আচরণ থেকে আমরা দু'দলের কর্মীরাই বিরত হতে বাধ্য হই। সে সময়ে এ. আই. এস. এফের ত্রিপুরাতে শীর্ষ নেতা ছিল প্রশান্ত কাপালী। যিনি এখন সি. পি. আই দলের সম্পাদক। প্রশান্তের মত ভদ্র এবং সজ্জন হাতে গোনা ২/৩ জন পাওয়া মুশকিল। সে ছিল আমার বন্ধু। তাকে প্রায়ই সাইকেলের সামনে হাতলে বসিয়ে ঘুরতাম। সে সময় আমাদের মধ্যে হঠাৎ রাজনৈতিক সম্পর্কের এত অবনতি হয়েছিল যে একদিন প্রশান্তকে কলেজটিলার আপ ওঠার সংযোগস্থলে খুব অভদ্র ব্যবহার করে সাইকেল থেকে নামিয়ে দিই। সে ঘটনা আজো মনে পড়লে আমাকে পীড়িত করে। এখন অবশ্য প্রশান্ত আর আমি পরস্পরের বন্ধু এবং সুহৃদ।

জনশিক্ষা কো-অপারেটিভ প্রেসের সামনেই ছিল প্রাণতোষ পালের পানের দোকান সেখানে মূলত আড্ডা মারতেন শঙ্করদা, ডাঃ হরিপদ চক্রবর্তী (হোমিওপ্যাথি), শঙ্করদার সহপাঠি বন্ধু প্রেমানন্দ দাস, কয়েকজন কর্মচারী এবং অবশ্যই রাধেশ্যাম সাহা। আমি খুব কমই যেতাম। প্রাণতোষ পাল ছিল পার্টি সমর্থক। তবে তিনি নিরীহ এবং গোবেচারা ধরনের ভীতু লোক ছিলেন। শঙ্করদার কাছে শুনেছি প্রাণতোষবাবুর দোকানের সামনে যারা আড্ডা মারত তাদের সবাই প্রাণতোষবাবুর ভীতির ব্যাপারটা জানত। তাই মাঝে মাঝেই কেউ না কেউ বটতলায় ভীষণ গণ্ডগোল বা কামান চৌমুহনিতে পুলিশের লাঠিচার্জ

হচ্ছে, সে এই মাত্র দেখে এসেছে বললেই প্রাণতোষদা দোকানের ঝাঁপ লাগানোর প্রস্তুতি শুরু করত। তখন তাঁর হাতে ধরা পানের পাতাতে যে স্পীডে তিনি চুন বা খয়ের লাগাতেন সেটাও দর্শনীয় ব্যাপার ছিল।

গোলবাজার ঢুকতেই যে গোলচক্করটি আছে সেখানে ছিল হরিপদ চক্রবর্তীর হোমিওপ্যাথির চেম্বার। কিসের প্র্যাক্টিস! সবসময়েই হরিপদদা চেম্বারে বসে রাজনৈতিক আড্ডায় মশগুল থাকতেন। ওঁর স্ত্রী মাঝে মাঝে চেম্বারে এলে স্ত্রীকে শুনিয়ে শঙ্করদা এদের বলতেন ভাই প্র্যাক্টিসের সময় এসে তোমরা কাল থেকে আর ঝামেলা বাড়িও না। উপবিষ্ট ২/১ জন পেসেন্ট যদি তখন ও অপেক্ষামান থাকত তবে তাদের খুব মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেন। অবশ্যই সবটা বৌদিকে খুশি করার জন্য। হরিপদদা, শঙ্করদা এবং পরবর্তী সময়ে প্রতাপগড় বিধানসভা থেকে নির্বাচিত বিধায়ক মধুসূদন দাস সহপাঠী ছিলেন। হরিপদদা বয়সে শঙ্করদা এদেরও সিনিয়র ছিলেন বলেই মনে হয়। এরা ১৯৬৯ সনে বি. এ. পাস করে কলেজ থেকে বেরিয়ে যান। ডাঃ হরিপদ চক্রবর্তী এখনও প্রতাপগড় এলাকাতেই বসবাস করেন এবং এলাকায় জনপ্রিয় পার্টি নেতা।

একদিন শঙ্করদাকে খুঁজতে গিয়েছিলাম প্রাণতোষ পালের পানের টং-এর সামনে। গিয়ে দেখি শঙ্করদা, রাধেশ্যামদা, হরিপদদা, প্রেমানন্দ দাস সবাই চুটিয়ে আড্ডা মারছে। আমি কি কুক্ষণে যে হরিপদদাকে নকশালদের গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও এর যে শ্লোগান সে সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। প্রাণতোষ পালের দোকানের সামনে লোক জমে যাওয়ার উপক্রম। হরিপদদা উচ্চগ্রামে বঙ্গবন্ধু কায়দায় এক বক্তৃতা দিয়ে বলল আমাকে তুমি ১০ টি রাইফেল সংগ্রহ করে দাও আমি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ১০টি গ্রাম মুক্ত করে দেব। আমি সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশে তাকাচ্ছিলাম পুলিশের কোন স্পাই আছে কিনা দেখার জন্য। সেদিন প্রাণতোষ পালের হাতে ধরে রাখা পানের পাতায় চুনের কাঠির যুগলবন্দি দেখেছিলাম। উত্তেজনায় প্রাণতোষদা যে স্পীডে চুনের কাঠি চালাচ্ছিলেন তাতে পানের পাতা কেন ছিঁড়েফুঁড়ে গেলনা সেটাই আশ্চর্যের। রাধেশ্যামদা চলতি কথা অর্থাৎ কোলকাতার ভাষায় কথা বলতেন। তিনি সেদিন মাঝখানে পড়ে হরিপদদার উত্তেজনা থামিয়ে ছিলেন। বললেন— ডাক্তার, তোমার বিপ্লব যেদিন হবে সেদিন দেখা যাবে। এখন খামোকা কেন প্রাণতোষের হার্টফেলের ব্যবস্থা করছ। শঙ্করদার কাছে শুনেছিলাম তারা ছাত্র-ঐক্য-সংস্থা করার সময়ে নেতাজীর জন্মদিনে এক সভায় সভাপতি ছিলেন হরিপদ চক্রবর্তী। ছাত্রনেতা নিশীথ দাসের বক্তব্যের পর সভাপতির ভাষণ দিতে উঠেছিলেন হরিপদদা। গলার স্বর প্রথমেই সপ্তমে তুলে বলেন, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র মহামানব তার জীবন রোমাঞ্চকর - বন্ধুগণ আমি উত্তেজিত, আমি আর বলতে পারব না, সভা এখানেই শেষ। সেদিন হরিপদদার হঠাৎ আবেগে উত্তেজিত হয়ে সভা সমাপ্ত করার ব্যাপারটি কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলাম। অত্যন্ত সরল ছিলেন হরিপদদা।



ডা. হরিপদ চক্রবর্তী

হরিপদ চক্রবর্তী এবং মধুসূদন দাস (বর্তমানে প্রয়াত)

এদের দু'জনকে প্রথম দেখি ১৯৬৯ সালে এম বি বি কলেজের সাইকেল স্ট্যান্ডে। সেদিন দু'জনেই কি একটা বিষয়ে মনোযোগ দিয়ে আলোচনা করছিলেন এবং মধুসূদন দাস মনের সুখে বিড়ি ফুঁকছিলেন। সে সময়কার পরিস্থিতিতে দৃশ্যটি খুব বিসদৃশ মনে হয়েছিল আমার। কেননা তখন উঠতি বয়সের যুবকরা, কলেজের ছাত্ররা স্ট্যাটাস সিম্বল হিসাবে ধূমপান করত তবে সেটা ছিল সিগারেট। উমাকান্ত স্কুলে পড়ার সময় আমার সহপাঠী সুভাষ দাস (সদ্য চড়িলামের এক স্কুল থেকে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক) এবং কলেজে মধুসূদন দাসকে বিড়ি খেতে দেখেছিলাম। শখ করে দু'এক দিন যে আমরা হুঁকোয় বা বিড়িতে টান দিইনি তা নয় তবে সেটা ছিল নিতান্তই বিলাসিতা। সম্বচ্ছরের চালচিত্র নয়।

অজয় বিশ্বাসের নেতৃত্বে মূলতঃ বিভিন্ন কর্মচারী সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন, ছাত্র-যুব সংগঠনের যুক্ত একটি মঞ্চ তৈরীর কাজ শুরু হয়েছিল, ১৯৬৮ সনে। তারই প্রস্তুতি পর্বে বেশ কয়েকটি সভা আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে সংগঠিত হয়েছিল। আমি ও উপস্থিত ছিলাম। সেই সভায় ২/১ বার ছাত্র-ঐক্য সংস্থার প্রতিনিধি হিসাবে মধুসূদন দাস ও হরিপদ চক্রবর্তীর দেখা পাই। দু'জনেই তাদের মত করে সংগ্রামের জন্য একটি যুক্ত মঞ্চের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করে বক্তব্য রাখেন। ১৯৬৯ সনের ৬ই ফেব্রুয়ারী গঠিত হয়েছিল ছাত্র-যুবক সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারী, ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতির সংগ্রামের জন্য একটি যুক্ত মঞ্চ। ঐতিহাসিক সেই সংগঠনটির নাম ছিল ৬ই ফেব্রুয়ারী কমিটি। এই যুক্ত মঞ্চ শুধু বামপন্থী নয়, জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস সমর্থকসহ বহু সংগঠন নিয়ে গড়ে উঠেছিল। মানুষকে সংগ্রামের পথে নামানোর জন্য এবং যে কোন ধরণের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক জিঘাংসা বা দুর্নীতি, অসাম্যের বিরুদ্ধে লড়াই এর জন্য রাজনৈতিক সংকীর্ণতা যে বর্জনীয় তার পথিকৃত ছিল ৬ই ফেব্রুয়ারী কমিটি। যতটুকু মনে পরে এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ অজয় বিশ্বাস ও অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন রজত গুপ্ত। পরবর্তী সময়ে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার ও এই সংগঠনটির সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। বর্তমানে এই ঐতিহাসিক সংগঠনটি মৃত। বামপন্থী কর্মচারী আন্দোলনে বিভাজনের পর যখন ১৯৯১ সনে কর্মচারী সমন্বয় কমিটি বিভক্ত হয়ে পরে তার আগে থেকেই ৬ই ফেব্রুয়ারী কমিটিও আস্তে আস্তে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়। সম্ভবত রাজ্যে এখন বন্ধু বামফ্রন্ট সরকার সুতরাং সংগ্রামের জন্য যৌথ মঞ্চের আর প্রয়োজন নেই বলেই বিবেচিত হচ্ছে রাজ্যের বামপন্থী নেতৃবৃন্দের। এ এক অদ্ভুত ধারণা ক্রিয়াশীল কিছু বামপন্থী নেতৃত্বের। প্রশাসনিক যে কোন জনস্বার্থ বিরোধী সিদ্ধান্তের বা রাজনৈতিক জিঘাংসার বিরুদ্ধে লড়াই করলেই ভাবটা এমন যে সে লড়াই বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। এদের ধারণা বামফ্রন্ট বন্ধু সরকার। সুতরাং এই আমলে কোন মানবাধিকার লঙ্ঘন, প্রশাসনিক বৈষম্য, দুর্নীতি, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ঘটতেই পারে না। যদি ঘটেও বামফ্রন্ট সরকারের স্বার্থে সেগুলো উপেক্ষা করতে হবে। এরা ভুলে যায় বামফ্রন্ট সরকারের শাসন কোন কমিউনিস্ট কাঠামোর মধ্যে নয়, পরিচালিত হচ্ছে বুর্জোয়া রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে। যে কাঠামোটি দাঁড়িয়ে আছে জনস্বার্থ বিরোধী ভিতের ওপর। প্রতিনিয়ত লড়াই, সংগ্রাম না চালালে এই বুর্জোয়া রাষ্ট্র কাঠামোর চরিত্র আংশিকও পরিবর্তন সম্ভব নয়।

১৯৬৯ সনের আগস্ট মাসে শুরু হয় কল্যাণপুরের ঐতিহাসিক ছাত্র আন্দোলন। রাজ্যে তখন সংখ্যাগুরু বাঙালী অংশের মানুষের মধ্যে ও আস্তে আস্তে প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়ার আঁচ লাগতে থাকে। ৬ই ফেব্রুয়ারী কমিটি এই ছাত্র আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসে। চিলড্রেন্স পার্কে ছাত্র-আন্দোলনের সমর্থনে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অজয় বিশ্বাস ছাড়া ও অন্যান্য সংগঠনের নেতারা বক্তব্য রাখেন। মধুসূদন দাস ও সেই সভায় বক্তব্য রেখেছিলেন। সেই বক্তব্যটি আমার কাছে খুবই অরাজনৈতিক মনে হয়েছিল। তিনি তাবিজ-কবচ, ঝাঁড় ফুক ইত্যাদিও সংগ্রামের পাশাপাশি শচীন্দ্রলাল সিংহের সরকারের বিরুদ্ধে প্রয়োগের জন্য আহ্বান রেখেছিলেন। সেই সময় যখন বর্তমান পুরপিতা শঙ্কর দাশ, হরিপদ চক্রবর্তী এরা সি. পি. আই (এম) দলের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছিলেন তখন মধুসূদন দাস এদের পরামর্শ দিয়েছিলেন বলে শঙ্করদার কাছে শুনেছি। মধুবাবুর পরামর্শ ছিল সি. পি. আই (এম) দলে স্টার নেতাদের ভিড় সুতরাং সেই দলে ঢুকলে নেতৃত্বে যেতে অনেকদিন সময় লাগবে। তুলনায় সি. পি. আই রাজ্য দলে তেমন কোন তারকা নেতৃত্ব নেই সুতরাং সেই দলে যোগ দিয়ে অচিরেই নেতা হওয়া যাবে। অতত্রব সবাই মিলে সি. পি. আই দলে যোগ দেওয়া উচিত। শেষ পর্যন্ত অবশ্য শঙ্করদা বা হরিপদদা কেউই তার কথায় কর্ণপাত করেন নি। মধুবাবু নিজেও সি. পি. আই দলে যোগ না দিয়ে কংগ্রেস দলে ভিড়ে যান। পরে কংগ্রেসের টিকিটে প্রতাপগড় বিধানসভা আসনে বিধায়ক পদে নির্বাচিত হন।

আমাদের রাজনৈতিক জীবনের চরম সৌভাগ্য চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক মাস্টারদা সূর্য্য সেনের সঙ্গীদের অন্যতম বিপ্লবী গনেশ ঘোষের সাহচর্য অল্প কয়েকদিনের জন্য আমরা পেয়েছিলাম ১৯৭০ সনে। তিনি কমলপুর পার্টির কোন একটি সম্মেলনে যোগ দিতে আগরতলা আসেন। সৌম্যদর্শন, অকৃতদার এই বিপ্লবী সি. পি. আই (এম) দলের নেতৃত্বের পদ অলংকৃত করছেন জেনে এবং তার দেখা পেয়ে আমরা আপ্লুত হয়ে পরি। মনে আছে তিনি আমাদের বন্ধু ত্রিপুরা দর্পণ সম্পাদক সমীরণ রায়ের বাড়িতে দুপুরে একবেলা খেয়েছিলেন। মিতভাষী এই বিপ্লবীর সঙ্গে ঐদিন একটি দুপুর একান্তে কাটানোর সুযোগ আমিও পেয়েছিলাম। কমলপুর সম্মেলনে গিয়ে তিনি মানিক ভান্ডার পার্টি অফিসে উঠেছিলেন। সেখানেই ঘুমোতেন। জীবনদা অর্থাৎ জীবন চক্রবর্তী তখন কমলপুরে শিক্ষকতা করতেন। জীবনদা এই সুযোগ হাতছাড়া করেন নি। রাতে গনেশ ঘোষের সঙ্গে পার্টি অফিসে ঘুমিয়ে ছিলেন। জীবনদার মুখে পরে জেনেছি প্রয়াত নেতা গনেশ ঘোষ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের আনুপর্বিক ঘটনা তাঁদের বলেছিলেন। গনেশ ঘোষ ছিলেন রসায়নের ছাত্র। তাই বোমা তৈরির কেমিষ্ট্রি তাঁর ভালই জানা ছিল। মাস্টারদার সংস্পর্শে এসে রয়াসন শাস্ত্রের উপর তাঁর এই জ্ঞান দেশ-মাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে তিনি উৎসর্গ করেন। গণেশ ঘোষ কমলপুর ছাড়া বিলোনীয়াতেও একটি জনসভায় ভাষণ দিয়েছিলেন।

১৯৭১ সনে আমাদের রাজ্যে আসেন পশ্চিমবাংলার অবিসংবাদিত কৃষক নেতা হরেকৃষ্ণ কোনার। আগরতলা চিলড্রেন্স পার্কের কমিউনিটি হলে তিনি আমাদের তিনদিনের রাজনৈতিক ক্লাশে অংশ নিয়ে পৃথিবীর কমিউনিস্ট আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন এবং মার্কসবাদ - লেলিনবাদের উপর বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কি অসাধারণ বক্তা

ছিলেন হরেকৃষ্ণ কোনার সেটা যে তাঁর পার্টি ক্লাস, বিভিন্ন সম্মেলনে বা সমাবেশে বক্তৃতা শোনেনি তার পক্ষে আঁচ করা ও সম্ভব নয়। যখন তিনি ১৯৭১ সনে আমাদের রাজ্যে আসেন তার অব্যবহিত পূর্বে তিনি স্বাধীন ও সমাজতান্ত্রিক ভিয়েতনাম সফর করে ফিরে এসেছিলেন। ভিয়েতনামের বিপ্লব সম্পর্কে ও তিনি পার্টি ক্লাসে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন। আমাদের স্মরণ আছে তিনি বলেছিলেন ভিয়েতনাম পরিদর্শন কালে সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টির এক প্রতিনিধিকে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন ভিয়েতনামে তখনও ব্রডগেজ রেল লাইন নেই কেন? প্রতিনিধিটি উত্তর দিয়েছিল যদি থাকত তবে আজকের এই ভিয়েতনাম দেখতে পেতেন না। প্রথমে বুঝতে পারিনি। পরে বুঝেছিলাম প্রাক বিপ্লবের যুগে ভিয়েতনামে যদি উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকত তবে মার্কিন সেনাদের সে দেশে সৈন্য, আগ্নেয়াস্ত্র, রসদ জড় করার অনেক বেশী সুবিধা থাকত। উঁচু-নীচু পাহাড়, বনানী ঘেরা ভিয়েতনামে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে মার্কিনীদের পরাস্ত করা অনেক বেশী কষ্টকর হত। কথা প্রসঙ্গে হরেকৃষ্ণ কোনার বলেছিলেন ত্রিপুরার প্রাকৃতিক পরিবেশ অনেকটাই ভিয়েতনামের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে।

পার্টি ক্লাসের শেষ দিনে হরেকৃষ্ণ কোনার যখন তার বক্তৃতা শেষ করে ফেলেন তখন ভানুদা পার্টি ক্লাসে যোগদানকারী কর্মীদের জিজ্ঞেস করলেন কারোর কোন প্রশ্ন করার থাকলে করতে পারেন। কোনারের বক্তৃতা মন্ত্র মুগ্ধের মত শুনে আমরা তখন ও তার রেশ কাটাতে পারিনি। হঠাৎ হরিপদদা উঠে দাঁড়ালেন, হরেকৃষ্ণ কোনারকে উদ্দেশ্য করে বললেন, কমরেড বিপ্লবের সময় আমরা রাইফেল কোথায় পাব? কোনার ধীরে সুস্থে নস্যির একটি টিপ নাকে গুঁজে বললেন বৈপ্লবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারলে রাইফেলের অভাব হবে না। জানি না, আজ যখন বিপ্লব সংসদীয় গণতন্ত্রের পাঁকে নিমজ্জিত তখনও হরিপদদার মাথায় রাইফেলের ভূত বেঁচে আছে কিনা।

ক্ষীরগোপাল খুন হওয়ার সপ্তাহখানেক আগে আমরা সবাই ছাত্র কনভেনশানে ধর্মনগর যাচ্ছিলাম বাসে চড়ে। সেই কনভেনশানে প্রধান অতিথি ছিলেন বর্তমান পশ্চিমবাংলা সি. পি. আই (এম) দলের ও বামফ্রন্টের সম্পাদক বিমান বসু। বাসে উঠেই ক্ষীরগোপাল বিজয় সিংহ রায়কে বলল বিজয়দা তোমার শার্টটা খুব সুন্দর। বিজয় হ্যান্ডলুমের একটি শার্ট সস্তায় কিনেছিল। বিজয় বলল, তুই পরবি? নিয়ে নে। ক্ষীরগোপাল তার গায়ের জামা খুলে বিজয়কে দিয়ে বলল, তুমি পরে নাও। বলে তার নিজের জামাটা বিজয়কে পরিয়ে দিয়ে, সে বিজয়ের হ্যান্ডলুমের শার্টটি পরে নিল। ছাত্র কনভেনশান শেষে আমরা আগরতলা ফিরে এলাম। তার ৩/৪ দিন পর এম. বি. বি. কলেজ প্রাঙ্গনে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তদের দ্বারা ছুরিকাহত হয়ে ক্ষীরগোপাল ওরফে শনি মারা যায়। ছোরার আঘাতে তার পেটের কিডনি, স্টমাক, নাড়ীভূড়ি সব বেরিয়ে এসেছিল। তখনও তার পরনে ছিল বিজয়ের দেওয়া সেই শার্টটি। আজও বিজয় সেই দুঃসহ স্মৃতি ভুলতে পারেনি। শনি ছিল আমার ছোটভাই তপনের সমবয়সী এবং বন্ধু। আমি তার মৃত্যু আজও ভুলতে পারি না।

যে বিশাল স্তম্ভের উপর এখন সি. পি. আই (এম) দল দাঁড়িয়ে রাজ্যের ক্ষমতা দখলের স্বাদ আহরণ করছে তার ভিত রচনা করতে গিয়ে শনির মত কত অসংখ্য লোক

আত্মত্যাগ করেছে কে তাদের স্মরণ রাখে।

পোষাক পরিচ্ছদ নিয়ে কত কান্ড যে আমাদের মধ্যে হত তার ইয়ত্তা নেই। আরেকজন সহযোদ্ধার পোষাক যেন প্রত্যেকে নিজেরই মনে করত। ১৯৭১-৭২ সনেই হবে। একদিন শীতের বিকেলে পার্টির কাজে বাইরে যেতে হবে। বিজয়কে পাঠানো হবে ঠিক হল। কিন্তু ও তখন শুধু পাঞ্জাবী পাজামা পরিহিত ছিল। তখন বিশু তার নিজের সোয়েটার, মাফলার বিজয়কে দিয়ে পরের দিন ফেরত দিতে বলল। বিজয় সেই সোয়েটার মাফলার দিয়ে পুরো শীত কাবার করে দিল। বারে বারে বলা সত্বেও বিজয় সোয়েটার, মাফলার বিশুকে ফেরত দেয় না। আমরা জানতাম বিজয় পাঞ্জাবীর নীচে সোয়েটারটি পরত। মাফলারটি বিশুকে দেখলেই লুকিয়ে ফেলত কোথাও। আমরা এই রহস্য বিশুর কাছে ভাঙিনি। বিশু বেশ কয়েকদিন বিজয়ের বাড়িতে হানা দিয়েও সোয়েটার, মাফলার উদ্ধার করে আনতে পারে নি কারণ বিজয়কে গিয়ে বাড়িতে পায় না। বিশু বলে কথা, সে-ও ছাড়বার পাত্র নয়। একদিন দুপুরে যখন বিজয় বাড়ি নেই তখন তার বিছানার নীচ থেকে সোয়েটার ও মাফলার উদ্ধার করে আনল।

১৯৭২ সনে বিধানসভা নির্বাচন। পার্টি বিকল্প সরকার গঠনের ডাক দিয়েছে। আমাদের কর্মীদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ। সিদ্ধান্ত হল জ্যোতিবাবু নির্বাচনী প্রচারে আসবেন। যেদিন আসবেন সেদিন তেলিয়ামুড়ায় একটি জনসভায় ভাষণ দেবেন এবং পরের দিন আগরতলা সদর এবং দক্ষিণ ত্রিপুরার কেন্দ্রীয় জমায়েতে ভাষণ দিয়ে চলে যাবেন। পার্টি ঠিক করল আগরতলা বিমান বন্দরে জ্যোতিবাবুকে গার্ড অব অনার দিয়ে মিছিল করে আগরতলা নিয়ে আসা হবে। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তেলিয়ামুড়া রওয়ানা দেওয়া হবে। সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল স্বেচ্ছাসেবকদের সাদা জুতো, সাদা শার্ট-প্যান্ট এবং লাল স্কার্ফ পরতে হবে। লাল স্কার্ফ কোন সমস্যা নয়। বিজয় প্রায় সময়ই পাজামা-পাঞ্জাবী পরত। ওর সাদা জামা- প্যান্ট বা জুতো কোনটাই নেই। আর আমার সমস্যা ছিল সাদা জুতার। বিজয়ই বুদ্ধি বের করল। আমাদের সহপাঠী ও বন্ধু জয়নগর বাড়ি দিলীপ দত্ত চৌধুরী (দিলু) ক্রিকেট খেলত। বিজয় বলল দিলুর বাড়ি গেলে সাদা জামা-প্যান্ট, জুতো সব পাওয়া যাবে। দিলুর বাড়ি গেলাম। সে বাড়ি নেই। তাতে কি আসে যায়। ওর ঘরের আলমারির ভেতরে ইস্ত্রি করা সাদা জামা, প্যান্ট দেখলাম। আলমারিতে তালা দেওয়া ছিল না। বিজয় আলমারি খুলে সাদা-জামা, প্যান্ট নিয়ে নিল। ঘরের ভেতরেই আলমারির পাশে সাদা কেডস্ জুতো দেখতে পেলাম। সেগুলি আমি নিয়ে নিলাম। দিলু যখন জানতে পেরেছিল তার জামা প্যান্ট ও জুতো খোয়া যাওয়ার কথা ততক্ষণে আমার তেলিয়ামুড়া পৌঁছে গেছি। পরে দিলুর গালাগাল খেলেও ঘটনাটি হাসি ঠাট্টার মধ্যেই শেষ হয়েছিল। দিলু আজ আর নেই। কয়েক বছর আগে সে মারা গেছে। দিলু হচ্ছে বর্তমান জয়নগর এলাকার সি. পি. আই (এম) পুর পরিষদের কাউন্সিলার জুয়েল দত্ত চৌধুরীর ছোট ভাই এবং ১৯৬৬ সনে খাদ্য আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত উমাকান্ত স্কুলের ছাত্র শহীদ অরবিন্দ দত্ত চৌধুরীর (কার্লিং) ছোট ভাই।

সেবারই আগরতলা বিমান বন্দর থেকে জ্যোতিবাবুকে গার্ড অব অনার দিয়ে নিয়ে আসার সময় কথা ছিল মানিক সরকার ও সমীরণ রায় একটি মোটর সাইকেলে মিছিলের

পুরোভাগে থাকবে। তার পেছনে অন্যান্য মোটর সাইকেল ও স্কুটারের মিছিল। তারপর জ্যোতিবাবুর গাড়ি। তাতে আমরা বাছাইকরা স্বেচ্ছাসেবকরা থাকব এবং এর পেছনে থাকবে জ্যোতিবাবুকে সম্বর্ধনা জানাতে যাওয়া বিভিন্ন এলাকার গাড়ি। সব কিছু ঠিক ঠাক। কিন্তু কনভয়ের যাত্রা শুরু করা যাচ্ছে না। কারণ সমীরণের মোটর সাইকেল স্টার্ট নিচ্ছে না। সমীরণ বেচারা ঘেমে-নেয়ে ক্লান্ত। পেছন দিক থেকে মানিক অনেকক্ষণ মোটর সাইকেল ধাক্কা দিয়ে বহুদূর পর্যন্ত নিয়ে গেছে তবু মোটর সাইকেল স্টার্ট নিচ্ছে না। আমরা বাধ্য হয়ে ওদের ফেলে রেখেই জ্যোতিবাবুর কনভয় আগরতলার দিকে যাত্রা করাতে বাধ্য হয়েছিলাম। পরে জেনেছিলাম উত্তেজনায় সমীবণ মোটর সাইকেলের চাবি না লাগিয়েই সেটা স্টার্টের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। মোটর সাইকেলের চাবি ছিল তার পকেটে। সে সময় আমি বা মানিক কেউই মোটর সাইকেল বা স্কুটার চালাতে জানতাম না। পরে আমি যখন ১৯৭৩ সনে কোলকাতা পড়তে যাই তখন সেবছরই একটি স্কুটার কিনে আগরতলা কিছুদিনের জন্য ফিরে আসি। সেই স্কুটারটি দিয়ে আমি আর মানিক প্রগতি স্কুল মাঠে স্কুটার চালানো শিখি। একদিন স্কুটার চালাচ্ছিল মানিক। আমি মাঠের পাশে দাঁড়িয়ে কোচের মত তার স্কুটার চালানো দেখছিলাম। হঠাৎ আওয়াজ করে স্কুটারের টায়ার পাংচার হয়ে গেল। পরে দেখি ছোট একটি হাড়ের টুকরো টায়ারে ঢুকে এই বিপত্তি ঘটিয়েছে।

এর পূর্বে শঙ্করদা আমাকে স্কুটাব চালানো শেখাবে কথা দিয়েছিলো। শঙ্করদার কালু কাকার একটি স্কুটার ছিল। পূর্ব সিদ্ধান্তমত সকাল বেলা কের চৌমুহনি সেজেগুজে স্কুটার চালানো শিখব বলে দাঁড়িয়ে আছি। সৎসঙ্গ আশ্রমের দিক থেকে কালুকাকার স্কুটার চালিয়ে শঙ্করদা কের চৌমুহনি এলেন কিন্তু তিনি কের চৌমুহনি আমাদেব দাঁড়ানো দেখেও থামলেন না। সোজা রামনগর ১নং-এর দিকে চলে যাচ্ছেন দেখে হঠাৎ মনে হল শঙ্করদা নিশ্চয়ই চেষ্টা সত্ত্বেও স্কুটার নিয়ন্ত্রণে এনে থামাতে পারছেন না। বিশুকে সঙ্গে নিয়ে স্কুটারের পেছনে ধাওয়া করলাম। পেছন থেকে আমি আর বিশু টেনে স্কুটার থামালাম। পরে আমরা স্কুটার ঠেলতে ঠেলতে কের চৌমুহনি জহরের চায়ের দোকানে এসে চা খেয়ে ভাল একজন স্কুটারচালক খুঁজে বের করে শঙ্করদাকে বাড়ি পাঠিয়েছিলাম। তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলম শঙ্করদার মত এমন আনাড়ী কোচের কাছে ভবিষ্যতে স্কুটার চালানো শিখব না। এরপর বহুদিন এই ঘটনা আমাদের আড্ডায় হাসির খোরাক জুগিয়েছে। শঙ্করদাকে অবশ্য আর কোনদিন স্কুটার চালাতে দেখিনি। এমনকি অ্যাডভেঞ্চারিজমের জন্য ফুলনদিকে স্কুটারের পেছনে বসিয়েও। মানিকের এখনও স্কুটার চালানো মনে আছে কিনা আমার জানা নেই।

১৯৭২ সনের ১৯শে অক্টোবর বিজয় সিংহরায়ের বাবা জি.বি হাসপাতালে অসুস্থ হয়ে ভর্তি হন। তিনি তখন প্রগতি স্কুলে করণিকের কাজ করতেন। ২৯শে অক্টোবর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন জি.বি হাসপাতালে। হাসপাতালে প্রতিনিয়ত বিজয়ের বাবাকে দেখাশোনা করতে যেতেন অনিল সরকার, মানিক সরকার, অজয় বিশ্বাস, ও.এন.জি.সি কর্মচারী নেতা পরিমল আইচ, রামনগর ৩নং রাস্তার বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রদীপ ভট্টাচার্য, প্রয়াত বন্ধু অরবিন্দ ভট্টাচার্য, রুপু দেববর্মা প্রমুখ। বীরেনদার স্ত্রী সরযূ দত্ত নিজে থেকেই সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত জি.বি হাসপাতালে বিজয়ের বাবার সেবা-শুশ্রূষার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তখন পার্টি কমরেডদের মধ্যে ছিল এমনই সম্পর্ক। তখনকার

এস.এফ.আই কর্মী সবিতা চৌধুরী (সমীরের স্ত্রী), সবিতাদির ছোট বোন নন্দিতা চৌধুরী, নিয়তি চৌধুরী, পুষ্প দে, পূর্ণিমা রায় (বর্তমানে তুলসীবতী স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা) এরা শুধু আমাদের সহযোদ্ধাই ছিল না—ছিল বোনের মত। স্নেহের আঁচলে আমাদের সবাইকে বেঁধে রাখতে চাইত। বিজয়ের পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। কিন্তু ছাত্র, যুব কর্মীদের, পার্টি নেতাদের আন্তরিক সাহচর্যে সে কোনদিন অভাব টের পেয়েছে বলে আমার মনে হয়নি। ১৯৭২ সনের ১৩ই নভেম্বর বিজয় প্রগতি স্কুলে তার বাবার শূন্যপদে কাজে যোগ দেয়। পরে সেই স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হয়।

১৯৭২ সনের বিধানসভা নির্বাচন আমাদের সে সময়কার পার্টিকর্মীদের কাছে ছিল অগ্নি পরীক্ষার মত। পার্টি রাজ্যে বিকল্প সরকার গঠনের ডাক দিয়েছিল। পার্টির বিভিন্ন জনসমাবেশে, মিছিলে অসংখ্য নূতন মুখের ভিড়। নির্বাচনী কাজে বেরুলে ব্যাপক মানুষ হাসিমুখে আমাদের সাদরে বরণ করে নেওয়ার ঘটনাবলী আমাদের ক্রমশই উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল। আমরা ও তখন বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলাম রাজ্যে বিকল্প সরকার সি. পি. আই (এম) এর নেতৃত্বে গঠিত হবে। আমাদের প্রত্যেকটি কর্মীর কাজে ছিল তখন যুদ্ধ জয়ের প্রেরণা। দলের প্রার্থী তালিকায় ছিল নূতন, আনকোরা প্রার্থীর ছড়াছড়ি। যাদের সামনে রেখে কাজ করতে কর্মীদের উৎসাহ অসীম পর্যায়ে পৌছেছিল।

আমাদের কৃষ্ণনগর, লেইক চৌমুহনি এলাকায় বহু পুরোনো ক্লাবের একটির নাম ছিল হারাধন সংঘ। সে অঞ্চলে তখন পার্টি কর্মী দিলীপ দে ওরফে প্রভু, নির্মল মোদক প্রভৃতি। দিলীপের নাদুসনুদুস, গোলগাল চেহারার জন্য ওকে আমরা প্রভু সম্বোধন করতাম। সেই অঞ্চলে নির্মল মোদকের বাড়ির উল্টো দিকে কামানি ইঞ্জিনীয়ারিং বলে একটি ওয়ার্কশপ ছিল। ওয়ার্কশপের মালিক-কর্মচারী সবাই ছিল কেরলের লোক। আমি, শঙ্করদা, প্রভু ও নির্মল গেলাম কামানি ইঞ্জিনীয়ারিং-এ চাঁদা সংগ্রহের জন্য অর্থাৎ নির্বাচনী তহবিলে টাকা তোলার জন্য। যেতে যেতে নির্মল বলল মালিক ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদের দেশের লোক সুতরাং ভাল চাঁদা পাওয়া যাবে। বছর দুয়েক আগে আমি কেরল ঘুরে এসেছি এস. এফ. আই. সম্মেলন উপলক্ষে। দেখেছি ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ, এ. কে. গোপালন এদের জনপ্রিয়তা। আমিও নির্মলের কথায় সমর্থনসূচক মাথা নাড়ালাম। কিন্তু ওয়ার্কশপে গিয়ে বাধল চরম বিপত্তি। শঙ্করদা ও আমার সম্মিলিত প্রয়াসে ও ওয়ার্কশপের ম্যানেজার ও কর্মচারীদের আমাদের বক্তব্যের বিন্দুবিসর্গ বোঝাতে সমর্থ হলাম না। আমরা যখন ঘেমে-নেয়ে উঠলাম তখন হঠাৎ নির্মল মোদক সামনে এগিয়ে এল। আমি তাকে আমার সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর সুযোগ দিলাম। ভাবলাম নির্মল পশ্চিমবাংলার দুর্গাপুর থেকে আই. টি. আই প্রশিক্ষণ দিয়ে এসেছে হয়ত আমাদের চেয়ে চোস্ত হিন্দি বা অন্য কোন ভাষা কেরলীয়ানদের বোধগম্য করাতে পারবে। আমার আশায় ছাই দিয়ে এগিয়ে চলল নির্মলের হিন্দি সংলাপ। নিম্নে সেই সংলাপ হুবহু তুলে ধবার কষ্টকল্পিত প্রয়াস নিচ্ছি।

'হাম মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকা তরফসে আয়া। ইধার আভি নির্বাচন হ্যায়। হামকো থোড়া চাঁদা দে দো।'

কেরলীয়ান ম্যানেজার ও কর্মচারীরা অসহায়ের মত চেয়ে রইল নির্মলের মুখের দিকে। নির্মল আবার চেষ্টা করল।

'আপ লোক ই. এম. এস নাম্বুদ্রিপাদকা দেশকা আদমি হ্যায় তো। হাম উসিকা পার্টি করতা হ্যায় ইধার ত্রিপুরামে। নাম্বুদ্রিপাদকো নির্বাচনকে লিয়ে ইধার আনেগা। আভি হামকো চান্দা দো।'

এরপর আমার পক্ষে আর কামানি ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের ভিতর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব ছিল না। আমি অভদ্রের মত হাসি চেপে রাখার জন্য দৌড়ে বাইরে চলে আসি। ওয়ার্কশপের ম্যানেজার চাঁদা শেষ পর্যন্ত দিয়েছিল কিনা আমার স্মরণ নেই। তবে সেদিনের মত চাঁদা তোলা আমাদের পটল তুলতে হয়েছিল কেননা শঙ্করদা আমি ও দিলীপ তিন জনেরই হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গিয়েছিল। পরে শুরু হয় পেট ব্যথা। নির্মল কিন্তু নির্বিকার। তার বক্তব্য সে কোন ভুল কথা বা ভুল হিন্দি বলেনি। এরা ঠিক তার কথা বুঝতে পেরেছে এবং সে নাকি লক্ষ্য করেছে নাম্বুদ্রিপাদের কথা যখন সে বলছিল তখন কেরেলীয়ানদের চোখে তারা চিকচিক করে উঠেছিল। এরপর থেকে চাঁদা সংগ্রহে বেরুলে আমরা নির্মলকে চোখে চোখে পাহারায় রাখতাম। অতি উৎসাহে কোথাও যাতে আর হিন্দি না বলতে যায়।

৭২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবাংলা থেকে প্রমোদ দাশগুপ্ত আসেন আমাদের রাজ্যে নির্বাচনী সভা করতে। বেশ কয়েকটি জনসভা তিনি সেবার বিভিন্ন জায়গায় করেছিলেন। এর মধ্যে অন্যতম একটি ছিল ধর্মনগর শহরে। সকালে প্রমোদ দাশগুপ্তকে নিয়ে শঙ্করদা, আমি ও সুভাষ চক্রবর্তী রওয়ানা দিলাম ধর্মনগরের উদ্দেশ্যে। তখন আসাম- আগবতলা সড়ক এত ঝকঝকে মসৃণ ছিল না। আগরতলা থেকে ধর্মনগর পৌঁছুতে প্রায় ৮ ঘন্টা লেগে যেত মূলতঃ রাস্তা খারাপ থাকার সুবাদে। সে কারণে আমরা সকাল সকাল যাত্রা শুরু করেছিলাম। তবে একটি ব্যাপারে বাঁচোয়া ছিল কেননা তখন সড়কপথে কোন এসকর্টের ঝামেলা ছিল না। যার যখন খুশি আসাম আগরতলা সড়ক পথে চলাচল করতে পারত। তখন সবে আমি এম. বি. বি. কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি পেয়ে সাবালক হয়েছি। শঙ্কবদা ও বছর তিনেক আগে এম. বি. বি. কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেছেন। এর আগে তিনি কোলকাতায় আশুতোষ কলেজে পড়তেন। সেখান থেকেই তিনি ধুমপান শিখে ত্রিপুরায় ফিরেছেন। আমি আর সুভাষ ইতিমধ্যে ধুমপানে হাতেখড়ি নিয়ে নিয়েছি। সুভাষ অর্থাৎ হো-চি-মিন আমার আগেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে থাকাকালীন সময়েই ধুমপান শিখে এই রাজ্যে পদার্পণ করেছিল। সে যাহোক, রাস্তায় যেতে যেতে পালা করে আমরা তিনজন মূত্রত্যাগের নাম করে নামতে শুরু করলাম। এতে স্বাভাবিককারণেই দেরী হচ্ছিল অযথা। তৃতীয়বার যখন আমি আর শঙ্করদা বড়মুড়া পাহাড়ে প্রস্রাবের কথা বলে নেমে গেলাম প্রমোদবাবু কিছু বললেন না। শুধু ভুরু কুঁচকে একটু তাকালেন। আমি আর শঙ্করদা যখন ফিরে এসে গাড়িতে বসলাম তখন প্রমোদবাবু আমাদের বললেন চল তো, তোমরা কোথায় পেচ্ছাব করেছ একটু দেখে আসি। এখনও গেলে পেচ্ছাবের ফেনা দেখতে পাব। আমার আর শঙ্করদার অবস্থা অনুমেয়। মনে মনে ভাবছিলাম ধরণী কেন দ্বিধা বিভক্ত হচ্ছে না। ভাবছিলাম ঠিকঠাক যদি প্রমোদবাবু গাড়ি থেকে নেমে পড়েন তবে প্রস্রাবের ফেনা দেখাব কোথায়। আমরা তো সিগারেট খেয়ে গাড়িতে উঠেছি। প্রস্রাব তো কেউই করিনি। প্রমোদবাবুর আমাদের অসহায় মুখের দিকে

চেয়ে সম্ভবত মায়া হয়েছিল। বললেন উঠে বস গাড়িতে। আমার তো ঠিক সময় ধর্মনগর পৌঁছে জনসভা করতে হবে নাকি? তাছাড়া তোমাদের ও তো পথে কোথাও খেয়ে নিতে হবে। আমরা জানালাম মনু পার্টি অফিস সে ব্যবস্থা করে রেখেছে। প্রমোদবাবুর ও সেখানেই খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গাড়ি আবার যাত্রা শুরু করলে প্রমোদবাবু খোশমেজাজে একটা চুরুট ধরিয়ে বললেন, তোমাদের যদি সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছে হয় তবে গাড়িতে বসেই খেও। আমার কোন অসুবিধা হবে না। আমি আর ভয়ে বলতে পারলাম না - সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছে হবে না কেন। আপনি যে হারে সুগন্ধী চুরুট টানছেন এতেই তো প্রলুব্ধ হচ্ছি বারবার।

এরপর প্রমোদবাবু বললেন, জানো তো - স্কুলে পেচ্ছাবের কথা বলে ক্লাসের বাইরে এসে বিড়ি ফুঁকতাম। একদিন মাস্টারমশাই পেছন পেছন এসে আমাকে কানে ধরে বলে তুই যে পেচ্ছাব করেছিস তোর মুতের ফেনা দেখা। কি বিপদে যে সেদিন আমি পড়েছিলাম। আজ হয়ত তোমরা বুঝতে পেরেছ। প্রমোদবাবুর এই খোলামেলা আলোচনা মুহূর্তে আমাদের বয়সের বাধার দূরত্ব ঘুচিয়ে দিল। গুমোট যে অস্বস্তিকর অবস্থায় আমরা পড়েছিলাম মুছে গেল। আমরা প্রাণ খোলা হাসিতে সবাই বন্ধু হয়ে গেলাম। তারপর সারা রাস্তা বিভিন্ন গল্প করতে করতে কি করে যে পার হয়ে গেলাম বলতে পারব না। এঁরা যে কত বড় মাপের মানুষ ছিলেন লিখে বোঝাতে পারব না।

১৯৭২ সনে একদিন বিকেলে বটতলা পার্টী অফিসে নির্বাচনী কর্মী সভা চলাকালীন সময়ে যখন নৃপেনদা বক্তব্য রাখছিলেন তখন পার্টী অফিসে কোলকাতার নামজাদা বামপন্থী এডভোকেট স্নেহাংশু আচার্য্য এসে হাজির। নৃপেনদা স্নেহাংশুবাবুকে কর্মী সভায় নিয়ে এলেন। স্নেহাংশু আচার্য্য সেই সভায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখতে গিয়ে জানালেন, ১৯৪৮ সনে যখন পার্টী বেআইনী ঘোষিত হয় তখন নৃপেন চক্রবর্তীকে আত্মগোপনে রাখার দায়িত্ব পান স্নেহাংশু বাবু। স্নেহাংশু আচার্য্য নৃপেনদাকে নিজের বাড়িতে উড়িয়া রান্নার পাচক হিসাবে নিয়োগ করেন। নৃপেনদার প্রকৃত পরিচয় তাঁর বাড়ির লোককে ও জানান নি। নৃপেন দা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে উড়িয়া বামুনের মত স্নেহাংশু বাবুর বাড়িতে রান্না বান্নার কাজ করে গেছেন নিঁখুতভাবে। রান্না ঘরেই ঘুমোতেন। বাড়ির কেউ কোন দিন কিছু আঁচ করে উঠতে পারেনি। পরে যখন পার্টীর উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়, নৃপেনদা স্নেহাংশু বাবুর বাড়ি ছেড়ে চলে আসার সময় তাঁর প্রকৃত পরিচয় স্নেহাংশু বাবুর বাড়ির লোকেরা জানতে পেরে খুব লজ্জা পেয়েছিলেন। স্নেহাংশু বাবু সেবার ত্রিপুরা রাজ্য পার্টীকে নির্বাচনী কাজ চালানোর জন্য এক ডজন মাইক্রোফোন দান করেছিলেন।

১৯৭৩ সনে আমাকে, শঙ্করদাকে এবং বিমল সিনহাকে নৃপেনদা আলিমুদ্দিন স্ট্রীটে সি. পি. আই (এম) পার্টির সদর দপ্তরে নিয়ে গেলেন। প্রমোদবাবুর সঙ্গে পরিচয় করাতে গেলে তিনি অনায়াসে আমাকে এবং শঙ্করদাকে চিনে ফেলেন। নৃপেনদা আমরা কোলকাতা কিভাবে পার্টির কাজ করব তারজন্য প্রমোদবাবুর কাছে পরামর্শ চান। প্রমোদবাবু উত্তরে জানান, এদের আপাততঃ পার্টি করার কোন প্রয়োজন নেই। এরা পড়াশুনা সেরে পৈতৃক প্রাণ নিয়ে আগে বাড়ি ফিরে যাক। তারপর সারাজীবন রাজনীতি করতে পারবে। আমরা সেদিন অনুভব করতে পেরেছিলাম কি অসীম মমতায় প্রমোদবাবু একথাগুলো বলেছিলেন।

কারণ পশ্চিমবাংলায় তখন চলছিল সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস শাসন। যে শাসন জঙ্গলের রাজত্বকে ও লজ্জা দিত। প্রকাশ্যে, চোরাগোপ্তা বামপন্থী নেতা কর্মী খুন তখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিনিময়ের পর সুভাষ চক্রবর্তী এরা সোনামুড়া মহকুমায় জমি হস্তান্তর করে চলে আসে। সুভাষের বাবা ছিলেন পণ্ডিত মশাই এবং অনেক শিষ্যের কুলগুরু। শিষ্যদের বাড়ি গেলে চাল-ডাল-আনাজ-নারকেল ইত্যাদি সিধা পেতেন। তাছাড়া প্রণামী হিসাবে টাকা তো পেতেনই। প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক এবং বর্তমান প্রদেশ কংগ্রেস সহ-সভাপতি তাপস দে সুভাষের বাবার ছাত্র ছিলেন বলে জানি। আমাদের ভাঁড়ারে যখন টান পড়ত অর্থাৎ পকেটের রেস্ত ফুরিয়ে যেত তখন সুভাষকে ঠেলে ঠুলে আমরা সোনামুড়া পাঠিয়ে দিতাম। সে ফিরে আসার সময় টাকা ছাড়া ও চাল-ডাল, নারকেল ইত্যাদি নিয়ে ফিরে আসত। কিছু সামগ্রী বাজাবে সুভাষকে দিয়ে বিক্রি করিয়ে আমাদের পকেটের কয়েকদিনের রসদ আমরা জোগাড় কবে নিতাম। প্রতিবারই সুভাষকে আমি আশ্বাস দিতাম তার যখন ভাঁড়ারে টান পড়বে তখন আমি তার পাশে আছি। সুভাষ আর আমি ধলেশ্বর কল্যানী এলাকায় একই পাড়ায় থাকতাম। একটি বিরাট বড় পুকুরের পশ্চিম পাড়ে আমাদের বাড়ি আর দক্ষিণ পাড়ে সুভাষের মামা উপেন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়ি। সুভাষকে তো আমরা কামধেনু গাভী বানিয়ে ফেলে ছিলাম। তার অভাব এলে তাকে দেখার সুযোগ কোথায় আমাদের। আবার তাকে পাঠিয়ে দিতাম সোনামুড়া। তাছাড়া সুভাষের বড় ভাই শঙ্কর চক্রবর্তী তখন কোলকাতা রাইটার্সে কাজ করতেন থাকতেন কোলকাতার একটি মেসে । তিনিও সুভাষকে প্রতি মাসে হাত খরচ পাঠাতেন। সুতরাং সুভাষের অভাব কোন সময়ই খুব একটা হত না। নানা বদভ্যাসের জন্য অভাব ছিল আমাদের । ঘাটতি মেটাতে হত সুভাষকে আমাদের সর্বগ্রাসী অভাবের। অথচ শঙ্করদার বাড়ির অবস্থা ছিল স্বচ্ছল। তিনি ও ভাল টাকা হাত খরচের জন্য পেতেন। আর আমার কলেজে পড়ার সময় হাতে প্রতিমাসে ৬০০/৭০০ টাকা চলে আসত। আজকের বাজারে যার অর্থমূল্য কত দাঁড়াতে পারে অনুমান অসম্ভব। গান্ধীঘাট পি.আর.সি ক্যাম্পের ভাড়া বাবত তুলতাম মাসিক তিনশ টাকা, বাবা কমলপুর থেকে আমার জন্য পাঠাতেন দুইশত টাকা প্রতিমাসে। আর আমি তখন কৃষ্ণনগর মামার বাড়িতে থাকি। আমার তিন মামা আমাকে প্রত্যেকে পঁচিশ টাকা করে ন্যূনতম হাত খরচ দিতেন। পি. আর. সি. ক্যাম্পের বাড়িটি ছিল আমার মেশো মশায়ের। তিনি ব্যাঙ্কের একটি পাশবুক আমাকে ভাড়া জমা করার জন্য দিয়ে গিয়েছিলেন। আমি কস্মিনকালে ও সেই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এক পয়সা জমা দিতে পারিনি। পরে আমার সেই ঋণ বাবাকেই শোধ করতে হয়েছে। আমি যেবার অর্থাৎ ১৯৬৮ সনে বিজ্ঞান বিভাগের প্রথম বর্ষের অনার্স পরীক্ষা না দিয়ে পরের বছর বি এ পাশ কোর্সে ভর্তি হই তখনই বাবা মনস্থির করে নেন আগরতলা আর থাকবেন না। আমার সঙ্গে থাকলে আমার ছোট ভাইয়েরা ও গোল্লায় যাবে। সুতরাং তখন থেকেই তদ্বির আরম্ভ করেন তিনি আগরতলা থেকে মফস্বল বদলি হয়ে চলে যেতে। বাবা খাদ্য দপ্তরে ফুড ইন্সপেক্টরের চাকরি করতেন। অবশেষে কমলপুর বদলী নিয়ে সেখান চলে যান। পরে আগরতলা কল্যাণী এলাকার বাড়ি ভাড়া দিয়ে মা ও ছোট ভাইদের কমলপুর নিয়ে যান। আমি এসে

উঠি কৃষ্ণনগর প্রগতি রোড মামারবাড়ি। আমাদের নিজস্ব বাড়ি হয় কৃষ্ণনগর প্রগতি রোডে ১৯৭৪-৭৫ সনে। তখন আমি কোলকাতা পড়াশুনা করতে চলে গেছি। হাতের টাকা শেষ হলে আমি কমলপুর চলে যেতাম। নানা প্রয়োজনের কথা বলে মার কাছে থেকে টাকা নিয়ে আসতাম। এত টাকা দিয়ে কি করতাম আমরা? আসলে সে সময় আগরতলা শহরের আমরা যারা পার্টি কর্মী ছিলাম এদের মধ্যে অধিকাংশেরই বাড়িঘরের আর্থিক অবস্থা ছিল খুব দুর্বল। আর আমরা সবাই ছিলাম একই পরিবারের সদস্যের মত। কোন সুখ, কোন আনন্দ কাউকে ফেলে রেখে উপভোগ করার মত মানসিকতা কারোর মধ্যে ছিলনা। যেকারণে আমাদের মধ্যে যাদের পক্ষে সম্ভব আমরা মা-বাবাকে প্রতারিত করেছি বিভিন্ন মিথ্যা কথা বলে বিরাট একটি পরিবার পরিচালনার সামগ্রিক স্বার্থে। অন্যায় হয়ত করেছি পিতা-মাতার সঙ্গে, কিন্তু এসব ঘটনার জন্য তাঁদের কোনদিন দুঃখ পেতে দেখিনি। বরঞ্চ এখন আমাদের কারোর স্বার্থপরতা, হীনমন্যতা, নীচতা দেখলে তাঁরা দুঃখ পান অনেক বেশি। আজকের পরিবর্তিত স্বার্থদীর্ণ সামাজিক পরিবেশে আমাদের পূর্ব পুরুষেরা বড় বেমানান, অপাংক্তেয়। হয়তোবা আমরাও তাই হয়ে উঠছি ক্রমশ। আজ কোথায় সেই সহমর্মিতা, যূথবদ্ধ জীবন যাপনের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা? সহযোদ্ধা ও দিনের শেষে কাজ ফুরিয়ে গেলে কাজের বেলায় কাজী থেকে কাজ ফুরালে পাঁজি হিসাবে বিবেচিত হয়। সময়ের ব্যবধানে মানসিক এই অবক্ষয় ও নিশ্চিতভাবে আদর্শ থেকে বিচ্যুতিব অন্যতম একটি কারণ।

১৯৭২ সনে নির্বাচনে যখন আমরা দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করছি তখন কংগ্রেস দল ও কিন্তু বিনা লড়াই-এ এক ফোঁটা জমি ছেড়ে দেয়নি। কংগ্রেস দল শ্লোগান লিখেছে- 'গড়তে দেশ, রুখতে চিন, কংগ্রেসকে ভোট দিন।' আমরা চটজলদি উত্তর বের করে পাল্টা শ্লোগান লিখেছি— 'বেশ গড়েছ দেশরেও ভাই, বেশ রুখেছ চিন, মাথার ওপর পাহাড় প্রমাণ আমেরিকার ঋণ।' সেই নির্বাচনে সিপিআইকে উদ্দেশ্য করে দেয়াল লেখা হয়েছিল— 'দিল্লি থেকে এল গাই, সঙ্গে বাছুর সিপিআই।' তাছাড়া ও জনপ্রিয় আরেকটি শ্লোগান আমরা সেই নির্বাচনে দেয়াল লিখনে বিভিন্ন জায়গায় লিখেছিলাম— 'স্বার্থদুষ্ট অন্তর্দ্বন্দ্ব কলহে লিপ্ত কংগ্রেসকে একটি ও ভোট নয়'।

সে বছর কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস দলের প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন বিচিত্র মোহন সাহা। একদিন বর্তমান মন্ত্রী অনিল সরকার ও বিজয় সিংহ রায় গিয়েছিল কমলাসাগর নির্বাচনী প্রচারে। পার্টি কর্মীরা অনিলদাকে জিজ্ঞেস করল কিভাবে নির্বাচনের প্রচার চালাব। অনিলদা পুরানো পত্রিকার কাগজে আলতা দিয়ে নির্বাচনী শ্লোগান লেখার পরামর্শ দিলেন। লিখে দিয়ে এলেন শ্লোগান— 'কাস্তে হাতুড়ী তারকা চিহ্নে ভোট দিন।' 'সিপিএম প্রার্থী নগেন দেবকে ভোট দিন।' 'কংগ্রেসকে একটিও ভোট নয়। ইত্যাদি ইত্যাদি। অনিল দা কমরেডদের নির্দেশ দিলেন যেখানে মাটির দেওয়াল পাবে সেখানে যাতে কয়লা দিয়ে লেখে—'বিচিত্র তোমার চিত্রখানি আয়না দিয়া দেখ'।

আগরতলা কৃষ্ণনগর বিধানসভা আসনে সিপিআই(এম) সেবার প্রার্থী দিয়েছিল তরুণ এডভোকেট শ্রী অশোক চক্রবর্তীকে। তার বিপরীতে কংগ্রেস দলের প্রার্থী ছিল তৎকালীন অর্থমন্ত্রী কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য, চার্টার্ড একাউন্টট্যান্ট। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল



জ্যোতি বসু ও নৃপেন চক্রবর্তী

এই আসনে। অনিলদা আমাদের একটি ছড়া লিখে দিলেন কৃষ্ণনগর বিধানসভা এলাকায় দেওয়াল লিখনের জন্য। অন্যান্য কিছু জায়গার সঙ্গে কৃষ্ণনগর হারাধন সংঘ সংলগ্ন এলাকায় এখন যেখানে ট্রাফিক পয়েন্ট আছে বাজবড়ির উত্তর গেট যাওয়ার সংযোগ স্থলে টার্নিং পয়েন্টে রাস্তার দক্ষিণ পূর্ব কোণে প্রয়াত মৃগাঙ্ক বায়ের বাড়ির বাউন্ডারি ওয়ালে আমরা লিখলাম—' আরেক গোঁসাই কেষ্ট ঠাকুর নবদ্বিপী রঙ্গ, পরের খামার চুরি করে করেন হরিসঙ্গ। আখড়াটি তার কুঞ্জবন, শ্বেতপাথরের বৃন্দাবন, মুখে তার ইন্দিরন, ধন্য এবার নির্বাচন।' আমাদের জানা ছিল না কৃষ্ণনগর এলাকায় বংশানুক্রমিকভাবে কৃষ্ণদাস বাবু অনেক ভক্তের কুল গুরু। এই এলাকার আমাদের পার্টি কর্মী দিলীপ দের বাবা-কাকা এদের সমস্ত জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সকলের কুলগুরু ছিলেন তিনি। সকাল হতে না হতেই এলাকায় বারুদের বিস্ফোরণের মত পরিস্থিতি। দিলীপ ও নির্মল মোদককে টার্গেট করে সবাই তাদের উপর ক্ষুব্ধ, অভিমানাহত। আত্মীয়স্বজন কেউ তাদের সঙ্গে কথা বলে না— প্রায় সমাজচ্যুত হওয়ার ব্যাপার। খবর পেয়ে আমি আর শঙ্করদা গিয়ে বয়স্ক, প্রবীণ লোকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে এই ছড়াটি মুছে দেওয়া হবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে যাত্রা পরিস্থিতি সামাল দিই। নির্বাচনে সেবারও কৃষ্ণদাস বাবুই জয়ী হয়েছিলেন। তবে তার জয়ের মার্জিন কমেছিল। সেবারের নির্বাচনে মোট ৬০টি বিধানসভা আসনের মধ্যে সিপিআই(এম) দল পেয়েছিল ১৮টি আসন। বিকল্প সরকার গঠন করতে না পারলেও শক্তিশালী একটি বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ন হয়ে ভবিষ্যতে ক্ষমতা দখলের পথ সুগম করে নিয়েছিল।

সে বারের নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধী রাজ্যে এসেছিলেন নির্বাচনী প্রচারে। তাঁর রাজ্যে আসার আগে আমরা সন্ধ্যায় দেওয়াল লিখতে লিখতে রাত্রি ১১/১২টা নাগাদ

পৌঁছে যাই উষাবাজার পলিটেকনিক কলেজ অঞ্চলে। তখন পলিটেকনিক কলেজে পড়ত কের চৌমুহনি এলাকার পার্টি কর্মী চন্দন চক্রবর্তী। সে রাত্রিতে আমি, শঙ্করদা, রবি চক্রবর্তী, সমীর, মধু, বিজয় সকলে চন্দনের আতিথেয়তা গ্রহণ করে পলিটেকনিক কলেজ হোস্টেলে রাত কাটাই। অন্য অনেক বোর্ডারের খাওয়ার একত্র করে এবং উষাবাজারে বাংলা মদের দোকানের পাশে বসে বিক্রি করা একটি দোকান থেকে মাংস কিনে এনে চন্দন আমাদের খাইয়েছিল। মাংসের টুকরো দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে খেতে আমাদের সেদিন খুব কষ্ট হয়েছিল। বুঝতে পারছিলামনা কিসের মাংস। রাতে এত ক্ষুধার্ত ছিলাম যে বেশি চিন্তা করার সুযোগ ছিল না। বেশ কয়েকদিন পর চন্দনের কাছেই জানতে পেরেছিলাম যে সেই মাংসের দোকানী কুকুরের মাংস বিক্রি করতে গিয়ে এলাকার লোকের হাতে ধরা পড়ে উত্তম-মাধ্যম খেয়েছে। তখন আমি বুঝতে পারি, ব্যাটা সেদিন রাতেও আমাদের কুকুরের মাংসই খাইয়েছিল। আমরা সেই মাংসই ক্ষুধার তাড়নায় গোগ্রাসে খেয়েছিলাম।

রবীন্দ্রভারতী পর্ব

আমি ১৯৭২ সনে গৌহাটি ঝালুকবাড়ি ল' কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। গৌহাটি রেল স্টেশন সংলগ্ন রেল কোয়ার্টারে আমার দাদু থাকতেন (বাবার মেসোমশাই)। তিনি রেলওয়ের গার্ড ছিলেন। আমি সেই কোয়ার্টারে গিয়ে উঠলাম। রাত্রিরবেলা প্রতিদিন ভাত খেয়ে গৌহাটি রেল স্টেশনের সামনে সিগারেট খেতে যেতাম। একদিন এক অসমীয়া মাতাল আমাকে বাঙলায় কথা বলতে দেখে 'বাঙালি লরা' ইত্যাদি সম্বোধন করে বিনা প্ররোচনায় খুব গালাগালি করল। আমি কি ছাই জানতাম সেই অসমীয়া ছেলেটি এই এলাকার বিখ্যাত মাস্তান। একটা সময় যখন মাতলামি ও গালাগালির মাত্রা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন আমি ছেলেটিকে দু'চার ঘা বসিয়ে দিয়ে কোয়ার্টারে ফিরে এলাম। রাতে কাকা বাড়িতে এসে যখন আমার দাদুকে এই এলাকার বিখ্যাত মাস্তানকে অপরিচিতি এক বাঙালি ছেলের হাতে মার খাওয়ার কাহিনী বলছিল তখন আমি নিজে থেকেই ঘটনাটা খুলে বললাম। কাকা রেলের ডিউটি সেরে গৌহাটি স্টেশনে নেমে ঘটনাটি শুনে ছিল। আমি ঘটনার সঙ্গে জড়িত আঁচও করতে পারেনি। আমার কাছে ঘটনা শোনার পব আমার দাদু, কাকা এরা সবাই আমার নিরাপত্তা নিয়ে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁদের সংগত কারণেই ধারণা হল মাস্তানদের গ্রুপটি আজ না হোক কাল শনাক্ত করে ফেললে ওরা আমাকে খুন করতে পারে। সুতরাং গৌহাটিতে মাসখানেক ল'ক্লাস করে আমাকে পাততাড়ি গুটিয়ে চলে আসতে হল আগরতলা। সেই ঘটনার পরদিন সন্ধ্যায় আমাকে গৌহাটি থেকে ট্রেনে তুলে দেওয়া হল। আমিও মনে মনে খুশি। গৌহাটি আমার মোটেও ভাল লাগছিল না। আগরতলা ফিরে এসে পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হওয়ার বাসনার কথা ভানুদাকে জানালাম। আমরা আমাদের মনের কথা অকপটে ভানুদাকে জানাতে পারতাম। দু'তিন-দিন পর নৃপেনদা আমাকে বটতলা পার্টি অফিসে সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের বসার আলাদা রুমে ডেকে নিয়ে গেলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন পার্টি হোল টাইমার হওয়ার বাসনার কথা আমার অভিভাবকরা জানে কিনা। আমি জানালাম, না আমি আমার মনোভাবের কথা মা-বাবা কাউকে জানাইনি। নৃপেনদা জিজ্ঞেস করলেন, তারা আমার ভবিষ্যত সম্পর্কে কি চিন্তা করছেন। আমি বললাম, মা-বাবার ইচ্ছে আমি কোলকাতা নয়ত শিলচর গিয়ে যাতে এম.এ এবং ল' কোর্সে ভর্তি হই। নৃপেনদা আমাকে বললেন, এই মুহূর্তে পার্টির আর্থিক অবস্থা যে অবস্থায় আছে সবাইকে পার্টির হোল টাইমার করা সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে পার্টি মানিক সরকারকে তার ইচ্ছা অনুযায়ী পার্টি হোলটাইমার করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে।

আমার মা-বাবার যখন আমাকে পড়ানোর আর্থিক সামর্থ্য ও ইচ্ছা দুইই আছে, আমার তাঁদের নিরাশ করাটা ঠিক হবে না। পার্টি করার সুযোগ কোলকাতা বা শিলচরে পড়া চলাকালীন পেয়ে যাব বলে তিনি জানালেন। মামাকেশব এবং অন্যান্য বেশ কিছু বন্ধু বান্ধব যথারীতি আগেই কোলকাতা গিয়ে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ এবং সুরেন্দ্র নাথ ল' কলেজে ভর্তি হয়ে গেছে। ওদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। ওদের কাছ থেকেই তখনকার কোলকাতার ভয়াবহ পরিস্থিতির খবর জেনেছিলাম। প্রতিটি কলেজে ছাত্র পরিষদের দৌরাত্ম্যের কাহিনিও জানতাম। তবু বললাম যা ইচ্ছে তাই হোক সামনের বছর আমার ভর্তির ব্যবস্থা কর আমি কোলকাতা চলে আসব। বান্ধবহীন শিলচবে আমি পড়তে পারব না। সেখানে আমার মন বসবে না। ফাঁকে একবার শিলচর অমিয়চন্দ ল' কলেজ পরিদর্শন করে ভর্তির খোঁজখবর নিয়ে এসেছিলাম। আমার শিলচর ভাল লাগেনি। ১৯৭৩ সনে ভর্তির সবুজ সংকেত পেয়ে কোলকাতা চলে গেলাম। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম.এ ভর্তি হলাম এবং সুরেন্দ্রনাথ ল' কলেজে প্রথমবর্ষে ভর্তি হলাম। থাকতাম জোঁড়াসাকো রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন হোস্টেলে। সেখানে আমার আশ্রম চৌমুহনির বন্ধু সুবল পালকে পেলাম। কৈলাসহরের প্রদীপ দেব, রেবতী সিনহা, দোলন সিনহা, প্রনব সিনহা, উদয়পুরের যোগেন দাস, পার্থ চক্রবর্তী, আগরতলা কবিরাজ টিলার কাজল দেব, হাবড়ার অসীম ব্যানার্জি ওরফে বোম এবং আরো অনেক বন্ধু জুটে গেল। আমি রবীন্দ্র ভারতীতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এম.এ. ক্লাসে বোধ হয় একদিনই গিয়েছিলাম। ক্লাসে ছাত্রীর সংখ্যা ৯৫ শতাংশ, ছাত্রের সংখ্যা মেরে কেটে ৫ শতাংশ হবে। অমি খুব সহজভাবে, স্বচ্ছন্দে মেয়েদের সঙ্গে মিশতে পারতাম না। আড়ষ্টতা আমাকে গ্রাস করে নিত। খুব নার্ভাস হয়ে পড়তাম। সুতরাং ক্লাসে যাওয়া বন্ধ করে হোস্টেলেই ঘুমিয়ে থাকতাম। সঙ্গে জুটে গেল বন্ধু সমীরণ রায়ের জ্যাঠতুতো কাম মাসতুতো ভাই বিভাস পোদ্দার এবং বর্ধমানের রাজ কুমার কোনার। এধরনের বিটকেল আমি জীবনে খুব কম পেয়েছি। এ বলে আমায় দ্যাখ ও বলে আমায়। দু'একদিন জোর করে সুবল পাল এরা আমাকে রবীন্দ্র ভারতী ক্যান্টিনে নিয়ে গেল। দেখি সমস্ত ক্যান্টিন জুড়ে মেয়েদের সাম্রাজ্য। গুটিকয় ছেলে যারা আমরা ক্যান্টিনে বসে ছিলাম পারলে মেয়েরা সবাইকে পিঠে চাপড় মেরে সম্ভাষণ জানায়। দেখলাম সবাই এতে অভ্যস্ত। কেউ কিছু মনে করে না। এরপর ভয়ে ক্যান্টিন যাওয়া ছেড়ে দিলাম। রবীন্দ্র ভারতীতে তখন জোড়াবাগান আর গোয়াবাগানের অসিত এবং পিন্টুর সাম্রাজ্য চলছে। এরা ছাত্র পরিষদের নেতা। ষণ্ডা মার্কা চেহারা, বয়সের কোন গাছ পাথর নেই এরা নাকি ছাত্র। ভাগ্যিস এরই মধ্যে পরিচয় হয়ে যায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত শিক্ষক বিখ্যাত লোকসংগীত শিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরীর সঙ্গে। আমি আর কেশব পূর্ব বাংলার লোক শুনে আমাদের পছন্দ করত। ওঁর বাড়িতে বহুদিন গানের রিহার্সালে আমাদের নিয়ে গেছেন। একবার আমার মনে আছে খড়গপুরে ওঁর এক জলসায় তার প্রাইভেট কার দিয়ে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। খোলা মঞ্চে গান গেয়ে গেয়ে হাজার-হাজার দর্শককে মাতিয়ে দিয়ে এসেছিলেন। ভোররাত্রে খড়গপুর থেকে রওয়ানা দিয়ে দুপুর ১০টা নাগাদ হোস্টেলে এসে পৌঁছি।

একবার নির্মলেন্দু চৌধুরীর গানের পুরো গ্রুপ কানাডা সফরে যাবে ঠিক হয়। তিনি

আমাকে আর কেশবকে পাসপোর্ট-ভিসা করিয়ে নিতে বলেন যাতে গানের গ্রুপের সঙ্গে বিনে পয়সায় কানাডা ঘুরে আসতে পারি। আমার পেটে কিল দিলে একটি লাইন গান গলা দিয়ে বেরোয় না জানি। তাই আমি সভয়ে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি। বিশ্ববিদ্যালয় লনে ক্যান্টিনে হোস্টেলে সর্বত্র অসিত-পিন্টুকে সবাই তোয়াজ করে চলে। আমি চিন্তা করে দেখলাম তোয়াজ করার এই ব্যাপারটা আমার একদম পোষায় না। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাসে বা ক্যান্টিন কোথাও না যাওয়াই ভাল। হোস্টেলে থাকিইবা কতক্ষণ যে অসিত-পিন্টুকে তোয়াজ করতে হবে! এর মধ্যে শঙ্করদা এবং বিমল সিনহার সন্ধান পেয়ে গেছি। শঙ্করদার টালিগঞ্জে পিসীর বাড়িতে থেকে এম.এ এবং ল' কোর্সে ভর্তি হয়েছেন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিমল সিনহা সুরেন্দ্রনাথ ল' কলেজে ভর্তি হয়ে থাকে শিয়ালদা



বাঁদিক থেকে
লব (হাবড়া), শ্যামলী (মিলু) রীতা ও সুব্রত

জাস্টিস মন্মথ মুখার্জি রো'-র গলিতে 'ত্রিপুরা মেসে'। আমরা তিনজন সকাল ১০টা -১১টার মধ্যেই চান-খাওয়া সেরে নিয়ে সারা কোলকাতা চষে বেড়াতাম। নাটক দেখতাম সিনেমা দেখতাম। কোন দিন সেসব কিছু না করে শুধু অগুণিত মানুষের মেলা দেখতাম বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে। আর সন্ধ্যের পর চলে যেতাম বৌ-বাজার ছানাপট্টির গলি। সেখানে দেবুদা অর্থাৎ দেবব্রত দত্তগুপ্ত এবং অন্যান্য সব কমরেডদের সঙ্গে প্রতিদিন জমকালো আড্ডা জমত। আগেই বলেছি তপন করের সুবাদে দেবুদাদের এই আড্ডার আবিষ্কার আমি ১৯৭০ সনেই করে গিয়েছিলাম। এছাড়াও রবীন্দ্র ভারতী হোস্টেলে দুপুরে যে ঘুমোব সে উপায় কোথায়। তিন শয্যার আসন বিশিষ্ট আমার রুমে থাকে আগরতলার বিভাস পোদ্দার এবং বর্ধমানের রাজকুমার কোনার। বিভাস প্রেম করে রবীন্দ্র ভারতীর এম.এ-র ছাত্রী কোলকাতার কুমারটুলীর মেয়ে অনুরাধা পালের সঙ্গে আর রাজকুমার কোনার করে হাওড়ার মেয়ে রুবী নামে একটি মেয়ের সঙ্গে। দুপুর হতে না হতেই ক্লাস ফাঁকি দিয়ে দু'জোড়া প্রেমিক যুগল চলে আসত রুমে এবং শুরু করে দিত কপোত-কপোতীর বিরামহীন গুঞ্জন। এরমধ্যে কার বাবার সাধ্যি ঘরের মধ্যে অবস্থিত তৃতীয় খাটটিতে একটু নাক ডাকিয়ে ঘুমোবে। আমার বন্ধু কামান চৌমুহনির 'পাল ফার্মেসি' দোকানের মালিকের ছেলে সুবল পালকে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে মিউজিকে এম.এ. পাঠরতা একটি মেয়ে যার নাম শ্যামলী চাটার্জী ডাকনাম মিলু ভাই ডেকেছে। মেয়েটির বাবা তখন মেদিনীপুর জেলার ডাক্তার ছিলেন। যদিও ঐ মেয়েটি সম্ভবতঃ বর্ধমানের স্থায়ী বাসিন্দা। মেয়েটি

রবীন্দ্র ভারতীর মেয়েদের হোস্টেলে থাকত। মিলুর সঙ্গে ২/১ দিন সুবলের মাধ্যমে কথা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং ক্যান্টিনে আমার দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে মিলু সুবলকে আমার কথা জিজ্ঞেস করলে সুবল আমার মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার ক্ষেত্রে আড়ষ্টতা এবং অস্বাচ্ছ্যন্দতার কথা জানায়। সুবল মিলুকে অনুরোধ করে পারলে আমাকে যাতে একটু স্মার্ট করে দেয়। আমার কপালে নেমে আসে সাময়িক ঘোর অন্ধকার।

গিরীশ পার্ক, রামমন্দির এসব এলাকায় মাঝে মাঝেই আড্ডা দিতাম রবীন্দ্রভারতী হোস্টেলের ত্রিপুরার ছেলেরা। সেখানে সুবল পালের বোন হিসাবে শ্যামলী চ্যাটার্জি ওরফে মিলু ২/১ বার এসেছিল। ভাল গান গাইত। আমাদের সকলকে গান গেয়ে শুনিয়েছিল। আমার সঙ্গে কথা বলে খুব একটা ইমপ্রেসড্ হয়েছে বলে মনে হয়নি। কারণ আমি স্বচ্ছন্দ হতে পারিনি তার সঙ্গে কথা বলার সময়। আমার আড়ালে যে মিলুকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমাকে স্মার্ট করে গড়ে তোলার জন্য সেটা আমি জানতাম না।

একদিন দুপুরে ভাত খেয়ে আমি রবীন্দ্রভারতী হোস্টেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলাম মিলু হোস্টেলের দিকে আসছে। আমি যাতে ও আমাকে দেখতে না পায় তার জন্য একটু আড়ালে চলে এলাম। আড়াল থেকে লক্ষ্য করলাম সে হোস্টেলের দোতালার সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে আসছে। তখন সুবল পাল হোস্টেলে ছিল না। আমার ভয় হল তাহলে মিলু কার কাছে আসছে? হোস্টেলের একটি বেয়ারা তখন নীচে নামছিল তাকে বললাম কেউ আমার খোঁজ করলে আমি নেই বলে দেবে। এই নির্দেশ দিয়ে আমি রুমে চলে এলাম। আমার রুমটি ছিল একটি করিডোরের শেষপ্রান্তে। হঠাৎ দেখি মিলু করিডর দিয়ে আমাদের রুমের দিকে আসছে। আমি খুব নার্ভাস হয়ে পড়ি। বিভাস পোদ্দার আমাকে খাটের নীচে লুকিয়ে থাকার পরামর্শ দেয়। আমিও মূর্খের মত খাটের নীচে লুকিয়ে পড়ি। সেই মেয়ে সুবলের কাছ থেকে খবর পেয়ে নিশ্চিত হয়েই এসেছিল আমি হোস্টেলে আছি। আমাকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতেও দেখেছে, আমি ভেবেছি দেখেনি। মিলু এসে সোজাসুজি বিভাসকে জিজ্ঞেস করে আমি কোথায়? বিভাস বলে—আমি অনেকক্ষণ আগে খাওয়া দাওয়া করে হোস্টেল ছেড়ে বেরিয়ে গেছি। স্বাভাবিক কারণেই মিলু বিশ্বাস করতে পারেনি। বিভাসের চোখ বারবার খাটের নীচে যাচ্ছিল দেখে সেই সাংঘাতিক মেয়েটি আমাকে খাটের নীচ থেকে বের করে আনে। এই কাহিনী সে আমাদের বন্ধুবান্ধব সবার কাছে পরে বিশদভাবে বলে আমাকে কম নাস্তানাবুদ করেনি। তবে আমি স্বীকার না করলে অকৃতজ্ঞ বিবেচিত হব। সেটা হোলো মিলুই আমাকে মেয়েদের সঙ্গে চলাফেরা এবং মেলামেশায় স্বচ্ছন্দ করে তুলতে সাহায্য করেছিল। সে আমাকে বুঝিয়েছিল আমার সঙ্গে মিশতে গেলে তুমি যে ছেলে আর আমি যে মেয়ে একথাটি তুমি মনে রাখো কেন? তুমি কেন ভাবতে পার না আমি তোমার খুব ভাল একজন বন্ধু। যে তোমার সব কথা, অনুভূতি মনোযোগ দিয়ে শুনবে, সম্মান জানাবে। তুমিও আমার সব কথা, সব অনুভূতি শুনে তার প্রতি সম্মান জানাবে। সে যা হোক, মিলু তার বিয়েতে আমাকে নেমন্তন্ন করেছিল। আমি যেতে পারিনি। আশা করি, সে সুখে আছে। কামনা করি—আমার জীবনের প্রথম বান্ধবী সে আজীবন সুখে থাকুক ভরা সংসার নিয়ে।

এদিকে, রবীন্দ্রভারতী হোস্টেলের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ক্রমশ নরক হয়ে উঠছিল।

অসিত-পিন্টু এবং এদের কিছু চ্যালা-চামুণ্ডা প্রতিদিন হোস্টেলে এসে মদের আসর বসাত। মদের টাকা ও আনুষঙ্গিক মাছ, মাংসের টাকার যোগান হোস্টেলের মেসের খরচ থেকে যোগাতে হত। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন মহকুমা বিশেষত মেদিনীপুরের বেশ কিছু আবাসিক খুবই দরিদ্র ছিল। মেসের বাড়তি টাকা যোগান দিতে গিয়ে এদের হাতে আর টিফিনের টাকা থাকত না। আমাদের খুব কষ্ট হত। এদের অনেককে আমি খিদের সময় শুধু জল খেয়ে থাকতে দেখেছি। এছাড়াও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের লনে, ক্যান্টিনে ত্রিপুরার ছেলেদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকের মত ব্যবহার করত ছাত্রপরিষদের রবীন্দ্রভারতী ইউনিটের নেতারা। বামপন্থী বা অন্য কোন ছাত্র সংগঠনের কোন অস্তিত্বই তখন ছিল না। সব জাতীয়তাবাদী সবুজ সেনা। অপমানের পারদ যখন তুঙ্গে উঠল তখন আমরা ত্রিপুরার রবীন্দ্রভারতী হোস্টেলের সব ছেলেরা হোস্টেলের বাইরে বিভিন্ন জায়গায় মিটিং করলাম। আশ্চর্যের ব্যাপার হোলো, রবীন্দ্রভারতী হোস্টেলে ত্রিপুরার যত ছেলে আমরা ছিলাম তাদের অধিকাংশই কংগ্রেস সমর্থক পরিবারের ছেলে বা ত্রিপুরাতে সক্রিয় কংগ্রেস কর্মী ছিল। কিন্তু এরাই স্বদলীয় লোকদের দ্বারা নিগৃহীত হতে আরম্ভ করেছিল। ত্রিপুরার অধিকাংশ ছেলেরা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ছাত্রপরিষদ সংগঠনের সদস্যপদ নিয়েছিল এবং দৈনন্দিন ইউনিয়নের কাজে অংশগ্রহণ করত। বরঞ্চ আমি বা মামা কেশব ছাত্রপরিষদ সংগঠন না করলেও কোন ধরনের নিগ্রহের সম্মুখীন হইনি। ততদিনে আমি রবীন্দ্রভারতী হোস্টেলের ত্রিপুরার সব ছেলেদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছি। আমি সবাইকে বোঝালাম---ত্রিপুরাতে আমরা প্রত্যেকে যে পার্টিই করি না কেন কোলকাতা আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা সবাই দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসাবে ব্যবহার পাচ্ছি। সুতরাং কোলকাতা পড়াশোনা চলাকালিন আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক কোন বিভেদ থাকা চলবে না। আগরতলা বা ত্রিপুরায় ফিরে গিয়ে আবার প্রয়োজনে দলাদলি করব। আমাদের গোপন পরামর্শ সভায় আস্তে আস্তে বিমল সিনহা এবং শঙ্করদাকেও যোগদান করে পরামর্শ দেওয়ার সুযোগ করে দিই। ইতিমধ্যে আমি তিনশয্যা বিশিষ্ট রুমটি ছেড়ে দোতালায় জানালার পাশে সুবল পালের দুই সিটের রুমে চলে আসি। সুবল পাল পুজোর ছুটির বেশ কিছুদিন আগে বাড়ি চলে আসে। তখন আমি একা রুমে থাকি। পুজোর বন্ধ চলে আসে। আমি, শঙ্করদা, মামা কেশব আগরতলা চলে আসার জন্য বিমানের টিকিট কাটি। তখন খুব ভোরে কোলকাতা-আগরতলা রুটের বিমান ছাড়ত। আমরা আগের দিন রাতেই খাওয়া দাওয়ার পর কোলকাতা বিমানবন্দরে চলে যাই। যেদিন আমি আগরতলা চলে আসব তার আগের দিন বিকেলে উৎপল সাহা রবীন্দ্রভারতী হোস্টেলে গিয়ে হাজির। সে বলল হোস্টেলে থাকবে। আমি জানালাম থাকা-খাওয়ার কোন সমস্যা নেই। আমার পুরো রুম খালি এবং হোস্টেলের মেসেও খাওয়ার ব্যবস্থা করে যেতে পারব। সমস্যা একটাই, আমি আর কেশব আজ রাতেই কোলকাতা বিমানবন্দর চলে যাবো। উৎপল বলল তার কোন অসুবিধা নেই। ও একা আমার রুমে থাকতে পারবে। আমি উৎপলকে আমার রুমে থাকার ব্যবস্থা করে এবং আমার অনুপস্থিতিতে হোস্টেল মেসে খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে সেই রাতেই হোস্টেল ত্যাগ করে বিমানবন্দর চলে গেলাম।

সেদিন ভোর ৪টা নাগাদ কাজল দেব (বর্তমানে আইনজীবী) এবং পার্থ চক্রবর্তী

(কোলকাতা একটি পেপার মিলে এখন কর্মরত) রবীন্দ্রভারতী হোস্টেল থেকে পায়ে হেঁটে কোলকাতা বিমানবন্দরে গিয়ে হাজির। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখি ওদের পায়ে জুতোও পরা নেই। ওরা জানাল আমরা বেরিয়ে আসার কিছুক্ষণ পর অসিত-পিন্টুর গ্রুপ মদমত্ত অবস্থায় হোস্টেল আক্রমণ করে। ত্রিপুরার ছেলে যাকে হোস্টেলে পেয়েছে মারধোর করেছে। টাকা-পয়সা জামাকাপড় যার কাছে যা পেয়েছে কেড়ে নিয়েছে। কাজল এবং পার্থ'র সবকিছু লুঠ করে নিয়ে গেছে। টাকা নেই বলে ওরা পালিয়ে বিমানবন্দর হেঁটে চলে এসেছে আমাদের খবর দিতে। কে কোথায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে ওরা বলতে পারছে না। ওরা আরো জানাল, অসিত-পিন্টু ভালো করেই জেনে নিয়েছে আমি এবং কেশব হোস্টেল ছেড়ে চলে গেছি। তারপরই ওরা আক্রমণ চালায়। আমার রুমে ঢুকে উৎপলকে পেয়ে খুব মেরেছে বলে কাজল ও পার্থ জানাল। আমি ও কেশব আগরতলা আসার টিকিট বাতিল করে কাজল ও পার্থকে নিয়ে ট্যাক্সি ধরে হোস্টেলের দিকে রওয়ানা দিলাম। শঙ্করদাকে আমি বললাম, আপনি চলে যান। এই ঘটনার একটা হেস্তনেস্ত না করে আমি আর আগরতলা ফিরছি না।

ভোরবেলা ট্যাক্সি করে আমি, কেশব, কাজল এবং পার্থ এসে পৌঁছুলাম রবীন্দ্রভারতী হোস্টেলে। এসে দেখি হোস্টেলে ত্রিপুরার কোন ছেলে নেই। তাদের জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে রুমে এবং রুমের বাইরে করিডোরে। সবাই'র রুমের দরজা ভাঙা নয়ত ভেতরের ছিটকিনি ভাঙা। অর্থাৎ ওরা রুমের দরজা বন্ধ করেও রেহাই পায়নি। দরজা ভেঙে ওদের রুমে ঢুকে মারধোর করেছে এবং তাদের জিনিসপত্র লুটপাট করেছে। হোস্টেলের বয়, বেয়ারা এবং অন্যান্য বোর্ডারদের থেকে জেনেছি—প্রথমে রাত্রি ১২টা নাগাদ অসিত, পিন্টু ওরা হোস্টেলে ঢুকে আমাদের ছেলেদের অতর্কিতে মারধোর করে। অনেকেই ভয় পেয়ে এদিক-সেদিক দৌড়ে পালিয়ে যায়। অসিত-পিন্টু এরা প্রথমবার মারধোর করার পর হোস্টেল ছেড়ে চলে যায়। আমাদের ছেলেরা বিপদ কেটে গেছে ভেবে আবার গুটিগুটি পায়ে আশেপাশে লুকিয়ে থাকা আস্তানা থেকে হোস্টেলে ফিরে আসে। অসিত-পিন্টু এবং তার চ্যালা-চামুণ্ডারা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিয়ন রুমে বসে মদের আসর বসিয়েছিল হোস্টেল থেকে ফিরে গিয়ে। এরা আবার ভোরবেলা ৪টা নাগাদ হোস্টেলে ফিরে এসে ঘুম থেকে তুলে তুলে ত্রিপুরার ছেলেদের বেধড়ক মারধোর করে। সর্বস্বান্ত করে সব জিনিস লুটপাট করে নিয়ে যায়। গোটা ঘটনা জেনে এবং ছড়ানো-ছিটানো অত্যাচারের চিহ্ন দেখে চোখে জল চলে এসেছিল। খবর পেলাম আমার রুমে সেদিনই আশ্রয় নেওয়া উৎপল দু'কিস্তিতে মার খেয়ে সবচেয়ে বেশি আহত হয়েছে। আহতদের সকলকে কোলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। জোড়াসাঁকো থানায় যাইনি ইচ্ছে করে। জানতাম গেলে আমাদেরই অ্যারেস্ট করে রাখা হতে পারে।

সোজা চলে গেলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। গিয়ে উৎপলসহ আরো অন্যান্য আহতদের পেলাম হাসপাতালে ভর্তি হয়ে আছে। সেখানেই জানলাম ত্রিপুরার অন্যান্য ছেলেরা 'মহাজাতি সদনে' আশ্রয় নিয়েছে। সেখানে গিয়ে সবাইকে পেলাম। দীর্ঘক্ষণ মিটিং হল। আমি ত্রিপুরার সব ছেলে যারা ছাত্রপরিষদ করে তাদের বললাম, তোমরা ছাত্রপরিষদের সভাপতি কুমুদ ভট্টাচার্যের বেহালার বাড়িতে গিয়ে ওনাকে ঘেরাও কর।

তোমাদের আশ্রয় এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে চাপ দাও। সমস্যা দেখা দিল প্রায় ৩০/৪০টি ছেলে কপর্দকহীন অবস্থায় 'মহাজাতি সদনে' আশ্রয় নিয়েছে, এরা খাবে কি করে। বেহালার কুমুদ ভট্টাচার্যের বাড়ি যে ওরা যাবে তার ভাড়াই ওদের পকেটে নেই। কোলকাতার সঙ্গে বহু আগে থেকেই আমার যোগাযোগ ছিল। বৌবাজার ছানাপট্টির দেবুদা, কোলকাতা মেডিকেল কলেজ এবং আরও বিভিন্ন জায়গায় পাঠরত ছাত্রদের কাছ থেকে আমি ঋণ হিসাবে টাকা সংগ্রহ করে মহাজাতি সদনে আশ্রিত ত্রিপুরার ছেলেদের ব্যয় নির্বাহ করে যেতে লাগলাম। সবাই বাড়িতে জরুরি ভিত্তিতে টাকা পাঠানোর জন্য টেলিগ্রাম করল। সবার টাকা এসে পৌঁছুলে আমি ঋণ নেওয়া টাকা পরিশোধ করে দিয়েছিলাম। পশ্চিমবঙ্গ ছাত্রপরিষদের সভাপতি কুমুদ ভট্টাচার্য কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'হার্ডিঞ্জ হোস্টেল'-এর কর্ণধার জয়ন্ত ভট্টাচার্যকে দায়িত্ব দিলেন ত্রিপুরার ছেলেদের হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে আপাততঃ জায়গা করে দেওয়ার জন্য। তখন কুমুদ ভট্টাচার্য ও সুব্রত মুখার্জি একই গ্রুপ করত এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক মধুর ছিল। জয়ন্ত ভট্টাচার্য ছিল সুব্রত মুখার্জির লোক। সে কারণেই কুমুদ ভট্টাচার্যের অনুরোধ মত ত্রিপুরার ছেলেদের হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে জায়গা করে দিয়েছিল। আমি 'হার্ডিঞ্জ হোস্টেল'-এ উঠলাম না। আমার বন্ধু সুবল দেবনাথ তখন মেডিকেল কলেজে ১ম বর্ষে এম.বি.বি.এস কোর্সে ভর্তি হয়ে কলেজ স্ট্রীটের 'শীল ম্যানশান'-এ বোর্ডার হিসাবে ভর্তি থেকে পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছিল। আমি সুবলের গেস্ট হয়ে মেডিকেল কলেজ হোস্টেল 'শীল ম্যানশান'-এর অতিথি আবাসিক হয়ে গেলাম।

খেয়েদেয়ে অলস দিন কাটছিল আমাদের সে সময়ে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ ক্লাস কেউই করতে যাওয়ার সাহস পাচ্ছিল না। কুমুদ ভট্টাচার্যের কাছে দিনের পর দিন ধরণা দিয়েও ত্রিপুরার ছেলেরা সমস্যা সুরাহার কোন ব্যবস্থা করতে পারছিল না। তখন আমরা ঠিক করলাম যদি সম্ভব হয় কোনদিন এম.এ পরীক্ষা দেব নয়ত দেবই না। কিন্তু ত্রিপুরার ছেলেদের বিনা কারণে কোন অন্যায় ছাড়া মারধোরের প্রতিশোধ নেব। সেই অনুযায়ী সমস্ত খবরাখবর আগে থেকেই সংগ্রহ করে একদিন দুপুরে ৪/৫টা ট্যাক্সি করে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের লনে আমরা যাই। সে সময় আমাদের সঙ্গে হাবড়ার অসীম ব্যানার্জি ওরফে বোম, লব, গোবিন্দ, শ্রীধর এরাও গিয়েছিল। এদের মধ্যে একমাত্র বোমই রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় হোস্টেলে আমাদের সঙ্গে থাকত। লব, গোবিন্দ, শ্রীধর এরা ছিল বোমের বন্ধু। হাবড়া থেকে হামেশা হোস্টেলে চলে আসত এবং আমাদেরও বন্ধু হয়ে যায়। বোমও ত্রিপুরার ছেলেদের মত রবীন্দ্রভারতী হোস্টেল থেকে বিতাড়িত হয়ে যায়। ঘটনার দিন রাত্রিতে বোম হোস্টেলে ছিল না। তবে ওর সমস্ত জিনিসপত্র লুটপাট হয়ে গিয়েছিল। নিশ্চিতভাবেই এর কারণ ছিল বোমের সঙ্গে ত্রিপুরার ছেলেদের সখ্যতা ও নৈকট্য। বোম ছিল অসীম সাহসী। ওর বন্ধুরা সবাই একইরকম ছিল। আমি বেশ কয়েকবার হাবড়া বোমের বাড়ি গেছি। এরা ছিল সে সময়কার হাবড়ার ত্রাস। এদের প্রত্যেকের ছিল নকশাল অতীত। পরে ছাত্রপরিষদ কর্মী। বোম, লব, গোবিন্দ সবার নামে ছিল বেশ কয়েকটি খুনের মামলা। আমি প্রায়ই ভাবতাম এদের সবার এত সংবেদনশীল, সুন্দর মন ছিল কিন্তু এই নৃশংস কাজগুলি কি করে করতে পারত। অসীম ওরফে বোম

ছিল ৬ ফুটের ওপর লম্বা, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা পরত সে। চোখের পাওয়ার ছিল খুব বেশি। চশমা ছাড়া কিছুই দেখতে পেত না। এখন হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার সুব্রত পাল রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে একই সময় এম.এ ক্লাশে ভর্তি হয়েছিল, তবে হোস্টেলে থাকত না। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় অভিযানের সময় সেও আমাদের সঙ্গে গিয়েছিল রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের জোড়াসাঁকো লনে। হার্ডিঞ্জ-এর সামনে কুলুটোলা লেন থেকে ট্যাক্সি ধরে সবাই ৬টি ট্যাক্সি করে ইউনিভার্সিটি লনে যাই। পূর্ব পরিকল্পনামত ৩/৪টি গ্রুপে ভাগ হয়ে ইউনিভার্সিটি ইউনিয়ন রুম, ক্যান্টিন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল বিল্ডিং সব জায়গায় আমরা অতর্কিতে টর্পেডো হানার মত হামলা চালাই। অসিত-পিন্টু এবং তাদের চ্যালা-চামুণ্ডা কাউকে সেদিন রেহাই দেওয়া হয়নি। ত্রিপুরার ছেলে কে কে গিয়েছিলাম সবার নাম মনে নেই। তবে আমরা কেউ বাদ যাইনি। হামলা চলাকালীন সময় রবীন্দ্রভারতীর মূল বিল্ডিং-এ বোমের চশমা খুলে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে। বোম দেওয়ালে পিঠ দিয়ে কোনরকমভাবে আন্দাজে ভর করে আক্রমণ ঠেকিয়ে যাচ্ছিল। খবর পেয়ে ছুটে গিয়ে আগে ওর চশমা আবিষ্কার করে পরিয়ে দিলাম। জানতাম চশমা ছাড়া ও অন্ধ। শুধু লম্বা হাত ছিল বলে এতক্ষণ যুঝতে পেরেছিল। কৈলাসহরের রেবতীমোহন সিন্‌হার ভীমসুলভ তাণ্ডব অসিত-পিন্টু মৃত্যুর দিন অবধি ভুলতে পারবে না। তার একার পরাক্রমে কতজন যে সেদিন আহত হয়েছে বলা দুষ্কর। এমনিতে অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির ছিল রেবতী। ভেতরে রাগ জমতে জমতে ঘৃণায় পাথর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যার স্ফুরণ আমরা সবাই সেদিন দেখেছিলাম। আমার কাজটা ছিল অনেকটা রেফারির মত। আমাদের সবকটি দল ভাল খেলছে কি না তদারকি করা। প্রায় ঘণ্টাখানেক তাণ্ডব চালিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা বেরিয়ে এসে ট্যাক্সি ধরে চলে এলাম। ইউনিভার্সিটি লন দিয়ে হেঁটে আমি আর কাজল দেব বেরুচ্ছি তখন হঠাৎ দেখি উল্টোদিকের বিল্ডিং-এর দরজায় দাঁড়িয়ে পিন্টু আমাদের দিকে পিস্তল তাক করেছে। আমি কাজলকে বললাম, পেছনের দিকে দৌড় দেওয়ার চেষ্টা করিস না। পিন্টুর চোখে চোখ রেখে তাড়াতাড়ি হেঁটে দূরত্ব কমিয়ে আন। ও নার্ভাস গুলি করতে পারবে না। হঠাৎ কাজলের হাত ধরে আমি পিন্টুর দিকে দৌড় দিই। পিন্টু ভয়ে রিভলবারসহ পালিয়ে যায়।

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় লন ছেড়ে জোড়াসাঁকোর রাস্তায় যখন আমরা হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে আসছি কারো সাহস হয়নি আমাদের রুদ্রমূর্তি দেখে বাধা দেওয়ার। রবীন্দ্রভারতীর সেদিনের হিংসার তাণ্ডবের বিশদ বিবরণ দিতে চাই না। ত্রিপুরার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের ছেলে রেবতী সিন্‌হা, ঈশ্বরবাবু সিন্‌হা, প্রিয়তোষ, পরিতোষ এদের পর্যন্ত অপমানের আগুনে পুড়তে, পুড়তে প্রতিহিংসাপরায়ণ একটা বাঘে পরিণত করে ফেলেছিল নিজেকে। ত্রিপুরার অনেক ছেলে ত্রিপুরার বাইরে পড়াশোনার সুবাদে প্রথমবারের মত কোলকাতা আসতে বাধ্য হয়েছিল। আমরা প্রায় সকলেই ছিলাম গোবেচারা, আনস্মার্ট। মারদাঙ্গার কোন এজেণ্ডা আমাদের মাথায় কোনদিন ছিল না। শুধুমাত্র আমাদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া অমানবিক ঘটনাসমূহ আমাদের একসময়ে কোলকাতা শহরের ত্রাসে রূপান্তরিত করেছিল। কোলকাতা গিয়ে আমি শুনেছি বিভিন্ন হোস্টেলে বিশেষত হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের ছেলেদের দিয়ে কোলকাতার ছেলেরা, ছাত্রপরিষদের নেতারা পান-

বিড়ি-সিগারেট আনাত। বস্তী পার্টি, অশ্লীল ছাপার অযোগ্য সম্বোধন ছিল ত্রিপুরার ছেলেদের প্রাপ্য। ত্রিপুরার ছেলেরা যেন দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকই শুধু নয় মনুষ্যেতর প্রাণী। কেন জানিনা আমার সঙ্গে এ ধরনের স্পর্ধা কেউ কখনো দেখায়নি। তাহলে হয়ত এতদিন আমার স্থান হত জেলখানার গারদের ভেতর। আমি একটু ডানপিটে ধরনের ছেলে ছিলাম কিন্তু অকারণ হিংসা-বিদ্বেষ কোনদিনই পছন্দ করতাম না। কিন্তু ত্রিপুরার প্রতি, ত্রিপুরার ছেলেদের প্রতি অবজ্ঞা, অবহেলা আমাকেও আপাত নিষ্ঠুর করে তুলেছিল। কাউকে মারধোর আমি কোনদিনই করিনি বা আমার সামনে করতে দিইনি। কিন্তু বিপক্ষের ছেলেদের হোস্টেল থেকে বিতাড়নের অনুমতি দিতে আমি দ্বিধা করিনি। এই কাজটি আমার সম্পূর্ণ চরিত্রবিরোধী কাজ ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি এই স্বভাববিরুদ্ধ নিষ্ঠুর কাজটি করতে আমায় প্ররোচিত করেছিল।

হার্ডিঞ্জ পর্ব

আমি 'শীল ম্যানসন' থেকে প্রতিদিন সকাল বিকাল পায়ে হাঁটা দূরত্বে অবস্থিত হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে যেতাম। বিকেলে আমি, শঙ্করদা, বিমল প্রতিদিন এন্টালি বসন্ত কেবিনের দোতালায় এস.এফ.আই অফিসে যেতাম। বিমান বসু, দীনেশ মজুমদার, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, সুভাষ চক্রবর্তী, শ্যামল চক্রবর্তী এদেব দেখা মিলত। সুভাষদার এবং শ্যামলদার তখনকার সময়ে হবু পত্নী রমলাদি এবং শিপ্রা চক্রবর্তীর সঙ্গে সেখানেই দেখা হত। কি অদ্ভুত অবাজনৈতিক পরিবেশ চলছে তখন। সারা রাজ্যজুড়ে বামপন্থী যেকোন সংগঠনের আন্দোলন দূরে থাক দৈনন্দিন কাজকর্ম প্রায় বন্ধ। এস.এফ.আই অফিসে তখন এস.এফ.আই বনাম ডি ওয়াই.এফ.আই প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের আলোচনা শুনতে শুনতে বিমল, আমি, শঙ্করদা সিদ্ধান্ত নিলাম শুধু শুধু সময় নষ্ট করে গাঁটের পয়সা খরচ করে আব এস.এফ.আই অফিসে আসব না। এর চেয়ে বি.বি গাঙ্গুলি স্ট্রীটের ছানা পট্টিতে দেবুদা এদের পুরো গ্রুপের আড্ডাটি ছিল প্রাণবন্ত, রাজনৈতিক এবং মনে আশা ও সাহস সংগ্রহের সহায়ক। সেখানেই নিয়মিত আড্ডা দিতে শুরু করলাম। প্রায়ই দেবুদাকে নিয়ে ৯টা ১২টার শোতে সিনেমা দেখতাম। নিউ মার্কেট সংলগ্ন নিজাম রেস্টুরেন্ট থেকে বীফ আর পরোটা খেয়ে নিতাম। সুস্বাদু এবং খুব সস্তা ছিল আমাদের রাতের ডিনার। দেবুদা ওরফে দেবব্রত দত্তগুপ্তের সান্নিধ্য এবং স্নেহচ্ছায়া আমাদের জীবনের চরম প্রাপ্তি। শুধু আমাদের অর্থাৎ বিমল, শঙ্করদা ও আমার নয় ত্রিপুরার সব ছেলেদের তিনি অকৃপণ ভালোবাসায় নিঃস্বার্থভাবে প্রতিকূল পরিবেশে সাহায্য করে গেছেন, আশ্রয় দিয়েছেন।এমন কোন ত্রিপুরার ছেলে নেই যারাই দেবুদার কাছে বিভিন্ন সময় সাহায্যের জন্য গেছেন বা আজো যান উপকৃত না হয়ে ফিরে এসেছেন। আমাদের মধ্যে কয়জন কৃতঘ্ন তার এই উদার ভালোবাসার স্বীকৃতি দিতে পেরেছি? দেবুদাকে এস.এফ.আই অফিসের ঘটনাবলী জানানোর পর তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন তোমরা কোলকাতা এসেছ প্রায় দেড়-দু'বছর হয়ে গেছে। প্রাথমিকভাবে প্রমোদবাবু তোমাদের এখানে রাজনীতি করতে বারণ করেছেন সম্পূর্ণ অন্য কারণে। তোমরা বাইরে থেকে এসে অনর্থক না কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পড় সে কারণে তিনি তোমাদের এখানে রাজনীতি করতে বারণ করেছিলেন। তার অর্থ তো এই নয় যে প্রমোদবাবু পশ্চিমবঙ্গ অরাজনৈতিক একটি রাজ্য হিসাবে পরিচালিত হোক চান। তোমরা আবার গিয়ে প্রমোদবাবুর সঙ্গে সরাসরি কথা বল। দেবুদার পরামর্শমত আমরা আলিমুদ্দিন স্ট্রীটে গিয়ে সরাসরি প্রমোদ দাশগুপ্তের সঙ্গে অলোচানা করলাম। আমি যেহেতু

প্রত্যক্ষভাবে ত্রিপুরার ছেলেদের বিভিন্ন সমস্যার সঙ্গে জড়িত ছিলাম, তাই হার্ডিঞ্জ হোস্টেলকে কেন্দ্র করে কিভাবে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আইন কলেজ এবং অন্যান্য কলেজগুলোতে গোপনে সংগঠন গড়ে তোলা যায় কংগ্রেসের সমর্থক ছেলেদের ব্যবহার করে, প্রমোদবাবুকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। বিমল এবং শঙ্করদা যেহেতু সমস্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল, আমাকে দ্ব্যর্থহীনভাবে সমর্থন করল। প্রমোদবাবু কোনভাবেই রাজি হচ্ছিলেন না। তিনি বোঝানোর চেষ্টা করলেন এর আগে যতজন হার্ডিঞ্জ হোস্টেলকে কেন্দ্র করে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বামপন্থী ছাত্র রাজনীতি করতে চেয়েছে হয় তারা খুন নয়ত নিখোঁজ হয়ে গেছে। সুতরাং আমাদের অনুমতি দেওয়ার অর্থ জীবনের ঝুঁকি নিতে দেওয়া। আসলে আমার যেটা তখন মনে হয়েছিল সেটা হচ্ছে অকৃতদার প্রমোদ দাশগুপ্ত ছিলেন আদ্যোপান্ত স্নেহপ্রবণ। যে কোন কারণে হোক আমাদের তিনটি বাঙ্গাল ছেলের প্রতি তার অপত্যস্নেহ মনের সংগোপনে বাসা বেঁধে গিয়েছিল। সে কারণে বারবার কোন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে আমাদের ঠেলে দিতে তার মন সায় দিচ্ছিল না। আমি তো বরাবরের ইঁচড়ে পাকা ছেলে। প্রমোদবাবুর সামনে বলেই ফেললাম—কি জানি কবে থেকে কমিউনিস্টদের জীবন ভারতবর্ষে ঝুঁকিমুক্ত, মসৃণ হয়ে পড়েছে আমরা জানতে পারিনি। প্রমোদবাবু চশমার ভেতর থেকে গভীর অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে আমাদের জরিপ করলেন। তারপর বিমানদাকে ডেকে আনলেন এবং আমাদের সঙ্গে আলোচনা করে কিভাবে দৈনন্দিন সংগঠনের কাজে আমাদের যুক্ত করা যায় তার নির্দেশ দিলেন। বিমানদা আমাদের আগে থেকেই চিনতেন এবং জানতেন।

কার্যত তিন/চার দিন আমি, বিমল এবং শঙ্করদা বিমানদার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তাকে বোঝাতে সমর্থ হয়েছিলাম যে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কোলকাতার বিভিন্ন কলেজ হোস্টেলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছেলেদের নিয়ে গোপনে এস.এফ.আই-র সংগঠন বৃদ্ধি করা সম্ভব। এই সন্ত্রাসজনিত পরিস্থিতিতে অত্যন্ত সংগোপনে এবং সতর্কতার সঙ্গে এই কাজটি গোপনে করে যেতে পারলে ভবিষ্যতে তার সুফল পেতে আমরা বাধ্য। অনুরোধে ঢেঁকি গেলানোর মত প্রায় জোর করে বিমানদার সম্মতি আমরা আদায় করেছিলাম। আমাদের তিনজনকে নিয়ে অর্থাৎ আমি, বিমল এবং শঙ্করদাকে নিয়ে একটি পার্টি ইউনিট গঠন করা হল। সেই ইউনিটের কনভেনার বিমল সিন্‌হা। ঠিকানা-ত্রিপুরা মেস, জাস্টিস মন্মথ মুখার্জি রো। পার্টিগতভাবে সিদ্ধান্ত হল বিমানদা সুকুমার রায় নামে সমস্ত যোগাযোগ বিমলের সঙ্গে করবেন এবং তার নির্দেশ অনুযায়ী বিমল আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। এন্টালি রোডে জোড়া গির্জার পাশের গলি দিয়ে ঢুকে একটি বাড়িতে সারাভারত কৃষক সভার অফিস ছিল। বর্তমান সি পি আই (এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বিনয় কোনার কৃষক সভার অফিসে সে সময় গৃহবন্দির মত ছিলেন। তার ওপর নজরদারি ছিল খুবই ঢিলেঢালা ধরনের অর্থাৎ নাম-কা-ওয়াস্তে গৃহবন্দি। সরকারি কর্তব্যরত ইন্টিলিজেন্স ব্রাঞ্চের কর্মীরা ডিউটিতে হাজিরা দিয়েই হয় ঢুলে বসে ঘুমোতেন নয়ত আশেপাশে চা-পানি খেতে বেরিয়ে পড়তেন। পশ্চিমবঙ্গ পার্টি বহুদিন ধরে এ ব্যাপারটা লক্ষ্য করে বুঝে গিয়েছিল, কৃষকসভার অফিসটি অনেক নিরাপদ। যেহেতু এখানে স্থায়ীভাবে আই.বি-র লোকেরা পাহারায় নিযুক্ত, অন্য

কোন পুলিশি খবরদারি এখানে হয় না। সিদ্ধান্ত হল, কৃষকসভার একটি রুমে আমরা প্রয়োজন মত মিটিং করব। বিমানদা সুকুমাব রায় নাম দিয়ে চিঠি লিখে বিমলের ত্রিপুরা মেসে পাঠাতেন এবং তার লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সঠিক তাবিখ এবং সময়ে আমরা পৌঁছে যেতাম এন্টালি জোড়া গির্জাব পাশে কৃষকসভাব অফিসের নির্ধারিত রুমে। সেখানেই বিস্তৃত আলোচনা কবে গোপনে ছাত্র সংগঠন কিভাবে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার অধীনস্ত বিভিন্ন ফ্যাকাল্টিতে ও হোস্টেলে গড়ে তোলা যায তার পরিকল্পনা হত।

পার্টি ইউনিটে সিদ্ধান্ত হল বিমানদা বিভিন্ন জেলার বামপন্থী ছাত্রকর্মীদের সুকুমার রায় নামে চিঠি দিয়ে আমার কাছে পাঠাবেন। আমি তাদের হার্ডিঞ্জ হোস্টেল এবং যার যার পড়াশুনার সুবিধামত বিশ্ববিদ্যালয়েব হোস্টেলে ভর্তি কবে দেব। যাবা ভর্তি হবে তারা ভর্তিব পর আব কোন যোগাযোগ আমাব সঙ্গে রাখবে না। ভর্তির সময় আমিও যাতে সরাসরি নিজে তাদের ভর্তি না কবে অন্য কারো মারফত ভর্তির ব্যবস্থা করে দিই। আরো দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হল আমরা অর্থাৎ আমি, বিমল ও শঙ্করদা যাতে ভুলেও আলিমুদ্দিন স্ট্রীটে পার্টি অফিসে বা এস এফ আই / ডি.ওয়াই.এফ.আই অফিসে না যাই। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি হল আমি যাতে 'শীল ম্যানশান' ছেড়ে হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে চলে আসি। পার্টির সিদ্ধান্ত অনুযাযী আমি হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের ৪ তলায় একটি সিঙ্গল বেডেড রুমে চলে এলাম। নামেই সেই রুমটি আমার নামে বরাদ্দ হয়েছিল। সেই রুমে স্থায়ীভাবে থাকত বিভাস পোদ্দাব। সে আমার বন্ধু সমীরণ রায়ের মাসতুতু ভাই এবং জ্যেঠতুতো ভাই দুটোই। আমি সাবা হোস্টেলে ঘুরে আজ এর রুমে কাল তার রুমে ঘুমোতাম কৌশলগত কারণে। সে কারণেই হোস্টেল যতবার আক্রমণ হয়েছে আমাকে কেউ খুঁজে পায়নি। সে যা হোক। সুকুমার রায়ের নামে চিঠি নিয়ে ছাত্ররা আসতে শুরু করল। আমি তাদের ত্রিপুরার যে সমস্ত ছেলেবা ছাত্রপরিষদ প্রত্যক্ষভাবে করত তাদের মাধ্যমে ভর্তি করতে শুরু করলাম। আস্তে আস্তে গোটা হোস্টেলের চেহারা যখন বদলাতে শুরু করেছে তখনই সুব্রত মুখার্জি এবং কুমুদ ভট্টাচার্যের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। হাবড়ার অসীম ব্যানার্জি ওরফে বোম, শিলিগুড়ির পীযূষ ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গার ফণীভূষণ রায়, স্বপন চক্রবর্তী, খড়গপুরেব কান্তি ঘোষ, বর্ধমানের রাজকুমার কোনার, কোচবিহারের বাবুদা, প্রশান্ত মুখার্জি, আলিপুরদুয়ারের সান্টু ইত্যাদি হোস্টেলের ছেলেরা আমাদের ত্রিপুরার ছেলেদের সঙ্গে ছিল। জয়ন্ত ভট্টাচার্য, সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া এরা সুব্রত মুখার্জির গ্রুপের নেতৃত্ব দিত। পশ্চিমবাংলার অধিকাংশ ছেলে তখন সুব্রত মুখার্জির গ্রুপ করত। হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে সুখের দিন শেষ হয়ে আবার আরম্ভ হয়ে গেল দু'গ্রুপের মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বাতাবরণ সৃষ্টির প্রক্রিয়া। ত্রিপুরার ছেলেদের আবার দুর-ছাই করা আড়ালে আবডালে শুরু হয়ে গেল। আমরাও ভেতরে ভেতরে আবার একটি মুখোমুখি সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম। হোস্টেলের পরিস্থিতি এমন হয়ে এসেছিল যে, মাঝেমাঝেই সৈফুদ্দিন চৌধুরী (বর্তমানে পি.ডি.এস নেতা), গৌতম দেব (বর্তমানে বামফ্রন্ট সরকারের আবাসন মন্ত্রী), সুব্রত মুকুটি এরা হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে এস.এফ.আই-র গোপন সাংগঠনিক সভা করতে সক্ষম হয়েছিল। অবশ্যই তাদের সভা করার ব্যবস্থা আমাদেরই করে দিতে

হয়েছিল। এমনকি আমাদের হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে থাকার সময় আগরতলা রামনগর এলাকার তৎকালীন সময়ের পার্টি নেতা বলাই সিং রায় পুলিশ কেসের জন্য ২/৩ মাসের জন্য আত্মগোপনে থাকতে বাধ্য হয়। তাকে আমরা হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে ২/৩ মাস থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। সে স্বচ্ছন্দে হোস্টেলে ছিল। তার কোন অসুবিধা হয়নি। অথচ বলাই-এর রাজনৈতিক পরিচয় ত্রিপুরার সব ছেলে যারা হার্ডিঞ্জের বোর্ডার ছিল ভাল করেই জানত। কিন্তু কোনভাবেই বলাই-এর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়নি। কারণ ত্রিপুরার কোন ছেলে বলাই'র রাজনৈতিক পরিচয় কারোর কাছে প্রকাশ করেনি।

হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে সুব্রত মুখার্জির গ্রুপ আর কুমুদ ভট্টাচার্যের গ্রুপের যখন প্রচণ্ড খেয়োখেয়ি আরম্ভ হল তখন নিরাপত্তাজনিত কারণে সুকুমার রায়ের চিঠি নিয়ে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারটা সাময়িককালের জন্য স্থগিত রাখা হল। তাছাড়া সৈফুদ্দিন চৌধুরী, গৌতম দেব ও সুব্রত মুকুটি এদেরও কয়েকদিন হার্ডিঞ্জে না আসার জন্য আগাম সতর্কবার্তা পাঠিয়ে দেওয়া হল। হোস্টেলে ছোটখাট একটি অস্ত্রাগার গড়ে তোলা হল। অসীম ওরফে বোম, লব, গোবিন্দ, শ্রীধর এদের মাধ্যমে হাবড়া থেকে স্টেনগান থেকে রিভলবার সবই সংগ্রহ করা হল। সংগৃহীত অস্ত্রগুলি আমার হেফাজতে অর্থাৎ আমার নির্দেশে বিশেষ বিশেষ জায়গায় লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। এ ব্যাপারে হোস্টেলের দারোযান চন্দ্রিকা প্রসাদ, কাশী, ঋষি এরা সকলে আমাদের অনুগত হয়ে উঠেছিল। ফলে আমাদের গোপন খবর বিরোধী গ্রুপ জানতে পারত না কিন্তু বিরোধী গ্রুপের সব খবর বিশেষত আমার কাছে নিখুঁত বর্ণনাসহ চলে আসত। শুধু দারোয়ানরা নয়, সুব্রত মুখার্জির গ্রুপের সঙ্গে মিশে থাকা দু'একজন বিবেকের তাড়নায় এই সাহায্য করে যেত।

স্টেনগানটি ১,৮০০ (আঠারশ) টাকা দিয়ে বোম হাবড়া থেকে কিনেছিল। এর মধ্যে ৮০০ টাকা ছিল সেন্ট্রাল বারের সামনে পাওয়া সোনার চেন বিক্রির টাকা। বাকি এক হাজার টাকা আমরা সংগ্রহ করে দিয়েছিলাম। রিভলবারটি শ্রীধর তার বাড়ি থেকে দিয়েছিল। প্রদীপ দেব আর নির্মল সিন্‌হা স্টেনগান ও রিভলবার হাবড়া থেকে নিয়ে আসে। বিরাটী স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে বাসে চেপে হোস্টেলে অস্ত্র নিয়ে আসে।

ত্রিপুরার ছেলেরা পালা করে প্রায় প্রতিদিন ফণীভূষণ রায়, স্বপন চক্রবর্তী এদের নেতৃত্বে কুমুদ ভট্টাচার্যের বেহালার বাড়িতে সকালবেলায় দল বেঁধে যেত। হোস্টেলের, বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিস্থিতি তাকে জানাত। ত্রিপুরার ছেলেদের একটাই দাবি ছিল তখনকার ছাত্রপরিষদ সভাপতি কুমুদ ভট্টাচার্যের কাছে তিনি যাতে উদ্যোগী হয়ে হোস্টেলের উত্তেজনাকর এবং অস্বস্তিকর অবস্থার অবসান ঘটান। কারণ আমরা কেউ আর অশান্তি চাইছিলাম না। মানে মানে পড়াশুনা শেষ করে ত্রিপুরাতে ফিরে যাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে পড়েছিলাম।

হোস্টেলের কথা অনেক বলা হল। পরে আরও বলতেই হবে। এখন অন্য প্রসঙ্গ সম্পর্কে কিছু বলা যাক। আমরা কোলকাতা আসার কয়েক মাস পরেই ১৯৭৩ সনের শেষ ভাগে চিলড্রেন্স পার্কের কমিউনিটি হলে এস.এফ.আই-র রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আমি আর বিমল সিন্‌হা সেই সম্মেলনে যোগ দিতে কোলকাতা থেকে আগরতলা চলে আসি। এসেই আমি আর বিমল এস.এফ.আই-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য পদ থেকে

তো বটেই, এমনকি রাজ্য কমিটি থেকে সরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করি। আমাদের যুক্তি ছিল যেহেতু আমরা বেশ কয়েক বছরের জন্য পড়াশুনার কারণে কোলকাতা চলে এসেছি এবং সংগঠনের দৈনন্দিন কাজে থাকতে পারব না সুতরাং আমাদের এস.এফ.আই-র পদ আঁকড়ে রাখার কোন অর্থ নেই। আমাদের বক্তব্য সম্মেলনের উপস্থিত প্রতিনিধিরা বাস্তব কারণেই মেনে নিল। সম্মেলন শেষের আগের দিন রাত্রিতে বটতলা পার্টি অফিসে সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্যে যারা পার্টি সভ্য তাদের নিয়ে পার্টি ফ্র্যাকশন কমিটির সভা হল। নৃপেনদা সেই সভায় বললেন, আমি এবং বিমল যেহেতু দীর্ঘদিন এস.এফ.আই-র কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম সুতরাং আমরা যখনই রাজ্যে আসব তখন এস.এফ.আই-র রাজ্য কমিটির সভায় যাতে আমরা যোগ দিতে পারি তারজন্য আমাদের রাজ্য কমিটির আমন্ত্রিত সদস্য রাখা হোক। আমার আর বিমলের তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও সভায় উপস্থিত পার্টি সভ্যরা নৃপেনদার প্রস্তাব সানন্দে মেনে নিল। আমাদের কোন ওজর আপত্তি টিকল না। আমরা এস.এফ.আই-র রাজ্য কমিটির আমন্ত্রিত সদস্য রয়ে গেলাম। সম্মেলন শেষে যখন আবার কোলকাতা ফিরে যাই তখন স্বজনবিয়োগ ব্যথা নিয়ে ফিরে গিয়েছিলাম। প্রথমবার যখন কোলকাতা গিয়েছিলাম তখন ভর্তির ব্যবস্থা হয়েছে জেনে তাড়াহুড়ো করে চলে গিয়েছিলাম। সবাইকে জানিয়েও যেতে পারিনি। দ্বিতীয় যাওয়াটা হল বন্ধু-বান্ধব, সহযোদ্ধাদের অশ্রুজলের বিনিময়ে। ফিরে গিয়ে আবার থ্রি মাস্কেটিয়ার্স অর্থাৎ আমি, শঙ্করদা আর বিমলের শুরু হল কোলকাতা চষে বেড়ানো। বিমল সব উদ্ভট কাণ্ডকারখানা করত কোলকাতার পথে-ঘাটে। মাঝে মাঝে তার কার্যকলাপে লজ্জা পেতে হত আমাদের। যেমন বাসে-ট্রামে, ট্যাক্সিতে বা চলার পথে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমরা কোলকাতার ভাষায় কথা বলব না। আমাদের কথোপকথন চলত খাস বাংলায় এবং স্বাভাবিকভাবেই পথচলতি মানুষের কৌতূহল উদ্রেক করত। বিমল বাসে চলার সময় যদি কেউ তার পা মাড়াত তবে তাকে উদ্দেশ্য করে বলত, কর্তা রাখুইন না আপনার পদযুগল আমার মাথার উপর রাখুইন। বাসের সমস্ত লোক ফিরে ফিরে তাকাত আমাদের দিকে। বিমল নির্বিকার। আমি আর শঙ্করদা লজ্জায় লাল হয়ে যেতাম। এসপ্লানেড ইস্টে একদিন মেট্রো সিনেমার সামনে শঙ্করদার জন্য অপেক্ষা করছি হঠাৎ বিমল তাকে এক টাকা দেওয়ার জন্য বায়না ধরল। কি প্রয়োজন জিজ্ঞেস করলে বলে না। আমাকে গালি দিয়ে বলে, এঙ্গলের ছাও তুই এত কৃপণ কেনে? তারপরও যখন আমি অনড় তখন বলে—ভাই তোর দুইটা পায়ে পড়ি একটা টাকা দে। কতক্ষণ আর কঠিন থাকা যায়। একটাকা দিলাম। আমাকে অবাক করে বিমল চলে গেল ফুটপাতে আতসকাচ দিয়ে বসে থাকা জ্যোতিষীর কাছে। একটাকা জ্যোতিষকে দেওয়ার পর জ্যোতিষ যখন আতসকাচ নিয়ে বিমলের হাতের রেখা দেখবে বলে হাত টানছে তখন বিমল তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল—আজ্ঞে কর্তা, আপনে নিজের হাত দেইখ্যা কইন যে রৌদ্রের মধ্যে আর কতদিন ফুটপাতে বইয়া মাইনসের হাত দেখন লাগব। জ্যোতিষীর বিস্ময়ে হাঁ করা মুখ আমি সেদিন দেখেছিলাম। সেদিন অনুভব করেছিলাম কুসংস্কার, বুজরুকি, লোক ঠকানো, অবৈজ্ঞানিক জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতির বিরুদ্ধে বিমলের ঘৃণা কত সহজাত এবং আন্তরিক।

একদিন আমি আর বিমল বেহালা থেকে ট্রামে করে এসে নামলাম আলিপুর রেসের

মাঠের কাছে। বিমলকে বললাম ট্যাক্সি ধরে হোস্টেলে ফিরে যাই চল। বিমলকে এও বললাম আমার কাছে পয়সা নেই। বিমল বলল-ট্যাক্সিতে কেন ট্রামে বা বাসে যাওয়ার পয়সাও তার নেই। আমি মূর্খের মত বললাম, তাহলে হেঁটেই চল যাই। বিমল হাঁটা শুরু করল। গরমে গলে যাওয়া পীচে তার হাওয়াই চপ্পলের ফিতে গেল ছিঁড়ে। বিমলের হাবভাবে মনে হল অপরাধটা আমার। হাওয়াই চপ্পলের ফিতে লাগানোব জন্য গুনা সংগ্রহের জন্য আমাকে নির্দেশ দিল। কোলকাতায় কোথায় পাব গুনা। খালি পায়ে হাঁটতে হাঁটতে কলুটোলা স্ট্রীটে হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে গিয়ে পৌঁছলাম। বিমলের ফর্সা শরীর রোদে লাল হয়ে গিয়েছিল। আমার রুমে গিয়ে জামা-কাপড় খুলে বিভাস পোদ্দারেব কাছে, সুব্রত পাল এদেব কাছে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করল। বিভাস বিমলকে পরামর্শ দিল কি একটা অপূর্ব অমৃত তার কাছে আছে যেটা খেয়ে স্নান করে পেটপুবে ভাত খেয়ে ঘুম দিলে বিমলের সব কষ্ট দূর হয়ে যাবে। যথারীতি বিমল তাই করল। বিকেলে উঠল তার ধুম জ্বর। জ্বরে প্রায় বেহুঁশ হওয়ার মত অবস্থা। আমি হোস্টেলে ছিলাম না। বিভাস ভয় পেয়ে দেবুদার সঙ্গে যোগাযোগ করে বিমলকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করে দিল। সন্ধ্যায় হোস্টেলে ফিরে খবর পেয়ে কৈলাসহরের প্রদীপ দেব-কে সঙ্গে করে বিমলের সাথে দেখা করতে গেলাম। আমাদের দেখেই বিমল চিৎকার শুরু করল। নার্সকে ডেকে বলল— সিস্টার, এই দুই যমদূতকে এখান থিকা হরান। হেরা আমাব প্রাণ নিত আইছে। আমি বললাম, ঠিক আছে আমরা চলে যাচ্ছি। তবে তার আগে ওযার্ডেব ডাক্তারেব সঙ্গে দেখা করে তোমাকে ১০-১২টা ইঞ্জেকশন যাতে প্রতিদিন দেয় তার ব্যবস্থা করে যাচ্ছি। আমি জানতাম বিমল সূঁচের ঘা-কে খুব ভয় পায়। বিমল তড়াক করে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে ওয়ার্ড ভর্তি রোগী, ভিজিটর, নার্সেব সামনে আমার পায়ে ধরে কাকুতি মিনতি করতে থাকে। লজ্জায় আমি আর প্রদীপ প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম হাসপাতাল থেকে। সেবার বিমলের লাম্বার-পাংচার করতে হয়েছিল। দেবুদা মেডিকেল কলেজের কর্মচারীদের ইউনিয়ন দেখার জন্য পার্টিগত দায়িত্বে ছিলেন। সুতরাং মেডিকেল কলেজে দেবুদার পরিচিতি ছিল ব্যাপক। বিমলের চিকিৎসার সমস্ত দায়িত্ব হাতে তুলে নিয়েছিলেন দেবুদা। বিমল সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আবার আমাদেব সঙ্গেই সকাল-বিকাল চলতে শুরু করল।

হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের গ্রাউন্ড ফ্লোরে খুব সমৃদ্ধ একটি জিমন্যাসিযাম ছিল। ভারত-বিখ্যাত ব্যায়ামবীর মনতোষ রায়ের পরিকল্পনা মত তৈরি করা হয়েছিল ব্যায়ামাগারটি। প্রায়দিনই সন্ধ্যায় আমাদের আড্ডা জমত ব্যায়ামাগারের বিভাস পোদ্দারের সৌজন্যে। বিভাস কোনদিন আমাকে বলত, ভাই ২০টি টাকা দাও, বোমের মনটা খুব খারাপ। কোনদিন বোমকে বা সুব্রতকে বলত— আমার মন খারাপ। ইত্যাদি মিথ্যে কথা বলে প্রত্যেকের থেকে টাকা নিয়ে ব্যায়ামাগারে আসর বসিয়ে ঘণ্টা বাজাত। আমরা একে একে নীচে নামতাম। অথচ জানতাম না বিভাস আমার কথা বলে বোমের থেকে টাকা নিয়েছে। আবার আমার থেকে টাকা নিয়েছে বোমের কথা বলে। ধরা পড়লেই বিভাস এসে বলত পাছায় একটি লাথি দাও। আমার গুরুদেব বলেছে— অন্যায় করলে, মিথ্যে কথা বললে পাছায় একটি লাথি খেয়ে নিতে। কি আর করা যাবে? এরপর কি আর লাথি মারা যায়?

বিমল প্রতিদিন আমাদের আড্ডায় আসব যখন জমে উঠত ব্যায়ামাগারের সামনে দিয়ে দু'বার-তিনবার আসা-যাওয়া করত। কৈলাসহরের প্রদীপ দেব-কে ডাকত—প্রদীপ শুনি যাও যে, জরুরি কথা আছে। প্রদীপ তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়ে বলত—আপনার জরুরি কথা আমার জানা আছে। আমনে আইতে হইলে ভিতরে আইয়েন। বিমল অনেকক্ষণ প্রদীপের সঙ্গে হম্বি-তম্বি করে প্রতিদিন ব্যায়ামাগারে ঢুকত। যাওয়ার আগে উদয়পুরের শ্যামল ভট্টাচার্যের সঙ্গে কসরৎ করে প্রতিদিন ব্যায়ামাগারের একটি করে ডাম্বেল ভেঙে দিয়ে যেত। এভাবে ভাঙতে ভাঙতে ব্যায়ামাগারের প্রতিটি ডাম্বেল বিমল ভেঙে দিয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কি, বিভাস পোদ্দার, বিমল সিন্‌হা আর সুব্রত পালের যন্ত্রণায় প্রতিদিন আমায় অস্থির থাকতে হত। একদিন সন্ধ্যের পর অনেকক্ষণ হেঁটে বিমল, আমি, শঙ্করদা হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে ঢুকলাম। বিমলকে বললাম, ২০ টাকা পকেট থেকে বের কর। ও প্যান্টের দু'পকেট উল্টে দেখাল এক পয়সাও নেই। আমার আর শামু ওরফে সুব্রত পালের সন্দেহ হল। আমরা ওকে একটি করে কিল দিই বিমল শার্টের হাতা, প্যান্টের গোপন পকেট, মোজার ভেতর থেকে ১৬টি কিল খেয়ে ১৬ টাকা বের করে দিল। তারপর কিল দিলেও আর টাকা বের করে না। সম্ভবত আর ছিলও না। বিমল হাউ-মাউ চিৎকার আরম্ভ করল, এই টাকা নাকি ওর ত্রিপুরা মেসের মাসিক বরাদ্দ টাকা। আমি আর সুব্রত যতই বলি ফেরত দিয়ে দেব কিন্তু বিমল বিশ্বাস করে না। পরে শঙ্করদাকে আমরা টাকার জামিনদার মানলাম। তখন বিমল বলল, ঠিক আছে শঙ্করদা ভদ্রলোক, তাইনে যদি জামিনদার হয় আমার আপত্তি নাই। শঙ্করদা জামিনদার হতে রাজি হলে, বিমল তার কাছ থেকে উদ্ধার করা ১৬ টাকা খরচ করার অনুমতি আমাদের দিয়েছিল। সেই টাকা খরচের পর অবশ্য টাকা ফেরত পাওয়ার জন্য বিমলের আর কোন তাগাদা ছিল না। ১৯৯৫ সনে ও যখন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তখন একদিন কোর্টে এসে যখন বিভিন্ন ব্যাপারে আমাকে বিরক্ত করছিল তখন আমি তাকে বললাম, শামু এখন চীফ জুডিশিয়েল ম্যাজিস্ট্রেট আর শঙ্করদা হাইকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর; তাদের গিয়ে ধর না। আমি তো পার্টি থেকে বেরিয়ে গেছি, আমাকে কেন বিরক্ত করিস। বিমল আমাকে নিয়ে সুব্রত পাল ওরফে শামুর চীফ জুডিশিয়েল ম্যাজিস্ট্রেটের চেম্বারে গিয়ে ঢুকল। শামুকে বলল, হালারপুত আমার ১৬ টাকা সুদে-আসলে ১৬,০০ (ষোলশ) টাকা হইছে। অক্ষন ফিরত দে। আমি বললাম, ১৯৭৪ সনের ১৬ টাকা ১৯৯৫ সনে অর্থাৎ ২১ বছর পর ১৬,০০০ (ষোল হাজার) টাকা হবে। বিমল শামুকে বলল, তাইলে ষোল হাজারই দিতে হইব। শামু বিমলকে বলল, নিশ্চয়ই দিমু, তবে আগে জামিনদার শঙ্কর দাশ-রে লইয়া আয়। তারপর পুরো ব্যাপারটাই হাসি-ঠাট্টার মধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছিল। ১৯৯১ সনে পার্টি ছেড়ে দিয়ে জোট আমলে আমরা সবাই 'ত্রিপুরা দর্পণ' পত্রিকা অফিসে আড্ডা মারতাম। গভীর রাতে বিমলের আগ্রহের আতিশয্যে প্রায়ই সমীরণ ও আমাকে যেতে হত তার কোয়ার্টারে সঙ্গ দেওয়ার জন্য। আমরা পার্টি ছেড়ে দিলেও বিমল আমাদের এক মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারত না। শিয়ালদহ স্টেশনে যেদিন আমি ও বিমল দেখলাম, 'ধূমপান আপনাদের আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়'—স্লোগানের নীচে কে যেন কাঠকয়লা দিয়ে লিখে রেখেছে 'মৃত্যুর জন্য আমাদের তাড়া নেই' সেদিন বিমল হাসতে হাসতে বলল, কোলকাতার লোকেরা আস্তাইজ্জা পুংডা। আজও ভাবি

এত সরল অকৃত্রিমভাবে বিমলই একমাত্র পারত নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে।

বিভাস সাহা, আগরতলা মন্ত্রিবাড়ি রোডে বাড়ি। এখন কোলকাতায় ইনকাম ট্যাক্স ল'ইয়ার। সে আবার বিভাস পোদ্দারের দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছিল। তাকে হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের চারতলার প্রিফেক্ট করেছিলাম। বিভাস পোদ্দার বিমলকে উল্টা-পাল্টা কি যেন খাইয়ে অসুস্থ করে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করিয়েছিল। বিমল হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের চারতলায় আমার রুমে ওঠে। সেখানেই দেখা হয় বিভাস সাহার সঙ্গে। বিমল বিভাস সাহাকে জিজ্ঞেস করে বিভাস পোদ্দার তোমার আত্মীয় হয়নিরে বা। বিভাস সাহা সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে। তখন বিমল বলে, তুমি তো রে বা ভালা পোলা, এই শুয়রের বাচ্চা তোমার আত্মীয় হইল কেম্নে।

মিলু অর্থাৎ শ্যামলী চ্যাটার্জি যে আমাকে বন্ধু হিসাবে সখ্যতা গড়ে তুলেছিল সে আমি হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে চলে এলেও আমার সঙ্গে দেখা করতে চলে আসত। আমাকে বলত, বন্ধু চেষ্টা করে দেখ না আমাকে ভালোবেসে জীবনসঙ্গিনী করা যায় কি না। আমার বন্ধু-বান্ধবদের কাছে গিয়েও আমাকে বিয়ে করার জন্য কাকুতি-মিনতি করত যাতে আমার সম্মতি আদায় করা যায়। আগরতলার বাড়িতে আমার মাকে উদ্দেশ্য করে ও একটি চিঠি লিখেছিল। সৌভাগ্যের ব্যাপার মিলু কোনদিনই কারো কাছে অসত্য কথা বলেনি। বলেছে, ধীরাজ আমার বন্ধু। আমি ওকে ভালবেসে ফেলেছি তার জীবনসঙ্গিনী হওয়ার জন্য একতরফাভাবে। যাহোক, বিমল এত সরল ছিল যে প্রতিদিন শঙ্করদার সামনে আমাকে ধমক দিত মিলুকে বিয়ে করার জন্য। বিমলের যুক্তি ছিল যদি মেয়েটি আত্মহত্যা করে ফেলে তবে কি হবে?

একটা দুঃসহ সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল আমাদের সময়, বিশেষত আমার। খবর পেলাম বন্ধু ও সহযোদ্ধা সুভাষ চক্রবর্তী এক ট্রাক দুর্ঘটনায় উত্তর ত্রিপুরার মাছলিতে ১৯৭৪ সনের ২০শে আগস্ট মারা গেছে। সুভাষ ওরফে হো-চি-মিন আমাদের সবার খুব প্রিয়বন্ধু ছিল। আমি যখন পড়তে কোলকাতা চলে আসি তখন ও 'নাগাল্যান্ড চিট ফান্ড' নামক একটি নন-ব্যাঙ্কিং অর্থনৈতিক সংস্থার ত্রিপুরার ইনচার্জ হিসাবে কাজে যোগ দিয়েছিল। আমাকেও খুব পীড়াপীড়ি করেছিল তার কোম্পানিতে যোগ দিয়ে অর্থনৈতিক-ভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য। চিটফান্ডের কাজকর্ম সম্পর্কে কোন ধারণাই তখন ছিল না। তবুও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার লোভ ছেড়ে কোলকাতা চলে আসি। জেনেছিলাম, অফিসের কাজে ধর্মনগর হয়ে আগরতলা ফেরার পথে ট্রাক দুর্ঘটনা হয়। একটি বাচ্চা ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে সুভাষ ঠিক সময়ে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামতে পারেনি। ট্রাকের স্টিয়ারিং বুকে চেপে ও মারা যায়। দীর্ঘ সময় সুভাষ বেঁচেছিল। কিন্তু খাদের মধ্যে পড়ে যাওয়া ট্রাকগাড়ির স্টিয়ারিং কেটে ওকে ৪/৫ ঘণ্টার মধ্যেও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ৪/৫ ঘণ্টা অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে সুভাষ অবশেষে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। মৃত্যুর সময়ও সুভাষ মানুষের প্রতি তার অসীম ভালবাসা ও দায়বদ্ধতার নিদর্শন রেখে গেছে। আজো সুভাষের কথা মনে এলে আমি আত্মসম্বরণ করতে পারিনা। কোলকাতা চলে আসার সময় ১৯৭৩ সনে একদিন জিরানীয়া খুব অনুরোধ করে আমাকে নিয়ে যায় দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়ি। একটি ১৯/২০ বছরের মেয়েকে আমার সঙ্গে পরিচয়

করিয়ে দেয়। বাসে ফেরার পথে সুভাষ আমাকে বলে সে খুব শীগ্‌গিরই এই মেয়েটিকে বিয়ে করবে। ওরা পরস্পরকে ভালোবাসে। আমি বললাম, তুই পাগল হয়েছিস্? তোর বয়স কত হয়েছে? তাছাড়া বিয়ে করে খাওয়াবি কি? তখনই জেনেছিলাম ওর তখন ২৩ বছর বয়স অর্থাৎ আমার থেকে ও বছর দু'য়েকের বড়। পরে বুঝেছিলাম তাড়াতাড়ি বিয়ের জন্য সুভাষ কেন হন্যে হয়ে চাকরি খুঁজছিল। সুভাষ আমার থেকে কথা আদায় করেছিল ওর বিয়ের সময় যত অসুবিধা থাক আমাকে যেতে হবে। জানিনা কেন ১৯৭৪ সনের ২০শে আগস্ট ওর মৃত্যুর দিন অব্দি ও বিয়েটা করতে পারেনি। যদিও এখন মনে হয় বিয়েটা না করে ভালোই করেছিল সুভাষ। এর আগেই পেয়েছিলাম বন্ধু সুবল পালের আগরতলা খুন হয়ে যাওয়ার দুঃসংবাদ। তার উপর হোস্টেলের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক জটিলতা। সবসময় একটা স্নায়বিক উত্তেজনায় কাটাতে হত আমাদের। কোলকাতায় পড়তে আসা ত্রিপুরার ছেলেরা জীবন নিয়ে ত্রিপুবাতে ফিরে যেতে পারবো কিনা সে বিষয়ে আমরা সন্দিহান ছিলাম। আমি খুব আশ্চর্য হয়ে পড়েছিলাম এই ভেবে যে কংগ্রেস সমর্থক ছেলেদেরও সিদ্ধার্থ রায়ের আমলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণে নিরাপত্তা বলতে কোন জিনিস ছিল না। সেদিক থেকে চিন্তা করতে গেলে শঙ্করদা, বিমল বা আমার কোন সমস্যা ছিল না। আমরা হোস্টেলে না থেকে বাইরে যে যেখানে ছিলাম সেখানে থেকে নিরাপদেই পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে পাবতাম। কিন্তু ত্রিপুরার ছেলেদের যারা কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বা রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হোস্টেলে থাকত তাদের অবর্ণনীয় যন্ত্রণা আমাদের সকলকে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনের গ্রন্থিতে আবদ্ধ করেছিল। যন্ত্রণায় বিদ্ধ হলেও বিকল্প কিছু করার ছিল না। ১৯৭২ সন থেকে ১৯৭৭ সন পর্যন্ত যারা কোলকাতাকে দেখেছেন বা কোলকাতায় থেকেছেন তারা ছাড়া সেই বিপন্ন সময়ের দুঃসহ যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি কেউ কল্পনায় আঁচ করতে পারবেন না। শুধু অনুমানের জন্য বলছি—সেই পাঁচ বছরের সিদ্ধার্থ জমানা কংগ্রেসী শাসনের দুঃস্বপ্নের স্মৃতি পশ্চিমবঙ্গের লোককে আজো তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে বলেই শত দুর্বলতা সত্ত্বেও বামপন্থীরা একনাগাড়ে ৩০ বছর ধরে পশ্চিমবাংলা শাসন করতে পারছে। পশ্চিমবাংলায় বামপন্থীদের ক্ষমতা দখল এবং ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের নেপথ্য ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একা মানুদা সর্বভারতীয় কংগ্রেস দলটিকে পশ্চিমবাংলায় অন্তর্জলিযাত্রায় পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন। কংগ্রেসের ট্রেড ইউনিয়নের প্রয়াত এন.এল.সি.সি নেতা লক্ষ্মীকান্ত বোস আমাকে একান্ত আলাপচারিতায় বলেছিলেন মানুদা অর্থাৎ সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের মত লোক কংগ্রেস দলের নেতৃত্ব দিলে সে দল নীলামে উঠতে বাধ্য। প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন এডভোকেট জেনারেল স্নেহাংশু আচার্য এবং মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা প্রয়াত রাম চ্যাটার্জি ছিলেন লক্ষ্মীদার খুব কাছের লোক, শুভাকাঙ্ক্ষী। লক্ষ্মীদা আমাকে বলেছিলেন, স্নেহাংশুদা এবং রাম চ্যাটার্জি কতবার ওনাকে কত বিপদে কিভাবে সাহায্য করেছিলেন। তাই লক্ষ্মীদার বক্তব্য ছিল এদের মত লোক কংগ্রেসে আছে বলেই জনগণ কংগ্রেস থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। তিনি বলেছিলেন, তবুও আমি কংগ্রেস করি আমার পারিবারিক রাজনৈতিক আনুগত্যের কারনে। কিন্তু শ্রদ্ধা করি স্নেহাংশু আচার্য, রাম চ্যাটার্জির মত উদার, বন্ধুবৎসল মানুষদের। মন থেকে ঘৃণা করি সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের মত

মানুষদের। তিনি বলতেন, সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় শুধুমাত্র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নাতি— এই পরিচয়ের সুবাদে রাজনৈতিক মুনাফা আদায় করে রাজনীতি করে যেতে পারছেন, আসলে তিনি দেশবন্ধুর কুলাঙ্গার নাতি। সেই সময়ে স্যার আশুতোষ মুখার্জির স্মৃতি বিজড়িত কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য ভূলুণ্ঠিত করে দিয়েছিল ছাত্রপরিষদ নামক ছাত্র সংগঠনটি। কোন পরীক্ষা সঠিক সময়ে হত না। গণটোকাটুকি ছিল প্রত্যেক পরীক্ষায় অবধারিত সত্য। ছাত্র সংসদের ইউনিয়ন রুমে বসে যারা পরীক্ষা দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করত তারা যতক্ষণ খুশি বই দেখে টুকে উত্তর লিখতে পারত। একজনের হয়ে আরেকজন পবীক্ষায় বসতে পারত। কোন ইনভিজিলেটর পরীক্ষা হলে অর্থাৎ ইউনিয়ন রুমের হলে প্রবেশ করতেন না তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। ইউনিয়ন রুমে বসে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট একটি টাকা ইউনিয়ন ফান্ডে জমা দিতে হত। ইউনিয়ন রুমে বসে পরীক্ষা দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে কত না ধরাধরি, উমেদারি করতে হত কি আর বলব। তারপরও কোন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে খাতা বিভিউ করিয়ে তাকে পাশ করানোর জন্য ইউনিয়ন তহবিলে চাঁদা দিতে হত। অবশ্যই অসাধ্য সাধন হয়ে যেত। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কোর্সে ভর্তির জন্য মেরিট লিস্ট ছাড়া ইউনিয়নের একটা লিস্ট হত। ইউনিয়নের লিস্টে ভর্তি তালিকায় নাম তুলতে হলে মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করতে হত এবং সফল হলে মেধা ছাড়াও ভর্তি হওয়া যেত। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা হতে পারলে সে সময়ে ২/৩ বছরে কোটি টাকা কামিয়ে নেওয়া' অসম্ভব কিছু ছিল না। ত্রিপুরার যত ছেলেমেয়েকে আমি সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি করিয়েছি ইউনিয়ন তালিকায় বা হোস্টেলে ভর্তি করিয়েছি, খাতা রিভিউ করিয়ে পাস করার ব্যবস্থা করে দিয়েছি তাদের সবার কাছ থেকে যদি ইউনিয়নের ধার্য টাকা নিতাম তবে আমিও সে সময় কোটিপতি বনে যেতে পারতাম। যাদের অনৈতিকভাবে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছিলাম তাদের প্রত্যেকেই আজ সমাজের বিভিন্ন স্তরে, কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত সুতরাং তাদের নাম উল্লেখ করে বিব্রত করতে চাই না। তখনকার সময়ে কোলকাতা আইন কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ছিলেন বলাই চন্দ্র পাল। তিনি প্রিন্সিপাল হওয়ার জন্য মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। ইউনিয়নের ব্যাকিং-এর জন্য তিনি এসে আমাকে হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে ব্যাডমিন্টন খেলা অবস্থায় পাকড়াও করলেন। ওনার সব কথা সবিস্তারে বলে তিনি বললেন, আমার ল' পরীক্ষার ফাইনালের রোল নং টা যেন তাকে দিই তিনি আমাকে পরীক্ষায় প্রথম করে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট থেকে আইন কলেজের স্পোর্টস বাজেটে কয়েক লক্ষ টাকা বেশি মঞ্জুর করিয়ে দেবেন। সবটাই যাতে আমি আমার খুশি মত খরচ করতে পারি বা টাকাটা তুলে স্রেফ এডজাস্টমেন্ট ভাউচারের ব্যবস্থা করে দিই। উনি সবটাই একসেপ্ট করে নেবেন। আমি সবিনয়ে বলাইবাবুকে জানিয়েছিলাম আমি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের ছাত্র নই, সুরেন্দ্রনাথ ল' কলেজের ছাত্র এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রবীন্দ্রভারতীর এম.এ স্টুডেন্ট। সুতরাং আমাকে সাহায্যের কোন সুযোগ তার নেই আর থাকলেও আমি তার সাহায্য নিতাম না। তাকে সাহায্য করার কোন সুযোগ আমার নেই যদি থাকত তবে অবশ্যই তাকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকতাম। বলাইবাবু অবাক হয়ে আমার দিকে

তাকিয়েছিলেন এবং নিশ্চিতভাবেই ভাবছিলেন আমি কোলকাতা আইন কলেজের ছাত্র না হয়ে কিভাবে হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে আছি এবং গোটা ইউনিয়ন পরিচালনা করছি। কার্যত আমি নই, ইউনিয়ন পরিচালনা করত আমাদের ত্রিপুরার ছাত্রপরিষদের ছেলেরা তাদের কোলকাতার শুভানুধ্যায়ী বন্ধুদের নিয়ে। আমি পেছন থেকে তাদের পরামর্শ যোগাতাম। তাতেই সবাই ধারণা করত আমিই বোধহয় ইউনিয়নের হর্তাকর্তা। জানি না অন্য কেউ স্বীকার করবে কি না তবে আমি সে সময়কার পড়াশোনার পবিবেশ বোঝাতে গিয়ে একটি উদাহরণ দিচ্ছি। আমি আইনের স্নাতক এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নিয়েছি। কিন্তু কোন পবীক্ষা আমি দিই নি। আমার হয়ে কে দিয়েছে আমি মনে করতে পারছি না। আমি পরীক্ষার সময় হোস্টেলে ঘুমিয়েছি। আমাকে খুশি করার জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কেউ গিয়ে আমার পরীক্ষা দিয়ে এসেছে। আমি সিদ্ধার্থ জমানার আইনের স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রীপ্রাপ্ত। আমাব মত আরো অনেকেই আছেন। জানি না, ছেলেপুলেদের কাছে খাটো হয়ে যাওয়ার ভয়ে তারা এই চরম সত্য কথাটি স্বীকার করবেন কিনা। ভাগ্যিস আমি শিক্ষকতার চাকরি নিইনি। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো আমাদের মধ্যে আমার জানা মত অনেকে শিক্ষকতার চাকরি নিয়েছেন সিদ্ধার্থ জমানায় পাশ করে। আমার বিশ্বাস আর যাই হোক শিক্ষকতা করার নৈতিক অধিকার আমাদের কারোর নেই। আইন ব্যবসা করছি। সেটা আলাদা ব্যাপার। আমাদের যোগ্যতা বিচার না করে কোন মক্কেল আমাদের কাছে আসবে না। মক্কেলের স্বার্থরক্ষার জন্য ডিগ্রী যেভাবেই পাই না কেন আমাদের এখন নিজেদেব যোগ্য করে তোলার জন্য অধ্যবসায় এবং পরিশ্রম করতে হচ্ছে। লোক ঠকানোর কোন অবকাশ নেই।

পবপর ২/৩ দিন হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে গুরুতর প্রসঙ্গ আলোচনা করেছি। আরো গুরুতর বিষয়ে ঢোকার আগে আমার দেখা দু'চারজন বর্ণময় এবং বিচিত্র চরিত্রের মানুষের প্রসঙ্গ অবতারণা করছি। হাবড়ার অসীম ওরফে বোম, গোবিন্দ, শ্রীধর, লব-কুশ এদের প্রসঙ্গ আগেই উল্লেখ করেছি। লব-কুশ ছিল যমজ ভাই। এরা ৪ জনই ছিল হাবড়ার ত্রাস। আমি এদের যত দেখতাম অবাক হয়ে যেতাম। এরা এত বন্ধুবৎসল ও অমায়িক ছিল যে কয়েকদিনের মধ্যেই ত্রিপুরার ছেলেদের কাছে এরা গ্রহণযোগ্য এবং আপনজন হয়ে ওঠে। সবাই ছিল মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। বোম রবীন্দ্রভারতী হোস্টেলের সময় থেকেই আমাদের সঙ্গে ছিল। বোমের সুবাদেই তার হাবড়ার অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় এবং অন্তরঙ্গতা। বোমের সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল আমার সঙ্গে এবং সে একমাত্র আমার নির্দেশ অবলীলায় মেনে চলত। জানি না—তার কারণ কি ছিল। আমি অনুভব করতে পারতাম এরা সকলে নকশাল আমলের বিভিন্ন খুন, জখম, রাহাজানির মামলায় নাজেহাল হয়ে সেসব মামলা থেকে অব্যাহতি পেতে কংগ্রেস দলে যোগ দিয়েছিল। কোলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন রেজিস্ট্রার হরষিত ঘোষের মাধ্যমে বোম এদের কংগ্রেস দলের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। হরষিত ঘোষের ছোটভাই বর্তমানে প্রয়াত অমর ঘোষ ছিল হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে ছাত্রপরিষদ নেতা। সুব্রত মুখার্জি, প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি এদের সমসাময়িক। কংগ্রেস রাজনীতিতে থাকলে যা হয়, বোম, লব-কুশ, গোবিন্দ, শ্রীধর এরাও বিভিন্ন গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জড়িয়ে একে অপরকে অবিশ্বাস, সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছিল।

উপরে উপরে যতই পরস্পরের সঙ্গে এরা ভাব দেখাক না কেন, ভেতরে ভেতরে এরা ক্রমেই একে অপরের শত্রু হয়ে উঠছিল। নিজস্ব লোকের মাধ্যমে এরা সকলে হাবড়ায় নিজস্ব, ব্যক্তিগত প্রভাব বাড়াতে উদ্যোগী ছিল। গোষ্ঠী চালাতে গিয়ে অর্থের প্রয়োজন হত। অসামাজিক বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের সেই টাকার যোগান দিতে বাধ্য করত। যেহেতু এদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমাদের সদ্‌ভাব ছিল এদের ব্যক্তিগত বিরোধে আমরা কেউ মাথা ঘামাতাম না। কিন্তু যেহেতু বোম আমাদের হোস্টেল-মেট ছিল এবং তার সুবাদেই সবার সঙ্গে আমাদের পরিচয় সুতরাং সহানুভূতি ছিল আমাদের বোমের প্রতি। হাবড়ার বন্ধু-বান্ধবরা হোস্টেলে এলে আমরা সতর্ক দৃষ্টি রাখতাম বোমের বন্ধু-বান্ধবদের গতিবিধির উপর যাতে কোন অসতর্ক মুহূর্তে বোমের ক্ষতি না করতে পারে। বোম যখনই হাবড়া যেত আমি সবসময় ২/৩ জন বিশ্বস্ত বন্ধু-বান্ধব বোমের সঙ্গে দিয়ে দিতাম যাতে হাবড়ায় ওর কোন ক্ষতি কেউ না করতে পারে।

কিন্তু ১৯৭৭ সনের অক্টোবর মাস বা নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আগরতলা চলে আসি পড়াশুনা শেষ করে। তারপর আমার বা আমাদের কারোর পক্ষে আর বোমকে পাহারা দিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। বোম, গোবিন্দ, লব-কুশ সবাই আততায়ীর হাতে খুন হয়ে গেছে। সবার শেষে খুন হয়েছে বোম, সল্টলেকে তার নিজস্ব ফ্ল্যাটে। হাবড়ার উঠতি মাস্তানরা পয়েন্ট-ব্ল্যাক-রেঞ্জ থেকে বোমের চেম্বারে ঢুকে গুলি করে তাকে হত্যা করে। এর পূর্বেই বোম বিয়ে করেছিল। সন্তানও আছে শুনেছি। দুর্ভাগ্য আমার এতদিনের পুরানো বন্ধু বোম কিন্তু তার স্ত্রী ও সন্তানদের চিনিনা, জানিনা। একমাত্র শ্রীধর সম্ভবত বেঁচে আছে। শ্যামবাজার এলাকায় শিফ্‌ট করে ও চলে এসেছিল আমাদের কোলকাতা থাকা অবস্থায়ই। সে কারণেই সম্ভবত সে নিরাপদ থাকতে পেরেছে।

অসীম ব্যানার্জি ওরফে বোম ছাড়া পশ্চিমবাংলার আর যে কয়জন আমাদের নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসতেন এবং বিভিন্ন বিপদে আপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তারা হলেন ফণীভূষণ রায়, শিলিগুড়ির পীযূষ ঘোষ, খড়গপুরের কান্তি ঘোষ প্রভৃতি। ফণীদা ছিলেন বয়সে এবং পড়াশোনার ক্লাশের বিচারে আমাদের সিনিয়র। কুমুদ ভট্টাচার্যের অনুগামী। অত্যন্ত সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক। অনুকূল ঠাকুরের অন্ধ ভক্ত। এখন ঋত্বিক হয়েছেন। দেওঘর নিয়ে মেতে থাকেন। সম্প্রতি কোলকাতা কর্পোরেশন থেকে অবসর নিয়েছেন। কোলকাতা টালা ট্যাঙ্কের পাশে পাইকপাড়া ফ্ল্যাট কিনে আছেন। এখনও মাঝে মাঝে ফোন করেন, কুশল বিনিময় হয়। কোলকাতা থাকাকালীন কিভাবে যে আমাদের সবাইকে সাহায্য করেছেন, আশ্রয় দিয়েছেন বুক পেতে সে কথা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। অহেতুক আমাদের জন্য বারবার বিপদে জড়িয়েছিলেন। গ্রেপ্তারবরণ করেছেন। কোলকাতা ছেড়ে আসার শেষদিন পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে সুখে-দুঃখে জড়িয়েছিলেন। আমাদের ত্রিপুরার এক বন্ধুকে সন্তানের মত অসীম মমতায় ২/৩ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে সুস্থ করে তুলেছেন। আজকালকার দিনে নিজের সহোদরও এমন করে বলে শুনিনি। শুনেছি সেই বন্ধুটি একমাত্র ফণীদার কৃতজ্ঞতার দায় স্মরণে রেখেছে। জেনে খুব ভাল লেগেছে। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিয়নের কর্মকর্তা জগন্নাথ দে (কোলকাতা কর্পোরেশনের কর্মী), কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের ব্যবসায়ী মুকুলদা প্রভৃতির

ভালোবাসা, সাহায্য, সাহচর্য আমাদের বিপদের সময় আপ্লুত করে দিয়েছিল। কান্তিদা বয়সে আমাদের বড় ছিলেন। তার মন ছিল সমুদ্রের মত বিশাল। আমাদের ২/৩ বার খড়গপুর নিয়ে গেছেন। সুব্রত মুখার্জির অনুগামী হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সঙ্গে মিশেছেন। আমি প্র্যাকটিশ শুরু করার পর দু'বার আগরতলা এসে আমার আতিথেয়তা গ্রহণ করেছেন। কান্তিদা বেশ কয়েক বছর হল মারা গেছেন। শুনেছি হতাশা থেকে অতিরিক্ত বেহিসেবি মদ্যপানই তার মৃত্যুর কারণ। পীযূষ ছিল আমার জুনিয়র, আমার পরম স্নেহভাজন ছোটভাইয়ের মত। সে আর রামনগর ৪ নং রোডের শেখর দত্ত ছিল মানিক-জোড়। এরা দু'জন অসীম ভালোবাসায় আমার জামা-কাপড় কেচে দেওয়া, শরীরে পালা করে সপ্তাহে অন্তত ২ দিন সাবান ঘষে দেওয়া, আমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা, টাকা পয়সার হিসাব রাখা সব কাজ করত। পীযূষ খুব সুশ্রী, শৌখিন এবং স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে ছিল। শিলিগুড়িতে ওর এখন আইনের ব্যবসায় পসার খুব ভাল। শেখর দত্ত, সুব্রত পাল ওরফে শামু এবং আমার সঙ্গে পীযূষের নিয়মিত যোগাযোগ আছে। পীযূষ খুব মেজাজী ছেলে ছিল। এখনও তার সেই মেজাজ অক্ষুন্ন আছে। পীযূষ আমরা হোস্টেলে পড়াকালীন সময়ে আগরতলা ঘুরে গেছে। আমি মেয়েদের নিয়ে সস্ত্রীক শিলিগুড়ি ওর বাড়িতে গিয়ে বেশ কয়েকদিন ছিলাম। চলে আসার সময় ওর শিশুর মত কান্না আমার মত পাষাণকেও টলিয়ে দিয়েছিল।

এবার চলে আসি বর্ধমানের রাজকুমার কোনারের প্রসঙ্গে। খুবই দরিদ্র কৃষক পরিবারের ছেলে। মুখ ভর্তি বসন্তের দাগ। বয়সে আমাদের বেশ কয়েক বছরের বড়। উগ্র সি.পি.আই (এম) সমর্থক। কিন্তু রাজুদা এতই রসিক ছিলেন যে কংগ্রেসী ছেলেরাও তাকে কিছু বলত না। তাছাড়া প্রথমদিকে রবীন্দ্রভারতীতে রাজনৈতিক পরিচয় গোপন করেই ভর্তি হয়েছিলেন বলে মনে হয়। পরে চলতে চলতে আমরা তার রাজনৈতিক পরিচয় জানতে পারি। ত্রিপুরা দর্পণের সম্পাদক সমীরণ রায়ের মাসতুতো কাম জ্যেঠতুতো দাদা বিভাস পোদ্দারের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন রাজুদা। সে সময়ে এই দু'জনের প্রেমের অভিসার আমরা হাঁ করে দেখতাম। রাজুদা প্রেম করতেন রুবি বৌদির সঙ্গে। তার সঙ্গেই পরে রাজুদার বিয়ে হয়। হুগলি থেকে রুবি বৌদি এম.এ ক্লাশ করতে রবীন্দ্রভারতী জোড়াসাঁকো লনে আসতেন। রুবিদিকে প্রায়ই রাজুদা হাওড়া থেকে ট্রেনে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসতেন। রুবিদির বাবা এই প্রেমপর্বের ঘটনা জেনে কিছু স্থানীয় মস্তান লাগিয়েছিলেন রাজুদার পেছনে। রাজুদার সরস কথাবার্তা শুনে ওরা হাত গুটিয়ে নেয়। রাজুদার হবু শ্বশুর নিজেই আসরে নামেন। রাজুদাকে একদিন ডেকে বলেন, বাবা কাল থেকে তুমি কি রুবিকে বোনের মত দেখতে পারবে না আমাদের দিকে চেয়ে। রাজুদা চটজলদি হবু শ্বশুরকে বলেছিলেন, কাল থেকে আপনি আমার হবু শাশুড়ি মা-কে আমার মুখের দিকে চেয়ে বোনের মত দেখতে পারলে আমিও পারব। রাজুদার হবু শ্বশুর রেগে গিয়ে বলেছিলেন, তুমি যদি জোর করে রুবিকে বিয়ে কর তবে তুমি ওর মন পাবে না, শুধু শরীরটা পাবে। রাজুদার উত্তর ছিল সেটাই তো আমি চাই। শুনেছি বিয়ের পর রাজুদার শ্বশুরের সঙ্গে সম্পর্ক সুমধুর হয়েছিল।

১৯৭৪ সন আমি তখন কলেজ স্ট্রীটে মেডিকেল কলেজ হোস্টেল 'শীল ম্যানসানে'

এম. বি. বি. এস. পাঠরত বন্ধু সুবল দেবনাথের গেষ্ট হয়ে পরম সুখে দিনাতিপাত করছি। আগরতলা থেকে আশ্রম চৌমুহনীর বন্ধু দীপক দেবনাথ গিয়ে কোলকাতা উঠল। উদয়পুরের জেলা জজ কোর্টের বর্তমান পাবলিক প্রসিকিউটর বিপ্লব দত্ত তখন হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে ৪ তালায় থাকত। আপাত নিরীহ প্রকৃতির বিপ্লব ছিল রসে ভরা। হিন্দী সিনেমার কমেডিয়ান কেষ্ট মুখার্জীর অভিনয় করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিত। হোস্টেলের এত টালমাটাল অবস্থার মধ্যে তার অবস্থান কোথায় কেউ বুঝতে পারত না। কিন্তু যখনই আমরা বিপদে পড়েছি বিপ্লব আমাদের সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করত, সাহায্যের চেষ্টা করত।

সে যাহোক, দীপক, বিপ্লব আর সুবলের ছিল প্রেম করে বেড়ানোর রোগ। এরা প্রতিযোগীতা দিয়ে কত প্রেম যে করেছে আমি তার হিসেব দিতে পারবনা। তবে বিপ্লব এবং দীপকের প্রেম রজনীর প্রথম রাতেই স্নায়বিক উত্তেজনায় পরিসমাপ্তি ঘটত। বেশীদূর এগোনোর ক্ষমতা বা সাহস কোনটাই এদের দু'জনের ছিল না। সেদিক দিয়ে বন্ধু সুবল দেবনাথ অনেক সাহসী এবং দক্ষ সার্জারীঃ ডাক্তার হয়ে উঠেছিল। কখন কোন প্রেম কতটুকু এগিয়ে নিয়ে সার্জিক্যাল অপারেশন করে বাদ দিয়ে দিতে হবে সে ব্যাপারগুলো তার নখদর্পণে ছিল।

ইষ্ট বেঙ্গল-মোহনবাগান ফুটবল খেলার দিন ঠিক হল। দীপক, সুবল এরা ঠিক করল ময়দানে রাত্রিতে লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কেটে খেলা দেখবে। আমাকে খুব অনুরোধ করল রাত্রিতে ওদের সঙ্গে গিয়ে টিকিটের লাইনে দাঁড়াতে। আমি সুবল এবং দীপককে বললাম, আমি জীবনে লুডো খেলিনি অলসতার কারণে সুতরাং আমাকে ফুটবল খেলা দেখার জন্য প্রলুব্ধ করে লাভ নেই। সুবল, দীপক, তপন দত্ত এবং পশ্চিমবাংলার আরো ৭/৮ জন এম. বি. বি. এস. ছাত্র রাত্রি.৯টা নাগাদ রাতের খাবার খেয়ে ট্রাম ধরে ময়দানের দিকে বেরিয়ে গেল। আমি মহানন্দে খাওয়া-দাওয়া সেরে লম্বা ঘুম দিলাম। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে দেখলাম আমার জন্য এক বিস্ময় অপেক্ষা করছে। হোটেলের দারোয়ানের কাছে জানলাম রাত ৩টা নাগাদ সুবল, দীপকসহ গোটা টিম হোস্টেলে ফিরে এসেছে। প্রত্যেকেই মেডিকেল কলেজ ইমারজেন্সিতে তাদের ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ লাগিযে হোস্টেলে ফিরেছে।

খোঁজ নিয়ে জানলাম— ময়দানের টিকিটের লাইন সুশৃংখলভাবেই এগুচ্ছিল। খোড়সওয়ার পুলিশ লাইন পাহারা দিচ্ছিল। রাতের শেষ বাস এবং ট্রামে যাদবপুর থেকে এক দঙ্গল ইষ্টবেঙ্গল সমর্থক বাঙাল এসে লাইনে দাঁড়ায়। এদের মধ্যে রসিক কেউ ঘোড়েসওয়ার পুলিশের অজ্ঞাতে ঘোড়ার পাছায় সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরো লাগিয়ে দেয়। ঘোড়া উন্মত্তের মত ছুটতে ছুটতে লাইন ভেঙে দেয়। ঘোড়েসওয়ার পুলিশ পাগলের মত লাঠিচার্জ শুরু করে। গোটা লাইন ভেঙে দীপক, সুবল ওরা লাঠির বাড়ি খেয়ে ড্রেনে পড়ে যায়।

রাত্রি বেলা কেউ হাত ভেঙ্গে, পা ভেঙ্গে ট্যাক্সি করে হোস্টেলে ফিরে আসে। পরের দিন ওরা ময়দানে খেলা দেখতে যাওয়া তো দূরে থাক বিছানা থেকেই উঠতে পারেনি।

কোলকাতা বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রীটে অবস্থিত গোয়েঙ্কা কলেজ অব কমার্সের পাশেই ছিল ছানাপট্টি। সেখানেই আড্ডা দিতেন দেবুদা অর্থাৎ দেবব্রত দত্তগুপ্ত, যিনি এখন পশ্চিমবাংলায় বিশিষ্ট বামপন্থী লেখক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। পশ্চিমবাংলা সরকারি কর্মচারী



দেবু দত্তগুপ্ত

কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র 'সমন্বয়' প্রকাশের প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দেবুদা। দেবুদা ছিলেন আমার, বিমল ও শঙ্করদার ফিলোসফার এবং গাইড। সত্যিকারের সব্যসাচী বলতে যা বোঝায় দেবুদা আমাদের চোখে ছিলেন তারই প্রতিমূর্তি। দেবুদা ছিলেন জ্ঞানী, সুলেখক, বক্তা, সংগঠক, তার্কিক এবং অপূর্ব সেতারবাদক। পাশাপাশি তিনি ছিলেন প্রচণ্ড সাহসী এবং যে হাতে সেতার বাজান সেই হাতে নিখুঁত বোমা বানাতে পাবতেন, অব্যর্থ লক্ষে রিভলবারের নিশানা ছুঁড়তে পারতেন। আমরা ছিলাম দেবুদার অনুরক্ত ভক্ত। ছিলাম কেন বলছি এখনও আছি।

১৯৭৪ সনে দেবুদাকে নিয়ে আমি ও বিমল আগরতলা আসি। তখন শীতকাল। বিমলের আমন্ত্রণে দেবুদাকে নিয়ে আমি কমলপুর যাই। বিমলের তখন মেদহীন ধবধবে ফর্সা কন্দর্পকান্তি চেহারা। কমলপুব মহকুমা, কৈলাসহর মহকুমায় তার রবিনহুড ইমেজ। বিমল আমাদের ভুজরুং-ভাজরুং দিল। কমলপুরের হালাহালি এলাকা থেকে পাহাড়ি পথে পায়ে হাঁটা রাস্তায় নাকি ৩/৪ ঘণ্টার মধ্যে কৈলাসহর পৌঁছে যাওয়া যায়। আমরা বললাম মন্দ কি ? দেবুদা ত্রিপুরার পাহাড়ও দেখলেন আবার আমরা ৩/৪ ঘণ্টায় কমলপুর থেকে কৈলাসহর পৌঁছে গেলাম। যাতে সন্ধ্যার সময় বা তার কিছুক্ষণ পরে কৈলাসহর পৌঁছতে পারি সে অনুযায়ী বিমলের নির্দেশিত পথে হালাহালি থেকে বেলা ৩টা ৩-৩০ মিঃ নাগাদ রওয়ানা দিলাম। পাহাড়ি পথে হাঁটছি তো হাঁটছি—পথ আর শেষ হয় না। ৪/৫ ঘণ্টা হেঁটে ফেলেছি, রাত্রি ৮টা-৮.৩০ মিঃ বাজে। পথ তবু শেষ হয় না। আমাদের তবু পাহাড়ি পথে হাঁটার কিছুটা অভ্যাস আছে, দেবুদার তো তাও নেই। তাছাড়া দেবুদার শ্বাসকষ্টের সমস্যা অর্থাৎ 'এজমা' ছিল। দেবুদার শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হল। তিনি হাঁফাতে লাগলেন। আমরা বিশ্রাম নিয়ে দেবুদার একটু শ্বাসকষ্ট কমলে হাঁটতে শুরু করি। তারপর পালা করে আমি আর বিমল দেবুদাকে কাঁধে নিয়ে চলতে আরম্ভ করি। মনে হয় ঘুরে ফিরে একই জায়গায় ফিরে আসছি। বুঝলাম বিমল রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে। অরণ্যের অদ্ভুত শব্দ, বাতাসের ঝটকা, পাতার মর্মর ধ্বনি গায়ে কাঁটা তুলছিল। ভাগ্যিস শীতকাল বলে সাপের উপদ্রব ছিল না। গাছের ছায়ায় ঢাকা পাহাড়ি ঝরণায় হাত-পা-মুখ সব ধুয়ে নিচ্ছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে শীত অন্তর্হিত হয়ে শরীর ঘামে লেপ্টে গিয়েছিল। বিমল তাড়া দিল তাড়াতাড়ি কর। হাতিরা নিঃশব্দে বনে পদচারণা করে, ঝরণার জলে জল খেতে আসে। লাফ দিয়ে ঝরণা থেকে উঠে পড়লাম। ভাবলাম বনের পথ তো আর শেষ হবে না। আমরা তো আজ বাঘের খাদ্য। তাই খাদকের হাতে পৌঁছানোর আগে অরণ্যের, পর্বতের সৌন্দর্য প্রাণভরে দেখে নিই। সত্যি, জীবনে সেদিনই ভয়াবহ সংকটে অরণ্য এবং পর্বতের বিশাল, ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবলোকন করেছিলাম।

পথ হারিয়ে ফেলা পথিকের মত যখন উদ্দেশ্যবিহীনভাবে হাঁটছিলাম তখন হঠাৎ

একটি আলোকবিন্দু নজরে এল। সেই আলোকবিন্দু অনুসরণ করে আমরা হাঁটা শুরু করলাম। দেবুদার শ্বাসকষ্ট এত প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, এক মিনিটের পথ তাকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যেতে পাঁচ মিনিট লেগেছিল। অবশেষে ভোর ৩/৪টা নাগাদ সেই আলোর উৎসের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম।

আমাদের অবাক হওয়ার পালা তখনও শেষ হয়নি। দেখলাম একটি গোটা উপজাতি পরিবার সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে বনের কাঠ, শুকনো পাতা জড়ো করে আগুন জ্বালিয়ে তার চারপাশে বসে আছে। ১৯৭৪ সনে ত্রিপুরাতে শীতের আধিক্য ছিল প্রবল। পরিবেশের ভারসাম্যের পরিবর্তনের ফলে এখন শীত কমতে কমতে প্রায় শূণ্যের কোঠায় তাও স্বল্প সময়ের জন্য যখন এসে দাঁড়িয়েছে তখন সে সময়কার শীতের প্রাবল্য বোঝানো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আমরা অবশ্য তখন রাত্রিতে বনের মধ্যে পথ হারিয়ে জীবন শংকায়, হাঁটতে হাঁটতে বোধশক্তি হারিয়ে শীত অনুভব করার সামর্থ হারিয়ে ফেলেছি। আগুনের কুণ্ডলীর কাছে গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন প্রথম পথশ্রমের ক্লান্তি, ক্ষিদে এবং তীব্র শীত অনুভব করলাম। দীর্ঘ সময় পর প্রাণের স্পন্দন অনুভব করলাম। মানুষের দেখা পেয়ে হৃদয় একটু সহমর্মিতার জন্য তৃষ্ণার্থ হয়ে উঠল। উপজাতি পরিবারটি আমাদের দেখে ত্রাস্ত হয়ে পড়ল কিছুটা হয়ত বা সংকোচে। নগ্ন উপজাতি রমণী ত্বরায় শীর্ণ কুটিরে ঢুকে শত ছিন্ন একটি কাপড়ের টুকরো গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে এলেন। স্বামীকে এক টুকরো ছেঁড়া পাছড়া দিলেন লজ্জা নিবারণের জন্য। তাদের নাবালক তিনটি ছেলেমেয়ে আগুনের চারদিকে উলঙ্গ অবস্থায়ই আগুনের তাপ নির্বিকারভাবে পোহাতে লাগল। বুঝলাম শীত নিবাবণের জন্য এদের কোন বস্ত্রসামগ্রী নেই। তাই শীতের মরশুমে এরা আগুনের চারপাশে সারারাত বসে থেকে শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচার চেষ্টা করে। ভাগ্যিস আমাদের সঙ্গে বিমল ছিল। সে ককবরক ভাষায় আমাদের অবর্ণনীয় দুর্দশার কথা বুঝিয়ে বলার পর উপজাতি রমণীটি এদের ঘরে থাকা পরের দিন এদের খাবারের জন্য সঞ্চিত চাল ফুটিয়ে ভাত এবং একটি পেঁপে শুধুমাত্র কাঁচালঙ্কা দিয়ে ঝোল তৈরি করে দিল। পেঁপের তরকারি প্রচণ্ড ঝাল হয়েছিল। আহা-উহু করতে করতে আমি আর বিমল ক্ষুধার তাড়নায় সবটুকু ভাত এবং তরকারি খেয়ে ফেলেছিলাম। সেই খাওয়াই তখন অমৃতের মত মনে হয়েছিল। ঝালের জন্য দেবুদা একমুঠ ভাতও খেতে পারেনি। আগুনের কুণ্ডলীর পাশে বাকি রাতটুকু বসে ওদের সঙ্গে গল্প করে কাটিয়েছি। সে সময়ে উপজাতি পরিবারের কর্তাটির কাছে জানতে পেরেছিলাম বনজসম্পদ লুকিয়ে চুরিয়ে অর্থাৎ বনের কাঠ, আনাজ, সব্জি ইত্যাদি বিক্রি করে, জুম চাষ করে কায়ক্লেশে এদের দিন কাটে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ সম্পূর্ণ অধরা এদের কাছে। কয়েক মাইল এলাকার মধ্যে আর কোন জনবসতি নেই। অনেকটা আদিম গুহামানবের মতই এদের জীবনযাত্রা। মাঝে মাঝে খ্রীশ্চান মিশনারীরা এসে এদের খোঁজ নেয়। ওষুধপত্র, জামা-কাপড় ও আর্থিক সাহায্য দেয়। আর্থিক দৈন্যকে পুঁজি করে সত্তর এর দশক থেকেই উপজাতি জনপদে খ্রীশ্চান মিশনারীরা সেবামূলক কাজের মধ্য দিয়ে তাদের সমর্থনের ভিত তৈরি করে চলেছে। এই ঘটনার আঁচ পেয়ে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার কথা পরে পার্টিকে জানিয়েছিলাম।

পরের দিন ভোরে উপজাতি সাবালক পুরুষটি আমাদের পথ দেখিয়ে কাঞ্চনবাড়ি

বাজাবের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসে। উপজাতি পরিবারটির আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে তার হাতে পাঁচিশ টাকা তুলে দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলাম। দরিদ্র উপজাতি পরিবারটি অতিথিপরায়ণতার ঐতিহ্যে দাগ কাটতে দেয়নি। কিছুতেই টাকা নিতে সম্মত হয়নি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, উপজাতি জুমচাষী। আমাদের শহুরে ভদ্রতার গরিমা সেদিন লজ্জায় অধোবদন হতে বাধ্য হয়েছিল।

সেদিন সকালে কাঞ্চনবাড়ি বিমলের এক প্রাক্তন সহপাঠী বনকর্মীর কোয়ার্টারে আশ্রয় নিয়েছিলাম। দুপুরে মুরগিব মাংসেব সুস্বাদু ঝোল সহযোগে পেটপুবে ভাত খেয়ে টানা ঘুম দিয়েছিলাম। বিকেলে ঘুম থেকে উঠে জিপে চেপে আমি, বিমল ও দেবুদা কৈলাসহব গিয়ে পৌঁছাই। সন্ধ্যায় কৈলাসহর পার্টি অফিসে জমকালো আড্ডায় বিমলের পথ হারিয়ে ফেলার ঘটনা রসিয়ে রসিয়ে বিবৃত করে সবাইকে আনন্দ দিয়েছিলাম।

বিভাস পোদ্দার রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল কিনা আমার জানা নেই। তবে আমি ১৯৭৩ সনে রবীন্দ্র ভারতী হোস্টেলে গিয়ে দেখি বিভাস একটি রুমে রাজ কুমার কোনারের সঙ্গে ভাগাভাগি কবে অবস্থান করছে। আমিও সেই রুমে ঢুকে পড়ি। পরবর্তী ক্ষেত্রে আমি যখন হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের ৪ তলায় একটি সিঙ্গল বেড থাকার জন্য পাই তখন বিভাস পোদ্দার সেই রুমে ঢুকে থাকতে আরম্ভ করে। বিভাস কিংবা আমি কেউই হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে আইনত বসবাস করতে পারি না কেননা আমরা কেউই কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের ছাত্র ছিলাম না। হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে রুম আমার নামে বরাদ্দ হল কিন্তু আমি যাযাবরের মত ৪ তলা, ৫ তলায় যখন যেখানে সুযোগ পাই অন্যের রুমে রাত্রিবাস কবি। দুপুবে বিভাসের অনুগ্রহে আমার রুম মাঝে মাঝে ব্যবহার করার সুযোগ পাই। বিভাস প্রতিদিন সকাল ১০টার মধ্যে চান, খাওয়া দাওয়া সেরে, ক্লিন শেভ করে একটি সানডে সাপ্তাহিক পত্রিকা বগলে করে ইউনিভার্সিটি লনে নেবে যেত। সবাইকে পরিচয় দিত সে আমার পি.এ। বিশেষতঃ ইউনিভার্সিটিতে বিশেষ কোন কাজে আসা সুন্দরী মেয়ে বা মহিলাকে দেখলে খুব সুন্দর একটি হাসি দিয়ে জিজ্ঞেস করত- আপনার কি সাহায্যে লাগতে পারি বলুন। সেই ভুবনজয়ী হাসিতে কত মেয়ের যে মাথা ঘুরেছে তার ইয়ত্তা নেই। বিভাস কিন্তু রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় হোস্টেলে থাকার সময়ই রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলায় এম.এ. পাঠরতা কোলকাতা কুমারটুলির এলাকার অনুরাধা পালের সঙ্গে প্রেম বিনিময় করে তাকে বিয়ে করে ফেলেছিল। বিয়ের পর অনুরাধা বৌদি কুমারটুলির বাপের বাড়িতে থাকতেন। ১৯৭৫ সনে যখন আমি হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে থাকি তখন লক্ষ্য কবলাম বেশ কিছুদিন ধরে বিভাস কুমারটুলি যাচ্ছে না অনুরাধা বৌদির সঙ্গে দেখা করতে বা ওর সদ্যোজাত মেয়েকে দেখতে। বিভাসকে জিজ্ঞেস করলে ও জবাব দেয় একটা বেবী ফুড নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু পকেটে টাকা নেই তাই যেতে পারছি না। আমি সেদিন রাতেই ওকে বেবী ফুডের টাকা দিলাম এবং বললাম ভোরবেলা দোকান খুললেই যাতে বেবী ফুড কিনে কুমারটুলি চলে যায়।

পরের দিন ঠিক ১০ টা নাগাদ চান, খাওয়া-দাওয়া সেরে বিভাস কুমারটুলির উদ্দেশে আমাকে বলে রওয়ানা দিল। বিকেল বেলা কলুটোলা স্ট্রীটে চন্দ্রিকার খাটিয়ায় বসে আড্ডা মারছি হঠাৎ সূর্যসেন স্ট্রীটের দিক থেকে লোক ছোটাছোটি করে দৌড়ে আসছে

দেখলাম। কিছুক্ষণ পরে আমাদের হোস্টেলের দুটি ছেলেও ছুটে এল। জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে? ওরা বলল, বাংলা সিনেমার তখনকার সময়ের জনপ্রিয় কৌতুকাভিনেতা জহর রায় মারা গেছেন তার মির্জাপুর স্ট্রীটের মেসে। বাংলা চলচিত্রের অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রী এসেছে প্রয়াত জহর রায়কে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। এত ভিড় হয়েছে যে পুলিশকে লাঠি উঁচিয়ে ভিড় হঠাতে হচ্ছে। সে কারণেই জনতার এত দৌড়-ঝাঁপ। ওদের মুখেই শুনলাম-ওরা বিভাস পোদ্দারকে দেখে এসেছে জহর রায়ের মেসের সামনে স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে ট্রাফিক কন্ট্রোল করছে। আমি ভাবলাম কুমারটুলি থেকে ফিরে বিভাস স্বেচ্ছাশ্রমে আত্মনিয়োগ করেছে। সন্ধ্যের পর বিভাস ফিরে এল ভেজা জামা-কাপড় নিয়ে। বিকেলের দিকে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে বিভাস সেই বৃষ্টিতে ভিজে এসেছে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, বৌদি এবং মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে? সে নিরুদ্বিগ্ন মুখে উত্তর দিল কি করে হবে। আমি বললাম কেন, কি হয়েছে। বিভাস রসিয়ে রসিয়ে জানাল ইউনিভার্সিটি লনে ঘণ্টা দুয়েক কাটিয়ে ও যখন ১২টা থেকে ১২-৩০ মিঃ নাগাদ মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের সামনে ট্রামের জন্য দাঁড়িয়ে আছে তখন নাকি দেখে, অভিনেত্রী অপর্ণা সেনের গাড়ি সূর্য সেন স্ট্রীটে ঢুকছে। সে খোঁজ নিয়ে জানতে পারে মির্জাপুরের মেসে জহর রায় মারা গেছেন। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সবাই সেখানে জড় হচ্ছেন। তখনই বিভাস মির্জাপুর জহর রায়ের মেসের সামনে ছুটে যায় এবং সেই দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অক্লান্তভাবে স্বেচ্ছাশ্রম বিলি করে হোস্টেলে ফিরে এসেছে। আমি গম্ভীরভাবে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, বেবী ফুডের টাকা কোথায়? সে তার বিখ্যাত বিটকেলে হাসি আওয়াজ করে বলল, মার চাক্কু। সারাদিন যে পরিশ্রম গেছে— বারেবারে টিফিন করে টাকা থাকে না কি! আমি অবাক হয়ে ভাবলাম কত রকম ধাতুতে যে মানুষ তৈরি হয়। বিভাসের সঙ্গে কথা বাড়ানোর প্রবৃত্তি হল না। আমি হোস্টেলের ৫ তলায় উঠে গেলাম।

একবার সৌগত রায়ের বাড়িতে আমি, বোম, ফনীদা, রেবতী আরো কে কে যেন গিয়েছিলাম হোস্টেলের কিছু সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য। কিন্তু আলোচনা চলাকালীন ফনীদা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বেশ কিছু কাগজপত্র সৌগত রায়ের টেবিল থেকে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে উদ্যত হন। আমি অনেক কষ্টে ফনীদার হাত থেকে সেগুলো রক্ষা করে নিয়ে আসি। ফনীদাকে বলি পরে প্রয়োজনে আমার কাছ থেকে নিয়ে নেবেন। সৌগত রায় সে সময় ছিল স্টেট ট্রান্সপোর্ট অথরিটির চেয়ারম্যান। ওনার টেবিলে বেশ কিছু বিভিন্ন রুটের মিনিবাসের অফারের কাগজ এস.টি. এ বোর্ডের সচিব এবং চেয়ারম্যানের সই করা এবং সিলসহ পড়েছিল। আশ্চর্যজনকভাবে অফার প্রাপকের নাম ও ঠিকানার জায়গাগুলি ছিল ফাঁকা। ফনীদার হাত থেকে টানাটানি করে অফারগুলি নিতে গিয়ে অক্ষতভাবে তেরটি অফারের কাগজ উদ্ধার করতে পেরেছিলাম। সেগুলো আমার রুমের ড্রয়ারে রেখেছিলাম। চালচুলোহীন মানুষ আমি তাই টেবিলের ড্রয়ারে চাবি দিতাম না। ফনীদা কোনদিন সেই অফারগুলি চেয়ে নেননি। বিভাস একটি/দুটি করে সেই অফারগুলিতে তার সঙ্গে সদ্য পরিচিত হওয়া মেয়েদের ভাই-এর নামে বা তাদের নির্দেশ মত প্রাপকের নাম ঠিকানা লিখে ১৩টি মিনিবাসের অফারই বিলি করে দেয়। জানি না, সত্যি সত্যি সেই অফার প্রাপকরা মিনিবাস রুটে আদৌ নামাতে পেরেছিল কিনা। বিভাস পোদ্দার আমার জীবনে

দেখা সবচেয়ে রোমান্টিক প্রেমিক। জীবনে তাকে রাগতে দেখিনি কখনো। তার উপর শত অন্যায় সত্ত্বেও কাউকে রাগ করে থাকতে পেরেছে দেখিনি। বিভাস কাউকে কখনো মেরেছে বা গালাগালি করেছে সামনা সামনি এমন ঘটনা আমি স্মরণ করতে পারছি না।

একদিন অনুরাধা বৌদি হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে বিভাসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। শীতের দিন, সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আমি বিভাসকে বললাম, বৌদিকে বাসে তুলে দিয়ে এস. রাত হয়ে গেছে। সেদিন ঘণ্টা আধেক পরে আমি, সুব্রত পাল, পীযূষ ঘোষ এবং শেখর দত্ত হোস্টেল থেকে বেরিয়ে কলেজ স্কোয়ারের মৌচাকে টিফিন করতে যাচ্ছিলাম। আমাদের ৪ জনের টাকা পীযূষ ঘোষের কাছে জমা থাকত। সেই সব হিসেব-নিকেষ রাখত। পারতপক্ষে পীযূষ, শামু এবং শেখর আমাকে নিয়ে মৌচাকে যেতে চাইত না। এদের বক্তব্য ছিল আমি গেলে না কি মৌমাছির ঝাঁকের মত লোক এসে পয়সা ছাড়া টিফিন করতে ছুটে আসে আর আমি নির্দ্বিধায় সকলকে খাওয়াতে থাকি। ট্যাঁকের পয়সার দিকে নজর থাকে না। সেদিন ভাগ্যিস রাজি হয়েছিল আমাকে নিয়ে মৌচাকে যেতে। সে কারণেই বিভাসের বীরত্বের একটি কাহিনী স্বচক্ষে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। রাস্তা পেরোচ্ছি এমন সময় হঠাৎ দেখলাম ইউনিভার্সিটির সামনে বাস স্ট্যান্ডে বিভাস দু'জনকে কাকুতি মিনতি করছে। পাশে অনুরাধা বৌদি দাঁড়িয়ে আছে। আমি এগিয়ে গেলাম। দেখলাম অনুরাধা বৌদি কাঁদছে। কি ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম যে দুটি লোকের সঙ্গে বিভাস ইনিয়ে বিনিয়ে আলাপ করছে এরা বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ যাবত বৌদিকে উত্যক্ত করছিল। বিভাস এদের যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা না করে শান্তিপুরী ভাষায় মোলায়েম স্বরে এদের সহবত শেখানোর চেষ্টা করছে প্রায় আধঘণ্টা যাবত। আর ঐ দুটো লোক উল্টে বিভাসকে ধমকে চলেছে। অপমানে বৌদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলেন। আমার মাথায় রক্ত উঠে গেল। ইউনিভার্সিটির সামনে হোস্টেলের ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে এ ধরনের অসভ্যতা করার স্পর্ধা দেখানোর ব্যাপার চিন্তা করে সবচেয়ে বেশি রাগ হল বিভাসের ওপর। কেন সে হোস্টেলে একটা খবর পাঠানোর ব্যবস্থা করল না ভেবে। আমি বিভাসকে সরিয়ে দিয়ে সেই দুটো লোকের গালে সজোরে দুটি করে চড় বসিয়ে দিই। লোকগুলি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আমার দিকে তেড়ে আসতে চাইলে পীযূষ, শামু আর শেখর এদের এমন মার দেয় যে ওরা চলতি বাসে উঠে চম্পট দেয়। মারের চোটে এদের দু'জনের মধ্যে একজনের খুব দামি হাতের ঘড়ি ছিটকে মাটিতে পরে যায়। সেটি কুড়িয়ে না নিয়েই ওরা পালিয়ে যায়। অনেকদিন ঘড়ি দারোয়ান চন্দ্রিকার কাছে গচ্ছিত ছিল। দাবিদার হিসাবে ঘড়ি ফেরত নিতে কেউ আসেনি। একটি কথা স্বীকার করতে আমি বাধ্য। অর্থনৈতিকভাবে বিভাস খুব সৎ ছিল। সে আমার পি.এ পরিচয় দিয়ে ইউনিভার্সিটি লনে ঘুরে বেড়াত। ওকে সব সময় রানী মৌমাছির মত লোকজন ঘিরে রাখত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করিয়ে নেওয়ার জন্য। বিভাস কোনদিন কারো কাছ থেকে এক পয়সা নিয়েছে বলে শুনিনি বা কেউ অভিযোগও করেনি। পরে জেনেছিলাম কিছুদিন অপেক্ষা করার পর শামু অর্থাৎ সুব্রত পাল রেবতী সিন্হার কাছে দু'শ টাকায় ঘড়িটি বিক্রি করে দিয়েছিল।

উদয়পুরের যোগেন দাস আমাদের সহপাঠী কিন্তু ৩/৪ বছর বয়সে বড় ছিল। সে নাম্বার টেন সিগারেট দু'ভাগ করে খেত। রবীন্দ্রভারতী হোস্টেলে থাকার সময়ই শুভ্রা

ঘোষ নামে অতীব সুন্দরী একটি মেয়ে ওর প্রেমে পড়ে হোস্টেলে আসত। এ যেন রাজকন্যা আর ভিখিরীর প্রেম— যেমনটা আমরা সিনেমায় দেখে থাকি। যোগেন ছিল নিতান্ত দরিদ্র পরিবারের ছেলে। শুভ্রার বাবা ছিল সে সময়ে উড়িষ্যায় আই.এ.এস অফিসার। ভুবনেশ্বরে পোস্টিং। আই.এ.এস অফিসার এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি। শুভ্রা কোলকাতা মামার বাড়িতে থেকে পড়তে এসে যোগেনের প্রেমে পড়ে।

যাহোক, ১৯৭৫ সনের ২৪শে জানুয়ারি যোগেন আর শুভ্রার বিয়ে ঠিক হয় ভুবনেশ্বর। আমি, কেশব, বোম, নির্মল সিন্‌হা, উদয়পুরের কংগ্রেস নেতা কামিনী দাস সে বিয়েতে বরযাত্রী গিয়েছিলাম। ২২শে জানুয়ারি সন্ধ্যায় হাওড়া থেকে ট্রেনে উঠি। ২৩শে জানুয়ারি ভোরবেলা ভুবনেশ্বর পৌঁছে দেখি রেলওয়ে স্টেশনে সুদৃশ্য পোষাক পরা বাজনাদাররা বাজনা বাজাতে বাজাতে আমাদের অভ্যর্থনা করতে এসেছে। হতচকিত হয়ে যাই। আমাদের সকলকে সুদৃশ্য গাড়িতে চড়িয়ে সার্কিট হাউসে নিয়ে তোলে। সেখানে আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। সেখানে গিয়ে দেখি থরে থরে বিভিন্ন ধরনের সুদৃশ্য, দামী ফল আমাদের জন্য সাজানো রয়েছে। যার যা খুশি তুলে খাও। ৫/৬ জন উড়িয়া তেলের শিশি নিয়ে তৈরি হয়ে আছে আমদের তৈলমর্দন করে দেওয়ার জন্য। যে কয়দিন ছিলাম খুব আয়েস করে সবাই শরীরে তৈলমর্দন করিয়ে নিয়েছিলাম। ২৪শে জানুয়ারি যোগেন আর শুভ্রার বিয়ের আসরে উড়িষ্যার সব বিখ্যাত লোকেদের সমাগম ঘটেছিল। বিখ্যাত ওডিসি নৃত্যশিল্পী সংযুক্তা পাণিগ্রাহী এবং তার স্বামী এসেছিলেন। সংযুক্তা নাচ পরিবেশন করেছিলেন এবং তার স্বামী সংগীত পরিবেশন করেছিলেন নাচের সাথে। ঠিক তখনই বিয়ের আসরে খবর এসেছিল সে বছর সংযুক্তা পাণিগ্রাহী 'পদ্মশ্রী' খেতাব পাওয়ার জন্য মনোনীত হয়েছেন। আমরা সেই সংবাদ জেনে সকলে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে সংযুক্তা পাণিগ্রাহীকে অভিনন্দিত করেছিলাম। সে যাত্রায় শুভ্রার বাবা আমাদের কোনারকের সূর্য্যমন্দির, নন্দনকানন, পুরীর সমুদ্রতট ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন।

খুব আনন্দ করেছিলাম যোগেন আর শুভ্রার বিয়েতে। আগরতলার মত জায়গা থেকে গিয়ে এই রাজকীয় সমাদর পাওয়া ছিল আমাদের কাছে অভাবনীয়। খুব দুঃখের কথা হল যোগেন আর শুভ্রার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। শুভ্রা খুব দুঃখে উদয়পুরে ছেলেদের নিয়ে দিন কাটাচ্ছে।

আমার মা'র বিবেচনায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমার মত বজ্জাত এবং দুষ্ট ছেলে আর দ্বিতীয়টি জন্মগ্রহণ করেনি। আমার পেছনে সব এনার্জি উজাড় করে দিয়ে অন্য ভাই-বোনদের জন্য খরচ করার জন্য কোন এনার্জি আর মার ছিল না বলে তাঁর ধারণা। আমি মায়ের এই অনুভূতি সত্য বলেই বিশ্বাস করতাম। কিন্তু হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে গিয়ে সুব্রত পাল ওরফে শামুর (বর্তমানে গৌহাটি হাইকোর্ট, আগরতলা বেঞ্চের রেজিস্ট্রার) সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর জানলাম আমার চেয়ে এক ধাপ উঁচু বজ্জাতও পৃথিবীতে আছে। সত্যিই আমার অনুমান সঠিক কিনা তার ভার পাঠকদের উপর ছেড়ে দিলাম। তুল্যমূল্য বিচারের জন্য আমার কৃত এবং শামুর দ্বারা সংগঠিত শয়তানিগুলি নীচে বর্ণনা করছি। খালি মাথায় হাত বুলাই এবং সেইসব কাটা দাগগুলি খুঁজি যেগুলো মার সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে ঝগড়া করার সময় মার ছোঁড়া ইট, কাঠ ইত্যাদি শক্ত জিনিষের সংস্পর্শে এসে অসংখ্য

স্মৃতি চিহ্ন হিসাবে থাকার কথা। খুঁজে পাই না, সময়ের ব্যবধানে সব হারিয়ে গেছে।

কল্যাণীতে আমাদের বাড়ি ছিল ধলেশ্বর, নয়াপাড়া। একটি বড় পুকুরের চার পাড়ে ১৮টি পরিবারের বাস। আমাদের বাড়ি ছিল পুকুরের পশ্চিম পাড়ে। পূর্ব-উত্তর কোণায় ছিল কৃষ্ণগোপাল দাস এদের বাড়ি। সন্ধ্যা হওয়ার আগেই কৃষ্ণদা হাত-পা ধুয়ে খড়ম পড়ে মাদুর বিছিয়ে পড়তে বসে যেতেন। সন্ধ্যে থেকে রাত্রি পর্যন্ত সুর ধরে জোরে জোরে সুর করে পড়তেন স্বামী-স্ত্রী দম্পতি। সেই আওয়াজ আমার মায়ের কানে যেত আর তিনি উদ্বেগাকুল চিত্তে বাড়ির গেটের দিকে তাকাতেন আমি কখন বাড়ি ফিরি। ম্যাটিনি শো'র অর্ধেক সিনেমা দেখে, ফুটবল খেলে, কলেজ লেকে চান করে তারপর এক প্রস্থ ধূমপান করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে পেরিয়ে যেত। আবার ফেরার পথে সিগারেটের গন্ধ যাতে কেউ না পায় তার জন্য আম, জাম বা শেফালি ফুলের পাতা ছাগলের মত চিবিয়ে, দু'আঙুলে ঘষে যখন নিশ্চিত হতাম গন্ধ দূর হয়েছে তখনই বাড়ি ফিরতাম। এমন কসরতেও কিছুটা সময় ব্যয় হত। বাড়ি ফিরলেই প্রতিদিন কৃষ্ণদার উদাহরণ টেনে মা গাল পাড়তেন। আমি পরের দিন শোধ তুলতাম অন্যভাবে। কৃষ্ণদাদের বাড়িতে ওদের এক বিধবা পিসি থাকতেন। যার ছিল অন্ধ কুসংস্কার। কৃষ্ণদাদের বাড়িতে ঢোকার দু'টি গেট ছিল। যে গেট দিয়ে ঢোকা হত সেই গেট দিয়েই বেরুতে হত। নাহলে নাকি কৃষ্ণদাদের বাড়ির বাণ কেটে যাবে এবং ভূত-প্রেত ইত্যাদির দৃষ্টি বাড়িতে পড়বে। পরিবারের সকলের অকল্যাণ হবে। আমার কাজই ছিল এই গেট দিয়ে কৃষ্ণদাদের বাড়ি ঢুকে অন্য গেট দিয়ে বেরুনো। তখনই কৃষ্ণদার পিসি সুর ধরে ধরে নোয়াখালি ভাষায় অকথ্য গালমন্দ করত। যথারীতি সেই গাল আমার মায়ের কানে সুরলহরী তুলত অনায়াসে। গালাগালির মর্মার্থ ছিল এত বজ্জাত ছেলেকে মা আঁতুড় ঘরে নুন খাইয়ে মেরে ফেলে না কেন? আমার এক বন্ধু ছিল কাঞ্চন চক্রবর্তী। ঠাকুরদা-ঠাকুরমা এবং বিধবা পিসি'র সঙ্গে থাকত আমাদের পাড়ায়। ওর বাবা অনিল চক্রবর্তী থাকত শিলিগুড়ি। ঠাকুরদা-ঠাকুরমা এবং পিসির অন্ধ ভালবাসায় কাঞ্চন হয়ে উঠেছিল পাজির পা-ঝাড়া। ছাই মেখে কাঞ্চন সাজত শিব। আর সমস্ত শরীরে কালি মেখে, কোমরের কাইতনের তাগার সঙ্গে কচুরিপানা বেঁধে আমি সাজতাম কালী। বাড়ি বাড়ি গিয়ে সন্ধ্যের সময় নাচ দেখিয়ে যা পয়সা পেতাম বা চাল, পান-সুপুরি পেতাম সেগুলি বিক্রি করে সেই পয়সায় সিনেমা দেখতাম দুই বন্ধু মিলে। একদিন সন্ধ্যের পর কৃষ্ণদাদের বাড়ি গিয়ে কালী আর শিব হয়ে নেচে কাঞ্চনের বুকে পা রেখে দাঁড়িয়েছি এমন সময় কৃষ্ণদার পিসি একটি থালে চাল, পান-সুপুরি সঙ্গে অন্ধকারে ভুলে হয়ত বা এক আনা দু'আনার পরিবর্তে রূপোর এক টাকা এনে আমাদের সামনে ধরল। কাঞ্চন লোভ সামলাতে না পেরে বা হয়ত ভেবেছিল ভুল ভাঙলে পিসি যদি আবার রূপোর টাকা ফিরিয়ে নেয় সেই কারণে হঠাৎ থাল থেকে রূপোর টাকা তুলে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দৌড় দেয়। আমি বেসামাল হয়ে পড়ি এবং কচুরিপানা খুলে গিয়ে সে কি লজ্জার কথা। কৃষ্ণদার পিসি আমাদের চিনে ফেলে এবং তার হুঁশ ফেরে যে ভুলে রূপোর এক টাকা আমাদের দিয়ে দিয়েছে। কৃষ্ণদার পিসীর বিলাপে দিন তিনেক কোন গাছের ডালে কাকও বসতে সাহস পায়নি। আমাদের বাড়িতে একটি ঝাঁকড়া জবা ফুলের গাছ ছিল। বাবা আমার দৌরাত্ম্যের কথা শুনতে শুনতে অতিষ্ঠ হলে জবাগাছের ডাল ভেঙ্গে

আমার সমস্ত জামা-কাপড় খুলে নিয়ে আমাকে মারতেন। এতই দুষ্ট ছিলাম যে জবা ফুলের ডাল ভেঙ্গে মারতে মারতে গাছটিই মারা পড়েছিল। আমার স্বভাব সংশোধন হয়নি। নারকেল সুপারি চুরির জন্য আমাকে শিবনগর এলাকার ছেলেরা হায়ার করত। শিবনগর বাড়ির গেটে হাতির শুঁড় খোদাই করা সুদৃশ্য এক বাড়িতে ছোট ছোট গাছে থরে থরে লাল রঙের ডাব ৩/৪টি গাছে ঝুলছিল। কিন্তু সেই ডাব কেউ চুরি করতে পারে না। কারণ গাছে অসংখ্য লাল পিঁপড়ে। ডাব পাড়তে গেলেই কামড়ে শেষ করে দেয়। তাছাড়া ডাবের প্রত্যেকটি ছড়ির সঙ্গে দড়ি এমনভাবে বেঁধে রাখা হয়েছে যে ডাবের ছড়িতে হাত দিলেই ঘণ্টা বেজে ওঠে। বাড়ির লোকেরা ঘুম থেকে উঠে যায়। কলেজে যাওয়ার সময় দিন দুয়েক বাড়ির আশেপাশে ঘুরে সব জরিপ করে নিলাম। পরে একদিন রাতে শিবনগরের বন্ধুদের নিয়ে প্রথমে বাড়িওলার ঘরের বাইরে আংটায় তালা ঝুলিয়ে দিই। সারা শরীরে কেরোসিন মেখে ঝপাঝপ ডাবের দড়ি কেটে হাতে হাতে ৪/৫ মিনিটের মধ্যে কাজ সেরে চলে আসি। ঘণ্টা বেজেছে, বাড়ির লোক ঘুম থেকে উঠে চিৎকার করেছে কিন্তু ঘর থেকে বেরুতে পারেনি বাইরে তালা দেওয়ার জন্য। ঠিক একই কায়দায় আমরা হাঁস-মুরগি চুরি করতাম। যার বাড়ি থেকে নারকেল চুরি করতাম কাঞ্চনের পিসিকে দিয়ে নারকেলের সন্দেশ বানিয়ে সেই বাড়ির লোকদের খাওয়াতাম। সুভাষ চক্রবর্তীর (হো-চি-মিন) মামা উপেন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়িতে খুব উঁচু নারকেল গাছে আমি লুঙ্গি মাথায় বেঁধে তড়তড়িয়ে উপরে উঠে নারকেল পেড়ে নীচে ফেলছি আর কাঞ্চন একটি লেবুগাছের নীচে দাঁড়িয়ে নারকেলের ক্যাচ ধরছে। আমার গৃহশিক্ষক ভুলু চক্রবর্তী (পাশের বাড়িব) রাতে প্রাকৃতিক কাজ করতে উঠে চাঁদের আলোয় গাছের মগডালে আমার এইরূপ দেখে প্রায় ফিট হয়ে যাওয়ার অবস্থা। পরদিন বাড়িতে সব খবর পৌঁছে যাওয়ার পর কি মারই না খেয়েছি। সেই চুরির নারকেলের সন্দেশ সুভাষের মামাতো বোন মায়া পিসীকে খাইয়েছিলাম। ঘুম ভাঙাতে বন্ধু রবি চক্রবর্তীর কাছ থেকে নস্যি দিতে যাচ্ছি বলে বেরিয়ে এসব কুকীর্তি করতাম। বিরক্ত হয়ে পরে বাবা নস্যির ডিবি কিনে দেয় যাতে বাড়ি থেকে না বেরুই। আমার সে কি যন্ত্রণা। সন্ধ্যের পর পড়ার বই-এর উপর মানিক-বঙ্কিম-শরৎচন্দ্রের যে কোন উপন্যাসের বই খুলে পড়তাম। তারপর নস্যি দিয়েও ঘুম আটকে রাখতে পারতাম না। বাবা রাতে পুকুরের পুব পাড়ে গলির মুখে সাইকেল থেকে নেমে গলা খাকারি দিতেন। আমি সেই আওয়াজ শুনে তড়াক করে ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠে উপন্যাসের বই সরিয়ে কৃষ্ণদার মত স্বামী-স্ত্রী-দম্পতি গোছের কোন পড়া উচ্চস্বরে পড়তে আরম্ভ করতাম। বন্ধু কাঞ্চনকে একবার পয়সার খুব টানাটানির কারণে রক্ত বিক্রি করে হলেও সিনেমা দেখাব বলে আশ্বস্ত করার সময় মা শুনে ফেলেছিলেন। তারপর থেকে মা আর আমার পড়াশোনা চলাকালীন সিনেমা দেখেননি আমরা সিনেমা দেখার নেশা ছাড়ানোর জন্য। তাতে লাভ হয়েছিল কিনা আমার জানা নেই।

কৃষ্ণদার এক কাকা মুর্শিদাবাদে থাকতেন। তিনি কম বয়সে মারা যান। সে খবর আগরতলা পৌঁছলে কৃষ্ণদার পিসি দিন সাতেক যমকে গাল দিয়ে সুর করে কাঁদতেন। সেই কান্না ছিল অনবদ্য। কাঁদতে-কাঁদতেই তিনি কেরোসিন তেল বিক্রি করতেন। কারোর ক্ষমতা ছিল না ফাঁকি দেয়। এর মধ্যে পুরানো বকেয়াও আদায় করতেন। নমুনা পেশ

করছি ঃ যমে কি আঁরে চোকে দেকেনানি গো— হেঁতে কি অন্ধ হইছে নি। আঁর দিকে হেঁতের চোক পরেনানি কোন। আঁর জোয়ান বাইরে না নি আঁরে নিতো পারে না নি। — কান্নায় সাময়িক বিরতি দিয়ে, বাচ্চুর মা— গতদিনের ৪ আনা বাকি আছিল। পয়সা গ্রহণ, তেল মেপে দেওয়া শেষ। বিলাপের কান্না আবার শুরু।

এবার সুব্রত পালের কাণ্ডকারখানা বলি। হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে ৪ তলায় আমাদের প্রায় দিনকার রাতের খাবার ছিল রুটি ডিমের ঝোল, ডাল। রাতে যারা ১০টার মধ্যে খেত না তাদের খাওয়ার টেবিলে ঢাকা দেওয়া থাকত। প্রতিদিনই এরকম ১০/১২টা মিল ঢাকা থাকত। শামু প্রত্যেকটি মিলের ডিমগুলি খেয়ে নিত। রাতের খাওয়ার খেতে এসে বোর্ডাররা প্রতিদিন হৈ-চৈ করত। শামু তখন নাক ডেকে ঘুমাত। যে কোন বোর্ডার কোন প্রয়োজনে ওষুধ খেলে, সে জ্বরের, আমাশয়ের বা টাইফয়েডের ওষুধই হোক না কেন শামু বলত আমিও খাব। ও ঠিক কড়মড়িয়ে সব ধরনের ওষুধ এমন কি এন্টিবায়োটিক ওষুধও কোন রোগ, জ্বালা-যন্ত্রণা ছাড়া অবলীলায় খেয়ে নিত। প্রকৃত রোগী ওষুধ খাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে আবার ওষুধ কিনতে বাধ্য হতো। হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে প্রত্যেক তলায় বড় বড় পেতলের ডেক, কড়াই, বালতি ইত্যাদি ছিল। হঠাৎ সেগুলো হাওয়া হয়ে যায়। এরপর ডাইনিং হলের ফ্যান উধাও। কোন হদিশ করতে পারছিলাম না কে করছে এই কাজ। হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে ছিল প্রশস্ত কাঠের সিঁড়ি। প্রত্যেকটি সিঁড়ির তিন কোনা তামার পাত দিয়ে মোড়া। শৌখিন, বিলাসী ব্যাপার। শুনেছি আগে হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে সব জমিদারের ছেলেরা বিয়ে-থা করে হুঁকো-তামাক সহ ব্যক্তিগত ভৃত্য নিয়ে পড়তে আসত। সে যা হোক, একদিন ৪ তলার বয় ঋষিকে হাতে নাতে ধরে ফেললাম সিঁড়ি থেকে তামার পাত খোলার সময়। মার দেওয়ার পর সে জানাল শামুর নির্দেশে সে এই কু-কাজ করছে। আরও জানলাম হোস্টেলের পেতলের ডেক, কড়াই, বালতি, ফ্যান ইত্যাদি সেই চুরি করে শামুর নির্দেশে বাজারে বিক্রি করে দিয়েছে। শামুকে জিজ্ঞেস করলে বলে, বেশ করেছি ভাল করেছি। আমার হাতে টাকা ছিল না কি করব? আমি দুর্বল স্বভাবের লোক। শামুর উত্তর শুনে চুপ করে থাকি। আমাদের বন্ধু শ্যামল ভট্টাচার্য অনেক পরিশ্রম করে একটি ইউনিভার্সিটিতে পাঠরতা কোলকাতার মেয়ের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তোলে। ঘোড়ার গাড়ি চড়িয়ে মেয়েটিকে হোস্টেলে এনে শ্যামলের রুমে বসিয়ে কোল্ড ড্রিংক্‌সের অর্ডার দেয়। শামু আমাদের এক বন্ধু অশোককে নির্দেশ দিয়ে শ্যামলের রুমে পাঠায়। অশোক গিয়ে বলে, শ্যামল তোমার ৪ মাসের মেসের টাকা বাকি। আজকে টাকা না দিলে মিল বন্ধ। শ্যামল কিছু বুঝে ওঠার আগে অশোক বেরিয়ে আসে। বেয়ারা কাশী যখন শ্যামলের রুমে কোল্ড ড্রিংক্‌স নিয়ে যাচ্ছিল শামু বোতল খুলে দুটো বোতলের অর্ধেক খেয়ে জল মিশিয়ে দেয়। সেই মেয়েটির সঙ্গে শ্যামলের প্রেম ভেঙে যায়। শ্যামল আমার কাছে বিচার দেয়। আমি ধৃতরাষ্ট্রের মত অন্ধ হয়ে থাকি।

আমি একমাস হোস্টেলের ৪ তলার মেস ম্যানেজার হয়েছিলাম। মনে মনে ইচ্ছে ছিল সবার থেকে ভাল খাইয়ে তাক লাগিয়ে দেব। শুরুও করলাম সেভাবে। বোর্ডার থেকে মেসের খাওয়া বাবত সংগৃহীত টাকা থাকত আমার ড্রয়ারে। কোন তালা ড্রয়ারে দেওয়া থাকত না। তবে বেরুবার সময় রুমে তালা দিয়ে বেরুতাম। আমাদের রুমগুলি ছিল মাথা

উঁচু সমান কাঠের পার্টিশান দেওয়া। মাসের ৭/৮ তারিখ বয় ঋষিকে বাজারে পাঠাতে গিয়ে দেখি আমার ড্রয়ারে একটি টাকাও নেই। মাথা খারাপ হওয়ার ব্যাপার। বাড়ি থেকে টেলিগ্রাম করে টাকা নেওয়াই। বন্ধু-বান্ধব থেকে অর্থাৎ মেডিকেল কলেজের সুবল দেবনাথ ও আশ্রম চৌমুহনির বন্ধু নিখিল দেবনাথ (সে তখন আমার সঙ্গে হোস্টেলে ছিল) থেকে টাকা নিয়ে বিপদ সামাল দেই। পরে শামুর মুখ থেকেই জানতে পারি সে-ই টাকার প্রয়োজন হওয়ায় পার্টিশান অতিক্রম করে আমার রুমে ঢুকে সব টাকা চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। আরও অনেক কীর্তি তার আছে পরে প্রসঙ্গক্রমে বলার চেষ্টা করব। এখন পাঠকরাই বিচার করুন কার অপরাধ গুরুতর। আমার না সুব্রত পাল ওরফে শামুর।

উদয়পুরের শ্যামল ভট্টাচার্যের চতুর্দিকে নানারকম যোগাযোগ ছিল। ওর বড় ভাই দিলীপ ভট্টাচার্য কংগ্রেস দলের বেশ প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। শ্যামল যখন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়ত তখন ত্রিপুরা সরকার থেকে কয়েকমাস পরই ওর নামে স্টাইপেন্ড যেত। সুব্রত পাল ওরফে শামু খবর পেল ইউনিভার্সিটির স্টাইপেন্ড সেকশনে শ্যামলের নামে ৫/৬ মাসের স্টাইপেন্ড বাবদ ২,৫০০ হাজার টাকা এসেছে। শামু এসে জানাল বোমকে। ওরা দু'জন কৈলাসহরের নিমাই দাশগুপ্তকে (যার চেহারা ছিল ৭৬ সনের মন্বন্তরের না খেতে পাওয়া মানুষের প্রতিচ্ছবি) ফিট করে নিয়ে গেল স্টাইপেন্ড সেকশনে। ড্রিলিং ক্লার্ককে বলল, শ্যামল ভট্টাচার্যের স্টাইপেন্ড দিন। ভদ্রলোক বললেন, শ্যামল ভট্টাচার্য কোথায়? শামু আর বোম নিমাইকে দেখিয়ে দিল। ড্রিলিং ক্লার্কের তো চোখ চড়কগাছ। কয়েক মাস পর পর শ্যামল তো ওনার কাছ থেকেই স্টাইপেন্ড আনেন। শ্যামলকে তিনি ভাল করে চেনেন। তবু বোম আর শামুর ভয়ে তিনি কিছু না বলে বললেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, ফিনান্স না বললে তো চেক দেওয়া যাবে না। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস্ চ্যান্সেলর ফিনান্স ছিলেন অম্লান দত্ত। বোম আর শামু নিমাই দাশগুপ্তকে নিয়ে অম্লান দত্তের সঙ্গে দেখা করল। নিমাইকে দেখিয়ে তাঁকে বলল, সময় মত স্টাইপেন্ড না পেয়ে দু'তিনদিন শ্যামল ভট্টাচার্য না খেয়ে আছে। অম্লানবাবু বিচলিত হয়ে উঠলেন। ওরিজিন্যালি নিমাই দাশগুপ্তের দুর্ভিক্ষ পীড়িত চেহারা দেখে তিনি বিশ্বাস করলেন এই ছেলে সত্যিই দু'তিনদিনের উপোসী। তিনি ড্রিলিং ক্লার্ককে ডেকে তৎক্ষণাৎ শ্যামলের স্টাইপেন্ডের চেক দিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন। নিমাইকে দেখে অম্লানবাবু আহারে-উহুরে বলে দু'দিন না খেয়ে থাকার যন্ত্রণা সহ্য করার জন্য গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করলেন। ড্রিলিং ক্লার্ক যাতে অম্লানবাবুকে সতর্ক না করতে পারে শামু আর বোম তার পেছন পেছন আঁঠার মত লেগে রইল। একটা প্রতারণা হতে যাচ্ছে বুঝেও নিছক ভয়ে ড্রিলিং ক্লার্কটি অনিচ্ছা সত্ত্বেও শ্যামল ভট্টাচার্যের ২,৫০০ টাকার স্টাইপেন্ডের চেক নিমাই দাশগুপ্তের হাতে তুলে দিলেন। কিন্তু সেটি ছিল এস.বি.আই'র একাউন্ট পেয়ি চেক। কি করা যায়। হোস্টেলের ৪ তলায় থাকত কোচবিহারের আনন্দজ্যোতি মজুমদার। খোঁজ নিয়ে জানা গেল তার ছোটভাই অপূর্বজ্যোতি মজুমদার স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার ব্যাবোর্ণ ব্রাঞ্চে প্রবেশন অফিসার হিসাবে কাজ করে। আনন্দকে নিয়ে বোম ও নিমাই চলে গেল অপূর্বজ্যোতির কাছে। প্রথমে অপূর্ব বলল শ্যামলের নামে কোন একাউন্ট আছে কি না। নিমাই গোবেচারার মত উত্তর দিল তার কোন একাউন্ট নাই। তখন অপূর্বজ্যোতি ব্যাঙ্ক

ম্যানেজারের সঙ্গে আলোচনা করে নিমাইকে বলল, চেকের পেছনে—"পে টু একাউন্ট অব অপূর্বজ্যোতি মজুমদার" লিখে সই করে দেওয়ার জন্য। নিমাই সেই অনুযায়ী চেকের পেছনে লিখে শ্যামল ভট্টাচার্যের নামে সই করল। চেক এনক্যাশ করে নিমাই আর বোম বগলদাবা করে ফিরে এল। কৈলাসহরের রেবতী সিন্হার মন ছিল খুব নরম। সে বেশ কয়েকদিন শামু আর বোমের পেছনে ঘুরেছে যাতে অন্তত ৫০০ টাকা শ্যামলকে দেওয়া হয়। কিন্তু বজ্জাত দুটো ১ পয়সাও শ্যামলকে দেয়নি ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে। শ্যামল আদৌ সেই ঘটনা আজ পর্যন্ত জানতে পেরেছে কিনা আমি জানি না।

শ্যামল আমার পেছন পেছন বেশ কয়েকদিন ঘুরেছিল সে সময়। বলছিল স্টাইপেন্ড আসছে না, কিছু আর্থিক উপার্জনের ব্যবস্থা করে দিতে। আমার জানাশোনা একটি স্কুলে এক দিদিমণি সেই সময় মাস তিনেকের ম্যাটারনিটি লিভে গেছেন। প্রধান শিক্ষককে বলে শ্যামলকে তিনমাসের জন্য শিক্ষকতার কাজে লাগিয়ে দিলাম। শামু শ্যামলকে বলল, অর্ধেক বেতন আমাদের খাওয়াবি। শ্যামল রাজি হয়ে গেল। শামুব উদ্বেগ শ্যামলের চাকরি নিয়ে শ্যামলের থেকে বেশি। কেননা মাস গেলে শ্যামলের বেতনের অর্ধেক টাকা পাবে তাই। শামু আমাকে রিপোর্ট করল তিন-চারদিন যাওয়ার পর শ্যামল নাকি স্কুলে যায় না। আমি শ্যামলকে জিজ্ঞেস করলাম, এত কষ্ট করে তোকে লিভ ভ্যাকান্সিতে ঢোকালাম আর তুই চাকরিতে যাচ্ছিস না কেন ? শ্যামল খুব অসহায় ভঙ্গিতে বলল, বন্ধু আর যাব না। কোলকাতার ছাত্ররা ঘোড়াপুংড়া। আমি বললাম, কি ব্যাপার? শ্যামল জানাল প্রথমদিন ক্লাশে এক ধেড়ে ছাত্র তাকে জিজ্ঞেস করে স্যাব,আপনার কি চুল কাটতে ৮ আনা বেশি লাগে? শ্যামল জানতে চাইল কেন ? বলল না আপনার কানের বাড়তি জঙ্গল পরিষ্কার করতে হয় তো তাই। শ্যামলের কান খুব ঘন কালো লোমে আবৃত থাকত। এই ঘটনার পরও শ্যামল ২ দিন নাকি স্কুলে গিয়েছিল। তৃতীয় দিন নাকি এক ছাত্র শ্যামলকে জিজ্ঞেস করে স্যার, চামচিকার ইংরেজি কি হবে ? শ্যামল সেদিনই মনের দুঃখে স্কুল ছেড়ে চলে এসেছিল। শামুর শ্যামলের উপর সে কি রাগ। কেন সে ডিকশনারি দেখে চামচিকের ইংরেজি জেনে পরের দিন থেকে ক্লাশে গেল না। আমি অবস্থার গুরুত্ব বুঝে শামুকে বকলাম। বললাম, তুই করবি চাকরি বল, তোকে ঢুকিয়ে দিচ্ছি। স্বাভাবিক কারণেই শামু রাজি হয়নি।

কৈলাসহরের প্রদীপ দেব ছিল শ্যামলের সবসময়ের ছায়াসঙ্গী। প্রদীপ ছিল ছোটখাটো দেখতে। তার গোঁফদাড়ি তখনও ভাল করে ওঠেনি। যে কোন লোক দেখলে মনে করত সে স্কুলের ছাত্র। প্রদীপ ছিল হাড়ে-হাড়ে বজ্জাত। সে শ্যামলের প্রতিদিনের ঘটনা আমাদের কাছে হুবহু রিলে করত। একবার দুর্গা পুজোর সময় আমরা অনেকেই আগরতলা আসিনি। কলুটোলা স্ট্রীট বিকেল থেকে জনস্রোত আছড়ে গিয়ে পড়ছিল কলেজ স্কোয়ার পূজা মণ্ডপে। আমরা খাটিয়া পেতে হোস্টেল গেটে আড্ডা মারছিলাম। শ্যামল প্রদীপকে নিয়ে ঘুরতে বেরুল। ঘণ্টাখানের পরে প্রদীপ পেটে খিল ধরা হাসি হাসতে হাসতে হোস্টেলে ফিরে এল। শ্যামল ক্রমাগত প্রদীপকে অনুনয়-বিনয় করছিল যাতে আমাদের কিছু না বলে। আমি শ্যামলকে ধমকে সরিয়ে দিলাম।প্রদীপ ঘটনা বলল। একটি খুব সুন্দরী মেয়ের পেছনে যেতে যেতে শ্যামল আস্তে আস্তে ক্রমাগত বলে যাচ্ছিল 'চা পিয়োগে'। শ্যামল মেয়েটির

জমকালো শাড়ি দেখে ভেবেছিল মেয়েটি মাড়োয়ারি। হঠাৎ মেয়েটি যখন সঙ্গে থাকা মেয়েটিকে বলল, দেখ তো মেড়োটা কি বলছে। তখন শ্যামল ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলে উঠেছিল—না, না, আমি মেড়ো নই, আমি বাঙালি। মেয়ে দু'টো শ্যামলকে কোন পাত্তা না দিয়ে কলেজ স্কোয়ারের পুজোর ভিড়ে মিশে যায়। শামুর যন্ত্রণায় শ্যামলকে প্রেমের কাঙাল হয়ে পথে নামতে হয়েছিল।

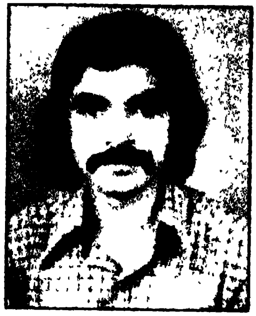
একদিন সন্ধ্যায় হোস্টেলের গেটে ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ছে বলে আড্ডা মারছিলাম আমি, শামু, রেবতী এবং হাবড়ার শ্রীধর। এমন সময় প্রদীপ দেব এসে খবর দিল সেন্ট্রাল এভিনিউ-র সেন্ট্রাল বারে প্রদীপ, বোম এবং গোবিন্দ গিয়েছিল চাইনিজ খেতে। বোম আর গোবিন্দ চাইনিজের সঙ্গে বিয়ারও খাচ্ছিল। প্রদীপের বাথরুম যাওয়ার প্রয়োজন হওয়ায় উঠে বাথরুম সেরে ভুলে বোম, গোবিন্দ যে রুমে বসে খাচ্ছিল সেই রুমে না ঢুকে অন্য একটি রুমে ঢুকে যায়। সেই রুমে ৫/৬টি মাস্তান ছেলে বসে মদ খাচ্ছিল। তারা প্রদীপের গাল টিপে দিয়ে বলে স্কুল ছেড়ে এখানে কি বাছা। প্রদীপ পাল্টা ছেলেটির গাল টিপে দিয়ে বোম এদের রুমে এসে বসে যায়। সেই ৫/৬টি ছেলে প্রদীপকে খুঁজতে খুঁজতে রুম খুঁজে বের করে প্রদীপকে রুম থেকে টেনে বের করে নিয়ে যেতে চায়। বোম আর গোবিন্দ বাধা দেয়। সেই নিয়ে মারামারি বেঁধে যায়। বোম আর গোবিন্দকে ঐ ৫/৬টি ছেলে ঘিরে ধরে। প্রদীপ কোনরকমে সেন্ট্রাল বার ও কাফে থেকে বেরিয়ে এসে হোস্টেলে দৌড়ে চলে আসে এবং আমাদের খবর দেয়। আমি শামু, রেবতী, শ্রীধর, প্রদীপকে সঙ্গে নিয়ে টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে দৌড়ে সেন্ট্রাল বার পৌঁছি। গিয়ে দেখি বোম এবং গোবিন্দকে ঘিরে রেখে ঐ ৫/৬টি ছেলে এবং সেন্ট্রাল বারের কয়েকজন বেয়ারা আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। বোম প্রচণ্ড লম্বা থাকায় ওর লম্বা হাত দিয়ে বারের কাউন্টারে ঠেস দিয়ে, গোবিন্দকে সঙ্গে নিয়ে আক্রমণ প্রতিহত করে যাচ্ছিল। আমরা হঠাৎ করে খবর পেয়ে খালি হাতে গিয়েছিলাম। আমরা ৫ জন বোম ও গোবিন্দের সঙ্গে যোগ দিয়ে ঐ ৫/৬টি ছেলেকে পাল্টা মার দিই। ওরা ক্রমে পিছু হঠে দৌড়ে পালিয়ে যায়। হোটেলের যে বেয়ারাগুলি ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল তাদের কানে ধরে উঠ বস করিয়ে ছেড়ে দিই। এর মধ্যে খবর পেয়ে পুলিশ ভ্যান চলে এলে আমরা বারের পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে হোস্টেলে ফিরে আসি। আসার সময় বৃষ্টির মধ্যে ম্যানহোলের মধ্যে পা ঢুকে আমার পা মচকে যায়। আমাদের হোস্টেলের দোলন সিন্‌হার ভাগ্নী, বর্তমানে রেবতী সিন্‌হার স্ত্রী অনুপমা সিন্‌হা ও খোয়াই- এর নীলিমা দেব ওরফে গীতু প্রায় সপ্তাহখানেক হলুদ-মরিচ বেটে আমায় দিয়ে যেত মচকানো পায়ে গরম করে লাগানোর জন্য। তাদের আন্তরিক সেবাযত্নে সেরে উঠি। এদের কাছ থেকে বোন হিসাবে যে ভালবাসা পেয়েছিলাম সেই ঋণ পরিশোধ যোগ্য নয়। মারামারির সময় বোমের হাতে সেই ৫/৬টি ছেলের একজনের সোনার চেন ছিঁড়ে উঠে আসে। পরে বোম হাবড়া গিয়ে শ্যামলকে দিয়ে ৮০০ টাকায় সেই চেন বিক্রি করে দিয়ে এসে আমাদের সকলকে জানায়। পরে সেই টাকা স্টেনগান কিনতে খরচ করা হয়েছিল।

আমার বর্তমানে বন্ধু ও সুহৃদ আইনজীবী কংগ্রেস দলের নেতা পীযূষ বিশ্বাস ও উদয়পুরের কাজল দাস, হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজিত রায় বর্মন, কোলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় নিয়োজিত বাঁশরী সরকার, সমীরণ চক্রবর্তী, সঞ্জীব

চক্রবর্তী এদেরও স্বল্প সময়ের জন্য হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে পেয়েছি। কিন্তু সামগ্রিকভাবে আমরা ত্রিপুরার প্রায় সব ছেলে মিলে রাজনৈতিক সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে যে গ্রুপ তৈরি করেছিলাম সেই গ্রুপে এরা কেউ সামিল হয়নি। এবা হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে সুব্রত মুখার্জির ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত থেকে জয়ন্ত ভট্টাচার্যের নির্দেশ মত চলাফেরা করত। স্বাভাবিক কারণেই ত্রিপুরার প্রায় ৫০/৬০ জন ছেলের সঙ্গে এদের একটা মানসিক ব্যবধান গড়ে উঠেছিল। ক্ষমতাসীন সুব্রত মুখার্জির গ্রুপের দ্বাবা ত্রিপুরার ছেলেদের উপর সংগঠিত অত্যাচারের সঙ্গে পরিস্থিতির কারণেই হয়তবা এদের পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকতে হয়েছিল। হয়ত লিখলাম এই কারণে প্রত্যক্ষভাবে ত্রিপুরার ছেলেদের উপর এরা কেউ অত্যাচার করেনি। তবে যখন ত্রিপুরার ছেলেদের উপর অত্যাচার সংগঠিত হয়েছিল তখন এরা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিল। পরে কর্মজীবনে এদের সঙ্গে মিশতে গিয়ে দেখেছি এরা কেউই হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর নয়। সুতরাং অনুমান করে নিচ্ছি এরা পরিস্থিতির শিকার হয়ে নীরবে আমাদের বিরুদ্ধ-গোষ্ঠীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল।

আমাদের দিন হাসি-কান্না মিলিয়ে এগিয়ে চলছিল মোটামুটিভাবে। যতদিন যাচ্ছিল স্বার্থহীন ভালোবাসার বন্ধন আমাদের মধ্যে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছিল। ত্রিপুরার বেশ কিছু ছেলেকে আমরা নির্দেশ দিয়েছিলাম জয়ন্ত ভট্টাচার্য, সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া, অমর ঘোষ, অধীর সাহা, পীযূষ বিশ্বাস এদের সাথে মিলেমিশে থাকতে। তার মধ্যে একজন ছিল কৈলাসহরের নির্মল সিন্‌হা। সে এখন ত্রিপুরা জুডিশিয়েল সার্ভিসের গ্রেড ওয়ান অফিসার এবং বর্তমানে কৈলাসহরে কর্মরত। নির্মল সিন্‌হা ১৯৭৬ সনের ২১শে জানুয়ারি সন্ধ্যায় আমাকে খবর দিল আজ গভীর রাতে সুরিন্দর সিং আলুওয়াল্লিয়ার (পরবর্তী সময়ে বি.জে.পি দলের রাজ্যসভার সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন) নেতৃত্বে ত্রিপুরার ছেলেদের উপর হামলা হবে। আমি মুহূর্তের মধ্যে যারা যারা চূড়ান্তভাবে শারীরিক নিগৃহীত হতে পারে তাদের হোস্টেল ছেড়ে অন্যত্র সরে যেতে খবর পাঠালাম। আমাদের সংগৃহীত সমস্ত অস্ত্র নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তরিত করে ফেললাম যাতে আমাদের অবর্তমানে কেউ হদিশ না পায়।

সুব্রত পাল, শেখর দত্ত, ঈশ্বরবাবু সিন্‌হা, পরিতোষ পাল এদের হোস্টেলে থেকে যেতে বললাম। আমাদের গ্রুপের অন্য সবাইকে কাছাকাছি অন্য কোথাও সরে যেতে বললাম। যাদের অন্যত্র সরে যাওয়ার কোন জায়গা নেই তাদের রাত্রি ৯টা নাগাদ মেডিকেল কলেজের ইমার্জেন্সি বিভাগের সামনে আমার সঙ্গে দেখা করতে বললাম। সবাইকে বললাম, খুব প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র, টাকা পয়সা, মার্কশিট ইত্যাদি ছাড়া বোঝা যায় মত কোন জিনিষ নিয়ে যাতে কেউ হোস্টেল ত্যাগ না করে। রাত্রি ৮টা নাগাদ আমি অন্যান্য দিনের মত খুব অনায়াস ভঙ্গিতে হোস্টেল ছেড়ে একা বেরিয়ে পড়ি। না'মার সময় হোস্টেলের গেটে সুরিন্দর সিংদের ১০/১২ জনের জটলা দেখি। তখনই নিশ্চিত হয়ে যাই, যে খবর পেয়েছি সেটি সঠিক। আমি যখন হোস্টেল ছেড়ে বেরুচ্ছি হঠাৎ ওদের আড্ডা কয়েক সেকেন্ডের জন্য থেমে যায়। কিন্তু ওরা কেউ সন্দেহ করতে পারেনি যে আমি একেবারে হোস্টেল ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। আমি মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে 'শীল ম্যানসন'-এ গিয়ে উঠলাম। সে রাত্তিরে বোমের সঙ্গে কয়েকজনকে হাবড়া পাঠিয়ে দিলাম। বাকি ১০/১২ জনকে আমার সঙ্গে 'শীল ম্যানসন'-এ রেখে দিলাম। সে রাতে ঘুম আর



পরিতোষ পাল (বাবু)

আমাদের কারোর হয়নি। গল্পগুজব করেই সারারাত্রি কাটিয়ে দিলাম। রাত্রেই খবর পেলাম ১০টা নাগাদ সুরিন্দর সিং-এর নেতৃত্বে আমাদের প্রত্যেকের ঘরে ঘরে আক্রমণ চলছে। বিশেষত আমাকে, বোমকে না পেয়ে ওরা ক্ষিপ্ত হয়ে আমরা কি করে খবর পেলাম, কোথায় গেলাম সে খবর জানার জন্য ৫ তলায় শেখর দত্ত, ঈশ্বরবাবু সিন্‌হা, জয়দীপ পাল নামক পশ্চিমবাংলারই একটি ছেলেকে প্রচণ্ড মারধোর করে। ৪ তলায় পরিতোষ পাল ওরফে বাবুল পালকে মারধোর করে। উৎপলেন্দু বিকাশ সাহা থাকত তিনতলায়। আমরা যখন হোস্টেল থেকে বেরিয়ে যাই তখন সে এবং ৪ তলার নির্মল পাল (এখন ইনকাম ট্যাক্স ল'ইয়ার এবং পাবলিক নোটারি) হোস্টেলে ছিল না। উৎপলেন্দু বিকাশ সাহা কোনদিনই হোস্টেলে আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশত না। তার সখ্যতা ছিল তিনতলার প্রিফেক্ট জয়ন্ত ভট্টাচার্য অনুগামী গান্ধীর সঙ্গে। কিন্তু সেদিন আমাদের না পেয়ে সুরিন্দর, অধীর এদের মাথা এত খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে রাত্রিবেলা যখন উৎপল কিছু না জেনে শিস্ দিতে দিতে হোস্টেলের সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় গিয়ে পৌঁছুলো তখন উৎপলকে শুধুমাত্র ত্রিপুরার ছেলে এই অপরাধে মারধোর করল সুরিন্দর সিং এবং সুব্রত মুখার্জির অনুগামীরা। নির্মল পাল শিবপুর বি.ই কলেজের ছাত্র তার বন্ধু ত্রিপুরার অনুপ রক্ষিতকে নিয়ে রাত্রিতে হোস্টেলে ফেরে। নির্মল থাকত হোস্টেলের চারতলায়। হোস্টেলে ঢোকার



মাঝে বসে নির্মল পাল, হরিপদ সাহা

সময় চারদিকের শুনশান অবস্থা দেখে নির্মলের সন্দেহ হয় কিছু একটা ঘটেছে। ৪ তলায় ওঠার সময় ঈশ্বরবাবু সিন্‌হার সঙ্গে দেখা হলে তাকে জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে। ঈশ্বরবাবু নির্মলের কথার কোন জবাব দেয় না। চুপচাপ ৫ তলায় চলে যায়। নির্মল বন্ধুকে নিয়ে খেয়ে দেয়ে ঘুমোতে চলে যায়। নির্মলের রুমে থাকতো হোস্টেলের অন্যতম সিনিয়র বোর্ডার প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি, সুব্রত মুখার্জি এদের সমসাময়িক বিরাজ মোহন দত্ত। রাত্রিতে বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে নির্মল পালকে ঘুম থেকে তুলল প্রদ্যুৎ গুহ এবং মেদিনীপুরের অনামি শিকদার। বিছানা থেকে তুলে নিয়ে এল ৪ তলাব বারান্দায়। নির্মল দেখে সেখানে টেবিল ঘিরে বসে আছে প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি, সুব্রত মুখার্জি ও জয়ন্ত ভট্টাচার্য। নির্মল পাল দেখে ৪ তলার বোর্ডার ত্রিপুবার ছেলে পরিতোষ পালের (যিনি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার এডিশনাল পাবলিক প্রসিকিউটর ছিলেন এবং বছর দু'য়েক আগে হার্টের বাইপাস সার্জারি করাতে গিয়ে অন্ধ হয়ে যাওয়াতে এখন আর প্র্যাকটিস করতে পারেন না) গেস্ট কাজল সরকারকে (অবসরপ্রাপ্ত জুটমিল অফিসার এবং রূপছায়া সিনেমা হলের এক সময়ের মালিক যজ্ঞেশ্বর সরকারের বড় ছেলে) সুব্রত মুখার্জির ছেলেরা ৪ তলার ফ্লোরে নাকে খত দেওয়াচ্ছে। প্রায় ৬ ফুট লম্বা কাজলদার নাকে কোন দাগ পড়েনি দেখে আবার নাকে খত দিতে বাধ্য করছে। নির্মল পালের সেই দৃশ্য দেখে চোখে জল চলে আসার উপক্রম হয়েছিল। নির্মল পালকে সুব্রত মুখার্জি বলে, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্ত খবর পাঠিয়েছে তুই সি পি.এমের পলিটব্যুরো মেম্বার। নির্মল পাল জানায় পলিটব্যুরো ব্যাপারটা কি সেটাই সে জানে না। জয়ন্ত ভট্টাচার্য নির্মলকে জিজ্ঞেস করে ধীরাজ কোথায়? নির্মল বলে যে সে তার বন্ধুর সাথে গতরাতে হাওড়ার শিবপুর বি.ই কলেজে ছিল। আজ সেই বন্ধুকে নিয়ে হোস্টেলে ফিরেছে। সে কিছুই জানে না। এরপর নির্মলকে ২০০ ডন বৈঠক দিতে নির্দেশ দেয় জয়ন্ত ভট্টাচার্য। নির্মল যখন গোটা পঁচিশেক ডন-বৈঠক দিয়েছে তখন বিরাজ মোহন দত্ত রুম থেকে বেরিয়ে এসে সুব্রত এবং প্রিয়কে বলে তোরা এসব কি করছিস। নির্মলের মত ভাল এবং নিরীহ ছেলে গোটা হোস্টেলে আর খুঁজে পাবি নাকি তোরা। নির্মলকে আর ডন-বৈঠক দিতে হয়নি। তবে তাকে পরদিন সকালে হোস্টেল ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। ভোরবেলা নির্মল পাল হোস্টেল ছেড়ে বেরিয়ে যায় জিনিষপত্র নিয়ে তার বন্ধু অনুপ রক্ষিত-সহ। আমার সঙ্গে ভোরে 'শীল ম্যানসন'-এ গিয়ে দেখা করে। তার মুখ থেকে গত রাত্রের হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে ঘটে যাওয়া সব ঘটনা শুনি। নির্মলকে জিজ্ঞেস করি তার কয়েকদিন থাকার জায়গা আছে কিনা। সে জানায়, সে ব্যবস্থা তার আছে। ত্রিপুরার হরিপদ সাহা ওরফে রাজু বেলেঘাটা একটি ভাড়া বাড়িতে থাকত। নির্মল একদিন চাঁদনিচক তার বোনের বাড়িতে থেকে তারপর বেলেঘাটায় হরিপদের ফ্ল্যাটে চলে যায়। সেখান থেকেই সে আর হরিপদ আমাদের সঙ্গে পরবর্তী সময়ে নিয়মিত যোগাযোগ রাখত। সুব্রত পাল ওরফে শামু আমরা হোস্টেল ছাড়ার কয়েকদিন পর দমদম ওর বোনের বাড়ি চলে যায় কিছুদিনের জন্য। সেখান থেকে নিয়মিত আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। আমি শামুকে বোঝাই ও যদি হোস্টেলে না থাকে তবে ত্রিপুরার অন্যান্য ছেলেরা যেমন শেখর দত্ত, পরিতোষ পাল, ঈশ্বরবাবু সিন্‌হা এরা নিজেদের অসহায় ভাববে। সুতরাং সে যাতে বোনের বাড়িতে সপ্তাহে ১/২ দিন থাকলেও বাকি সময় হোস্টেলেই থাকে। তাছাড়া শামুর

এমন একটা চার্মিং পার্সোন্যালিটি ছিল যে সুব্রত মুখার্জির গ্রুপের ছেলেরাও শামুকে পছন্দ করত এবং ঘাঁটাত না। শামুকে বললাম, হোস্টেলে না থাকলে আমাদের বিরুদ্ধ গ্রুপের গতিবিধি জানবি কি করে। আর আমাদেরই বা সাহায্য করবি কিভাবে। শামু আমার যুক্তি মেনে নেয়। আমাদের স্বার্থে সে আবার হোস্টেলে ফিরে যায়।

২২শে জানুয়ারি আমরা ত্রিপুরার সবাই বেহালা, ১৪ নং ট্রামের লাস্ট স্টপেজে কুমুদ ভট্টাচার্যের বাড়িতে যাই। আমাদের অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের কথা এবং গতরাতে হোস্টেলে সংগঠিত সমস্ত ঘটনার কথা তাকে জানাই। কুমুদদা তার কাঁচা-পাকা দাড়িতে অনেকক্ষণ হাত বুলিয়ে, উদাসীন চোখে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থেকে আমাদের প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সির সঙ্গে দেখা করে সব জানানোর পরামর্শ দেন। আমাদের বন্ধু ধর্মনগরের অজিত দাস ছিল অত্যন্ত বদরাগী কিন্তু কুমুদ ভট্টাচার্যের অন্ধ অনুগামী। অজিত উত্তেজিত হয়ে কুমুদদাকে বলে প্রিয়দাকেই যদি সব জানাতে হয় তবে আপনাকে বলে লাভ কি। আমরা বিফল মনোরথ হয়ে, হতাশভাবে কুমুদদার বাড়ি থেকে চলে আসি। ২২শে জানুয়ারি বিকেলে আমরা নিজেদের মধ্যে শীল ম্যানসনে বসে আলোচনা সেরে নিই। মাসের ২২ তারিখ কারো পকেটে তেমন কোন টাকা নেই। ২/১ দিন টেনে-টুনে চলতে পারা যাবে। তারপর কি হবে অজানা। সেই সভায় সিদ্ধান্ত হয় পরের দিন অর্থাৎ ২৩শে জানুয়ারি প্রিয়দার বাড়িতে যাওয়া হবে। আমি সবাইকে জানিয়ে দিই ২১শে জানুয়ারি রাত্রিতে নির্মল পাল এবং কাজল সরকারকে যখন ৪ তলায় অপদস্থ করা হচ্ছিল তখন প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি উপস্থিত ছিল। সুতরাং প্রিয়দার কাছে গিয়ে লাভ হবে না। সবাই আমাকে বলল, তারাও বিশেষ কোন আশা নিয়ে প্রিয়দার কাছে যাবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়নি। শুধুমাত্র কুমুদদার কথাকে সম্মান জানাতে প্রিয়দার ওখানে যাওয়া। পরিশেষে বলে রাখি, কুমুদ ভট্টাচার্য লোকটি কিন্তু সজ্জন ব্যক্তি ছিল। সিদ্ধার্থ জমানার সঙ্গে তার চরিত্রের কোন মিল ছিল না।

আগের রাতের সিদ্ধান্ত মত আমরা সবাই অজিত দাস, প্রণব সিনহা, রেবতী সিনহা এদের নেতৃত্বে দক্ষিণ কোলকাতার সাউদার্ণ এভিনিউ, লেক মার্কেটের কাছে প্রিয়দার ফ্ল্যাটে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সকাল ৭টা থেকে আমাদের ছেলেরা তীর্থের কাকের মত প্রিয়দার ফ্ল্যাটের সামনে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। প্রিয়দার ফ্ল্যাটের লোক বলে দিল প্রিয়দা এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। সকাল ৮টা নাগাদ লম্বামত, ছিপছিপে চেহারার একজন লোক এসে আমার কাছে আমরা কে, কোথা থেকে এসেছি এবং প্রিয়দার সঙ্গে কি প্রয়োজন জানতে চাইল। আমি লোকটির পরিচয় জানতে চাইলে তিনি জানালেন তার নাম নীরেন চ্যাটার্জি, তবে এলাকাতে ওনাকে সবাই চীনা নামেই চেনে। উল্টোদিকেই ওনার বাড়ি। আঙুল দিয়ে ওনার বাড়িও আমাকে দেখালেন। তিনি এও জানালেন, এই এলাকার যুব কংগ্রেসের নেতা তিনি। তবে প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সির অনুগামী তিনি নন, তিনি কংগ্রেস নেতা লক্ষ্মীকান্ত বোসের অনুগামী। চীনা আমাকে তার বাড়িতে গিয়ে চা খাওয়ার আমন্ত্রণ জানাল। আমারও পথে ফেউ-এর মত দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগছিল না। আমি চীনার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে কেশবকে সঙ্গে করে চীনার বাড়িতে গেলাম। অজিত দাসকে দেখিয়ে দিয়ে গেলাম চীনার বাড়ি। বললাম, আমি ঐ বাড়িতে যাচ্ছি। প্রিয়দা ঘুম থেকে উঠলে আমাকে প্রয়োজনে যাতে ডেকে নেয়। চীনার বাড়িতে গিয়ে চা খেতে খেতে আমাদের

সমস্যার কথা বিস্তারিতভাবে ওকে বললাম। চীনার ব্যবহার আমার কাছে খুব আন্তরিক মনে হয়েছিল। চীনা আমার সব কথা শুনে বলল, প্রিয়দা আমাদের সমস্যার সমাধান করে দেবে বলে তার বিশ্বাস হয় না। যদি আমরা চাই তবে লক্ষ্মীকান্ত বোসের সঙ্গে চীনা আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে পারে। তার ধারণা আমরা আমাদের সমস্যার কথা খুলে বললে লক্ষ্মীকান্ত বোস আমাদের সাহায্য করতে পারে। আমি চীনাকে বললাম, প্রিয়দা কি বলে দেখে নিই। প্রয়োজনে অবশ্যই লক্ষ্মীকান্ত বোসের সঙ্গে কথা বলা যাবে। চীনা জানাল, সে বাড়িতেই আছে। প্রয়োজনে যাতে আমি তাকে ডেকে নিই। আজ ২৩শে জানুয়ারি লক্ষ্মীকান্ত বোস বাড়িতেই আছেন। লক্ষ্মীবাবুর অফিস এবং বাড়ি পাশের গলিতেই বলে চীনা জানাল। আমি আর কেশব চীনার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। সকাল ১০টা নাগাদ প্রিয়দা ঘুম থেকে উঠে নাইট গাউন পরে চলচ্চিত্রের নায়কদের মত তার দোতালার ফ্ল্যাটের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। ভাবখানা এই আমাকে দেখো, মুগ্ধ হও এবং বিদেয় হও। উনি অবশ্য পরে বুঝেছেন কিন্তু তখনও জানতেন না আমরা পার্বত্য ত্রিপুরার ছেলেরা কি অসম্ভব ধরনের জেদী এবং সাহসী। কোন কিছুর শেষ না দেখে ছাড়ি না। আমি, বোম আর অজিত প্রিয়দার তথাকথিত পি.এ-র বাধা দু'হাত দিয়ে সরিয়ে দোতালায় উঠে গেলাম। পেছনে পেছনে এলো রেবতী সিনহা ও প্রণব সিনহা। আমরা প্রিয়দাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম আপনার সামনে ত্রিপুরার ছেলেরা শারীরিকভাবে নিগৃহীত হল কি করে ? আমাদের ছেলেদেব জামাকাপড়, টাকা পয়সা কিভাবে লুন্ঠন করা হল আপনার সায় না থাকলে। প্রিয়দা মাঠে ময়দানে খুব ভাল বক্তৃতা করতে পারেন, অতি সহজেই বাক্যবিন্যাসের ঠাস বুনোনে লোককে বোকা বানাতে পারেন কিন্তু সেদিন আমাদের সাঁড়াশি আক্রমণে প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সিকে বোকা-বোকা দেখাচ্ছিল। তিনি সুব্রত মুখার্জির সঙ্গে আলোচনা করে আমাদের হোস্টেলে ফেরানোর চেষ্টা করবেন বলে আশ্বস্ত করতে চাইলেন। আমি প্রিয়দাকে বললাম, আমরা সুব্রত মুখার্জি, জয়ন্ত ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে বিচার চাইতে এলাম আর আপনি ওদের সঙ্গেই আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করবেন বলছেন। সুব্রত মুখার্জিকে বলে, অনুনয়-বিনয় করে আমাদের হোস্টেলে ঢোকানোর ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে না। হোস্টেলে ঢোকার ব্যবস্থা আমরা নিজেরাই করতে পারব। অজিত, রেবতী, বোম, প্রণব এরা সবাই আমাকে সমর্থন করল। আমরা প্রিয়দার ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে রাস্তার পাশে একটি পাঞ্জাবি চায়ের দোকানে খাটিয়ায় বসে চা খেলাম। আমি সকলকে নীরেন চ্যাটার্জি ওরফে চীনার সঙ্গে আমার কথোপকথনের বিষয়বস্তু জানালাম। সকলকে জিজ্ঞেস করলাম লক্ষ্মীকান্ত বোসের সঙ্গে আলাপ করব কিনা? অজিত দাস বলল, কুমুদদার সঙ্গে ফাইনাল একটা আলোচনা না করে অন্য কারোর সঙ্গে আলোচনা করাটা ঠিক হবে কি ? বোমসহ বাকি সবাই বলল দু'দিন হল পথে ঘুরছি। কোথায় খাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি সে খবরও কেউ নিচ্ছে না। সুতরাং আর কারো সঙ্গে ফাইনাল কথার প্রয়োজন নেই। ধীরাজ যেটা ভাল মনে করে তাই করুক। তাছাড়া লক্ষ্মীকান্ত বোস তো কংগ্রেস নেতা, তার সঙ্গে আলোচনা করতে অসুবিধা কোথায়। সিদ্ধান্ত হল আজই আলোচনা সম্ভব হলে সেরে নেওয়া ভাল। আমরা সবাই নীরেন চ্যাটার্জি ওরফে চীনার বাড়ি গেলাম। চীনাকে সব ঘটনা জানালাম। চীনা আগ্রহ সহকারে আমাদের কথা শুনল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের

লক্ষ্মীকান্ত বোসের বাড়িতে নিয়ে গেল। তখন বেলা প্রায় ১১/১১.৩০ মি: হবে। লক্ষ্মীকান্ত বোস তার অফিস চেম্বারে বসে দর্শনার্থীদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তার অফিসে গিয়ে জানলাম লক্ষ্মীকান্তবাবু ট্রেড ইউনিয়ন অর্গানাইজেশন করেন এবং তার সংগঠনের নাম এন.এল.সি.সি। তিনিই এই সংগঠনটির সর্বেসর্বা। চীনা লক্ষ্মীবাবুর অফিস রুম থেকে বেরিয়ে এসে বললেন—দু'জনকে ভেতরে যেতে লক্ষ্মীদা অনুমতি দিয়েছে। সবাই আমাকে এবং কেশবকে যেতে বলল। আমি বোম আর কেশবকে অথবা বোম এবং অজিত দাসকে যেতে বললাম। চীনা বলল—ধীরাজ তুমি অবশ্যই এসো। পরে আমি আর কেশবই গেলাম লক্ষ্মীকান্ত বোসের চেম্বারে। ভেতরে ঢুকে দেখলাম বছর চল্লিশের মাথায় বিশাল টাকওয়ালা এক ভদ্রলোক সাদা পায়জামা, সাদা হাফ-হাতা পাঞ্জাবি পরে চেয়ারে বসে আছেন। ঠোঁটের কোণে সবসময় হাসি ঝিলিক মেরে যাচ্ছে। প্রথম দর্শনেই আমার মনে হল খুব ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টারের লোক হবেন লক্ষ্মীকান্ত বসু। সেদিন লক্ষ্মীকান্ত বোসের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকারটি ছিল ঐতিহাসিক। আমার প্রথমেই মনে হয়েছিল ভদ্রলোক সরল প্রকৃতির খোলামেলা লোক। তার কাছে কিছু গোপন করাটা অন্যায় হবে। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। সে কারণে আমিই কথা শুরু করলাম। লক্ষ্মীবাবুকে বললাম—আমরা ত্রিপুরা থেকে এখানে পড়াশোনা করতে এসেছি। রাজনীতি করতে নয়। কিন্তু যেহেতু আমাদের প্রত্যেকের একটি রাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড আছে সুতরাং আমরা এখানে রাজনীতি বিবর্জিত জীবনযাপন করতে চাই না। মুশকিল হোলো এই যে আপনার সঙ্গে আমরা যে দু'জন দেখা করতে এসেছি অর্থাৎ আমি এবং কেশবকে দেখিয়ে বললাম আমাদের দু'জনের রাজনৈতিক অতীত বামপন্থী। এখনও আমরা সি.পি.আই (এম) সমর্থক। ত্রিপুরার বাকি ছেলেরা কংগ্রেস সমর্থক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র পরিষদের রাজনীতি করে। তবু কংগ্রেসী শাসনে এরা সবাই হোস্টেল থেকে বিতাড়িত হয়েছে কংগ্রেসের ছেলেদের দ্বারা। আর এদের পুনরায় হোস্টেলে ফেরানোর জন্য দৌড়ঝাঁপ করতে হচ্ছে আমাদেরও। লক্ষ্য করলাম লক্ষ্মীকান্ত বসু খুব মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনছিলেন। মাঝখানে কে যেন ভেতরে এসেছিল। তিনি চীনাকে বললেন আমরা বাইরে বেরিয়ে যাবার আগে কেউ যেন তাকে বিরক্ত না করে। বুঝতে পারছিলাম তিনি আমার কথায় খুব মজা পাচ্ছিলেন। সব কথা শোনার পর তিনি আমাকে বললেন—তুমি আর তোমার সঙ্গের ছেলেটি যে সি.পি.আই (এম) পার্টি কর সেটা আমায় বলতে তোমার ভয় করল না? আমি বললাম কেন সি.পি.আই (এম) দল কি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়ে গেছে নাকি? লক্ষ্মীবাবু হেসে বললেন— না তা হয়নি। তবে এখনো অনেক সি.পি.আই (এম) নেতা বা কর্মী সি.পি.আই (এম) পার্টি করে কিন্তু প্রকাশ্যে বলতে ভয় পায়। তিনি বললেন—ঠিক আছে তোমাদের কথা শুনলাম, তোমাদের ভাল লেগেছে। আমাকে একটু চিন্তা করতে দাও। আমি সন্ধ্যায় তোমাদের কি সাহায্য করতে পারি সেই ব্যাপারে জানাব। আমার মাথায় দুষ্টবুদ্ধি খেলে গেল। আমি বুঝলাম— লক্ষ্মীদার ঠিকই আমাদের ভাল লেগেছে। অতএব তাকে এক্ষুণি আমাদের ব্যাপারে ইনভলভড্ করে ফেলা দরকার। আমি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম ঠিক আছে আপনার চিন্তা আপনি করুন কিন্তু আমাদের বিশজন ছেলের দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা করুন। কারণ আমাদের কারো কাছে খাওয়ার কোন পয়সা নেই, আপনার কংগ্রেসের

ছেলেরা আমাদের টাকা পয়সা লুট করে নিয়ে গেছে। লক্ষ্মীকান্ত বসু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, অন্য সবার কথা ছাড়লাম। তোমার আর তোমার সঙ্গীর খাওয়ার দায়িত্ব আমি নেব কেন ? আমি হাসতে হাসতে বললাম আপনার সঙ্গে আলাপ করে মনে হয়েছিল আপনি জননেতা। এখন দেখছি আপনি কংগ্রেস দলের নেতাই রয়ে গেছেন। লক্ষ্মীকান্ত বসু এবার প্রাণখোলা হাসিতে ফেটে পড়লেন। চীনাকে ডেকে বললেন—চীনা, লেক মার্কেটের 'সুখদা হোটেল'-এ ২০ জনের খাওয়ার স্লিপ ধীরাজের হাতে দিয়ে দাও। এদেব না খাওয়ালে আজ দুপুরে আমিও ভাল করে খেতে পারব না। নীরেন চ্যাটার্জি ওরফে চীনা আমার পিঠ চাপড়ে বলল—সন্ধ্যেবেলা অবশ্যই চলে এসো। তুমি লক্ষ্মীদার মন কেড়ে নিয়েছ। অবশ্যই লক্ষ্মীদা তোমাদের দায়িত্ব নেবে আমি হলপ করে বলতে পারি। চীনা তারপর আমার হাতে সুখদা হোটেলের নামে ২০ জনের খাওয়ার স্লিপ দিলেন। নিজে সঙ্গে গিয়ে সুখদা হোটেল চিনিয়ে দিয়ে বলে এলেন, আমারা যা চাই তাই যেন খেতে দেওয়া হয়। আমরা পেটপুরে কেউ মাছ, কেউ মাংস আবার কেউ দুটো দিয়েই খেয়ে নিলাম। তারপর হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম রবীন্দ্র সরোবর সন্ধ্যে হওয়া পর্যন্ত গাছের ছায়ায় গল্পগুজব করে সময় কাটানোর জন্য।

২৩শে জানুয়ারি, ১৯৭৬ সন সন্ধ্যায় আমি, বোম, অজিত দাস এবং সম্ভবত সেদিন সন্ধ্যায় শঙ্করদা (বর্তমানে আগরতলা পুর পরিষদের পুরপিতা) আমাদের সঙ্গে ছিলেন, সবাই মিলে লক্ষ্মীকান্ত বোসের সাউদার্ণ মার্কেট সংলগ্ন অফিস কাম বাড়িতে গেলাম। লক্ষ্মীকান্ত বসু ২/১ মিনিট কথাবার্তার পর বললেন—আমি তোমাদের সাহায্য করব। তোমরা যাতে হোস্টেলে ফিরে যেতে পার সসম্মানে তার ব্যবস্থা করে দেব। আমার সৌমেন মিত্রের সঙ্গে কথা হয়েছে। সৌমেন তোমাদের সব ঘটনা জানে। যতদিন না তোমরা হোস্টেলে ফিরে যেতে পারছ ততদিন ধীরাজকে হার্ডিঞ্জ হোস্টেল থেকে বহিস্কৃত ছাত্রদের জামিনদাব হয়ে আমার বাড়িতে থাকতে হবে। আমি এককথায় রাজি হয়ে গেলাম। বললাম, আমি না হয় আপনার বাড়িতে জামিনদার হিসাবে রইলাম কিন্তু অন্য ছেলেদের কি হবে। লক্ষ্মীবাবু বললেন, তোমাদের কারোর তো বিছানাপত্তর নেই মনে হচ্ছে। আমরা জানালাম না নেই। তিনি বললেন—ঠিক আছে, পাশেই একটি মেয়েদের স্কুল আছে সেখানে অন্য সবাইর থাকার ব্যবস্থা করে দেব। স্কুল সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলে। তোমরা সকাল ১০টার মধ্যে স্কুল চত্বর ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে আবার বিকেল ৫টার পর স্কুলে ঢুকবে। স্কুলের নাইটগার্ড তোমাদের বড় একটি হলঘরের চাবি দিয়ে দেবে। তোমরা বেরুবার সময় সেই ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। ডেকোরেটারের দোকান থেকে সতরঞ্চি, বেডশিট ও বালিশ দিয়ে যাবে। লক্ষ্মীদা অফিসের একটি ছেলেকে (এই মুহূর্তে তার নাম মনে পড়ছে না) ডেকে স্কুলটি আমাদের দেখিয়ে দিতে বললেন এবং স্কুলের নাইটগার্ডের সঙ্গে আমাদের লক্ষ্মীদার কথা বলে পরিচয় করিয়ে



লক্ষ্মীকান্ত বসু

দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আমাকে বললেন ডেকরেটারের দোকান থেকে কি কি জিনিস আনতে হবে সঙ্গের ছেলেটিকে বলে দেওয়ার জন্য, সেই আমাদের জিনিসগুলি সরবরাহ করবে। আমাকে বললেন, তোমার কিছু আনতে হবে না। জামাকাপড় যা আছে সেগুলো নিয়ে এলেই চলবে। আমি লক্ষ্মীদাকে বললাম, আমি সবাইকে স্কুলে ঢুকিয়ে দিয়ে, তারপর সবাইকে নিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত্রি ১০টা নাগাদ আসব। এরপর এন.এল.সি.সি অফিস থেকে বেরিয়ে আমরা সবাই সঙ্গের ছেলেটিকে নিয়ে স্কুলে চলে গেলাম। লক্ষ্মীদার বাড়ির কাছেই সে স্কুল। নাইটগার্ডের সঙ্গে পরিচিত হলাম। কয়টা সতরঞ্চি, বেডশিট, বুকের উপর দেওয়ার জন্য চাদর এবং বালিশ লাগবে সঙ্গের ছেলেটিকে তার রিকুইজিশন দিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। নাইটগার্ডকে বললাম, রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা রাত্রি ১০টার আগেই চলে আসব। স্কুল থেকে বেরিয়ে আমরা সবাই চলে গেলাম কলেজ স্ট্রীট এলাকায় 'শীল ম্যানসন' হোস্টেলে। সেখান থেকে আমাদের জিনিসপত্র নিয়ে, বন্ধু সুবল দেবনাথের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে এলাম সাউদার্ণ মার্কেটের পাশের সেই স্কুলে। স্কুলে জিনিসপত্র রাখলাম। দেখলাম ইতিমধ্যে ডেকরেটারের দোকান থেকে সব জিনিস স্কুলে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। তবে মাথার বালিশের পরিবর্তে পাশ-বালিশ পাঠিয়ে দিয়েছে ৬/৭টি। বুঝে নিলাম এক একটা পাশ বালিশে তিন/চারজনকে মাথা রেখে ঘুমোতে হবে। সবাই স্কুল থেকে বেরিয়ে সাউদার্ণ মার্কেটের 'সুখদা' হোটেলে খেতে গেলাম। খেতে খেতে আমরা ঠিক করে নিলাম প্রতিদিন ১০টার মধ্যে চান সেবে আমরা স্কুল থেকে বেরিয়ে রাস্তার পাশের পাঞ্জাবি ধাবায় চলে আসব। তারপর আলোচনা করে ঠিক করে নেব বিকেল ৫টা পর্যন্ত কিভাবে কালক্ষেপ করা যায়। খাওয়া-দাওয়া শেষে প্রথম যেদিন বন্ধুদের স্কুলে রেখে আমি লক্ষ্মীদার বাড়ি একা চলে আসি সেদিন মন খুব খারাপ লাগছিল। একটা বিয়োগ ব্যথা আমায় কুরে-কুরে খাচ্ছিল। কিন্তু মনকে প্রবোধ দিয়েছিলাম এই বলে যে পরিস্থিতির কারণে এর চেয়ে অনেক বেশি অসহনীয় অবস্থার সঙ্গেও খাপখাইয়ে নিতে হয়। তাহলে আমি পারব না কেন? তাছাড়া শুধু তো রাত্রিতে ঘুমোনো। বাকি সময় তো আমরা সবাই একসাথেই কাটাব। শঙ্করদা আর বিমলকে ছেড়ে লক্ষ্মীদার বাড়ি গিয়ে ঢুকলাম। আশ্চর্য এক বিস্ময় আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। লক্ষ্মীদার একান্ত অনুচর কাম পার্সোনাল এসিস্ট্যান্ট আমাকে বলল লক্ষ্মীদা এখনো ফেরেনি। ফিরতে একটু রাত হবে। তোমাকে তোমার বিছানা দেখিয়ে দিচ্ছি, ঘুমিয়ে পড়। দেখলাম লক্ষ্মীদার শোবার ঘরে একটি খাটে ধবধবে বিছানা পাতা রয়েছে। অ্যাটাচড্ বাথরুম। বিছানার পাশে জামা-কাপড় রাখার জন্য আলমারি, আলনা সবই খুব সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। মাঝখানে কিছু জায়গা ছেড়ে আরেকটা খাট। জানলাম সেখানেই লক্ষ্মীদা ঘুমান। প্রথমদিন ঘরে একা হওয়ায় স্বচ্ছন্দ বোধ করছিলাম। আলমারি এবং আলনায় জামা-কাপড় ভাগ করে রেখে বাথরুমে ঢুকলাম। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে বিছানায় শুয়েছি যখন তখন রাত প্রায় ১১টা হবে সে সময় বাড়ির ভেতর গাড়ি ঢোকার আওয়াজ পেলাম। বুঝলাম লক্ষ্মীদা ফিরে এসেছেন।

আমি ঘুমের ভান করে বিছানায় ঘাপটি মেরে পড়ে রইলাম। লক্ষ্মীদা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি কখন এসেছি, খেয়েছি কিনা ইত্যাদি। ঘরে ঢুকে

যখন দেখলেন আমি ঘুমিয়ে পড়েছি তখন আমাকে আব ঘুম থেকে তুললেন না। তিনি জামা-কাপড় ছাড়লেন। লক্ষ্য করলাম সুদৃশ্য একটি রিভলবার তার কোমরে বেল্টের সঙ্গে বাধা। তিনি রিভলবার বেল্টসহ খুলে আলমারিতে রাখলেন। পাঞ্জাবির পকেট থেকে ৩/৪ টি টাকার বাণ্ডিল বের করে আলমারিতে রাখলেন। আমি হাঁ করে দেখলাম আলমারিতে থরে থরে টাকা সাজানো। আমি সেদিন রাতের মত কৌতূহল চেপে রেখে ঘুমোনোর চেষ্টা করলাম। নিদ্রাদেবী আমার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন, অতিসত্বর ঘুমিয়ে পড়তে পারতাম। ভেবেছিলাম রাতে উত্তম কুমারের 'নায়ক' সিনেমার মত টাকার পাহাড়ে ডুবে যাচ্ছি, তলিয়ে যাচ্ছি এ জাতীয় একটি স্বপ্ন নির্ঘাত দেখব। কিন্তু সেদিন সে ধরনের কোন স্বপ্ন দেখেছিলাম কিনা জানিনা। হয়ত দেখেছিলাম গভীর ঘুমের জন্য পরের দিন আর মনে করে উঠতে পারিনি।

পরদিন সকালে প্রায় ৭টা-৭.৩০ মিঃ নাগাদ লক্ষ্মীদা আমায় ঘুম থেকে জাগালেন। জিজ্ঞেস করলেন আমার কি বেড-টি খাওয়ার অভ্যেস না মুখ ধুয়ে তারপর চা খাব। আমি জানালাম কোনটাতেই আমার আপত্তি নেই। লক্ষ্মীদা বেয়ারাকে চা দিতে বললেন। লক্ষ্য করলাম ইতিমধ্যে লক্ষ্মীদা চান সেরে ফেলেছেন। বুঝলাম প্রতিদিন চান সেরে তিনি অফিসে গিয়ে বসেন। বেয়ারা আমাদের চা দিয়ে গেল। চা খেতে খেতে লক্ষ্মীদা আমার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন। আমার বাড়িতে কে কে আছেন, বাবা কি করেন, ভাইয়েরা কে কি পড়ছে আনুপূর্বিক সব খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিলেন। আমিও জানলাম লক্ষ্মীদা বর্ধমানের লোক। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন বলতে দেশের বাড়িতে কেউ আর বেঁচে নেই। তিনি সেদিন গল্পচ্ছলে আমাকে বলেছিলেন তিনি তার নিজ বাড়িতে সি.পি.আই (এম) কর্মীদের দ্বারা কংগ্রেস করেন বলে আক্রান্ত হয়েছিলেন। যখন তার জ্ঞান ফেরে তখন তিনি দেখেন একজন সি.পি.আই (এম) কর্মী যিনি তার প্রতিবেশী তিনিই তাকে সেবা শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তুলেছেন। সেই ভদ্রলোকই আরো দু'জন প্রতিবেশীর সহায়তা নিয়ে লক্ষ্মীদাকে সেদিন রাতেই ট্রেনে তুলে দেন কোলকাতা চলে আসার জন্য। লক্ষ্মীদা স্বগতোক্তি করে বললেন, সে কারণেই আমি বিশ্বাস করি সি.পি.আই (এম)-এর সব লোক খারাপ নয়। গল্পচ্ছলে সেদিন তিনি আরও বললেন, কোলকাতার স্বনামধন্য, বামপন্থী আইনজীবী স্নেহাংশু আচার্য লক্ষ্মীদার সমস্ত মামলা মোকদ্দমা প্রায় বিনে পয়সায় লড়ে দেন। লক্ষ্মীদা সেদিন স্নেহাংশু আচার্যের বিশাল উদার মানসিকতার কথা, বিভিন্ন সংগঠন, ব্যক্তিকে বিভিন্ন ব্যাপারে তার দানের কথা উল্লেখ করেন। পাশাপাশি স্নেহাংশু আচার্যের রসিকতারও একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। একদিন এক পার্টিতে নাকি সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় তার পত্নী মায়া রায়-কে নিয়ে এসেছিলেন। স্নেহাংশু আচার্য'র সঙ্গে মায়া রায় আলাপ করতে এগিয়ে এলে স্নেহাংশু আচার্য্য নাকি মায়া রায়কে সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের সামনেই বলেন— কিরে মায়া, বিলেতে পড়তে যাওয়ার সময় যে টাকা নিলি, সে কি শোধ করবি না? তারপর ছাপার অযোগ্য এক কথা মায়া রায়কে বলেছিলেন। মায়া রায় হেসে নাকি উত্তর দিয়েছিল স্নেহাংশুদা তোমার বিটলেমি স্বভাব এখনও গেল না। সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ও নাকি স্নেহাংশু আচার্য'র কথা শুনে মুচকি মুচকি হাসছিলেন। লক্ষীদা বললেন, স্নেহাংশু আচার্য সবার কাছে এমন গ্রহণযোগ্য যে তার কথায় কেউ কিছু মনে করে না। লক্ষ্মীদা মন্তব্য করলেন - স্নেহাংশুদার

মত সি.পি.আই (এম) এর সব লোক যদি ভাল হোত তবে তিনিও সি.পি.আই (এম) পার্টি করতেন। আমায় বললেন, জানো তো মানুদার মত সব লোক যদি কংগ্রেসের হোত তবে পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেস করার মত লোক খুঁজে পাওয়া যেত না। বুঝতে পারলাম এক দল করলেও লক্ষ্মীদা সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়কে পছন্দ করেন না। মার্ক্সবাদী ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা রাম চ্যাটার্জী অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন লক্ষ্মীদার। সে কথাও তিনি বললেন এবং বহু বিপদে আপদে রাম চ্যাটার্জী লক্ষ্মীদাকে রক্ষা করেছেন, আশ্রয় দিয়েছেন স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি তিনি। আমি অবাক বিস্ময়ে সেসব অজানা কাহিনী শুনছিলাম এবং ভাবছিলাম মানুষের চরিত্র কত বিচিত্রগামী।

লক্ষ্মীদার বাড়ি থেকে ঘুম থেকে উঠে সকাল ১০টার মধ্যে চান-প্রাতঃরাশ সেরে বেরিয়ে পড়তাম। স্কুল থেকে অন্যরা সবাই ১০টার মধ্যে চান সেরে বেরিয়ে আসত। তারপর যেন আর আমাদের সময় কাটাতে চায় না। মাথার ওপর খোলা আকাশ। বিকেল ৫টা পর্যন্ত কোন ছাদ নেই। উদ্দেশ্যবিহীনভাবে এদিক সেদিক ঘোরাফেরা, পাঞ্জাবি ধাবায় বসে চা খাওয়া, দুপুরে 'সুখদা' হোটেলে খাওয়া সেরেও পর্যাপ্ত সময় আমাদের হাতে থাকত। তখন সন্ধ্যে পর্যন্ত সময় কাটানোটাই আমাদের কাছে প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সন্ধ্যের সময় ত্রিপুরা মেস থেকে বিমল সিনহা, টালিগঞ্জ পিসির বাড়ি থেকে শঙ্করদা, বেলেঘাটা থেকে নির্মল পাল, হার্ডিঞ্জ হোস্টেল থেকে সুব্রত পাল, পরিতোষ ওরফে বাবুল পাল এরা নিয়মিত আসত। সবাই মিলে জমিয়ে আড্ডা মারতাম। সুব্রত, বাবুল এদের কাছ থেকে হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের ভেতরের খবর, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিতাম। মাথায় তখন প্রতিনিয়ত ঘুরত কবে সব ছেলেদের নিয়ে হোস্টেলে ঢুকতে পারব। সুব্রত-প্রিয় এদের দাম্ভিকতা চূর্ণ করে হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে কিভাবে ত্রিপুরার ছেলেদের সসম্মানে প্রতিষ্ঠা করা যায় সেটাই সে সময় প্রধান ব্রত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিমল সিনহা এবং শঙ্করদার মাধ্যমে আমাদের প্রতিদিনকার খবরাখবর বিমান বোসের কাছে পৌঁছে যেত। বিমানদা প্রয়োজনীয় নির্দেশ এদের দিয়ে পাঠাতেন। সবসময় বিমল, শঙ্করদাকে দিয়ে বলে পাঠাতেন আমি যাতে খুব সাবধানে থাকি। কেননা পরিস্থিতির কারণে আমি বাঘের হাঁ করা মুখগহ্বরে প্রবেশ করে ফেলেছি। বেরিয়ে আসাটা খুবই দুঃসাধ্যের ব্যাপার। আমি যাতে কোন অবস্থাতেই পার্টি অফিস, এস.এফ.আই অফিস, ডি.ওয়াই.এফ.আই অফিসমুখো না হই।

আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম লক্ষ্মীদা খুব আড্ডাবাজ লোক। গল্প করতে ভালোবাসতেন খুব। তিনি চাইতেন দুপুর-রাত্রি আমি লক্ষ্মীদার সঙ্গে গল্পগুজব করি এবং খাওয়া দাওয়া করি। আমি লক্ষ্মীদাকে বোঝালাম দুপুরে এন.এল.সি.সি-র কাজে আপনাকে বাইরে যেতে হয় এবং প্রায়ই খেয়ে আসতে হয়। আমি দুপুরে আমাদের ছেলেদের সঙ্গে একসাথে খেয়ে নেব। রাত্রিতে আমরা গল্পগুজব করে ডিনার সারব। তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তিনি বললেন, বুঝতে পারছি তুমি তোমাদের ছেলেদের সঙ্গে যত বেশি পার সময় কাটাতে চাও। এই মনোভাব খুব ভাল। লক্ষ্মীদা বলতেন—ধীরাজ তোমাদের ত্রিপুরার ছেলেদের কালচার দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। রাজনৈতিক ব্যবধান সত্ত্বেও তোমাদের মধ্যে কি মধুর সম্পর্ক। জানো তো আমাদের পশ্চিমবাংলায় এই জিনিসটা

আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আমি লক্ষ্মীদাকে বলেছিলাম, আপনারা সবাই মিলে চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই রাজনৈতিক সুস্থ পরিবেশ আবার ফিরে আসবে। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন দেখছো না—কংগ্রেস রাজত্বে কংগ্রেসী ছেলেদের হোস্টেল থেকে মেরে বের করে দেয়, বিরোধীদের কথা বাদই দাও। আমাদের নিজেদের মধ্যে এত গ্রুপ, এত খেয়োখেয়ি, দলাদলি। তুমি আমাদের কাছে সুস্থ পরিবেশ আশা কর কিভাবে। জানো তো, আমি লক্ষ্মী বোসের যদি জনবল, অর্থবল, ডাণ্ডার জোর না থাকত তবে কোলকাতায় আমার দলের কারণেই আমি টিকতে পারতাম না। বর্ধমানের ছেলে হয়ে অচেনা, অজানা কোলকাতায় কি দুরন্ত অসম লড়াই চালিয়ে আমাকে প্রতিষ্ঠা পেতে হয়েছে তুমি জান না।

প্রায় প্রতিদিন রাত্রি ৯টার পর লক্ষ্মীদার ঘরে জমজমাট আড্ডা বসাতাম। তাতে ধর্মনগরের বন্ধু অজিত দাস, শঙ্করদাই মূলত আমার সঙ্গে থাকত। অন্যরাও মাঝে মাঝে আসত। লক্ষ্মীদাকেও আড্ডার নেশায় পেয়ে বসেছিল। যত কাজই থাক প্রায় প্রতিদিন তিনি আমাদের আড্ডায় এসে যোগ দিতেন। বুঝতে কোন কষ্ট হয়নি আমাদের যে, লক্ষ্মীদা লোকটি ছিলেন শিশুর মত সরল এবং ভালবাসার কাঙাল। আমাদের পেয়ে তিনি খানিকটা সময়ের জন্য হলেও প্রতিদিনের কৃত্রিম জীবনযাত্রার খোলস ছেড়ে আমাদের মত করে মাটির কাছাকাছি থেকে জীবনকে উপভোগ করতে আরম্ভ করেছিলেন। একদিন রাতে খাওয়ার টেবিলে আমি লক্ষ্মীদাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি তো বিয়ে থা করেননি, বিড়ি, সিগারেট, মদ ইত্যাদি খাওয়ার বদভ্যাস আপনার নেই এবং তেমন কোন নিকট আত্মীয়স্বজন নেই যাদের দায়িত্ব আপনাকে পালন করতে হয় তাহলে এত টাকা আপনি কামাচ্ছেন কেন ? লক্ষ্মীদা হেসে বললেন, তুমি জানলে কি করে ? আমি বলি যে করেই জেনে থাকি না কেন, আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। তিনি বললেন—এন.এল.সি.সি-র ৫ জনের একটি প্রতিনিধিদল দিল্লিতে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে ডেপুটেশন দিতে যাবে। সে কারণেই চাঁদা তোলা হচ্ছে। আমি বললাম, সে কি কথা। যাবে তো মাত্র ৫ জন। তাদের খরচ কত ? কিন্তু চাঁদা তো লক্ষাধিক টাকার বেশি তোলা হয়ে গেছে। লক্ষ্মীদা আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, দ্যাখো ধীরাজ টাকাতে আমার আসক্তি নেই। তবু আমি দুধেল গাইয়ের পার্টি করি। অর্থবল না থাকলে আমাদের পার্টিতে জনবল থাকে না। তখন তোমাকে কেউ জিজ্ঞেসও করবে না। আমাদের সংগঠনের স্ট্রাকচারের সঙ্গে বামপন্থী সংগঠনের স্ট্রাকচারের কোন মিল তুমি খুঁজে পাবে না। আমি লক্ষ্মীদার কথা খানিকটা হলেও বিশ্বাস করতে আরম্ভ করলাম। কারণ আমি দেখেছিলাম লোকটির বাজে নেশা তো ছিলই না এমনকি খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদও ছিল নিতান্ত সাদামাটা, আড়ম্বরহীন।

এর মধ্যে প্রায় মাসখানেক অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। আমাদের ছেলেরা সেই গার্লস স্কুলেই থাকছে। দৈনন্দিন রুটিন একই রকম, একঘেয়ে। সবাই ক্রমশঃ হতাশ হয়ে পড়ছিল। কেউ কেউ বাড়ি থেকে ঘুরে আসতে চাইছিল। আমি, অজিত, বোম নানা রকমভাবে ছেলেদের কোরামিন দিয়ে সতেজ রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। মাঝে মাঝে সবাইকে নিয়ে লক্ষ্মীদার ওখানে যেতাম। লক্ষ্মীদাকে বলতাম, আমাদের হোস্টেলে ঢোকার ব্যাপার কতদূর এগিয়েছেন বলুন। তিনি সৌমেন মিত্রের সঙ্গে, শিক্ষা বাঁচাও কমিটির নেতাদের

সঙ্গে, শত ঘোষ অর্থাৎ প্রফুল্ল ঘোষ, সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় এদের সঙ্গে কি আলোচনা হয়েছে সে ব্যাপারে সবিস্তারে বর্ণনা দিতেন। আমাদের ছেলেরা কিছুটা হলেও আশ্বস্ত হত লক্ষ্মীদার কথা শুনে। একদিন আমি লক্ষ্মীদাকে বললাম, কার সঙ্গে কি আলোচনা হয়েছে শুনে লাভ নেই। আমরা হোস্টেলে ঢুকতে পারব তো? লক্ষ্মীদা হেসে উত্তর দিয়েছিলেন— আমি ট্রেড ইউনিয়ন করি। তোমাদের হোস্টেলে ঢোকাতে না পারলে আমি ইনটেলেকচুয়ালদের নেতা হব কি করে? আমার যে বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা আমি বুদ্ধিজীবীদের সভায়ও বক্তব্য রাখব। আমি বলেছিলাম - জ্যোতি বসুর মত হতে চান নাকি আপনি? জ্যোতিবাবু যেমন ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব দিচ্ছেন আবার বিভিন্ন গণ সংগঠন, বুদ্ধিজীবীদের সভায়ও ভাষণ দিয়ে বেড়াচ্ছেন। লক্ষ্মীদা বললেন, তুমি ঠিক বলেছো। আরে পশ্চিম বাংলায় তো আছেই দু'জন নেতা। লক্ষ্মীকান্ত বসু আর জ্যোতি বসু। আমি ঠেস দিয়ে বললাম - কেন আপনাদের মানুদা। লক্ষ্মীদা বললেন, ওটা একটা নেতা নাকি। কাজের সময়, অফিস টাইমেও যদি তুমি যাও দেখবে ব্যাটা অফিসে নেই। কস্টিউম পরে সুইমিং পুলে সাঁতার কাটছে। চীফ সেক্রেটারিকেও ফাইল সই করাতে সুইমিং পুলে ছুটতে হয়। আমরা সবাই লক্ষ্মীদার এই সরল অমায়িক এবং অপকট আচরণে তাঁর গুণমুগ্ধ হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছিলাম। তিনিও এক ভালোবাসার অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে পড়ছিলেন আমাদের সঙ্গে। ইতিমধ্যে তার ঘরের আলমারির চাবি, ড্রয়ারের চাবি যেগুলোতে টাকা এবং রিভলবার থাকত তিনি আমাকে সঁপে দিয়েছিলেন। তাঁর ৩/৪ টি গাড়ির চাবিও আমার কাছেই তখন থাকত। তিনি আমাকে বলেই রেখেছিলেন, আমাদের যখন যেখানে যাওয়ার প্রয়োজন তার গাড়ি যাতে ব্যবহার করি। ড্রাইভারকে নির্দেশ দেওয়া আছে। যখন টাকার প্রয়োজন হবে, লক্ষ্মীদা যদি বাড়িতে না থাকে আমি যাতে খরচ করতে কুণ্ঠাবোধ না করি। লক্ষ্মীদা এমন একটি অপত্য স্নেহের বন্ধনে আমার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন যে তিনি যদি কোন স্টাফকে ছাঁটাই করতেন তাহলে একমাত্র আমিই সেই স্টাফকে পুনর্নিয়োগ করার স্পর্ধা দেখাতে পারতাম। ২/৩ বার দু'তিন জন ড্রাইভারকে, অফিস অ্যাটেন্ডেন্টকে লক্ষ্মীদা রেগে ছাঁটাই করে দিয়ে বেরিয়ে গেছেন। দুপুরে সব ঘটনা শুনে যখন দেখলাম অতি তুচ্ছ কারণ তখন তাদের বলেছিলাম— তোমরা কাজে যোগ দাও। ব্যাপারটা আমি লক্ষ্মীদার সঙ্গে বুঝে নেব। রাত্রিতে বা সন্ধ্যায় এসে লক্ষ্মীদা যখন দেখলেন ছাঁটাই হওয়া কর্মী নির্বিবাদে কাজ করে চলেছে তখন ওদের ডেকে জিজ্ঞেস করার পর ওরা যখন আমার নাম বলেছে তখন তিনি আর তাদের কিছু বলেননি। পরে অবশ্য আমি লক্ষ্মীদাকে সবটা ব্যাপার বুঝিয়ে বলেছি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মিথ্যে কান কথাও যে লক্ষ্মীদার কাছে কেউ কেউ বলেছে সেটাও খুলে বলেছি।

আমাদের ছেলেরা খোলা আকাশের নীচে হাঁটতে হাঁটতে হাঁপিয়ে উঠেছিল। সরস্বতী পুজো শেষ হয়ে ভাল গরম পড়েছে মার্চ-এপ্রিল মাসে। এই রোদে সারাটা দুপুর কোথায় হাঁটা যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আমি যারা নিয়মিত এন.এল.সি.সি অফিসে আসা-যাওয়া করেন তাদের এই এলাকাতে কোথাও ঘর ভাড়া পাওয়া যায় কিনা খোঁজ নিতে বলেছিলাম। এরই মধ্যে একজন এসে খবর দিল দেশপ্রিয় পার্কের পাশে 'প্রিয়া' সিনেমা

হস্টের সঙ্গে ট্রাঙ্গুলার পার্কের উল্টোদিকে দোতালায় তিনটি ঘরের একটি ফ্ল্যাট আছে। তবে পাড়ার ছেলেরা সেই ফ্ল্যাটটি দখল করে রেখেছে এবং নির্বিবাদে সেই ফ্ল্যাটে নানা ধরনের অসামাজিক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বাড়ির মালিক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। তারা তিনতলায় থাকেন। নীচের তলায় সব দোকান ভাড়া। মালিকের ছেলেরা কোলকাতায় থাকে না। আমরা যদি দখলদার তুলে ফ্ল্যাট দখল করি তবে যতদিন প্রয়োজন থাকতে পারব। ভাড়া দিতে হবে না। বাড়ির মালিক নাকি সেরকমই বলেছে। লক্ষ্মীদার সঙ্গে রাত্রিতে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করলাম। লক্ষ্মীদা বললেন, ফ্ল্যাটের মালিকের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা কর। ব্যাপারটা সত্যি ও হতে পারে। যারা ফ্ল্যাট দখল করে বসে আছে তাদের তো আর বাড়ির মালিক তুলতে পারবে না। তোমরা যদি ওদের বের করে দিয়ে ফ্ল্যাটের দখল নাও তাহলে তোমরা ত্রিপুরার ছেলে সারাজীবন তো আর ফ্ল্যাটের দখল রাখবে না। সেটাই বাড়ির মালিকের লাভ। একদিন দুপুরে আমি আর অজিত দাস সেই ফ্ল্যাটের মালিকের সঙ্গে কথা বলতে তিন তলা উঠলাম। ওঠার সময় জরিপ করে নিলাম দোতলার অবস্থা। দেখলাম দুটো ঘর তালা দেওয়া। আর একটি ঘরে ঝাঁকড়া চুল, বেঁটে মত একটা লোক শুয়ে আছে। পরে জেনেছিলাম তার নাম সেন্টু। সে কসবার সমাজ বিরোধী 'লালি'-র সাকরেদ। এই ফ্ল্যাট স্থানীয় কিছু ছেলের সহযোগিতায় লালি দখল করেছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় লালি আসে ফ্ল্যাটে। মদ এবং জুয়ার আসর বসে। মাঝে মাঝে দুপুরেও লালি আসে যেদিন ফ্ল্যাটের উল্টোদিকের খুব চলতি একটি টেইলারিং শপের মালিকের সুন্দরী স্ত্রী লালির কাছে অভিসারে আসে। বাড়ির মালিক আমাদের বললেন, ফ্ল্যাটের দখল নিতে পারলে তার কোন আপত্তি নেই। যতদিন খুশি আমরা থাকতে চাই থাকতে পারব। আমাদের ভাড়া দিতে হবে না। আমি বৃদ্ধ মালিককে বললাম, আমরা ২/৩ মাসের বেশি থাকব না। এরমধ্যেই হোস্টেলে ফিরে যাব সবাই। ফ্ল্যাটের মালিক আমাদের দেখে সন্দেহ প্রকাশ করলেন লালি-র মত গুণ্ডাকে এই চত্বরে সবাই ভয় পায়। সব জেনেও টেইলারিং শপের মালিক লালিকে ঘাঁটাতে সাহস পায় না। আমরা কি পারব তাদের হটিয়ে দিয়ে ফ্ল্যাট দখল করতে ? আমি বৃদ্ধ দম্পতিকে আশ্বস্ত করে বললাম, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কাল সন্ধ্যায় আমরা ফ্ল্যাট দখল করব।

সে সময় বোম, লব, গোবিন্দ, শ্রীধর এরা সবাই ছিল হাবড়া। রাতে বোমকে ফোন করে বললাম, তোমরা চারজন কাল দুপুরের মধ্যে অবশ্যই কোলকাতা চলে এস। পাঞ্জাবি ধাবার সামনে আমি দুপুর ৩টা থেকে অপেক্ষা করব। আসার সময় একটু সেজে এসো। ছোটখাট একটি বিয়েতে বরযাত্রী যেতে হবে। বোম আমার ইশারা বুঝে গেল। রাতে লক্ষ্মীদাকে বললাম, কাল সন্ধ্যায় ফ্ল্যাটের দখল নেব। স্থানীয় থানাকে একটু বলে রাখবেন। যাতে কোন খবর পেলেও না যায়। লক্ষ্মীদা বললেন, পারবে ফ্ল্যাটের দখল নিতে ? লোকজন দিতে হবে কি সঙ্গে? আমি বললাম, না, কাউকে দিতে হবে না। আমরাই পারব। লক্ষ্মীদা বললেন, আমারও তাই বিশ্বাস।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠেই লক্ষ্মীদাকে বললাম আজ আপনার সঙ্গে আমি রাত্রিতে থাকব না। নূতন ফ্ল্যাটে সবার সঙ্গে থাকব। যাতে এরা সাহস না হারায়। লক্ষ্মীদা বললেন, তুমি এত আত্মবিশ্বাসে ভরপুর থাকো কি করে? এখনো ফ্ল্যাটই দখল করলে না অথচ বলছ

রাতে ফ্ল্যাটে সবাইকে নিয়ে ঘুমোবে। আমি বললাম যা বলেছি তাই হবে। আপনি শুধু মনে করে স্থানীয় থানার ও. সি-কে যা নির্দেশ দেওয়ার কথা বলেছি সেটা বলে দেবেন। লক্ষ্মীদা বললেন, সে ব্যাপারে তোমার চিন্তা করতে হবে না। আমি ও. সি-কে আমার অফিসে ১০টায় ডেকেছি। আমি বললাম সে সময় কি আমার উপস্থিত থাকার প্রয়োজন আছে। লক্ষ্মীদা বললেন, না। আমি যা বলার বলে দেব। প্রয়োজনে ও. সি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করে তার কি করণীয় কর্তব্য জানতে চাইবে। আমি নিশ্চিন্ত হলাম। কারণ এতদিনে জেনে গিয়েছিলাম লক্ষ্মী বোস হিপোক্র্যাট নন। বিকেল ৪টা নাগাদ বোম, গোবিন্দ, শ্রীধর, লব এসে দেখা করল আমার সঙ্গে সাউদার্ন এভিনিউর পাশে পাঞ্জাবী ধাবায়। ওরা বরযাত্রী যাওয়ার সাজেই কোমরে পিস্তল সেঁটে এসেছিল। আমি ওদের সমস্ত পরিকল্পনা বুঝিয়ে বললাম। ওরা সবাই আমাকে আশ্বস্থ করে বলল, আমরা যে প্রস্তুতি নিয়ে এসেছি অন্ততঃ একশ জনের সঙ্গে লড়তে পারি। আর তোমার রিপোর্টিং শুনে মনে হল সর্বমোট ১০ জনের সঙ্গে হয়তবা লড়তে হতে পারে। তাছাড়া তুমি আমাদের দলপতি, চিন্তার কি আছে। তুমি লক্ষ্মীদাকে যে কথা দিয়েছ সেটা অক্ষরে-অক্ষরে পালিত হবে। আমি বোম, লব, গোবিন্দ, শ্রীধরের কথায় আশ্বস্থ বোধ করলাম। কারণ তখন স্কুলে থাকার বোর্ডার সংখ্যা কমতে কমতে ৩/৪ জনে এসে দাঁড়িয়েছিল। সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ আমি, বোম, লব, গোবিন্দ, শ্রীধর, অজিত আরো দু'তিন জন পৌঁছে গেলাম 'প্রিয়া' সিনেমা হল সংলগ্ন ফ্ল্যাটে। আমি দোতালায় উঠে দেখলাম ৫/৬ জন লোক একটি রুমে মদ খাচ্ছে এবং সম্ভবতঃ জুয়া খেলছে। কেননা তাদের প্রত্যেকের সামনে তাস বাটা আছে। আমি এদের বললাম আমি ১ থেকে ১০ গুনব এর মধ্যে তোমাদের সবাইকে রুম থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। মদ এবং জুয়া খেলায় রত ৫/৬ জন লাফ দিয়ে আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে আমাকে আক্রমনের চেষ্টা করল। ঠিক সে সময়ে আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে গেল বোমের নেতৃত্বে হাবড়ার পুরো টিম। কি বেধড়ক মার যে দিয়েছিলাম মাস্তানদের সেদিন রাতে, আজো স্মরণ করতে হলে আমি শিউরে উঠি। সেই মাস্তান গ্রুপের নেতা 'লালি'-র দু'হাঁটু এমন ভাবে ভেঙ্গেছিলাম যে তিন মাস সে শয্যা ছেড়ে, প্লাস্টার খুলে ঘর থেকে বেরুতে পারেনি। যখন লালি সুস্থ হয় তখন সেই এলাকার পরিবেশ আমরা এমন পাল্টে দিয়েছিলাম যে 'লালি' আর সে এলাকাতে ঢোকার সাহসই পায়নি। আমরা সবাই মাথার উপর ছাদ পেয়ে খুব খুশী হয়েছিলাম। কিন্তু একটি সমস্যা আমাদের প্রতিনিয়ত বিব্রত করত সেটি হলো দোতালার যে ফ্ল্যাটটি আমরা দখল করেছিলাম সেখানে মাত্র একটি বাথরুম ছিল। সকাল বেলা কারুর বাথরুম পেলে প্রায় ঘন্টা খানেক বাথরুমের লাইনে দাঁড়িয়ে বাথরুম ব্যবহার করতে হত। অনেকের তখন চর্মরোগও দেখা দিয়েছিল। এর মধ্যে কেশব ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমি কেশবকে ডাক্তারের পরামর্শমত টেনশান ফ্রি লাইফ লিড করার জন্য শান্তি নিকেতন নিয়ে যাই। সে সময় কেশবের অকৃতদার কাকা শান্তি নিকেতনে কাজ করতেন এবং কেশবের আপন বোন কৃষ্ণাকে নিয়ে তিনি শান্তি নিকেতনের কোয়ার্টারে থাকতেন। আমি কেশবকে শান্তি নিকেতনে পৌঁছে দিয়ে পরদিনই কোলকাতা ফিরে এসেছিলাম।

'প্রিয়া' সিনেমা হলের পাশে ফ্ল্যাট দখল করার ২/১ দিন আগে কুমুদ ভট্টাচার্য্য আমাকে খবর পাঠিয়ে তার বাড়িতে যেতে বলেন। একদিন সকালে অজিত দাসকে নিয়ে

কুমুদদার বাড়ি বেহালায় সকালে গেলাম। ওনার সঙ্গে আলোচনা করে বুঝলাম, লক্ষ্মীদার সাহায্য নেওয়ার ব্যাপারে তিনি মোটেই বিরক্ত নন। পরিস্থিতির কারণে যে আমাদের লক্ষ্মীদার কাছে সাহায্যের জন্য হাত পাততে হয়েছে সেটা তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন। কুমুদদা আমার হাতে কাঁকুড়গাছি এলাকার একটি এল আই জি (লোয়ার ইনকাম গ্রুপের) ফ্ল্যাটের চাবি তুলে দিয়ে বললেন, তোদের কয়েকজনের থাকার ব্যবস্থা করার জন্য বহু দরবার করে এই ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করতে পেরেছি। আমি বিবেচনা করে দেখলাম 'প্রিয়া' সিনেমা হলের পাশের ফ্ল্যাটটিতে আমরা ওভার লোডেড। বাথরুম ব্যবহার করতে হলে একঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়। সুতরাং বিনয় সাহা, নির্মল পাল, হরিপদ সাহা, শক্তি চক্রবর্তী, শেখর দত্ত এদের ৫ জনকে কাঁকুরগাছি থাকার জন্য পাঠিয়ে দিই। শেখর দত্ত মার খেতে খেতে, নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে হোস্টেল থেকে বেরিয়ে এসেছিল। আসলে শেখর, পীযূষ ঘোষ এবং আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হোস্টেলে থাকতে পারছিল না। ১৯৭৬ সালে আমরা ত্রিপুরার ছেলেরা দক্ষিণ কোলকাতা এবং উত্তর কোলকাতার দু'টো ফ্ল্যাটের মালিকানা পেয়ে গিয়েছিলাম দখলদারির সূত্রে। আজকের বাজারে যার মূল্য কয়েক লক্ষ টাকার বেশি হবে। কিন্তু ত্রিপুরায় ছেলেদের কোন পার্থিব লোভ হাতছানি দিয়ে ন্যায় ধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। সে কারনে দু'টো ফ্ল্যাটই আমরা প্রকৃত মালিকের কাছে দখলদারি ছেড়ে দিয়ে এসেছিলাম। কথাটা বোধহয় ঠিক বলিনি 'প্রিয়া' সিনেমা হল সংলগ্ন ফ্ল্যাটটি আমরা যেদিন হোস্টেলে ঢুকি তার ২/৩ দিন পর বৃদ্ধ মালিক দম্পতির হাতে ফ্ল্যাটের চাবি তুলে দিয়ে এসেছিলাম। বৃদ্ধ দম্পতি অনেক অনুনয় বিনয় করে আমাদের 'ফিস্ট' করার জন্য দু'হাজার টাকা আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। বহু চেষ্টা করে ও টাকাটা ফেরত দিতে পারিনি। পরে আমরা সে টাকায় হোস্টেলে একদিন 'ফিস্ট' করেছিলাম। আমরা হার্ডিঞ্জ হোস্টেল দখল নেওয়ার পর বিনয়, নির্মল, শেখর, হরিপদ, শক্তি হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে চলে আসে। তারপর সেই ফ্ল্যাটটিতে আমি বিভাস পোদ্দারকে সস্ত্রীক, মেয়েসহ থাকার জন্য চাবি দিয়ে দিই। বিভাস সেই ফ্ল্যাটে ১৯৭৭ সন থেকে বছর তিনেক ছিল। তখন আমি যথারীতি আগরতলা চলে এসেছি। অনুরাধা বৌদির সঙ্গে বিভাসের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। বৌদি মেয়েকে নিয়ে কুমারটুলি বাপের বাড়ি চলে যান। এরপর সে ফ্ল্যাটের চাবি বিভাস আমাকে জিজ্ঞেস করেই সুদীপ নাথ এবং সজল সাহাকে দিয়ে দেয়। সজল সাহা তখন কোলকাতায় ডাক্তারি পড়ত। সে আগরতলার 'সাহা সাইকেল স্টোর্স'-র মালিকের ছেলে। বেশ কিছুদিন এরা সেখানে থাকার পর প্রচুর টাকার ইলেকট্রিকেল বিল বকেয়া পড়ে যাওয়ায় ফ্ল্যাটের বিদ্যুতের লাইন ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন কেটে দেয়। সম্ভবত প্রথম থেকেই কেউ বিদ্যুতের বিল মেটায়নি। সুদীপ ও সজল ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে আসে। আমাকে আর কিছু জানায়নি। মোদ্দাকথা, আমার অজ্ঞাতসারে ফ্ল্যাটটি হাতছাড়া হয়ে গেছে।

ট্রাঙ্গুলার পার্কের উল্টোদিকে 'প্রিয়া' সিনেমা হল সংলগ্ন ফ্ল্যাটটি সম্ভবতঃ আমরা দখল করেছিলাম ১৯৭৬ সনের মার্চ মাসের মাঝামাঝি। আমাদের ছেলেরা মেস করে খুব আনন্দেই দিন কাটাতে লাগল। নিজেরাই বাজার-হাট করে। রান্না করে খায়। আমি সারাদিন তাদের সঙ্গে থাকি। রাত্রিতে জামিনদার হিসাবে লক্ষ্মীদার বাড়িতে ঘুমোতে যাই। মিথ্যে

কথা বলব না তখন লক্ষ্মীদার প্রতি আমাদের সকলেরই ভালোবাসা, শ্রদ্ধা মিশ্রিত একটি মমত্ববোধ গড়ে উঠেছিল তার চারিত্রিক সারল্যের কারণে। ঠোটের কোনে সব সময মিষ্টি মিষ্টি হাসি। প্রথম দর্শনে যে কোন লোকের হিন্দী সিনেমার ভিলেনের রোলে তাকে খুব মানানসই হবে ভেবে নিতে পারে। বাস্তবে তিনি ছিলেন ঠিক তার উল্টো। দয়া-মায়া, ভালোবাসা-করুণা সব মিলিয়ে মানবিক সমস্ত সহজাত গুণগুলি তার মধ্যে সন্নিবেশিত ছিল।

১লা মে ১৯৭৬ সন, শহীদ মিনার ময়দানে বিকেল ৩টায় 'মে ডে' অর্থাৎ আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালন করা হবে। প্রধান বক্তা জ্যোতি বসু। সকাল বেলা আমি লক্ষ্মীদার একজন ড্রাইভার সম্ভবতঃ তার নাম হারাধন তাকে বললাম - ঠিক ২.৩০ মিঃ সময়ে সে যাতে লক্ষ্মীদার অফিসে চলে আসে আমি একটু গাড়ি নিয়ে বেরুব। সকাল ৯.৩০ মিঃ নাগাদ লক্ষ্মীদা ও আমি যখন একসাথে প্রাতঃরাশ সারছিলাম তখন লক্ষ্মীদা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন - তোমাব কি আজ গাড়ি লাগবে? দূরে কোথাও লং ড্রাইভে যাবে কি? আমি বললাম না, আমি বিকাল ৩টায় শহীদ মিনার ময়দানে জ্যোতিবসুর বক্তব্য শুনতে যাব। যদি আপনার গাড়ির প্রয়োজন থাকে আমি বাসে কিংবা ট্রামে চলে যাব। আপনার চিন্তা করতে হবে না। লক্ষ্মীদা বললেন, আজ ৩/৪ জায়গায় এন. এল. সি সি-র সভা আছে। ৩/৪ টি গ্রুপকে গাড়ি দিয়ে সভাস্থলে পাঠাতে হবে। আমি ৪টায় জোড়াসাঁকো 'গিরীশ পার্ক'-এ সভা করতে যাব। যাওয়ার সময় তোমাকে ৩টায় শহীদ মিনার নামিয়ে দিয়ে যাব। আজকের দিনটা একটু ম্যানেজ করে নাও। আমি বললাম অযথা আপনি উদ্বিগ্ন হচ্ছেন। আমার কোন অসুবিধাই হবে না। সেদিন লক্ষ্মীকান্ত বোস তার গাড়িতে বসিয়ে আমাকে নিয়ে যান শহীদ মিনার ময়দান। আমাকে ছেড়ে দিয়ে তার গাড়ির কনভয় ছুটে যায় গিরীশ পার্কের উদ্দেশ্যে। লক্ষ্মীদা আরো ৩০ মিঃ পর বাড়ি থেকে বেরুলে পারতেন। শুধুমাত্র আমাকে ৩টায় শহীদ মিনার এলাকায় পৌছে দেওয়ার জন্য তিনি আধঘণ্টা আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন। জরুরী অবস্থা চলাকালীন সময়ে পশ্চিম বাংলায় সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের জমানায় এই উদার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সহনশীলতা আমি লক্ষ্মী বোস ছাড়া আর কারো মধ্যে দেখিনি।

'প্রিয়া' সংলগ্ন ফ্ল্যাটে তখন প্রায় প্রতিদিন বিমল সিন্‌হা রাত কাটাতে আরম্ভ করেছিল। সন্ধ্যায় রাস বিহারী এলাকায় শিয়ালদা 'ত্রিপুরা মেস' থেকে আড্ডা দিতে এসে রাতে আর ফিরে যেত না। কৈলাশহরের প্রদীপ দেবের সঙ্গে বেড শেয়ার করে ঘুমিয়ে যেত। প্রিয়া ফ্ল্যাটে মেসের প্রায় স্থায়ী ম্যানেজার নির্বাচিত হয়েছিল কৈলাশহরের কৃষ্ণদাস সিন্‌হা ওরফে দোলন সিন্‌হা। বিমলের খাওয়া পেতে কোন অসুবিধা হত না। সবই তো তার - 'মোর মানু গো'। একদিন সকাল ১০টা নাগাদ চান, প্রাতরাশ সেরে 'প্রিয়া' সিনেমা হল সংলগ্ন ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখি প্রদীপ আর বিমল ছাড়া সবাই ঘুম থেকে উঠেছে। আমি বিমলের পাছায় লাথি মেরে ওকে ঘুম থেকে তুললাম। বিমলের অনাবশ্যক চীৎকারে প্রদীপ দেব ও ঘুম থেকে উঠে পড়ল। ঘুম থেকে উঠে প্রদীপ আমাকে দেখে হাসতে হাসতে তার পেটে খিল ধরার উপক্রম। আগের দিন সন্ধ্যায় নাকি বিমলের পীড়াপীড়িতে প্রদীপ টালিগঞ্জ 'প্রদীপ' সিনেমা হল সংলগ্ন একটি বারদুয়ারিতে বিশ টাকার একটি নোট সংগ্রহ

করে গিয়েছিল। 'প্রদীপ' সিনেমা হলটি ঐতিহাসিক। গঙ্গার পাড়ে অবস্থিত। গঙ্গায় জোয়ার এলে সিনেমা হল কর্তৃপক্ষ মাইকে ঘোষণা দেন, দর্শক বন্ধুরা সিটের উপরে পা তুলে বসুন। হলের ভেতরে জোয়ারের জল ঢুকছে। আবার যখন ভাঁটার টান আসে তখন মাইকে ঘোষণা করা হয় জোয়ারের জল নেমে গেছে। আপনারা পা নামিয়ে বসতে পারেন। যাহোক, সেদিন বিমল আবেগে বারদুয়ারিতে বসে বকবক করছিল। প্রদীপ নিঃশব্দে গলাধঃকরণ করে যাচ্ছিল ছাই পাশ। বিমল ২ বার ছাইপাশ গিলে ভুলেই গিয়েছিল প্রদীপের সংগ্রহে আরো কিছু রয়ে গেছে। হঠাৎ বিমল বলল, কিরে বাবা, একলা-একলা খাও কেরে। আমারে দেও। বলেই বিমল বিভিন্ন গুরুতর প্রসঙ্গ প্রদীপকে বোঝাতে আরম্ভ করল। সেই গুরুতর প্রসঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে প্রধান বিষয় ছিল আমার মত মূর্খ এবং আউয়া নাকি বিমল তার এই পরিণত বয়সে দেখেনি। প্রদীপ বিমলের কথার ফাঁকে তার পাত্রে একেবারে নিখাদ খালি জল ঢেলে দিল। বিমল সেই জল গলাধঃকরণ করেই চেঁচিয়ে উঠেছিল - ইস্, কি কড়া দিছোরে বা, শিগগীর একটু লবন দেও। প্রদীপ লবনের পাত্র এগিয়ে দিলে বিমল ঠোঁটের আগায় ২/৩ বার লবন লাগিয়ে ধাতস্থ হয়।

কোথায় ভেবেছিলাম বিমল আর প্রদীপকে আচ্ছা বকুনি দেব দোলনের কাছ থেকে মেস খরচের ২০ টাকা নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু প্রদীপের মুখে এই ঘটনা শুনে আমার পেট হাসতে হাসতে খিল ধরে গেল। বিমল প্রদীপকে এই মারে তো সেই মারে। আমাদের সমসাময়িক যারা পার্টি নেতৃত্বে গিয়েছেন তাদের মধ্যে শিশুর মত সহজ সরল মনের লোক বিমলের মত কাউকে পাইনি। ১৯৯১ সনে পার্টি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর পার্টি নেতাদের মধ্যে একমাত্র বিমল সিন্‌হা আমাদের সঙ্গে অকুতোভয়ে যোগাযোগ রেখেছিল। ভালোবাসার অচ্ছেদ্যবন্ধন পার্টির তথাকথিত অনুশাসনের জন্য সে জলাঞ্জলি দিতে রাজী ছিল না। 'তিরিশ থেকে আশি' বইটি লেখার পর জীবন চক্রবর্তীকে ১৯৮২ সনে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়। একবার পার্টি থেকে কেউ বহিষ্কৃত হলে পার্টির কোন কর্মী বা নেতা তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায় না পারত পক্ষে। তার ওপরও শাস্তির খাঁড়া নেমে আসবে এই ভয়ে। বিমল ১৯৮২ সনে জীবনদাকে 'ত্রিপুরা দর্পণ' পত্রিকা অফিস থেকে জোর করে তার সঙ্গে জি. বি. হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে আমাদের সঙ্গে থাকত বিভাস সাহা। বর্তমানে সে কোলকাতা ইনকামট্যাক্সের আইনজীবী হিসাবে কর্মরত। বিভাসের মুখে শুনেছিলাম - বিমল মন্ত্রী হওয়ার পর দমদম এয়ারপোর্টে বিমলকে দেখেও বিভাস কাছে যায়নি। বিমল তার সিট ছেড়ে উঠে এসে বিভাসকে ধরে ফেলে এবং প্রথম দর্শনেই বলে, শুয়রের বাচ্চা আমারে দেইখ্যা কি চিনা যায় না? বিভাস উত্তর দেয় আপনি নিরাপত্তারক্ষী পরিবৃত, সাঙ্গ পাঙ্গ, চ্যালা-চামুন্ডা আপনাকে ঘিরে রেখেছে। আপনার কাছে গেলে ভাববে কোন স্বার্থের জন্য গিয়েছি। সে কারণেই মন্ত্রীর কাছে আমি ঘেঁষতে চাই না। এবার বিমলের প্রতিক্রিয়া নাকি আরো তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। বলে কুত্তার বাচ্চা, আমার নামে কোন্ শুয়রের বাচ্চা এমন কথা কয়। আমি আগে যেমন আছিলাম, অখনও তেমনই আছি। তোমার যখন খুশী আমার সঙ্গে দেখা করবা। এরপর বিমান ছাড়ার আগে পর্যন্ত বিভাসের সঙ্গে বিমল হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের পুরোনো বন্ধু-বান্ধব সবার কথা আলোচনা করে সময় কাটিয়েছে। বিমল যখন বিধানসভার অধ্যক্ষ ছিল তখন কত দিন



পোলিও খাওয়াচ্ছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিনহা

ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকা অফিসে ফোন করে আমাকে তার কোয়ার্টারে ডাকিয়ে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিয়েছে তার সঠিক সংখ্যা আমি বলতে পারব না। পার্টি নেতারা বিশেষতঃ নৃপেন চক্রবর্তী কি রকম প্রতিহিংসা পরায়ন ছিলেন প্রসঙ্গক্রমে সেটা উল্লেখ করছি। ১৯৯৩ সনে সি. পি. আই (এম) দল যখন রাজ্যে ক্ষমতায় এল তখন সবাই আশা করেছিল দশরথ দেবের নেতৃত্বে তৃতীয় বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় বিমল অবশ্যই ক্যাবিনেট র‍্যাঙ্কের মন্ত্রী হবে। কিন্তু মন্ত্রীসভা গঠন হওয়ার পর দেখা গেল আশ্চর্য্যজনকভাবে বিমল সিন্‌হার নাম মন্ত্রীসভার তালিকায় অনুপস্থিত। বহু অংক কষেও কেউ সে রহস্যের কারণটা আঁচ করতে পারেনি। আমি কিন্তু নেপথ্যের কারণটা জানি। ১৯৯১ সনে আমরা পার্টি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর বিমল যে আমাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখত সেই খবর নৃপেনদার কাছে ছিল। বিমল হয়ে উঠেছিল নৃপেনদার চক্ষুশূল। এরমধ্যে ঘৃতাহুতির মত একটি ব্যাপার ঘটে গেল। সেই ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে নৃপেনদা বিমলকে ১৯৯৩ সনে তৃতীয় বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় ঢুকতে দিলেন না। রাজর্ষি হোটেলে ১৯৯২ সনের শেষ দিকে একটি পার্টিতে বিমলের সঙ্গে আমার বহুদিন পর দেখা হয়। স্বাভাবিক কারণেই আমি আর বিমল ভিড় থেকে সরে গিয়ে একটি সোফায় ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আড্ডা মারছিলাম। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কোন এক আমলা আমাদের দু'জনের সেই ঘনিষ্ঠ ছবিটি ক্যামেরাবন্দী করে রাখেন। ১৯৯৩ সনে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এলে আমার এবং বিমলের ছবিটি যথাসময়ে নৃপেনদার হাতে তুলে দেন। নৃপেনদা সেই ছবিটি তুরুপের তাসের মত বিমলের বিরুদ্ধে রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সভায় ব্যবহার করেন। তিনি বলেছিলেন, পার্টি থেকে বেরিয়ে গিয়ে জোট আমলে যারা পার্টির পেছনে ছুরি মেরেছে তাদের সঙ্গে যার আঁতাত

রয়েছে তাকে মন্ত্রীসভায় নিতে হবে? পার্টির কি এতই দুরাবস্থা হয়েছে। নৃপেনদার প্রচণ্ড ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নৃপেনদাকে ১৯৯৩ সনে মুখ্যমন্ত্রী করতে রাজী হয়নি। দশরথ দেবকে মুখ্যমন্ত্রী মনোনীত করেন। আদ্যোপান্ত সৎ হলেও নৃপেনদার ক্ষমতার লোভ ছিল অপরিসীম। বুকের সেই জ্বালা কিছুটা তিনি বিমলের মন্ত্রীসভায় অর্ন্তভুক্তি আটকে দিয়ে প্রশমিত করতে পেরেছিলেন। পার্টি প্রথা বর্হিভূতভাবে রাজ্য যোজনা কমিশনের চেয়ারম্যানের পদ মুখ্যমন্ত্রীর পরিবর্তে নৃপেন চক্রবর্তীকে মনোনীত করে তার ক্ষোভ সাময়িক প্রশমিত করেছিলেন। আস্তে আস্তে নৃপেনদার পার্টির উপর কর্তৃত্ব কমতে শুরু করে। ১৯৯৫ সনে দশরথ দেবের প্রবল আগ্রহে বিমল সিন্‌হা তৃতীয় বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভার স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনোনীত হন। তারপরের ইতিহাস সবার জানা। ত্রিপুরা রাজ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসাবে বিমলের চেয়ে ডায়নামিক কোন মন্ত্রী আজো ও এ রাজ্যের জনগণের ভাগ্যে জোটেনি।

আমাদের ছেলেরা অপেক্ষাকৃতভাবে 'প্রিয়া' সংলগ্ন ফ্ল্যাট ও কাকুরগাছি ফ্ল্যাটে ভাল থাকলেও হতাশা আমাদের সকলকে গ্রাস করে ফেলছিল। ইউনিভার্সিটি ক্লাস করতে কেউ যেতে পারছে না। খাওয়া-ঘুম-ঘুরে বেড়ানো ছাড়া কোন কাজ নেই। এরই মধ্যে ল' কলেজের পরীক্ষার ফরম ফিল-আপের দিন ঘোষণা করা হোল। জুন মাসে ল' পরীক্ষা হবে। ত্রিপুরা মেসে তখন থাকত কমলপুরের ছেলে সুদীপ নাথ। দেখতে ছোট-খাট, নিরীহ চেহারা। ওকে কেউ সন্দেহ করার উপায় নেই। তার মাধ্যমে আমাদের সবার ল' কলেজ পরীক্ষার ফরম ফিল-আপ করে ইউনিভার্সিটিতে জমা দিলাম। ইউনিভার্সিটিতে বিভিন্ন সেকশানে আমাদেব পরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ কর্মচারী বন্ধুরা ছিল। ফণীদা আমাদের সকলের পরীক্ষার এডমিট কার্ড সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দিলেন। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা আইনে ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষার্থী তাদের সকলের সীট পড়েছিল দক্ষিণ কোলকাতার যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী ল' কলেজে এবং হাজরা ল' কলেজে। স্বাভাবিক কারণেই হার্ডিঞ্জ হোস্টেল থেকে সুব্রত মুখার্জির গ্রুপের ছেলেদের পরীক্ষার সময় দক্ষিণ কোলকাতা পরীক্ষা দিতে আসতে হত। আগেই খবর নিয়ে জেনেছিলাম হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের প্রতিটি তলা ২৪ ঘণ্টা ভেতর থেকে তালা দেওয়া থাকে। কেউ বেরুলে তালা খুলে দেওয়া হয়। কেউ এলে ভাল করে চিনে নিয়ে তালা খুলে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয়। আমি খুব চিন্তিত হয়ে উঠেছিলাম। লক্ষ্মীদার শত আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও হোস্টেলে ঢোকার ব্যাপারে কোন আশার আলো দেখতে পাচ্ছিলাম না। যে করে হোক একটু ঝাঁকুনি বা আলোড়ণ সৃষ্টি না করতে পারলে আমাদের আর হোস্টেলেই ঢোকা সম্ভব হবে না বুঝতে পারছিলাম। আমরা সবাই মিলে বসে একটা পরিকল্পনা করলাম। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ১১ এপ্রিল এবং ২১ এপ্রিল দু'বার হোস্টেলে ঢোকার পরিকল্পনা নিয়েও আমরা বিভিন্ন কারণে পরিকল্পনা সফল করতে পারিনি। লক্ষ্মীদা মিটিমিটি হেসে আমাকে টিপ্পনি কেটে বললেন—তোমাদের প্ল্যানই করা হবে, হোস্টেলে আর এভাবে ঢুকতে পারবে না। বরঞ্চ অপেক্ষা কর আমি মানুদাকে দিয়ে প্রিয়, সুব্রতকে ডাকিয়ে তোমাদের ঢোকার ব্যবস্থা করছি। আমি লক্ষ্মীদাকে বললাম, প্রিয়-সুব্রত'র করুণা নিয়ে আমরা ঢুকব না। প্রয়োজনে হোস্টেলের বাইরে থেকে পরীক্ষা দিয়ে আমরা বাড়ি ফিরে যাব। দু'বার হোস্টেলে ঢোকার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর

আমাদের ছেলেদের মনোবল তলানিতে গিয়ে ঠেকে। এদের চাঙ্গা রাখাই একটি কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। আমি সুব্রত পাল এবং পরিতোষ পালকে (বাবুল) হার্ডিঞ্জ থেকে ডাকিয়ে এনে আলোচনা করি। কি করে একটা বিশেষ সময় হোস্টেলের গেট অন্ততঃ ১৫/২০ মিনিট এর জন্য খোলা রাখা যায় তার উপায় খুঁজতে থাকি। অবশেষে ঠিক হয় ২১শে জুন খুব ভোরে সুব্রত আর পরিতোষ ৫ তলায় রাখা ট্যাঙ্কের সব জল ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। ট্যাঙ্কে পুনরায় জল ভরতে বেশ সময় নেয়। ৯-৩০ মিঃ থেকে ১০টা পর্যন্ত এরা দু'জন চান করার নাম করে ৫ তলার গেটের তালার চাবি খুলে ট্যাঙ্ক থেকে বালতি কেটে সাবান মেখে একটু সময় নিয়ে চান করবে। আমাদের ছেলেরা এই সময়ের মধ্যে ৫ তলা দিয়ে গেট খোলা পেয়ে হোস্টেলে ঢুকবে। ২০শে জুন, ১৯৭৬ সন আমি নিজে হাজরা ল' কলেজ এবং যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী কলেজের পরীক্ষা সেন্টারে গেলাম। এই দুই সেন্টারে হার্ডিঞ্জ হোস্টেল থেকে যারা পরীক্ষা দিতে এসেছিল তাদের সঙ্গে গায়ে পড়ে আমাদের ছেলেদের যারা ঐসব সেন্টারে পরীক্ষা দিচ্ছিল তাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে নির্দেশ দিলাম। পরীক্ষা শেষ হলে লনে দাঁড়িয়ে আমাদের ছেলেরা যখন ওদের সঙ্গে ঝগড়া আরম্ভ করল তখন আমাদের ছেলেদের আমি ডেকে ডেকে ফিরিয়ে আনলাম। জোরে জোরে ওদের শুনিয়ে বললাম যা হওয়ার কাল হবে। দেখি তোরা পরীক্ষা দিস কি করে। আমার উদ্দেশ্য ছিল হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের ছেলেরা ফিরে গিয়ে আজকের ঘটনার কথা জানালে পরের দিন গোটা হোস্টেলের ছেলেরা যাতে সুব্রত মুখার্জির গ্রুপের ল' পরীক্ষার্থী ছেলেদের পাহারা দিতে হোস্টেল ফাঁকা করে যোগেশ চন্দ্র ল' কলেজ ও হাজরা ল' কলেজে ছুটে আসে। পরীক্ষা শুরু হত ১০টায়। সুতরাং হিসেব করে নিলাম ওদের হার্ডিঞ্জ হোস্টেল থেকে অবশ্যই ৯টার মধ্যে রওয়ানা দিতে হবে। বোম এবং রেবতীর নেতৃত্বে মোট ১০ জন ছেলেকে দু'টো ট্যাক্সিতে হার্ডিঞ্জ হোস্টেল দখল করতে হাজরার মোড় থেকে সকাল ৯টায় রওয়ানা করিয়ে দিলাম। বোমের কাছে ছিল একটি পিস্তল, রেবতীর কাছে ছিল একটি টাক্কাল। তাছাড়া বোম ওরা জানত স্টেনগান ও আরেকটি পিস্তল হোস্টেলের ছাদে কোথায় লুকানো আছে। বোম এদের বলে দিলাম ৯.৩০ মিঃ থেকে ৯-৪৫ মিঃ এর মধ্যে হোস্টেলের পেছন দিক দিয়ে অর্থাৎ ইউনিভার্সিটি লনে ঢুকে লিফ্‌ট দিয়ে ৫ তলার খোলা গেট দিয়ে হোস্টেলের ভেতরে ঢুকে ভেতর থেকে যাতে ৩/৪/৫ তলার গেট আটকে দেয়। সেজন্য ওদের নূতন তিনটি তালা ও চাবি কিনে দিয়েছিলাম। ওদের বারবার বলেছিলাম ভেতরে ঢুকে যাতে কাউকে মারধোর না করে। বরঞ্চ ভয় দেখিয়ে সম্ভব হলে সুব্রত মুখার্জির গ্রুপের সব ছেলেদের জিনিসপত্রসহ হোস্টেল থেকে বেরিয়ে যেতে যাতে নির্দেশ দেয়। আমি যারা আমাদের ল' পরীক্ষার্থী তাদের নিয়ে পরীক্ষা শেষ হলে বিকেল ৪টার পর লক্ষ্মীদাকে নিয়ে হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে গিয়ে পৌঁছব বলে বোম, রেবতী ওদের বললাম। আমরা না যাওয়া পর্যন্ত যাতে আমাদের ছেলেরা হোস্টেলের ভেতরে তালা দিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে। দু'টি ট্যাক্সিতে রওয়ানা হয়ে গেল বোম, রেবতী, প্রদীপ, নির্মল পাল, গোবিন্দ, হরিপদ সাহা এবং আরো ৪ জন যাদের নাম এখন ঠিক স্মরণ করতে পারছি না। ওদের রওয়ানা করিয়ে দিয়ে আমি হাজরা ল' কলেজে চলে যাই। গিয়ে দেখি আমাদের ধারণা সঠিক। গোটা হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের বোর্ডার চলে এসেছে হাজরা ল' কলেজ আর

যোগেশ চন্দ্র ল' কলেজে। বুঝলাম, পরিকল্পনা মত হোস্টেলের গেট খোলা পেলে বোম এদের হোস্টেল দখল করতে কোন অসুবিধা হবে না। ১১টা ১১টা ৩০ মিঃ নাগাদ হাজরা ল' কলেজ এবং যোগেশ চন্দ্র ল' কলেজে জমায়েত হওয়া হার্ডিঞ্জের ছেলেদের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা এবং চাঞ্চল্য লক্ষ্য করলাম। আগে থেকেই কথা ছিল ফণীদা অর্থাৎ ফণীভূষণ রায় বিশ্ববিদ্যালয়েব টেলিফোন এক্সচেঞ্জে বসা থাকবেন আমাদের বিভিন্ন সময়ে খবর সরবরাহ করার জন্য। ফণীদাকে ফোন কবে জানলাম আমাদের পূর্ব পবিকল্পনা মত সুব্রত পাল, পরিতোষ পাল ওরফে বাবুল ঠিক ৯-৩০- মিঃ ৫ তলার গেট খুলে ছাদে এসে ট্যাঙ্ক থেকে বালতি কেটে চান করার সময় ৯ ৪৫ মিঃ নাগাদ বোম ওরা ইউনিভার্সিটি লনে ঢুকে হোস্টেলের পেছনের লিফ্‌ট দিয়ে উঠে হোস্টেলের খোলা গেট দিয়ে ৫ তলায় উঠে গেটে তালা মেরে দেয়। সুব্রত আর পবিতোষকেও অর্ধ সমাপ্ত চানের মাঝখানেই ওদের সঙ্গে হোস্টেলের ভেতরে ঢুকিয়ে নেয়। ৫ তলায় স্বপন চক্রবর্তীর রুমে সুরিন্দর সিং ওরা ওদের অস্ত্রশস্ত্র মজুত করেছিল। বোম সে ঘবের তালা ভেঙে ঘরের দখল নিয়ে নেয়। ভেতরে যারা সুব্রত মুখার্জির অনুগামী ছিল তাদের মধ্যে ২/৪ জন বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে রেবতী ও তার শিষ্য ঈশ্বরবাবু সিন্‌হা (যে আগে থেকেই হোস্টেলে ছিল) মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারেনি। রেবতীর হাতের টাঙ্গি দিয়ে কুপিয়ে ৮/১০ জনকে রক্তাক্ত জখম করে দেয। ৫ তলা এবং ৩ তলায় বলতে গেলে রক্তগঙ্গা বইছিল। সুরিন্দর সিং ওদের অন্য অনুগামীবা অনেকে অনেক কষ্টে পালিয়ে জান বাঁচায়। ইউনিভার্সিটি লনে জয়ন্ত চক্রবর্তী এবং অন্যান্য যাবা ইতস্ততঃ ঘোবাঘোবি করছিল এরা হোস্টেলের ভেতর আর্ত চিৎকার শুনে পুলিশে খবব দেয়। লালবাজাব থেকে পুলিশ এসে গোটা হোস্টেল ঘিরে ফেলেছে। বোম এদের পুলিশ বারবার সতর্ক করছে যাতে হোস্টেলের গেটের তালা খুলে দেয়। নয়ত পুলিশ গুলি করে কলাপসিবল গেটের তালা খুলে ভেতরে ঢুকবে। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম এক বেলার পরীক্ষা দেওয়ার পরই হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের পরীক্ষার্থীরা দ্বিতীয় বেলার পরীক্ষা না দিয়ে শশব্যস্ত হয়ে সবাই জমায়েত হওয়া লোকজন নিয়ে চলে গেল। সবার মুখে উদ্বেগের ছাপ। আমাদের কেউ কিছু বলাবও সাহস পেল না। কিন্তু আমি তো যা বোঝার বুঝে ফেললাম। এবারও আমাদের হোস্টেল দখল করা হোল না। পুলিশ অবশ্যই তালা ভেঙে হোস্টেলে ঢুকে আহতদের উদ্ধাব করে হাসপাতালে পাঠাবে। আর আমাদের ছেলেদের গ্রেপ্তার করে গারদে পুরবে। সেই অবকাশে সুব্রত মুখার্জির অনুগামীরা আবার হোস্টেলে ঢুকে দখল নিয়ে নেবে। আফসোসে আমি হাত কামড়াতে লাগলাম। কেন যে রেবতীকে পাঠালাম। আমি নিজে কেন গেলাম না। খবর পেলাম ইউনিভার্সিটির সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার সময় বোম ওদের সঙ্গ থেকে হরিপদ সাহা ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। ও হোস্টেলেই ঢোকেনি। ল' কলেজের পরীক্ষা শেষ হলে ৪টা নাগাদ লক্ষ্মীদার বাড়িতে ফিরে এসে লক্ষ্মীদাকে সব জানালাম। তিনি লালবাজারে ফোন করে জানলেন বোম, রেবতী, নির্মল, প্রদীপ, দোলন, গোবিন্দ, ঈশ্বরবাবু সিন্‌হা এবং পশ্চিমবাংলার একটি ছেলে জয়দেব পালকে হার্ডিঞ্জ হোস্টেল থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ লাল বাজার নিয়ে এসেছে। পুলিশ বোমের রিভলবার উদ্ধার করতে পারেনি। তবে রেবতীর রক্তমাখা টাঙ্গি এবং ঈশ্বরবাবু সিন্‌হার ব্যবহৃত কোপা দাও বাজেয়াপ্ত করেছে।

বোম ওদের গ্রেপ্তার হবার খবর শুনে আমার চোখে জল চলে এসেছিল। এই বিদেশ, বিভূঁয়ে জরুরি অবস্থার সময় কি করে এদের জেলখানা থেকে মুক্ত করব চিন্তা করতে গিয়ে আমি দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। লক্ষ্মীদা আমাকে আশ্বস্থ করলেন। বললেন, এত বিচলিত হচ্ছ কেন? কেউ তো আর মারা যায়নি। জেলে গেছে। খুব শীগগীরি জামিনে বের করে আনা যাবে। আমি লক্ষ্মীদাকে বললাম, অজিত দাস ছাড়া আর কেউ নেই 'প্রিয়া' সিনেমা হল সংলগ্ন ফ্ল্যাটে। আমি যতদিন না ত্রিপুরার ছেলেরা জামিন পাবে 'প্রিয়া' সংলগ্ন ফ্ল্যাটে ঘুমোব। লক্ষ্মীদা আমায় অনুমতি দিলেন। আমি ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখলাম মাথার নীচে দেওয়ার মত কোন বালিশ নেই। কেউ আমাকে কোন দিন এই সমস্যার কথা বলেনি। আমি আর ধর্মনগরের অজিত দাস দু'টো ইট পত্রিকা কাগজ দিয়ে ঢেকে মাথার নীচে দিয়ে ঘুমোতে আরম্ভ করলাম। ব্যাঙ্কশাল কোর্টে তখন, বিষ্ণু চরণ ঘোষ নামক এক ল' ইয়ারের দোর্দণ্ড প্রতাপ। আমি সেই ভদ্রলোকের সওয়াল প্রথম দিন শুনেই বুঝে গেলাম তিনি মাকাল ফল। তুষার চৌধুরী নামে একজন ল' ইয়ারকে পছন্দ হল। তাকেই বোম, বেরতীদের ল' ইয়ার নিযুক্ত করলাম। তিনি বোম এদের বিরুদ্ধে দায়ের করা কেসের সমস্ত কাগজপত্র পড়ে বললেন, কোনভাবেই ৫/৬ মাস আগে এদের জামিন হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। যদি না রাজনৈতিক প্রভাব কাজে লাগানো যায়। মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। আমি সকাল বিকেল লক্ষ্মীদাকে তাগাদা দিতে আরম্ভ করলাম। প্রতিদিন ব্যাঙ্কশাল কোর্টে আমি আর অজিত যেতাম। কোর্টের ভেতরে যেতে পিওনকে ১ টাকা দিতে হত। আমি আর অজিত একটাকা করে দু'জনে দু'টাকা দিয়ে কোর্টের রুমে ঢুকতাম। রেবতী আর বোমকে ২২ শে জুন কোর্টে তুললে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দু'দিনের পুলিশ রিমাণ্ডে নিল। অন্য সবাইকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দিল। এই মামলার তদন্তকারী অফিসার ছিলেন রুনু গুহ নিয়োগী। পুলিশ রিমাণ্ডে বোম আর রেবতীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জেনে গেল স্টেনগান, পিস্তল সব ফনীদা অর্থাৎ ফনীভূষণ রায়ের হেপাজতে আছে। দু'দিন পরে ফনীদাকে পুলিশ হার্ডিঞ্জ হোস্টেল থেকে গ্রেপ্তার করে কোর্টে পাঠাল। ফনীদার দেখানোমত স্টেনগান ও পিস্তল পুলিশ হোস্টেলের ছাদ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এল। এদিকে অন্য আরেকটি ঘটনা ২১ শে জুন' বিকেলে ঘটে গেছে। বিমল সিন্‌হা বিকেল ৩.৩০ মিঃ / ৪টা নাগাদ সেদিন কোথা থেকে খবর পেয়েছে যে আমরা হোস্টেলে ঢুকে গেছি। সে উদ্‌ভ্রান্তের মত এসে ইউনিভার্সিটি লনে হাজির। তখনই সেখানে জমায়েত হওয়া সুরিন্দর সিং এদের গ্রুপ বিমলকে মারধোর করে। লনে প্রচুর পরিমাণ পুলিশ মোতায়েন থাকায় বিমল প্রাণে বেঁচে যায়। পুলিশ বিমলকে উদ্ধার করে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। হার্ডিঞ্জের মধ্যে তখন আমাদের যেসব ছেলেরা ছিল তাদের পক্ষে বিমলকে দেখতে যাওয়া সম্ভব ছিল না। আমি এবং অজিতেরও যাওয়া নিরাপদ নয়। মেডিকেল কলেজের ছাত্র বন্ধু সুবল দেবনাথ ও বিলোনীয়ার ছেলে মেডিকেল ছাত্র তপন দত্তকে বিমলের চিকিৎসা ও শুশ্রাষার জন্য অনুরোধ করলাম। জরুরি অবস্থার সময় দেবব্রত দত্তগুপ্ত ওরফে দেবুদার পক্ষে ওসব জায়গায় অবাধে চলাচল সম্ভব ছিল না। তবু তার অফিসে ফোন করে দেবুদাকে সব ঘটনা জানালাম। পরে জেনেছি দেবুদা গভীররাতে হসপিটালের পাইপ বেয়ে পেছন দিক দিয়ে ঢুকে বিমলকে দেখে এসেছিলেন। এ জীবনে

আমরা যে কতজনের কাছে কতভাবে ঋণী হয়ে আছি। দু'দিন পর বিমলকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিলে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের মারামারির কেসে যুক্ত দেখিয়ে কোর্টে চালান দেয়। সেসময় আমার আর অজিতের কাজই ছিল প্রতিদিন ৯টার মধ্যে চান সেরে ১০টার মধ্যে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে পৌছে যাওয়া। দুপুরে কোর্টেই কিছু খেয়ে নিতাম। বিমলকে যেদিন কোর্টে চালান দিল প্রথমে তো সে আমাদের সঙ্গে কথাই বলতে চায় না। তারজন্য নাকি কোন উকিলও নিয়োগ করতে হবে না। রুনু গুহ নিয়োগী বিমলের সঙ্গে আলাপ করে বুঝে গেছে বিমল নির্দোষ এবং তাকে কথা দিয়েছে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখলে তাকে কয়েকদিনের মধ্যে কেস থেকে মুক্ত করে দেবে। তারপরও আমি জোর করে ওকালতনামায় ওর সই নিয়ে তুষারবাবুকে বিমল এবং ফনীদার আইনজীবী নিযুক্ত করি। ফনীদাকে কোর্ট থেকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দু'দিনের পুলিশ রিমাণ্ড দেয়। বিমলকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে পাঠায়। ব্যাঙ্কশাল কোর্টে যখন যার কেস উঠত পিওন তার নাম ধরে ডাকলে আসামি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হাত তুলত নয়ত বলত 'উপস্থিত'। সেদিন যখন পিওন বিমলের নাম ডাকল - তখন বিমল এমনভাবে 'হাজির হুজুর' বলে ওঠে যে কোর্টরুমেব ভেতরে থাকা হাকিমসহ সবার দৃষ্টি বিমলের দিকে আকর্ষিত হয়। প্রদীপ এদেব মুখ থেকে পরে শুনেছি আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের ভেতরে প্রথম ২/৩ দিন বিমল আমাদেব ছেলেদেব থেকে আলাদা থাকত। তাকে ডাকলেও সে উত্তর দিত না। সে যে হার্ডিঞ্জেব ছেলেদেব সঙ্গের নয় এটা প্রকাশের জন্যই ছিল তার ব্যর্থ প্রয়াস। তার ধাবণা ছিল জেলের ভেতরেব প্রতিদিনকার খবর রুনু গুহ নিয়োগী পেয়ে যায়। ২/৩ দিনের মধ্যে জেলের ভেতরে বোম এরা বিড়ি, সিগারেটের ব্যবস্থা করে ফেলে। এরা সবাই সিগারেটের মধ্যে গাঁজা ঢুকিয়ে ফুঁকতে থাকে। বিমল আস্তে আস্তে প্রদীপের কাছে এগিয়ে যায়। জিজ্ঞেস করে কিতা খাওরে বা। প্রদীপ বলে গাঁজা। খাইবেন নি? বিমল উত্তর দেয়, ও মাগ্গো মা, আমার মাথাত সিলি আছে। গাঁজাত টান দিলে সিলি ছুইট্টা যাইব গা। আরো দু'দিন পেরিয়ে গেলে বিমল প্রদীপকে বলে, এবার দেওরে বা। প্রদীপ বলে কেরে অখন সিলি ছুটত না। বিমল বলে না, অখন সিলি পুরান হইছে ছুটত না। আস্তে আস্তে ঝাঁকের কই ঝাঁকে ফিরে যায়।

১৪ দিন পর বোমসহ সকলের জামিন হয়ে যায়। শুধু ফনীদার জামিন হতে আরো ২/৩ দিন সময় বেশি লেগেছিল। কেসটাকে হালকা করার ব্যাপারে লক্ষ্মীদা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়কে নরমে-গরমে বলে কয়ে আমাদের ছেলেরা যাতে জামিন পায় তার ব্যবস্থা করেছিলেন। জামিনের শর্ত ছিল ৬ মাস আসামিরা কেউ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যেতে পারবে না। আইনজীবী তুষার চৌধুরী আমরা ছাত্র এবং ত্রিপুরা থেকে পড়তে গেছি এ কারণে আমাদের আর্থিক দিক দিয়ে যথেষ্ট ছাড় দিয়েছিলেন। তিনিও মাত্র ১৪ দিনের মধ্যে এভাবে কেস হাল্কা করতে পারার আমাদের ক্ষমতা দেখে অবাক হয়েছিলেন।

জেল থেকে বেরুবার ১/২ মাস পর সবাই বাড়ি থেকে ঘুরে যাবার আব্দার ধরল। আমি বললাম, ঠিক আছে বাড়ি যেতে পার কিন্তু যখনই টেলিগ্রাম পাবে, মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে ২৪ ঘন্টার মধ্যে চলে আসতে হবে। এর মধ্যে একদিন হঠাৎ লক্ষ্মীদা আমায়

বললো, সুব্রত মুখার্জী লক্ষ্মীদার বাড়িতে আসবে বিকেলে ৪টায়। আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চায় হার্ডিঞ্জ প্রসঙ্গে। সুব্রতদা এলেন। তিনি তখন পুরমন্ত্রী। সাইরেন বাজিয়ে এলাকা কাঁপিয়ে তিনি এলেন। লক্ষ্মীদা আমার সঙ্গে সুব্রতদার আনুষ্ঠানিক পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন - তোমরা আলোচনা কর আমি আমার অফিস ঘরে যাচ্ছি। সেটা সম্ভবতঃ ১৯৭৬ সনের অক্টোবর মাস ছিল। সুব্রত দা হার্ডিঞ্জের সঙ্গে তার কি নিবিড় নাড়ীর সম্পর্ক সেটা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেন। আমাকে বলেন কোর্টের শর্ত অনুযায়ী তো ডিসেম্বর পর্যন্ত তোরা হোস্টেলে ঢুকতে পারবি না। সুতরাং তিনি ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে বা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে সপ্তাহখানেকের জন্য রোম সফরে যাবেন। ফিরে এসেই তিনি আমাদের হোস্টেলে ফিরিয়ে নেবেন।এর মাঝে যাতে আমরা কোন উৎপাত বা হোস্টেল আক্রমণ করার, হোস্টেলের ঢোকার চেষ্টা না করি। আমি বললাম, সুব্রতদা ৬ মাসের জন্য হোস্টেলে বা ইউনিভার্সিটিতে না যাওয়ার শর্ত যে কোনভাবে হোক কোর্টে দরখাস্ত দিয়ে কমিয়ে আনা যাবে। তাছাড়া শর্ত তো আসামি ৭/৮ জনের জন্য। অন্যদের জন্য তো কোন শর্ত নেই। অতএব পুজোর আগে বা পরে ছেলেদের হোস্টেলে ঢোকাতে আপত্তি কোথায়? সুব্রতদা বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে জানুয়ারি মাসে ঢোকানোর ব্যাপারেই ইনসিস্ট করতে থাকেন। আমি চুপ করে যাই। মনে মনে ঠিক করে নেই সুব্রতদা যখন রোম সফরে যাবেন তখনই হোস্টেলে ঢুকে পড়ব। তার ফেরার জন্য অপেক্ষা করবনা। ইতিমধ্যে ৬ মাস ও পেরিয়ে যাবে এবং কোর্টের শর্তও থাকবে না। রাতে লক্ষ্মীদাকে সুব্রতদার সঙ্গে কথোপকথনের ব্যাপার বিস্তারিত বলি। লক্ষ্মীদা ও আমার সঙ্গে একমত হন - সুব্রতদার মনে কোন একটি বদ পরিকল্পনা আছে। সে কারণেই জানুয়ারি মাস বলে স্থির হয়ে আছেন।

৯ই নভেম্বর ১৯৭৬ সন মাও-সে-তুঙ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। খবরটা পেয়ে সারা দিন মনটা ভারাক্রান্ত ছিল। রাতে খাওয়ার টেবিলে লক্ষ্মীদা বলেন, কি ধীরাজ তোমাদের ম্যাও তো মারা গেল। আমি টেবিল ছেড়ে উঠে যাই। বলি আজ পর্যন্ত কোনদিন কি মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু এদের সম্পর্কে আমাকে কোন কটু মন্তব্য করতে দেখেছেন? তাদের রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে সহমত পোষণ না করতে পারি কিন্তু তাদের সম্পর্কে অশ্রদ্ধাসূচক কোন মন্তব্য করার মত নিম্নরুচির লোক নই আমি। লক্ষ্মীদা ভীষণভাবে লজ্জিত হয়ে পড়লেন। বার বার দুঃখ প্রকাশ করে আমাকে খাওয়ার টেবিলে টেনে বসালেন।

বিনয় সাহা আগরতলা এসেছিল তার বাবার শারীরিক অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে। কয়েকদিন থেকে যখন বাবার শরীর একটু ভাল হয় তখন কোলকাতা ফিরে আসে। যেকোন অসুবিধার কারণে কাঁকুরগাছির ফ্ল্যাটে না উঠে জাস্টিস মন্মথ মুখার্জি রো-তে ত্রিপুরা মেসে গিয়ে ওঠে। ১/২ দিন যেতে না যেতেই সৌমেন মিত্রের 'শিক্ষা বাঁচাও' কমিটির নেতা শিয়ালদার নরেন সাহা একটি চীনা ছেলেকে দিয়ে বিনয়কে ডেকে পাঠায়। চীনাটি কোলকাতাতেই জন্মসূত্রে বাসিন্দা। ভাল বাংলা বলতে পারে। শুধু মঙ্গোলিয়ান চেহারা। বিনয় চীনা ছেলেটির সঙ্গে গিয়ে হাজির হয় শিয়ালদা ব্লক কংগ্রেস অফিসে। গিয়ে দেখে নরেন সাহা বসে আছে, সঙ্গে ২১শে জুন হোস্টেলে হাতে কোপ খাওয়া কাটোয়ার ২নং সুব্রত মুখার্জি। নরেন বাজখাই গলায় বিনয়কে জিজ্ঞেস করে ধীরাজের সঙ্গে তোর

কতদিনের যোগাযোগ। বিনয় নরেন সাহাকে বলে—আপনার সঙ্গে আমার নিভৃতে কিছু কথা আছে। নরেন থতমত খেয়ে বিনয়কে ভেতরের অ্যান্টি চেম্বারে ডেকে নেয়। বিনয়ের বোনের বিয়ে হয়েছে বিহারের কিষাণগঞ্জ এলাকায়। বিনয় প্রায়ই সেখানে যেত। সেখানে গিয়ে এন্টালির বাবু, বাবলু এদের সঙ্গে পরিচয় হয়। তাদের কাছেই বিনয় শোনে ১৯৭০/৭১-এর সময় নরেন সাহা নকশালদের বোমে গুরুতর আহত হয়েছিল। এন্টালির বাবু, বাবলু সি.পি.আই (এম) সমর্থকদের তত্ত্বাবধানে মাস তিনেক চিকিৎসা করে নরেন সাহা সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পেরেছিল। বিনয় প্রথমেই অ্যান্টি চেম্বারে ঢোকার পর নরেন সাহাকে জিজ্ঞেস করে, এন্টালির বাবু, বাবলুদাকে আপনি চেনেন? নরেন সাহা থতমত খেয়ে বিনয়কে জিজ্ঞেস করে কি করে তুমি ওদের চেন? বিনয় জবাব দেয়। নরেন সাহা উত্তর দেয়—তুমিও সাহার ছেলে, আমিও সাহার ছেলে, তোমাকে এই এলাকাতে কেউ কিছু করতে পারবে না। বাইরে বেরিয়ে এসে সুব্রত মুখার্জি (নং-২)-কে শুনিয়ে শুনিয়ে বিনয়কে বলে তুমি সকাল সন্ধ্যা ব্লক অফিসে এসে হাজিরা দেবে। আর ধীবাজ এদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখতে পারবে না। বিনয়, আচ্ছা বলে বেরিয়ে আসে। সেদিনই সন্ধ্যায় বিনয় 'প্রিয়া' সিনেমা হল সংলগ্ন ফ্ল্যাটে গিয়ে আমাকে সকালে নরেন সাহার সঙ্গে তার কথোপকথনের সব বৃত্তান্ত জানায়। আশ্চর্যজনকভাবে সেদিনই বিকেলে নরেন সাহা আমার সঙ্গে আমাদের ফ্ল্যাটে গিয়ে ঘণ্টাখানেক আলাপ করে এসেছিল। আমি বিনয়কে বললাম, মিনিট পনেরও হয়নি নরেন আমার সঙ্গে আলাপ করে বেরিয়ে গেছে। বিনয় অবাক হয়ে পড়ে। আমি বিনয়কে বলি আগামীকালই যাতে ও কাঁকুড়গাছি ফ্ল্যাটে চলে যায়।

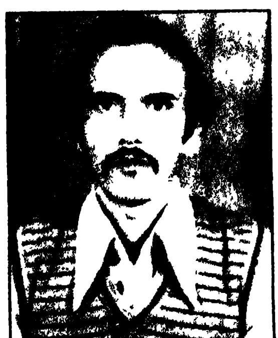
আমার তখন অর্জুনের লক্ষ্যভেদের মত একটিই চিন্তা। কবে সুব্রতদা, রোম সফরে যাবে সপ্তাহখানেকের জন্য তার সময়সূচি জানা। লক্ষ্মীদা আমাকে বলল, তুমি এত টেনশন নিচ্ছ কেন? সুব্রত তো পুরমন্ত্রী হিসাবে রোম সফরে যাবে। এ খবর পত্রিকাতেও উঠবে। মন্ত্রীদের সফরসূচির যে তালিকা প্রতিমাসে রাইটার্স থেকে বেরোয় তাতেও থাকবে। আমি সঠিক সময়ে তোমাকে জানিয়ে দেব। আমার তো মন মানে না। শুধু কৈলাসহরের প্রদীপ দেব, নিমাই দাশগুপ্ত, প্রণব সিনহা এবং ধর্মনগরের অজিত দাস 'প্রিয়া' সংলগ্ন ফ্ল্যাটে আছে। কাঁকুড়গাছির ফ্ল্যাট খালি। সবাই বাড়ি চলে গেছে। বোম এরা সবাই হাবড়া আছে। আমাকে তো সুব্রত মুখার্জির রোম যাত্রার সঠিক তারিখ জানলে ত্রিপুরায় থাকা আমাদের ছেলেদের টেলিগ্রাম করে ২/১ দিন সময় দিয়ে জানাতে হবে কোলকাতা চলে আসার জন্য। বোম এদের খবর দিতে হবে। অন্ততঃ দু'চার জন পাকা মাথা বসে হোস্টেলে ঢোকার চূড়ান্ত রূপরেখাটা তৈরি তো করতে হবে। আমার দিন আর কাটতে চায় না। প্রতিদিন প্রত্যেকটি পশ্চিমবাংলার প্রভাতী দৈনিক ঘেঁটে দেখি সুব্রত মুখার্জির রোম যাত্রার সফরসূচি বেরিয়েছে কিনা। তখনও হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে লুকিয়ে, চুরিয়ে ছদ্মবেশ নিয়ে যে দু'চারজন থাকার মত সাহস করতে পেরেছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখি কবে সুব্রতদা 'রোম' সফরে যাবে জানতে পারলে যাতে আমাকে জানায়। পরিশেষে, জানা গেল ১৯৭৬ সনের ২৫শে ডিসেম্বর থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সুব্রতদা সস্ত্রীক রোম সফরে যাবেন। আমি আমাদের যে সমস্ত ছেলেরা ত্রিপুরা চলে এসেছিল তাদের প্রত্যেককে টেলিগ্রাম করলাম অন্ততঃ ২৪শে

ডিসেম্বরের মধ্যে যাতে কোলকাতা ফিরে এসে আমার সঙ্গে 'প্রিয়া' ফ্ল্যাটে দেখা করে।

বোম, লব, গোবিন্দ, শ্রীধরকে খবর পাঠালাম ২৩শে ডিসেম্বরের মধ্যে যাতে 'প্রিয়া' ফ্ল্যাটে চলে আসে। বোম পাল্টা খবর পাঠাল ২৪শে ডিসেম্বর হাবড়া কি একটা জরুরি পোগ্রাম আছে ওদের সবার। ২৫শে ডিসেম্বরের আগে আসতে পারবে না। আমি বাধ্য হয়ে বললাম, ঠিক আছে মেডিকেল কলেজের উল্টোদিকের বসন্ত কেবিনের গলিতে ২৫শে ডিসেম্বর ২টোর মধ্যে যাতে অবশ্যই ওরা চলে আসে। ২৪শে ডিসেম্বর সকাল অব্দি ত্রিপুরা থেকে কেউ গিয়ে পৌঁছুল না। তখন ফ্ল্যাটে আছি শুধু আমি, কৈলাসহরের প্রদীপ দেব, নিমাই দাশগুপ্ত, প্রণব সিন্‌হা এবং ধর্মনগরের অজিত দাস। ওদের ৪ জনকে আমার প্ল্যানটা বুঝিয়ে বললাম। ওরা আমার সঙ্গে সহমত পোষণ করল। ২৫শে ডিসেম্বর বেলা ১টা নাগাদ চলে গেলাম কলেজ স্ট্রীট 'বসন্ত কেবিনে'র গলিতে। আমরা ৫ জন অপেক্ষা করতে লাগলাম হাবড়া থেকে বোম এদের এসে পৌঁছুনোর জন্য। যখন বেলা তিনটা বেজে গেল বোম ওরা এল না তখন ধরে নিলাম হাবড়া লাইনে কোন গোলযোগ হয়েছে যার জন্য ট্রেন এসে পৌঁছুতে দেরি করছে। হাবড়া লাইনে প্রায়ই এমন হত। এদিকে শীতের বেলা পড়ে আসছিল। আমি সন্ধ্যের আগেই হোস্টেলে ঢুকে যেতে চাইছিলাম। প্রদীপ, অজিত, নিমাই, প্রণবের সঙ্গে শেষ মুহূর্তে কথা বলে নিলাম। ওদের বোঝালাম আমরা ৫ জনই হোস্টেলে ঢুকে যাব। বোম এরা আসবেই। এলে পরে ঢুকবে। হোস্টেলে ঢুকে এমন একটা ভাব দেখাব যে হোস্টেল বাইরে থেকে আমাদের ছেলেরা ঘিরে রেখেছে। আমরা ৫ জন হোস্টেলের ভেতর সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করতে গেছি। ওরা বিশ্বাসই করতে পারবে না কোন প্রস্তুতি ছাড়া, একটি ব্লেডও সঙ্গে না নিয়ে আমরা হোস্টেলে ঢুকেছি। সাড়ে তিনটা নাগাদ হোস্টেলের সামনের গেট দিয়ে আমরা ৫ জন হোস্টেলে ঢুকে পড়লাম। গেটে ২১ জুনের ঘটনার পরই পুলিশ পাহারা বসেছিল। ৫/৬ জন পুলিশ গেটে বসে গল্প করছিল। আমাদের ছোট-খাট অবয়ব দেখে ওরা সন্দেহই করতে পারেনি আমরা বদ্ উদ্দেশ্য নিয়ে ঢুকছি। বিনা বাধায় আমরা ৫ জন ৫ তলায় উঠে গেলাম। ৫ তলার তখন প্রিফেক্ট ছিল অধীর সাহা। সে তার ঘরে ঘুমোচ্ছিল। আমি তাকে ঘুম থেকে তুললাম। সে কাঁচা ঘুম ভাঙার পর আমাকে দেখে যেন ভূত দেখল। অধীরকে জিজ্ঞেস করলাম সুরিন্দর কোথায়? সে বলল জানি না। রুমে আছে হয়ত। আমি অধীরকে বললাম, তুই তো জানিস আমি রেবতী বা বোমের মত মাথা গরম ছেলে নই। সে কারণে ওদের সবাইকে বাইরে হোস্টেল ঘিরে রাখার নির্দেশ দিয়ে আমি নিজে বাচ্চা-কাচ্চা ৪ জনকে নিয়ে হোস্টেলে ঢুকেছি। আমি চাই না ২১শে জুনের মত হোস্টেলে আবার রক্তপাত হোক। অধীরকে বললাম— সাবান দে, টাওয়াল দে। গায়ে মাখার কোন ওয়েন্টমেন্ট আছে কি? থাকলে দে। অধীর কাঁপা-কাঁপা হাতে সাবান, টাওয়াল এবং গায়ে মাখার ওয়েন্টমেন্ট আমাকে বের করে দিল। আমি বললাম, আমি চানে ঢুকছি। চান থেকে বেরিয়ে যাতে দেখি তোরা সবাই হোস্টেল ছেড়ে বেরিয়ে গেছিস। তোরা নিশ্চিন্তে বেরিয়ে যেতে পারিস। বাইরে আমাদের যেসব ছেলেরা হোস্টেল ঘিরে রেখেছে তাদের বলা আছে কেউ যদি চেঁচামেচি হৈ-হল্লোড় না করে তবে কাউকে যাতে কিছু না বলে। অধীরকে যা বলার বলে আমি চানে ঢুকলাম। প্রদীপ, অজিত, নিমাই, প্রণবকে বললাম— তোমরা কাউকে কিছু বলবে না। ৫ তলার কেন্টিনে বসে চা

আর টোস্ট খাও। প্রায় ঘণ্টা আধেক লাগিয়ে ভাল করে চান করে শরীরে কোল্ড ক্রীম ওয়েন্টমেন্ট মেখে যখন বেরুলাম তখন হোস্টেল শ্মশানপুরী। ৫ তলা, ৪ তলা, ৩ তলা থেকে বিছানাপত্তর গুটিয়ে প্রায় সব বোর্ডার হোস্টেল ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। আমি প্রদীপ, অজিত ওদের বললাম—৩ তলা-৪তলা-৫তলাব কলাপসিবল গেটে ভেতর থেকে তালা লাগিয়ে দাও। সব তলার বেয়ারা এবং রান্নার স্টাফদের বললাম—সবাই যাতে ৫ তলায় উঠে আসে। হোস্টেলের দারোয়ান চন্দ্রিকা এবং কাশীকে হোস্টেল গেটে তাদের মত করে ডিউটি দিতে বললাম। আমাদের ছেলেরা ছাড়া অন্য কেউ ভেতরে আসতে চাইলে যাতে বলে দেয় গেটের তালাব চাবি ওদের কাছে নেই।

হার্ডিঞ্জের ৩, ৪ এবং ৫ তলার স্টোররুম পরীক্ষা করে দেখলাম চাল, ডাল, তেল, নুন, মশলাপাতি ইত্যাদি যা আছে আমাদের ৫ জন এবং স্টাফদের অনায়াসে ৬ মাসের খাওয়ার হয়ে যাবে। মাঝে মাঝে বেয়ারাকে দিয়ে সব্জি, মাছ, ডিম ইত্যাদি আনিয়ে নিলেই চলবে। নিশ্চিন্ত হয়ে ৫ তলার কেন্টিনে বসে এক কাপ চা সবে হাতে তুলে নিয়েছি হঠাৎ হোস্টেলের নীচে মাইকের আওয়াজ শুনতে পেলাম। তখন বিকেল ৪-৩০ মিঃ হবে। বারান্দার গ্রীলের ফাঁক দিয়ে চেয়ে দেখি গোটা হোস্টেল পুলিশ ঘিরে ফেলেছে। কলুটোলা স্ট্রীটেব পুরো রাস্তা পুলিশের হেলমেটে থিক-থিক করছে। এর মধ্যে মাইকে ঘোষণা করছে—আমি লালবাজারের ডি সি-ডি.ডি সরোজ চ্যাটার্জি বলছি—ধীরাজ গুহ তুমি হোস্টেলের দরজা খুলে দাও, নয়ত আমরা গুলি করে তালা খুলতে বাধ্য হব। আমি প্রমাদ গুণলাম। চিন্তা করে দেখলাম, হোস্টেলের গেট না খুললে পুলিশ শেষ পর্যন্ত তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকবে এবং আমাদেব গোমড় ফাঁক হয়ে যাবে। আমাদের যে শূন্য কলসের চেয়ে খারাপ অবস্থা সেটা ফাঁস হয়ে যাবে। সুতরাং কোলকাতার ছেলেদের মত মুখেই স্টেজ মাতের চেষ্টা করতে হবে। আমি বারান্দার গ্রীলের ফাঁক দিয়ে মাথা বের করে চেঁচিয়ে বললাম—আমি ধীরাজ গুহ বলছি। আর মাইকিং-এর প্রয়োজন নেই। আমি নীচে আসছি। প্রদীপ, অজিত এদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে আমি গায়ে একটি হাল্কা চাদর জড়িয়ে (সম্ভবত অধীর সাহার ছিল) গদাই লস্করী চালে নীচে নামলাম। তিনতলার কলাপসিবল গেট খুলে নীচে নামার পরই অজিতকে বললাম—ভেতর থেকে গেটে তালা লাগিয়ে দাও। তোমরা সবাই ৫ তলাতে অপেক্ষা কর। আমি না বলা পর্যন্ত গেট খুলবে না। আমি হোস্টেলের গেট ছেড়ে কলুটোলা স্ট্রীটে নামা মাত্রই পুলিশ আমাকে ঘিরে ধরে ডি.সি-ডি.ডি সরোজ চ্যাটার্জির কাছে নিয়ে যায়। ভদ্রলোককে দেখে আমি চিনতে পারি। একবার লালবাজার গিয়ে ওনার সঙ্গে দেখা করে ইডেনে ক্রিকেট খেলা দেখার জন্য (সম্ভবত ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ভারত) কমপ্লিমেন্টারি পাস এনেছিলাম। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোটায়, এলাকার জগা চ্যাটার্জির সঙ্গে সি.এ.বি থেকে প্রচুর টিকিট সংগ্রহ করে হোস্টেলের ছেলেদের মধ্যে লটারি



নিখিল দেবনাথ

করে প্রতিদিনকার খেলার টিকিট বিলি করেছিলাম। তবে আমি এত অলস ছিলাম যে নিজে একদিনও খেলার মাঠে যাইনি। আমার বন্ধু নিখিল দেবনাথ প্রতিদিন খেলার মাঠে যেত। কোন মারোয়াড়ি পরিবারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নিয়েছিল। প্রতিদিন ওদের বাড়ি থেকে আনা সুস্বাদু খাবার খেয়ে ঢেঁকুর তুলে হোস্টেলে ফিরত। আমাকে সরোজবাবু বললেন, ত্রিপুরার ছেলেদের প্রতি আমার অতিরিক্ত একটু দরদ আছে ত্রিপুরার মেয়ে বিয়ে করেছি সেই সুবাদে। সুতরাং তোমাকে ১০ মিনিটের সময় দিচ্ছি তোমরা এর মধ্যে বেরিয়ে যাও। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আগরতলার একসময়ের প্রথিতযশা চিকিৎসক প্রয়াত জ্যোতিষ চক্রবর্তীর বোনকে সরোজবাবু বিয়ে করেছিলেন। আমি প্রত্যুত্তরে বললাম—আমরা হোস্টেলের আইনি বোর্ডার (ভাগ্যিস জানতে চায়নি আমি কোন আইনে বোর্ডার হতে পারি) আমরা কেন হোস্টেল ছেড়ে বেরিয়ে যাব। তাছাড়া আমরা তো জোর করে হোস্টেলে ঢুকিনি। কাউকে মারধোর করিনি, হোস্টেল থেকে জোর করে কাউকে বের করে দিইনি। সরোজ চ্যাটার্জি এবার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এল। বলল, ধীরাজ আমি তোমার রাজনৈতিক অতীত, বর্তমান সব জানি। তুমি লক্ষ্মী বোসকে ধোঁকা দিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় খুঁজে নিয়েছ। এবার সব ফাঁস হয়ে যাবে। তাছাড়া সুব্রত মুখার্জি ফিরে এসে তোমাদের হোস্টেলে ঢোকাবে বলেছে, তোমরা অপেক্ষা না করে এত তড়িঘড়ি করে কেন হোস্টেলে ঢুকতে গেলে। বুঝে গেলাম সুব্রতদা ব্রীফিং করে পাঠিয়েছে ডি.সি-ডি.ডি-কে। ভাগ্যিস আমাকে নির্মল পালের মত সি.পি.আই (এম) দলের পলিটব্যুরো সদস্য বানিয়ে ফেলেনি। আমি সরোজবাবুকে বললাম— ২/৪ দিন আগে শান্তিপূর্ণভাবে হোস্টেলে ঢোকাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল? এবার সরোজ চ্যাটার্জি মেজাজ হারিয়ে ফেলল। কোমর থেকে রিভলবার বের করে আমার কানের পাশে মাথায় চেপে ধরল। তিনি বললেন, তোমার মত সি.পি.এম-কে স্যুট করে ফেলে দিলে অসংখ্য শহীদ বেদির সঙ্গে বড়জোর আরেকটি শহীদ বেদি যোগ হবে। এর বেশি কিছু হবে না। আমি ১ থেকে ১০ গুণছি, এর মধ্যে তোমাদের ছেলেদের বল নীচে নেমে আসতে। তিনি এক, দুই, তিন বিরতি দিয়ে গুণতে শুরু করলেন। আমি হঠাৎ লক্ষ্য করি মেডিকেল কলেজের দেওয়ালের ওপারে গ্রীলের ফাঁক দিয়ে বোমের মাথা দেখা যাচ্ছে। বুঝলাম, হাবড়া থেকে ওরা চলে এসেছে। কিন্তু হোস্টেল পুলিশ ঘিরে রাখাতে হোস্টেলে ঢুকতে পারছে না। রাস্তার চারদিকে তখন অগুণতি কৌতূহলি মানুষের ভিড়। সরোজবাবু ৮ গুণে ৯ উচ্চারণ করার পর উপস্থিত জনতার মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। আমি ব্যাপারটা উপভোগ করছিলাম, বিন্দুমাত্র ভয় আমার পায়নি। কেননা প্রকাশ্য রাজপথে ১৯৭৬ সনের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে (সেদিন ছিল বড়দিন) পুলিশের কাউকে বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকে গুলি করে মারার মত রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল না। দ্বিতীয়তঃ যেভাবেই হোক আমি লক্ষ্মী বোসের লোক বলেই পুলিশ আমাকে জানত সুতরাং লক্ষ্মী বোসকে ঘাটাবার মত সাহস একজন ডি.সি-ডি.ডি-র থাকতে পারেনা। সরোজ চ্যাটার্জি দশ গুণে নেওয়ার পর আমি আমার মাথায় ঠেকানো রিভলবার হাত দিয়ে সরিয়ে দিলাম। সরোজ বাবুকে বললাম-আপনি ঠিকই বলেছেন অনেক লোককে আপনারা খুন করেছেন যাদের শহীদ বেদি যত্রতত্র দেখা যায়। মুশকিল হল, কাকে গুলি করতে হবে ঠিক করি আমরা, আপনারা সেটা কার্যকর

করেন। কাল থেকে আপনি ডি.সি-ডি.ডি থাকবেন কিনা সেটাও আমার বিবেচনার উপর নির্ভর করছে। আপনি একটা কাজ করুন-পুলিশ ওয়াবলেসে সি.এম-কে ধরে একটু আমায় দিন তো। চিন্তা করবেন না, আপনার ক্ষতি আমি করব না। ত্রিপুরার মেয়ে বিয়ে করেছেন সে কারণে আপনার প্রতিও আমার বিশেষ অনুকম্পা আছে। সরোজবাবু ভিরমি খেয়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি নিজের অপ্রস্তুত অবস্থা কাটানোর জন্য বললেন -আমি ফোর্স নিয়ে চলে যাচ্ছি। হোস্টেল গেটে পুলিশের সংখ্যা বাড়িয়ে যাচ্ছি। প্লীজ, সুব্রত বাবু না ফেরা পর্যন্ত আর কাউকে ঢোকাবেন না। আমি বললাম, কথা দিলাম। আমরা যে কয়জন হোস্টেলে আছি সুব্রতদাকে বুঝে নিতে পারব। সরোজ চ্যাটার্জি ফিরে গেলেন। সমবেত জনতা সহর্ষে করতালি দিয়ে পুলিশকে বিদায় জানাল। পুলিশ চলে যাওয়ার পর বোম, লব, গোবিন্দ, শ্রীধর এবা মেডিকেল কলেজের দেওয়াল টপকে আমার কাছে চলে এল। অজিত, প্রদীপ, নিমাই, প্রণব আমার নির্দেশের অপেক্ষা না করে গেট খুলে কলুটোলা স্ট্রীটে চলে এল। রাস্তার পাশে সুব্রত পালের (বর্তমানে গৌহাটি হাইকোর্ট, আগরতলা বেঞ্চের রেজিস্ট্রার) মূর্চ্ছা যাওয়ার মত অবস্থা হয়েছিল। সে জানায় দমদম তার দিদির বাড়ি থেকে বাসে ইউনিভার্সিটির সামনে নেমে সে দেখে পুলিশ আমার মাথায় পিস্তল ধরে এক, দুই, তিন গুণছে। যখন পুলিশ অফিসার ৯ গুণেছে তখন সে প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তারপর সে আর কিছু বলতে পারেনা। শামুর কথা শুনে আমরা সবাই খুব মজা করলাম। সেদিন রাত ৯টা পর্যন্ত হার্ডিঞ্জ হোস্টেল গেটে বসে সবাই দিলখোলা আড্ডা দিলাম। 'মৌচাক' থেকে খাওয়ার আনিয়ে সবাই খেলাম। পাহারারত পুলিশরা বারবার আমাকে অনুরোধ করছিল-স্যার, নতুন কাউকে ঢোকাবেন না তো হোস্টেলে? আমি বললাম না, আড্ডা দিয়ে সবাই যে যার বাড়িতে চলে যাবে। বোম এদের 'প্রিয়া' ফ্ল্যাটের চাবি দিয়ে বললাম— ফ্ল্যাটে চলে যাও। প্রতিদিন চান-খাওয়া-দাওয়া সেরে দুপুর ১২টার মধ্যে হোস্টেল গেটে চলে আসবে। আড্ডা মেরে রাতে ফিরবে। শামুকে বললাম, ত্রিপুরার সব ছেলেকে ফোন করে ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে কাঁকুড়গাছি এবং 'প্রিয়া' ফ্ল্যাটে ঢুকে যেতে বল্ল। বেয়ারা ঋষিকে টাকা দিয়ে বললাম— আমরা মোট কয়জন আছিরে আজ রাত্রিরে খাওয়ার মত? ঋষি হিসেব করে ২০ জন বা ২২ জন বলেছিল। বললাম-রেওয়াজী খাসির মাংস নিয়ে আয় সবাই আজ বড়দিনের মাংস খাব। ঋষি বাজারে চলে গেল টাকা নিয়ে। বোম বলল— গুরু আমরা কি নিরামিষ খাব ফ্ল্যাটে গিয়ে। আমি হেসে বোমকে ১০০ টাকা দিলাম। ভাল কথা— হোস্টেলের সব ডেভেলাপমেন্ট অজিতকে দিয়ে লক্ষ্মীদাকে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলাম।

২৬শে ডিসেম্বর থেকে ৩০শে ডিসেম্বর আমাদের দিন ভালোই কাটছিল। খাওয়া-দাওয়া, দুপুর থেকে হোস্টেলের গেটে বসে সবাই মিলে আড্ডা মারা। ইউনিভার্সিটি লনে গিয়েও লাভ নেই। তখন ইউনিভার্সিটি বন্ধ চলছিল। সবাই মিলে বসে আলাপ-আলোচনা একটি বিষয়েই করতাম—সেটি হল ৩১শে ডিসেম্বর সুব্রতদা নির্ঘাৎ এয়ারপোর্ট থেকে চ্যালাচামুণ্ডা সহ সোজা হোস্টেলে চলে আসবেন। সুব্রতদার কাছে সবসময় তখন লাইসেনস্ড পিস্তল থাকত। তাকে ঠেকাবো কি করে? কারোর মাথায় যুৎসই কোন পরিকল্পনা আসছিল না। শেষ পর্যন্ত আমি সবাইকে বললাম, চিন্তাভাবনা বাদ দাও।

সুব্রতদা আসুক পরিস্থিতি বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। খবর পেয়ে গেলাম সুব্রতদা সন্ধ্যার ফ্লাইটে কোলকাতা আসবে। তার মানে হোস্টেলে আসতে আসতে ৬.৩০ মিঃ/৭টা হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে ত্রিপুরা থেকে আমাদের ছেলেরা মোটামুটি সবাই কোলকাতা এসে পৌঁছে গিয়েছে। শিলিগুড়ি থেকে পীযূষ ঘোষও চলে এসেছে। আমি বোমকে বলে দিলাম ৩১শে ডিসেম্বর সন্ধ্যার আগে অর্থাৎ বিকেল ৫টার মধ্যে সব ছেলেকে নিয়ে হার্ডিঞ্জের উল্টোদিকে মেডিকেল কলেজের বাউন্ডারির ওপারে যাতে তারা প্রস্তুত হয়ে লুকিয়ে থাকে। হোস্টেলের ভেতরে ৫ তলায় ডেক-কড়াই, হাতা-খুন্তি সব হাতের কাছে রেডি রাখলাম। অজিত এদের বলে দিলাম—সুব্রতদার কনভয় কলুটোলা স্ট্রীটে ঢুকলে যাতে অজিত এবং আমাদের অন্যান্য ছেলেরা হোস্টেলের বেয়ারাদের নিয়ে ভারী আসবাবপত্র টানা-হ্যাঁচড়া শুরু করে, আরেকটি গ্রুপ যাতে ডেক-কড়াই ইত্যাদি হাতা-খুন্তি দিয়ে পিটিয়ে বিকট আওয়াজের সৃষ্টি করে। বাইরে থেকে যে কোন লোক যাতে এ ধরনের বিকট শব্দ পেয়ে অনুমান করে নেয় ভেতরে যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি চলছে। সেদিন অর্থাৎ ৩১শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ পুলিশ, প্রাইভেট মিলিয়ে প্রায় ৫০টি গাড়ির কনভয় নিয়ে সুব্রতদা কলুটোলা স্ট্রীটে ঢুকল। হোস্টেলের সামনে এসে গাড়ি থেকে নেমেই আমার নাম ধরে চিৎকার আরম্ভ করে দিল। আমি আগে থেকেই প্রস্তুত হয়েছিলাম। উপর থেকে হাঁক দিয়ে জানালাম আমি নীচে নামছি। হোস্টেলের গেটে এসে কল্লাপসিবল গেট খুলে বেরুতে যাব এমন সময় কসবার হাত কাটা দেবা, শিয়ালদার প্রদীপ ঘোষ এরা কলাপসিবল গেট দিয়ে জোর করে ভেতরে ঢুকতে চাইল। আমি সুব্রতদাকে বললাম—আপনি হার্ডিঞ্জের পুরানো বোর্ডার, আপনি যে কোন সময় হোস্টেলে স্বাগত। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রই নয়, শুধুমাত্র আপনার অনুগত হিসাবে এরা যদি আপনাকে সামনে পেয়ে হোস্টেলে ঢুকতে চায় এবং এরপর যদি কোন অঘটন ঘটে আমাকে দোষ দিতে পারবেন না। সুব্রতদা দেবা এবং প্রদীপ ঘোষকে ধমকে গেট থেকে বের করে নিয়ে আসে। আমি সুব্রতদাকে ভেতরে এসে বসতে বলি। সুব্রতদা গেটের ভেতরে এলে আমি কল্লাপসিবল গেট আটকে দিই। সুব্রতদাকে নিয়ে চেয়ারে বসাই। সুব্রতদা আমাকে বলেন, আমি তোকে লক্ষ্মীদার বাড়িতে কথা দিয়ে এসেছিলাম রোম থেকে ফিরে আমি তোদের হোস্টেলে ফিরিয়ে নেব। তুই আমার কথা বিশ্বাস না করে জোর করে হোস্টেল দখল করে আমাদের ছেলেদের মেরে বের করে দিয়েছিস। আমি বললাম, আপনি কি সুরিন্দর এদের মত আমায় কাপুরুষ ভাবেন নাকি? আমরা কাউকে মেরে হোস্টেল থেকে বের করিনি। কেউ যদি নিজের ছায়া নিজে দেখে ভয়ে হোস্টেল ছেড়ে পালিয়ে যায়—সেক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি। তাছাড়া আমরা জোর করেও হোস্টেলে ঢুকিনি। আপনি সুরিন্দরকে ডাকুন, ও এলে আমার সামনে বলুক যে ওদের আমরা বের করে দিয়েছি। উপরে তখন কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে বিকট আওয়াজ চলছে। সুব্রতদা আমায় বলল—তোকে আমি বলেছি হার্ডিঞ্জ হোস্টেল আমার মা। এই হোস্টেলে পয়সার অভাবে রুটি চুরি করে খেয়ে রাজনীতি করেছি। এই হোস্টেলের দখল আমি ছাড়তে পারব না। প্রয়োজনে আজ গুলি করে তোর ছেলেদের মারব। আমি বললাম, সুব্রতদা আমি আপনাকে সম্মান করি। উপরে আমাদের ছেলেরা তো আর খালি হাতে বসে নেই। বাইরে মেডিকেল কলেজের দেওয়ালের ওপারে চেয়ে দেখুন বোম হাবড়া থেকে শ'দুয়েক ছেলে এনে

জমায়েত করেছে। আপনাকে সম্মান করি বলে বোম এদেরও আমি হোস্টেলে ঢুকতে দিইনি। বলেছি সুব্রতদা রোম থেকে ফিরে আসুক তারপর আলোচনা করে যা হওয়ার তা হবে। এখন আপনি যদি মনে করেন মন্ত্রী হয়ে নিজের হাতে গুলি ছুঁড়ে কাল পত্রিকার কাগজে খবর হবেন আমার কি করার আছে? বাইরে সুব্রতদার ছেলেদের চেঁচামেচি, উপরে আমাদের ছেলেদের প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে বিকট আওয়াজ চালিয়ে যাওয়া—সে এক উত্তেজনাকর পরিস্থিতি। এর মধ্যে সুব্রতদা হোস্টেল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য কলাপসিবল গেট খুলতে বললেন আমাকে। গেট খুলতেই তিনি বাইরে বেরিয়ে সুরিন্দর এদেব ডেকে আলাপ করছিলেন, এই ফাঁকে আমিও গেট থেকে বেরিয়ে যে গাড়িতে সুব্রতদার স্ত্রী বসে আছেন সেই গাড়িব সামনে চলে গেলাম। সুব্রতদার স্ত্রীকে গিয়ে বললাম, বৌদি সুব্রতদা যে মাথাগরম মানুষ আপনি তো জানেন। আপনি উপরে চেয়ে দেখুন সবাই নীচের দিকে যার যার অস্ত্র তাক করে রেখেছে। একটু গোলযোগে কত লোকের লাশ যে পড়বে তাব কোন ইয়ত্তা নেই। এতে সুব্রতদার রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে দাগ পড়তে বাধ্য। আপনি সুব্রতদাকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। প্রয়োজনে কাল আমি নিজে আপনাদের বাড়িতে গিয়ে আলাপ করব। বৌদি গাড়ি থেকে নেমে এলেন। একরকম জোর করে সুরিন্দর এদের জটলা থেকে সুব্রতদাকে উদ্ধার করে গাড়িতে টানতে টানতে তুললেন। সুব্রতদার গাড়ি স্টার্ট দিল। এই দৃশ্য দেখে মুহূর্তেব মধ্যে কলুটোলা স্ট্রীট ফাঁকা হয়ে গেল। সব গাড়ি সুব্রতদাব গাড়িকে অনুসবণ করে বেরিয়ে চলে গেল। চারিদিকে জড় হয়ে থাকা আমাদের ছেলেরা হৈ-হৈ করতে করতে হোস্টেলের সামনে এসে ভিড় করল।

সেদিন কাউকে আর আটকে রাখতে পারলাম না। সবাই জলপ্রপাতের মত কলকল করতে করতে হোস্টেলের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল। হোস্টেল গেটে পাহারারত পুলিশেরা সন্ধ্যে থেকে নাটক দেখতে দেখতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। কাউকে বাধা দেওয়ার কথা তারা ভুলেই গেল। সারা রাত্রি হাসি-গানে, হৈ-হুল্লোড়ে আমাদের ছেলেরা হোস্টেল দখলের চূড়ান্ত বিজয়ে আনন্দ ফূর্তি করতে লাগল। কে যেন এক ফাঁকে শিয়ালদা থেকে বাজি কিনে নিয়ে এসেছিল। বাজির শব্দে ঘোষণা দিল আমরা জয়ী হয়েছি।

সুব্রতদা আর কোনদিন হোস্টেলমুখো হননি। সমস্যা হল সুব্রত মুখার্জির অনুগামী ছেলেরা তো সবাই বাইরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়ে গেছে। এরা তো ভয়ে ইউনিভার্সিটি লনেও আসে না। আমার বুকের ভেতর সবসময় একটা বেদনা অনুভব করতাম। হোস্টেলের বাইরে গিয়ে কোলকাতার মত জায়গায় এতগুলি ছেলে একসাথে থাকা কি কষ্টকর প্রায় ১ বছর হোস্টেলের বাইরে থেকে অনুভব করেছিলাম। হোস্টেলের সিনিয়র যারা আছেন তাদের সঙ্গে আলাপ করলাম। ২/১ জন ছাড়া সবাইকে নিমরাজী করানো গেল। লক্ষ্মীদার সঙ্গেও আলোচনা করলাম। লক্ষ্মীদা হেসে দিলেন। বললেন—আমি জানতাম। তুমি তো কোন গ্রুপের নেতা হতে পার না, জননেতা। অতএব তোমাকে তো সবছেলেকে হোস্টেলে ঢোকাতেই হবে। আমি বললাম, রসিকতা ছাড়ুন তো। বলুন না— সবাইকে হোস্টেলে ঢুকিয়ে নিলে কি ভাল হয় না? লক্ষ্মীদা বললেন, নিশ্চয়ই, সেটাই তো তোমার করা উচিত। আমি বললাম— এ কারণেই আপনি কংগ্রেস নেতা হলেও আপনাকে শ্রদ্ধা করি। বললাম—একটা সমস্যা কিন্তু হয়েছে। ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করব কি করে। আপনি



সামনে— কৃপাশঙ্কর, হরিপদ। মাঝে-- সুজিত, রমেন্দ্র, স্বপন।
পেছনে-- সুব্রত, বেবতী, শেখর, প্রদীপ, পপি, পীযুষ, অসীম (বোম) ও বাচ্চু

বরঞ্চ সুব্রতদাকে খবর দিয়ে বলুন সুবিন্দর সিং, প্রদ্যুত গুহ বা যে কোন নেতৃস্থানীয় কেউ যাতে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। লক্ষ্মীদা জানাল, এতে একটা সমস্যা হতে পারে। সুব্রতদা ভাবতে পারে তার উপর লক্ষ্মীদা অনুকম্পা দেখাচ্ছে। আমাকে বললেন তোমাদের সঙ্গে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলার যেসব ছেলেরা আছে তাদের দিয়ে জেলাভিত্তিক যোগাযোগের চেষ্টা কর। সে অনুযায়ী আমাদের ছেলেদের দিয়ে যোগাযোগেব চেষ্টা আরম্ভ করলাম। একদিন দুপুরে এলাকার উঠতি মাস্তান সৌমেন মিত্র অনুগামী ভবানী দত্ত লেনের জগা চ্যাটার্জিসহ ইউনিভার্সিটি লনে আড্ডা মারছি এমন সময় একটি ট্যাক্সিতে করে সুরিন্দর সিং, অধীর সাহা, অধীরের বড়ভাই সুধীর সাহা, অনামী শিকদার, প্রদ্যুৎ গুহ লনে এল। আমার সঙ্গে হোস্টেলের ঢোকার ব্যাপারে আলোচনা করতে ইচ্ছুক জানাল। আমি এদের ইউনিভার্সিটির রাখালদার ক্যান্টিনে গিয়ে বসতে বললাম। বোম আর অজিতকে ক্যান্টিনে ডেকে নিলাম। আমি ওদের জানালাম হোস্টেলে ঢুকতে গেলে প্রথম শর্ত হচ্ছে যারা-যারা আমাদের ছেলেদের মারধোর করেছে, জিনিসপত্র লুটপাট করেছে তাদের নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে। দ্বিতীয়ত, ছাত্র নয় এমন কাউকে হোস্টেলে ঢোকানো হবে না। তৃতীয়ত, হোস্টেলের নূতন নিয়ম কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। ওরা মোটামুটি আমার দেওয়া শর্ত মেনে নিল। কারা কারা হোস্টেলে ঢুকতে চায় তার তালিকা ওদের আমার কাছে দিতে বললাম। ২/৩ দিন পর মেদিনীপুরের মন্টু মাইতিকে দিয়ে সেই তালিকা আমার কাছে ওরা পাঠিয়ে দিল। কোর্টে প্র্যাকটিস করে বা কোন অফিসে চাকরি করে কিন্তু ভাড়া বাঁচানোর জন্য হোস্টেলে থাকে এমন ৫/৬টি নাম কেটে দিয়ে অন্যদের হোস্টেলে ঢোকার জন্য বলে দিলাম। আস্তে-আস্তে সবাই না হলেও নব্বই শতাংশ বোর্ডার হোস্টেলে ফিরে

এল। খুবই আনন্দেব কথা আমাদের ছেলেরা কারোর উপর কোন অত্যাচার করেনি।

বাকি কয়েকটা মাস মিলেমিশে সবাই সুন্দরভাবে কাটিয়ে আসতে পেরেছিলাম। এরমধ্যেই একদিন ছন্দপতন ঘটার মত অবস্থা হল। রাত্রি ১২টা নাগাদ ৩ তলার বেয়ারা এসে রাত্রিবেলা আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল। জানাল, তিনতলায় বোম, পীযূষ এরা সবাই জড়ো হয়েছে উৎপলকে হোস্টেল থেকে মেরে বের করে দেবে বলে। আমি তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে ৩ তলায় ছুটে গেলাম। কেশবের খোঁজ করলাম। বোম এরা জানাল কেশব নাকি আগেই ওদের বলে দিয়েছে রাত্রি দশটার মধ্যে ও ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। সুতরাং রাত দশটার পরে কোন ঘটনা ঘটলে কেশবের জানার কথাও নয় এবং তার দায়িত্বও নেই। বুঝলাম বোম এদের আকারে ইঙ্গিতে কেশব যা বলার বলে দিয়েছে। পীযূষকে বললাম—এত রাতে তোমরা কোত্থেকে এসেছ? বলল—রাত্রি দশটা তো পার করতে হবে তাই 'গ্রেস' সিনেমা হল থেকে সিনেমা দেখে এসেছি। ওরা ৭/৮ জন আমাকে খুব পীড়াপীড়ি করল রুমে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার জন্য। বোম ওরা সবাই বাইরে থেকে চার্জড় হয়ে এসেছিল। বোম আমাকে বলল—ধীরাজ, আমি তুই ছাড়া জীবনে কাউকে আমার সামনেব আসনে বসাইনি। শুধু আজ রাতে আমাব কথা রাখ—ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে যা। পীযূষ আমাকে 'দাদাভাই' ইত্যাদি বলে ওপরে চলে যেতে বলল। আমি এদের সবাইকে বললাম, উৎপলেব কি অপবাধ আমাকে খুলে বল। বোম বলল—তোকে বলে কোন লাভ নেই। তোর কাছে তো কেউই দোষী নয়, কোন অপবাধ কেউ করতে পারে না। পীযূষ আমাকে বলল—উৎপল কোনদিন কি আমাদের ছেলেদের সঙ্গে চলেছে না কথা বলেছে। সবসময় তো তিনতলার প্রিফেক্ট সুব্রতদা অনুগামী গান্ধী এদের সঙ্গেই চলত। বাড়ি থেকে যখন আসত ওদের জন্য খাওয়ার-দাওয়ার নিয়ে আসত। কোনদিন তোমার জন্য কিছু এনেছে কি ? আমি বললাম—এটা তো কোন অপরাধ হল না। যার সঙ্গে যার ভাব তার সঙ্গেই চলবে, তাকেই খাওয়াবে। তোমরা সবাই আমাকে যত কিছু খাইয়েছ, হোস্টেলের সব বোর্ডারকে খাওয়াও কি? খাওয়ানো কি সম্ভব? বোম বলল—আমি জানি তোর সঙ্গে যুক্তিতে পারবনা। আজ রাতের জন্য শুধু আমাদের ছেড়ে দে। আমি বললাম—ছেড়ে দেব। শুধু একটা কথার উত্তর দিয়ে যাও। আমরা হোস্টেলে থাকতে জয়ন্ত ভট্টাচার্য, সুবিন্দর এদের সব পরিকল্পনার আগাম খবর কি করে পেতাম বলতে পারবে কি ? সবাই চুপ করে রইল। আমি বললাম, উৎপলকে আমিই বলেছিলাম আমাদের কারো সাথে ও যাতে মেলামেশা না করে, গান্ধী ওদের সাথে মিশে থাকতে। শুধু উৎপল নয়, এমন আরো বেশ কয়েকজনকেই আমার এ ধরনের নির্দেশ দেওয়া ছিল। সেসব কারণেই যথাসময়ে সব খবর আমি আগাম পেয়ে যেতাম। এই কথা বলার পর উৎপলকে তার রুমে চলে যাওয়ার জন্য বলে আমি উপরতলায় অর্থাৎ ৫ তলায় ঘুমোতে চলে যাই। ৪ তলায় আমার রুমে তখন বিভাস পোদ্দারের পরিবর্তে থাকত কমলপুরের ছেলে সুদীপ নাথ। সে ত্রিপুরা মেসে থেকে কলেজে পড়ত। তার টি.বি হওয়াতে 'ত্রিপুরা মেসে' থাকার সমস্যা দেখা দিয়েছিল। আমি তাকে ত্রিপুরা মেস থেকে হোস্টেলে নিয়ে এসে আমার রুমে থাকতে দিই। এখানে থেকেই সে টি.বি-র চিকিৎসা করে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে।

পরের দিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে খোঁজখবর নিয়ে জানলাম রাতে আর কোন

গণ্ডগোল হয়নি। উৎপল বেশ কয়েকদিন আগেই আমাকে জানিয়েছিল তার পড়াশোনা এবং খাওয়া-দাওয়ার খরচ চালাতে খুব অসুবিধা হচ্ছে। কোন একটা ব্যবস্থা করা যায় কিনা। গতরাতের ঘটনার পর আমি এই সুবর্ণ সুযোগ হারাতে চাইলাম না। আগে আমি জানতাম উৎপলের মেস ফ্রী করতে চাইলে দু'এক জন গাঁই-গুই করতে পারে সে কারণে এ ধরনের কোন প্রস্তাব করিনি। সেদিন ৩ তলার প্রিফেক্টকে ডেকে বলে দিলাম এ মাস থেকে উৎপল এবং কৈলাসহরের প্রণব সিন্‌হার মিল ফ্রী করে দাও। প্রণবেরও বাড়ির আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। ৩ তলা এবং ৪ তলার ক্যান্টিন চালাত হোস্টেলের বেয়ারা ঋষি। তাকে ডেকে বললাম—আজ থেকে তুমি শুধু ৪ তলার ক্যান্টিন চালাবে। ৩ তলার ক্যান্টিন চালানোর দায়িত্ব দিয়ে দিলাম উৎপলকে। আমার ধারণা ছিল ক্যান্টিন চালিয়ে উৎপল যে টাকা আয় করবে তাতে ওর পড়াশোনা এবং হাতখরচ উঠে আসবে। আমার এই সিদ্ধান্তের কেউ প্রতিবাদ করেনি। এরপর আমরা চলে আসার পর যতদিন উৎপল এবং প্রণব হোস্টেলে ছিল সেই সিদ্ধান্তই চালু ছিল।

সরস্বতী পূজা চলে এল। সবাই বলল—ধূমধাম করে এবার পুজো করতে হবে। হোস্টেলে সবাই উদ্যোগী হয়ে পুজোর আয়োজন করল। প্রচুর লোককে নিমন্ত্রণ করা হল দুপুরে লুচি-তরকারি সহযোগে প্রসাদ নেওয়ার জন্য। সন্ধ্যায় হোস্টেলের লনে জলসার আয়োজন করা হল। বোম-পীযূষ এরা ধরে নিয়েছিল উৎপলকে পুজোর দায়িত্ব দিলে আমি খুশি হব। সুতরাং এরা উৎপলকে পুজোর বাজার-হাট, অতিথিদের খাওয়ানো, আপ্যায়ন করা, ক্যাশ সামলানো—সব দায়িত্বই দিয়ে দিল। উৎপল সকালবেলা অনেকগুলো ব্যাগ নিয়ে মানুষে টানা টাঙ্গা রিক্সায় চড়ে শিয়ালদার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল। ১০টা বেজে বেলা ১১টা বাজতে চলল উৎপলের দেখা নেই। দুপুরবেলা থেকে অতিথি-অভ্যাগতরা খেতে আসবে, কখন রান্না হবে চিন্তায় সবার মাথার চুল দাঁড়িয়ে পড়ার অবস্থা। আমি দেবদাস চ্যাটার্জি আর শেখরকে সবেমাত্র বলেছি শেয়ালদা বৈঠকখানা মার্কেট এলাকা ঘুরে যাতে দেখে আসে উৎপল কোথায়। ওরা জামাকাপড় পড়ে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে ঠিক এমন সময় একটি টাঙ্গা রিক্সায় উৎপল এসে হোস্টেলের গেটে নেমে দারোয়ান চন্দ্রিকা থেকে টাকা নিয়ে রিক্সা ভাড়া মেটাল। আমরা খবর পেয়ে নীচে দৌঁড়ে গেলাম। গিয়ে দেখি উৎপল হাত-পা ছেড়ে দিয়ে হোস্টেলের গেটের বেঞ্চিতে বসে আছে। ওর চশমা ভাঙা, পাঞ্জাবি ছেঁড়া। একগালে গুঁড়ো হলুদের ছাপ আরেক গালে গুঁড়ো মরিচের ছাপ। উৎপলকে জিজ্ঞাসা করে রহস্য উদ্‌ঘাটিত হল। হোস্টেলের বোর্ডার মালদার ছেলে স্বপন ভাদুড়িকে কিছুদিন আগে কেশব মেরে হোস্টেল থেকে বের করে দিয়েছিল কি একটা অপরাধে। স্বপন ভাদুড়ি গিয়ে ওঠে বৈঠকখানা রোডে। সেদিন সকালে উৎপলকে বৈঠকখানা বাজারে পেয়ে স্বপন ভাদুড়ি কেশবের চামচাকে পেয়েছি বলে উৎপলকে মারধোর করে সব টাকা-পয়সা কেড়ে নেয়। উৎপলের পাঞ্জাবি ছিঁড়ে ফেলে। হলুদ-মরিচের গুঁড়ো প্যাকেট ছিঁড়ে দেয়। পরে অবশ্য স্বপন ভাদুড়িকে বৈঠকখানা থেকে তুলে এনে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

সেদিন টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করে ৫ তলার মেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত সুবোধকে দিয়ে বাজার করিয়ে কোনরকমভাবে তড়িঘড়ি রান্না-বান্না করে অতিথিদের বেলা তিনটে নাগাদ খাওয়াতে পেরেছিলাম আমরা।

আনন্দের মাঝখানে হঠাৎ ছন্দপতন হল। বোমের টিউবারকিউলোসিস অর্থাৎ যক্ষ্মারোগ ধরা পড়ল। কাশির সঙ্গে দলা দলা কাঁচা রক্ত বেরুতে আরম্ভ করল। ডাক্তার দেখালাম। ডাক্তাররা বলল—যক্ষ্মা যে পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে হোস্টেলে রেখে চিকিৎসা সম্ভব নয়। বোম কিছুতেই হাসপাতালে ভর্তি হবে না। ওকে ধমকে যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে ভর্তি করতে নিয়ে গেলাম। বললাম—কথা দিচ্ছি তোমাকে সুস্থ না করে আগবতলা ফিরে যাব না। বোম বলল— ফেরার কথা আসছে কেন? আমি বললাম, ২/৩ মাসেব মধ্যেই তো ল' ফাইনাল পরীক্ষার রেজাল্ট আউট হবে। তারপর তো বাড়ি ফিরে যেতেই হবে। বোম ছলছল চোখে আমার হাত চেপে ধরল। বলল, না, তুই কোলকাতা ছেড়ে যেতে পারবি না, এখানেই সেট্‌ল করবি কথা দে। নয়ত আমি হাসপাতালে কিছুতেই ভর্তি হব না। অসহায় হয়ে বললাম—ঠিক আছে কথা দিলাম। বোম বাধ্য ছেলের মত হাসপাতালে ভর্তি হয়ে গেল। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজনহীন অবস্থায় নিঃসঙ্গভাবে হাসপাতালে থাকা যে কত কষ্টকর সে সময় বোমকে দেখে বুঝেছি। প্রায় প্রতিদিন বোমকে দেখতে সুদীপ নাথকে নিয়ে আমি যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে যেতাম। মাঝে ২/১ দিন যদি কোন কারণে বাদ পরে যেত তারপর হাসপাতালে গেলে অভিমানে বোমের চোখে জল চলে আসত। শিশুব মত মন ছিল ওব। এরই মধ্যে শেখব দত্তের মা মেডিকেল কলেজ হসপিটালে গলব্লাডার অপাবেশন কবার জন্য ভর্তি হল। সুদীপ নাথ শেখরের মা'কে-ও দেখতে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যেত। সেখানে গিয়ে নার্সিং কোর্সে পাঠরতা কোলকাতাব একটি মেয়ে শিপ্রাব সঙ্গে তার প্রেম হয়ে যায়। সুদীপ পরে সেই মেয়েটিকে বিয়ে কবে। শেখবের মা'র অপারেশন সফল হয় এবং তিনি সুস্থ হয়ে আগরতলা ফিরে যান। মাস দু'য়েকের মধ্যে বোমও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে হোস্টেলে চলে আসে।

এরই মধ্যে ১৯৭৭ সনের সম্ভবত জুলাই / আগস্ট মাসে ল' ফাইনাল পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয। পরীক্ষায় পাশ কবে যাই। আমি, বিমল, শঙ্করদা সহ ত্রিপুরার মোটামুটি সবাই কোলকাতা বার কাউন্সিলের সদস্য হওয়ার জন্য ফিসহ দরখাস্ত জমা দিই। যতদিন যায় বুকেব মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়। আগরতলার মায়া আমায় হাতছানি দিতে থাকে। অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে কোলকাতা বার কাউন্সিলের সদস্যপদের কাগজ হাতে পেয়ে যাই। খোঁজ নিয়ে জানি এই সদস্যপদের কাগজ দিয়েই আগরতলা বারে প্র্যাকটিস করতে পারব। কোন অসুবিধা নেই। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিই আগরতলা ফিরে আসব পুজোর আগেই। আমার সিদ্ধান্তের কথা বোম, পীযূষসহ পশ্চিমবাংলার আমাদের সব ছেলেদের জানিয়ে দিই। লক্ষ্মীদাকেও আমার সিদ্ধান্তের কথা জানাই। লক্ষ্মীদা বললেন—তুমি বলছ কি? সাউদার্ণ মার্কেটের দোতালায় আমি ২২০০ স্কোয়ার ফিটের দু'দুটো ফ্ল্যাট কেনার জন্য বুক করেছি। একটিতে তুমি থাকবে। অন্যটিতে আমি থাকব। প্রয়োজনে এখানে থেকেই প্র্যাকটিস কর। কাকে বিয়ে করতে চাও বল আমি তোমার বিয়ে দিয়ে দেব। এই পৃথিবীতে আপনজন বলতে আমার আর কেউ নেই। আমার যা কিছু আছে সব তোমার। আমি ভেবেছিলাম বাকি জীবন তোমার আশ্রয়ে শান্তিতে এবং নিরাপদে কাটিয়ে দেব। তিনি আমার হাত ধরে অনুরোধ করলেন আপাততঃ যাতে ইউনিয়ন কার্বাইডে স্যোসাল ওয়েলফেয়ার অফিসার পদে জয়েন করি। ফ্রি কোয়ার্টার, গাড়ি, টেলিফোন এবং ইনিশিয়েল

মাসিক মাইনে সতের হাজার টাকা। আমি চোখের জল ফেলে লক্ষ্মীদাকে আমার অক্ষমতার কথা জানাই। সেদিন আমি যখন লক্ষ্মীদার বাড়ি ছেড়ে চলে আসি তখন তিনি নিরুত্তর রইলেন। শুধু নীরবে চোখের জল ফেলেছিলেন। আমি মনকে পাষাণ করে অনেক কষ্টে তার বাড়ি থেকে চলে এসেছিলাম। বোম-পীযূষ এরা আমাকে বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দিল। বলল আমি অতি নিষ্ঠুর এবং নির্দয় প্রকৃতির ছেলে বলেই লক্ষ্মীদার এমন সস্নেহ কাতর অনুরোধ দু'পায়ে ঠেলে দিতে পেরেছি। বোম আমাকে সরাসরি চার্জ করে বলল তাকে হাসপাতালে ভর্তি করার সময় কেন আমি কথা দিয়েছিলাম আমি কোলকাতাতে সেট্‌ল করব। কেন তার সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করলাম। সে সময়ের ছাত্রপরিষদের সভাপতি অসিত মিত্রকে বোম ওরা হোস্টেলে নিয়ে এল। অসিত মিত্রকে দিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল আমি ছাত্রপরিষদ করব কিনা। কি পদ আমার চাই। আমি বোম-পীযূষকে বললাম—তোমরা এতদিন আমার সঙ্গে চলে আমাকে এই চিনলে? আমাকে কি কোনদিন আমার রাজনৈতিক পরিচয় গোপন রাখতে দেখেছ? আমি যা ছিলাম তাই আছি। সব জেনে যদি কেউ আমায় গ্রহণ করতে পারে তো করবে, নয়ত করবে না। আমি ত্রিপুরায় ফিরে না যেতে পারলে ডিপ্রেসানের রোগী হয়ে পড়ব। আস্তে আস্তে তোমাদের সকলের সামনেই আমি বদ্ধ উন্মাদ হয়ে ঘুরে বেড়াব—সেটা কি তোমাদের ভাল লাগবে? ওরা সবাই চুপ করে রইল। আমি চলে আসার আগেব ৩/৪ দিন হোস্টেলে যেন শ্মশানের নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। কেউ ঠিকভাবে খাওয়া-দাওয়া কবছিল না। বলতে গেলে রান্নাবান্নাও ঠিক মত হচ্ছিল না হোস্টেলে। আমি নিজেকে জাহির করার জন্য এসব ঘটনা লিখছি না। শুধুমাত্র ভালোবাসার যে অপ্রত্যাশিত দান আমাকে কোলকাতা বেঁধে রাখতে চেয়েছিল আর আমি নির্দয়ের মত, পাষাণের মত সে দান ফিরিয়ে দিয়ে চলে এসেছি আজ জীবনের গোধুলিবেলায় এসে মনে হচ্ছে কাজটা কি ঠিক করেছিলাম? কোলকাতা থেকে গেলে হয়ত বোম, লব, গোবিন্দ অকালে মারা পড়ত না। হয়ত বা তাদের নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি বন্ধ করে তাদের রক্ষা করতে পারতাম। পিতার মত অপত্য স্নেহে লক্ষ্মীদার আমাকে বেঁধে রাখার আকুল আহ্বান উপেক্ষা করে কৃতঘ্নতার কাজ করেছি। শেষজীবনে আমি যদি কোলকাতা থাকতাম তবে লক্ষ্মীদাকে বান্ধবহীন, স্বজনহীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হত না। পর মুহূর্তেই আমার মনে হয়েছে, ত্রিপুরার যে জল-মাটির সাহচর্যে পুষ্ট হয়েছি, লালিত-পালিত হয়েছি, যে বাতাস ফুসফুসে অক্সিজেন জুগিয়ে প্রাণশক্তি জুগিয়ে গেছে অসীম মমতায় তার ঋণ থেকে বড় দায় আর কিছু থাকতে পারে না। ত্রিপুরাতে ফিরে এসে ঠিকই করেছি। ত্রিপুরার প্রকৃতি তো আমাকে অকৃপণ হাতে ভালোবাসা উজাড় করে দিয়েছে। তার ঋণের দায় শোধ না করে অন্য কোন দায়িত্বের কথা চিন্তা করা বৃথা।

হোস্টেল ছেড়ে চলে আসার আগে হোস্টেলের তিনতালায় একসাথে যৌথসভা ডাকি। সেই সভায় সবাইকে আনুষ্ঠানিকভাবে আগরতলা ফিরে যাওয়ার কথা ঘোষণা করি। সে দিনের সভার হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা না করাই ভাল। শুধু ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ভেবেছি এত মানুষের আন্তরিক ভালোবাসা পেয়েছি যে আমার জীবন সার্থক। আমার আর কিছু চাওয়ার নেই। সেই সভায় তিনতালার তিন প্রিফেক্টের মাথার উপর

চেয়ারম্যান করে উৎপলেন্দু বিকাশ সাহাকে বসিয়ে দিয়ে আসি। একমাসও অতিক্রান্ত হতে পারেনি হোস্টেল থেকে ফোনের পর ফোন আমি যাতে অন্ততঃ ৫/৬ দিনের জন্য কোলকাতা যাই। হার্ডিঞ্জ হোস্টেল কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থানান্তর করে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার বামফ্রন্ট সরকারের সিদ্ধান্ত ঘিরে ত্রিপুরার ছেলেদের ঐক্য ছারখার। একে অপরকে বিশ্বাস করে না, অসহনীয় অবস্থা।

আমি কোলকাতা থেকে ফিরে আসার আগেই লোকসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করে নিয়ে। সারা দেশব্যাপী কংগ্রেস দল বিপর্যস্ত, পরাজিত। স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধী হেরে বসে আছেন। আমাদের হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের ছেলেদের দায়িত্ব ছিল দক্ষিণ কোলকাতা লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী যাতে জেতে তার দেখভাল করা। আমরা ত্রিপুরার ছেলেরা সবাই এমনকি কংগ্রেস সমর্থকরাও প্রিয়দার উপর খুবই বিরক্ত ছিলাম।

জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে প্রয়াত জননেতা জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে সারা ভারতবর্ষব্যাপী আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। তৎকালিন জনসংঘ দল, চরণ সিংহের লোকদল, মোরারজী দেশাই সবাই মিলে জনতা দল গঠন করে জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। বামপন্থীরা জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে জয়প্রকাশের নেতৃত্বে জনতা দলেব আন্দোলন সমর্থন করেছিলেন। জয়প্রকাশ নারায়ণ ১৯৭৬ সনে কোলকাতা জনসভায় ভাষণ দিতে এলে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের সামনে কংগ্রেসের নারী বাহিনীর হাতে তাঁর গাড়ি ভাঙচুর হয়। আমি সে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। ১৯৭৭ সনে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহৃত হয়ে লোকসভা নির্বাচন ঘোষিত হলে দক্ষিণ কোলকাতা আসনে বামফ্রন্টের সমর্থনে প্রার্থী হন জনতা দলের অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী। হার্ডিঞ্জের আমাদের ছেলেদের ছাত্রপরিষদ থেকে দায়িত্ব দিয়ে দক্ষিণ কোলকাতার বিভিন্ন বুথে পাঠানো হয়েছিল প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সির সমর্থনে রিগিং করার জন্য। আমাদের ছেলেদের যা ব্রিফিং করার, করে দেওয়া হয়েছিল। কংগ্রেস দলের গাড়িতে করে বিভিন্ন বুথে ঘুরে ঘুরে, কংগ্রেসের পয়সায় টিফিন খেয়ে ছেলেরা দিলীপ চক্রবর্তীকে ঢালাও ভোট দিয়ে ফিরে এসেছিল। নিঃশব্দ বিপ্লব কাকে বলে সেটা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। প্রকাশ্যে নির্বাচনের দিন পর্যন্ত কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কেউ একটা কথাও বলেনি। ভোটকেন্দ্রে গিয়ে জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে ঘৃণা উগরে দিয়ে এসেছিল জনগণ ভোটবাক্সে। ফলাফল প্রকাশিত হলে দেখা গেল সারা দেশের মত পশ্চিমবাংলায়ও কংগ্রেস পর্যুদস্ত, পরাজিত। জনতা দল প্রার্থী দিলীপ চক্রবর্তীর কাছে প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি বিপুল ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন। লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হলে হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের ইতিহাসে প্রথমবারের মত বাজী ফুটিয়ে কংগ্রেসের পরাজয়ে আনন্দ-উল্লাস করা হয়েছিল। সেদিনই প্রথম দেখা গেল ভেতরে ভেতরে এতদিন সুকুমার রায়ের চিঠি পেয়ে যাদের বিভিন্ন তালায় ভর্তি করেছি এরাই হোস্টেলে সংখ্যাধিক্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে ছাত্রপরিষদ অর্থাৎ সুব্রত-প্রিয় গোষ্ঠীর একাধিপত্য চূর্ণ হয়ে গেছে পুরোপুরি।

সে যাহোক, লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর আমি তো আগরতলা চলে আসি। এর কয়েক মাস পরই পশ্চিমবাংলায় বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে

বামফ্রন্ট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে জ্যোতি বসুব নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠন করে। পশ্চিমবাংলায় তখন জনজাগরণের এক নূতন-নূতন পর্যায় উন্মোচিত হচ্ছিল। তার বৃহদাংশেরই সাক্ষী ছিলাম আমরা। পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেই সিদ্ধান্ত নেয় ইউনিভার্সিটি এলাকার মধ্যে হার্ডিঞ্জ হোস্টেল রাখা চলবে না। হোস্টেল স্থানান্তরিত করা হবে ১৪, বিধান সরণী 'বীণা' সিনেমা হলের উল্টোদিকে। সরকারি এই সিদ্ধান্ত নিয়ে হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের অধিকাংশ বোর্ডাবের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সবার হার্ডিঞ্জকে ঘিরে একটা আবেগ সরকারি এই সিদ্ধান্তে আহত হয়েছিল। সবাই আশা করছিল—হোস্টেলে যারা সি.পি.আই (এম) দলের সমর্থক অর্থাৎ উৎপল, বিনয় এরা উদ্যোগী হয়ে সরকারি এই সিদ্ধান্ত প্রতিহত করুক। বোর্ডারদের সেন্টিমেন্টকে সম্মান জানিয়ে খুব কৌশলে কিছুদিন সময় অতিবাহিত করে সরকারি সিদ্ধান্ত কার্যকরি করতে পারলে আমাদের ছেলেদের মধ্যে ঐক্য বিনষ্ট হত না। আমার যেটা মনে হয়েছিল সেটা হল উৎপল ওদের বিশেষ কিছু একটা করার ছিল না সবকারি সিদ্ধান্তের বিষয়ে। তবে তারা পার্টি নেতৃত্বের সঙ্গে সমস্যাটি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে সিদ্ধান্তটি সাময়িক স্থগিত রাখার চেষ্টা করলে পারত। তা না করে প্রকাশ্যে সরকারি সিদ্ধান্তের পক্ষে কথা বলে দ্রুত হার্ডিঞ্জ হোস্টেল স্থানান্তরকে ত্বরান্বিত করার সমর্থনে কথা বলে বোর্ডারদের বিরাগ এবং অবিশ্বাসভাজন হয়েছে। বোর্ডাররা সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছিল সি.পি.আই (এম)-র ছেলেরাই উদ্যোগী হয়ে সরকারকে চাপ দিয়ে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে।

শেষ পর্যন্ত ১৪ বিধান সরণিতে হার্ডিঞ্জ হোস্টেল স্থানান্তবিত হয়ে যায়। সুব্রত মুখার্জির গ্রুপের ছেলেরা বিনয় ওদের বিধান সরণিতে চলে আসার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করে। এদের কেন জানি সন্দেহ হয়। কোলকাতা ইউনিভার্সিটির একটি হেলথ্ সেন্টার ছিল রফি আহ্মেদ কিদোয়াই স্ট্রীটে। সেটি তখন সাময়িককালের জন্য বন্ধ ছিল। বিনয়, নির্মল এবং আরো ৮/১০ জন হেলথ্ সেন্টারের কর্তৃপক্ষকে ম্যানেজ করে সেখানে গিয়ে ওঠে এবং অস্থায়ীভাবে ছাত্রাবাস গড়ে তোলে। পরে যখন আমি কোলকাতা যাই তখন বিধান সরণি এবং রফি আহ্মেদ কিদোয়াই স্ট্রীট-দু'জায়গাতেই থেকেছিলাম। আমার কোন অসুবিধা তো হয়ইনি বরঞ্চ দু'জায়গাতেই বিপুল আতিথেয়তা পেয়েছিলাম।

যা হোক্, বিনয় ওদের অনুমান কিছুটা সঠিক প্রমাণিত হয়েছিল। ১৪, বিধান সরণি হোস্টেলে যাওয়ার পর মেস চালু হতে কয়েকদিন সময় লেগেছিল। সে সময় ছেলেরা বাইরে খেয়ে নিত। বাইরে খেতে গেলে ত্রিপুরার ছেলে শেখর দত্ত, অপু রায়চৌধুরী, রঞ্জন ভৌমিক এদের লোক্যাল ছেলেরা অর্থাৎ ফাটাকেষ্টর ছেলেরা মারধোর করে। বিনয় উৎপল এদের ধারণা ছিল হোস্টেলে আমাদের বিরোধী গ্রুপের ছেলেরা পাড়ার ছেলেদের দিয়ে ত্রিপুরার ছেলেদের মার খাইয়েছে। বুঝলেও ওদের তখন কিছু করার ছিল না। এরা নিজেরাই ভাগাভাগি করে দু' জায়গায় গিয়ে উঠেছে।

এই অবস্থা চলাকালীন সময়ে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণি প্রতিনিধি এবং ছাত্র সংসদের নির্বাচনের দিন ঘোষিত হয়। মুশকিল হল তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের এস এফ আই নেতা সৈফুদ্দিন চৌধুরী, গৌতম দেব, সুব্রত মুকুটি এদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির ছাত্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল বিল্ডিং

'আশুতোষ বিল্ডিং' এ এদের কাজকর্ম সীমাবদ্ধ ছিল।

তাছাড়া পূর্বে কোনদিন এমনকি যুক্ত ফ্রন্ট আমলেও বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন কিংবা পরবর্তী সময়ে এস এফ আই কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জয়ী হতে পারে নি। ছাত্র পরিষদ কিংবা ব-কলমে ইউ এল সি এস নামে একটি তথাকথিত অরাজনৈতিক সংগঠন বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জয়ী হত। হার্ডিঞ্জ হোস্টেল থেকে আমাদের ছেলেরা এবং এস এফ আই অফিস থেকে বারবার আমাকে খবর দেয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনের পূর্বে যাতে কিছুদিনের জন্য কোলকাতা যাই।

আমি ১৯৭৭ সনের নভেম্বর মাসে আগরতলা বারে সদস্যপদ নিই। কিন্তু প্র্যাকটিস শুরু করতে পারছিলাম না পুরোপুরি এই দোটানা অবস্থার জন্য। যা হোক, ঠিক এ সময়েই কেশব আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে নেফ্রাইটিসের জন্য।আগরতলা থেকে তাকে কোলকাতা এস এস কে এম হাসপাতালে রেফার করা হয় উন্নততর চিকিৎসার জন্য। কেশবের তখন প্রতিদিন ডায়ালিসিস করা জরুরি হয়ে পড়েছিল। স্বাভাবিক কারণেই আমি যেহেতু অনেক দিন কোলকাতা ছিলাম, পরিচিতি আছে কিছু, তাই কেশবের পরিবার থেকে চাইছিল আমি যাতে কেশবের সঙ্গে কোলকাতা যাই। তখন সুজিত দত্ত কেশবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনিও আমাকে কেশবের হয়ে অনুরোধ করলেন। আমি, কেশবের বৌদি অনুদিসহ আরো কয়েকজন কোলকাতা গেলাম। কেশবকে এস এস কে এম হাসপাতালে ভর্তি করা হল এবং সেখানেই তার ডায়ালিসিস আরম্ভ হল। কেশব প্রায় মাস দু'য়েক এস এস কে এমে চিকিৎসিত হয়েছিল। আমার তখন কাজ ছিল কেশবের চিকিৎসার তদারকি করা আর বাকি সময় হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের দু'ভাগ হয়ে যাওয়া ছেলেদের কি করে এক গ্রন্থিতে আবার বাঁধা যায় তার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণি প্রতিনিধি নির্বাচন এবং ছাত্র সংসদ নির্বাচনের প্রার্থী খুঁজে বেড়ানো। একবার রাজা বাজার সায়েন্স কলেজ আরেকবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ কোলকাতার ক্যাম্পাস এবং বিভিন্ন হোস্টেল ঘুরে ঘুরে পরিচিত ছেলে খুঁজে বের করে তাদের এস এফ আই -এর প্রার্থী হতে রাজি করানো। এই ছিল তখন আমার কাজ। ভাগ্যিস তখন কোলকাতায় ফুলনদি অর্থাৎ ফুলন ভট্টাচার্য কি একটা কাজে গিয়েছিলেন। ফুলনদির খোঁজ পেয়ে আমি যেন হাতে চাঁদ পেয়ে গেলাম। ত্রিপুরার মেয়ে যারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বিভিন্ন হোস্টেলে তাদের তো চিনি না। ফুলনদিকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে প্রার্থী ঠিক করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে প্রার্থী করালাম। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যাতে এস এফ আই কোন সিট না হারায় সেটাই ছিল লক্ষ্য। ছাত্র সংসদ নির্বাচন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল। ইতিহাস সৃষ্টি করে প্রথমবারের মত কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দখল করল এস এফ আই। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হল সৈফুদ্দিন চৌধুরী। যিনি বর্তমানে পি ডি এস নেতা। ত্রিপুরার ছেলেদের মধ্যেও মতভেদ এবং মনান্তর কিছুটা কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলাম। দু'হোস্টেলেই সবাই স্বাচ্ছন্দে যাতায়ত শুরু করেছিল।

আমি স্থায়ীভাবে আগরতলা ফিরে এলাম। মনে তখন একটাই তৃপ্তি দীর্ঘদিন কোলকাতা থাকার সুবাদে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এস এফ আই-এর দখল করার ইতিহাসে সামান্য ভূমিকা হলেও পালন করতে পেরেছিলাম। কেশব কিছুদিন পর সম্পূর্ণ

সুস্থ হয়ে আগরতলা ফিরে আসে।

১৯৭৭ সনের অক্টোবর মাসে যখন হার্ডিঞ্জ হোস্টেল ছেড়ে প্রথমবারের জন্য আগরতলা এসেছিলাম তখন রাজ্যে আসার পরই ১৯৭৮ সনের জানুয়ারি মাসে বিধানসভার নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। রাজ্যে তখন এক জনজোয়ার শুরু হয়েছিল। কত সহস্র নূতন মুখ, নূতন কর্মী নির্বাচনী কাজে অংশগ্রহণ করছে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ভাবছিলাম ছোট সেই পার্টিটা ফলে-ফুলে আজ মহীরুহে রূপান্তরিত হয়েছে। কি আনন্দই না হয়েছিল। নির্বাচনে কাজ করতে করতে অসংখ্য নূতন সহযোদ্ধা যুবক-বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তাদের আপন করে নিয়েছিলাম। তারাও আমাকে আপন করে নিতে কার্পণ্য করেনি। ১৯৭৮ সনের নির্বাচনের আগে একটি চমকপদ ঘরোয়া সভার নমুনা দিচ্ছি।

১৯৭৭ সন রাজ্যে জনতা সি. পি. আই (এম) কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছিল রাধিকা রঞ্জন গুপ্তের নেতৃত্বে। মন্ত্রীসভায় সি. পি. আই (এম) দলের ৪ জন মন্ত্রী ছিল। সমীর রঞ্জন বর্মন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অর্থাৎ কেবিনেট মন্ত্রী। আর তার অধস্তন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী। কয়েমাস স্থায়ী ছিল এই মন্ত্রীসভা। তারপর ১৯৭৮ সনের ৫ই জানুয়ারী রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পাড়ায়-পাড়ায় সি. পি. আই. (এম) দল ঘরোয়া সভা, উঠান সভা ইত্যাদির উপর জোর দেয়। কৃষ্ণনগর, লেইক চৌমুহনী আমাব বাড়ির উল্টোদিকে ছিল প্রয়াত সহযোদ্ধা যুগললতা বৈদ্যর বাড়ি। ওনার বাড়ির উঠোনে একদিন উঠান সভা ডাকা হয়। বক্তা আরো অনেকের সঙ্গে ছিলেন কানু ঘোষ অর্থাৎ কানুদা। সেই সভায় কোলকাতা থেকে সদ্য আগত আমি ছিলাম নিছক এক শ্রোতা। অনেকেই নাতিদীর্ঘ বক্তব্য রাখেন সেই সভায়। সর্বশেষ বক্তা কানুদা। তিনি তাঁর অণুকরণীয় ভঙ্গিতে বলছিলেন জনতা আমলে মন্ত্রিসভায় ৪ জন সি. পি. এম. মন্ত্রীকে ৪টি টর্চলাইট হাতে দিয়ে আমরা পাঠিয়েছিলাম। কেন? জনতাদলের মন্ত্রীরা চুরি করলেই যাতে আমাদের মন্ত্রীরা টর্চলাইট টিপে সেইসব চোর মন্ত্রীদের হাতে নাতে ধরতে পারে। এমন সময় আমাদের পাড়ার বাড়ি বাড়ি কাজকরার ঠিকে ঝি বেলা সভা ছেড়ে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ায়। কানুদা বক্তৃতা থামিয়ে এমন ধমক দিলেন যে, বেলা সঙ্গে সঙ্গে উঠোনে বিছানো সতরঞ্জীতে বসে গেল। সভা শেষ। যার যেমন সবাই চলে গেছে। কিন্তু বেলা তো সতরঞ্জী ছেড়ে আর ওঠেনা। পরে বোঝা গেল, কানুদার ধমক খেয়ে বেচারীর কাপড় চোপড় নষ্ট হয়ে গেছে। লজ্জায় সে আর সভাস্থল ছেড়ে উঠতে পারছে না। কানুদা বক্তব্যের মাঝখানে সে প্রচণ্ড বাথরুম পাওয়ায় সভা থেকে উঠে প্রাকৃতিক কাজ সারতে বাইরে যেতে চেয়েছিল।

বিধানসভার নির্বাচনে ১৯৭৮ সনে বামফ্রন্ট পেল ৫৬টি আসন.আর টি.ইউ.জি পেয়েছিল ৪টি আসন। আমরা খুব দুঃখ পেয়েছিলাম এই ভেবে যে সর্বভারতীয় দল হিসাবে কংগ্রেস যদি ৪টি আসন পেত তবে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু আঞ্চলিক দলের প্রাদুর্ভাব পরে রাজ্য-রাজনীতিতে বেগ দেবে। ভবিষ্যত প্রমাণ করেছে আমাদের উদ্বেগ সঠিক ছিল। সেবারই উমাকান্ত স্কুলে ভোট গণনার সময় আমার পরিচয় হয়েছিল সমীররঞ্জন বর্মন এবং শচীন্দ্র দেওয়ানজীর সঙ্গে। দু'জনেই সেবার বিশালগড় এবং বড়জলা বিধানসভা কেন্দ্র



প্রথম বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভা

প্রথম সারি বাঁদিক থেকে— অনিল সরকার, দীনেশ দেববর্মা, বীরেন দত্ত, নৃপেন চক্রবর্তী, রাজ্যপাল লালনপ্রসাদ সিং, দশরথ দেব, খগেন দাস, যোগেশ চক্রবর্তী

দ্বিতীয় সারি বাঁদিক থেকে— বাদল চৌধুরী, বৈদ্যনাথ মজুমদার, আরবের রহমান, অভিরাম দেববর্মা ও সুধন্য দেববর্মা

থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। সমীররঞ্জন বর্মনের বিধানসভা কেন্দ্রে আমি সি.পি.আই (এম) দলের ভোটগণনা কর্মী ছিলাম। আমার টেবিলে সমীররঞ্জন বর্মন বসিয়ে দিলেন তার স্ত্রীকে ৪ ব্যাটাবির টর্চ দিয়ে। কারণ কি? সি.পি.আই (এম) দল ভোটকেন্দ্রেও কারচুপি করবে। বিদ্যুৎ চলে গিয়ে যদি অন্ধকার নেমে আসে তবে যাতে টর্চের আলোতে কারচুপি ধরে ফেলা যায় তারজন্য সমীর বর্মন প্রস্তুতি নিয়েই এসেছিল। অথচ আমরাই শংকিত ছিলাম কংগ্রেস দল কোন কৌশলে বে-আইনিভাবে ক্ষমতায় থাকার জন্য কোন অসদুপায় নেয় কিনা। যাহোক, বিদ্যুৎ যায়নি গণনা চলাকালিন সময়ে। সুতরাং সমীরদার স্ত্রীরও ৪ ব্যাটারির টর্চ জ্বালাতে হয়নি। কাকা-ভাতিজা দু'জনেই পরাজিত হয়েছিলেন। কাকা শচীন্দ্র দেওয়ানজী আর ভাতিজা সমীররঞ্জন বর্মন। নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার পর কাকা-ভাতিজা মুহূর্তের মধ্যে কিভাবে যে গণনা কেন্দ্র থেকে উমাকান্ত স্কুলের পেছন দিক দিয়ে বোর্ডিং অতিক্রম করে অন্তর্হিত হল সেটা আজো আমার কাছে রহস্য।

নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার পর আমবা মানে আমি, বিমল সিন্‌হা, গৌরমোহন সিন্‌হা এবং অন্য অনেকেই আশা করেছিলাম পার্বত্য ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ আদিবাসী জনগণের দীর্ঘদিনের বঞ্চনার অবসান ঘটাতে কমরেড দশরথ দেবকে মুখ্যমন্ত্রী করা হবে। আমরা দুরু দুরু বুকে পার্টির সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। পশ্চিমবাংলায় সি.পি.আই

(এম) পার্টি সম্পাদক, পলিটব্যুরো সদস্য প্রমোদ দাশগুপ্ত রাজ্যে এলেন। রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে সভা করে ঘোষণা করলেন ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হবেন নৃপেন চক্রবর্তী। আমরা খুব মর্মাহত হয়েছিলাম পার্টির এই সিদ্ধান্তে। কিন্তু পার্টি সদস্য হিসাবে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলাম পার্টি সিদ্ধান্ত।

কিন্তু আজো আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী যদি দশরথ দেব হতেন আর নৃপেন চক্রবর্তী পার্টির রাজ্য সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতেন তবে ত্রিপুরা রাজ্যে বামপন্থী আন্দোলন এভাবে বিভক্ত হওয়ার ঘটনা ঘটত না। অবশ্য সেটা আমার ব্যক্তিগত ধারণা। নির্বাচনের পর কেশবকে নিয়ে কোলকাতা গিয়ে মাসখানেক সেখানে থেকে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদ নির্বাচনের পর যখন আগরতলা ফিরে আসি তখন প্রায়ই আড়ালে আবডালে শুনতাম কিংবা আমার শুভানুধ্যায়ীরা এসে খবর দিত কারা কারা জোর প্রচার করছে আমি কোলকাতায় লক্ষ্মী বোসের অ্যালসেশিয়ান ডগ ছিলাম, ছাত্রপরিষদের গুণ্ডা ছিলাম। অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করতাম এ ধরনের নোংরা প্রচারের কুশীলবদের অধিকাংশই আমি কোলকাতা থাকাকালীন আমার প্রভাব কাজে লাগিয়ে নিজের নয়ত আত্মীয়-পরিজনদের ভর্তি, মার্কশিট রিভিউ, হোস্টেলে জায়গা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, রক্তের ব্যবস্থা, প্লেন বা ট্রেনের টিকিট কাটা কোন না কোন সুবিধা আমাব কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছে। সেই কৃতজ্ঞতার দায় পাছে না স্বীকার করতে হয় তাই আগাম আমার বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারে নেমে গিয়েছে। প্রথম প্রথম এসব প্রচার শুনলে খুব রেগে যেতাম। পরে ভেবেছি যাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে একটি নোংরা আবর্জনাময় দুর্গন্ধযুক্ত পাত্র বসানো আছে এরা কুৎসা না করে বাঁচবে কি করে? এদের জন্মই হয়েছে হীনমন্যতায় ভুগে যার থেকে দু'হাত ভরে পেয়েছে তাকে অস্বীকাব করার জন্য তার বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করা। এটি এক ধরনের রোগ। আস্তে আস্তে গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল এই প্রচার। এমন বহু রথী-মহারথীর মার্কশিট আজো আমার কাছে রয়ে গেছে যারা ১৯৭৮ সনে সি.পি.আই (এম) দল ক্ষমতায় না এলে কোলকাতা আইন পড়ার জন্য স্থায়ীভাবে চলে যাবে মনস্থ করে নিয়েছিল।

এসব হল বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা যা সামগ্রিক চিত্রকে প্রতিফলিত করতে পারে না। বাস্তব অবস্থা যেটা দেখেছি অসংখ্য সৎ, আদর্শবাদী যুবক-যুবতি পার্টিতে আমাদের অনুপস্থিতিতে এসেছিল কংগ্রেস রাজত্বের দুঃসহ জোয়াল কাঁধ থেকে নামিয়ে জনগণকে একটু স্বস্তি দেওয়ার জন্য। কিন্তু ক্রমেই তারা ক্ষমতার দম্ভে, পেশীশক্তির দাপটে আস্তে-আস্তে হারিয়ে গেছে। রাজ্য পার্টির বিভিন্ন স্তরে হাতেগোণা কিছু নেতাকে বাদ দিলে বাকি যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে কমিউনিস্ট সংস্কৃতি, মানবিক মূল্যবোধ, সততার ছিঁটেফোঁটাও অবশিষ্ট নেই।

ভয় হয় মনে আমাদের জীবদ্দশায় না দেখে যেতে হয় সব ব্যবধান ঘুচিয়ে বুর্জোয়া সংস্কৃতির সমগোত্রীয় হয়ে উঠেছে সাম্যবাদী সংস্কৃতি।

এই বিশ্বাস নিয়েই বেঁচে থাকতে চাই, যে মাটিতে জন্ম নিয়েছি এবং যার মাঝে অন্তর্লীন হব বলে শত প্রলোভন উপেক্ষা করে কোলকাতা ছেড়ে চলে এসেছি সে মাটি আমায় ফিরিয়ে দেবে না।